



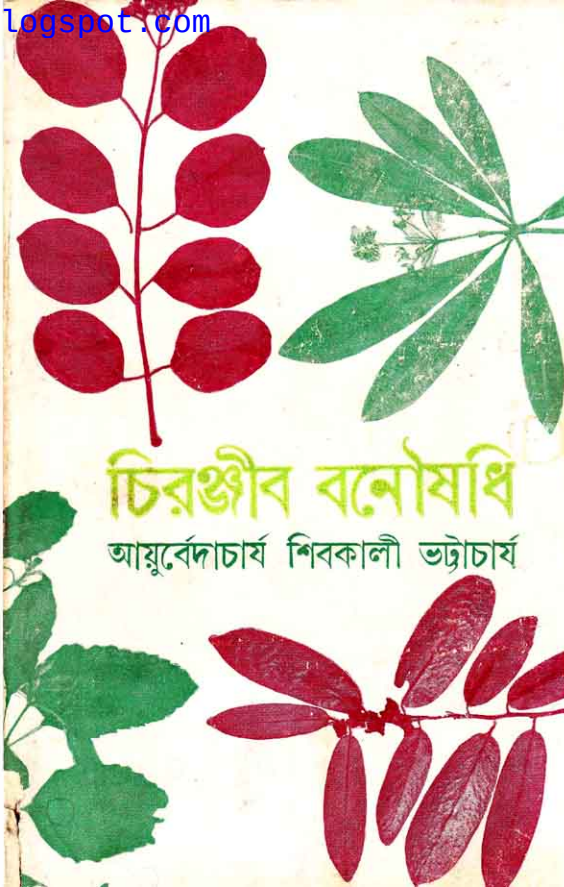
ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রকে যারা প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, তাদেরই উত্তরসূরী আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য। দেশভঙ্গপন্থ ও সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক মমতাবোধ এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি বিশাল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মৌলধারায় প্রবেশ করতেন ততী হন: "চিরঞ্জীব বনৌষধি" তাঁর সেই সুদীর্ঘ নিরলস অন্বেষণেরই ফলশ্রুতি।

প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমীকরণ এই গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক।

শিবকালীবাঈ দীর্ঘকাল ধরে এদেশের বনে, প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে চেনা-অচেনা মহাবান্ বনৌষধি সংগ্রহ করেছেন, পরীক্ষা করে দেখেছেন তাদের গুণাগুণ এবং বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ যে সম্ভব, তা তাঁর পরীক্ষার বার বার ধরা পড়েছে। দেশের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে জনসাধারণ যাতে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন, তাইই সবজি সজল নির্দেশক এই গ্রন্থ। তাঁর ভাষা সাহিত্যরসসম্পন্ন, মূল্যবান ও সহজবোধ্য। এক কথায়, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যরসের সার্থক যোগান এই গ্রন্থের একটি বড় সম্পদ।

# চিরঞ্জীব বনৌষধি

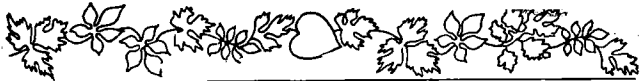
## আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য



পণ্ডিত স্বর্গত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের পুত্র শিবকালী ভট্টাচার্য জন্মেছেন ১৯০৮ সালে, অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায়। ছাত্রজীবনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঘটনা প্রবাহে এসে পড়েন কলকাতায়; অগ্রজ স্বর্গত কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্যের উৎসাহে তিনি আয়ুর্বেদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রখ্যাত আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ 'শচীন্দ্র বিনোদচন্দ্র', 'জ্যোতির বসুস্বামী', 'হারাম চক্রবর্তী', 'পদনাথ সেন', 'নলিনীরঞ্জন সেন' প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরবর্তীকালেও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ গি. কে. বসু, ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি, ডঃ বিজ্ঞান মুখার্জী, ডঃ এ. কে. বসু, ডঃ বি. সি. কুমার, ডঃ আর. এন. চক্রবর্তী প্রমুখ মনীষীদের সৌহৃদ্য লাভ করেন তিনি।

১৯৩৬-৪০-এর মধ্যে আয়ুর্বেদ ভেজের তি প্রদর্শনীর পরিচালনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি সফলকাম হন, আবার ১৯৬৪ সালে শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে আয়ুর্বেদ প্রদর্শনী শাখার ভারপ্রাপ্ত হয়ে যুক্ত সম্পাদনার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪২-৪৭ পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং ১৯৬৭ থেকে ও বঙ্গের ভৈজ্ঞানিকজ্ঞানে অধ্যাপনা করেন। ঐ সময় তিনি নিজেও উদ্ভিদবিজ্ঞানে জ্ঞানীপন্যাস, ছাত্র হ'য়ে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর নির্মিত জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৯ সালে স্টেট 'আয়ুর্বেদ ফার্মাসিউটিক্যাল' আয়ুর্বেদাচার্য উপাধি দান করেন।

আয়ুর্বেদের ঔষধ্য বিষয়ে এবং রাসায়নিক চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণামূলক করেছিলেন গ্রন্থের যত্ন-সম্পাদনার তিনি প্রখ্যাত অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সম্ভবতাকালে আয়ুর্বেদ পরিভাষা পরিচয় নামক একটি বিশিষ্ট গ্রন্থও তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল এবং সেটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়েছে।



## ভূমিকা

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতা কি? এই প্রশ্ন উঠিলেই মনে জাগে বেদের কথা। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানের বিশাল প্রাঙ্গণটি যে পূর্ণাঙ্গ রূপ লইতে চালাচ্ছে তাহাতে ভারতের দান সুমহান, তবে আমরা দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের অনুশীলনে বিরত ছিলাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিতে শাস্ত্রের অনুশীলন করি নাই।

বেদবিদ্যা-নিঃসৃত আয়ুর্বেদের দানকে বিংশ শতাব্দীর মানব-সভ্যতা নত শিরে গ্রহণ করিয়া সুদূর ভবিষ্যতকে সত্যদর্শনের পথে লইয়া চলিতেছে, এই সত্যদৃষ্টি লইয়া যাহারা আজ আয়ুর্বেদবিদ্যাকে দেখিতে চান তাহাদের হাতে তুলিয়া দিবার মত একখানি ভাল গ্রন্থ 'চিরজীব বনৌষধি'।

এই গ্রন্থে বেদের সূক্তি উল্লেখ করিয়া দেশীয় উদ্ভিদের পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম সুহৃদ আয়ুর্বেদের প্রাচীনকালের, মধ্যযুগের এবং আধুনিককালের চিকিৎসাবিদ্যার একখানি দর্পণ রচনা করিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং  
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।  
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োৱয়ং ক্রমঃ  
তব প্রসাদস্য পূরন্তু সম্পদঃ ॥

অর্থাৎ প্রথমে ফুল ফোটে তারপর ফল, প্রথমে মেঘ তারপর বৃষ্টি। কার্যকারণের ইহাই ক্রম, কিন্তু তোমার প্রসাদের পূর্বেই সম্পদের প্রাপ্তি হইয়াছে।

ঠিক এইভাবে স্রষ্টার করুণা উপলব্ধির জন্য জগতের রোগ দূর করিয়া দিতে প্রথমে ভেষজের প্রকাশ পরে আয়ুর্বেদের সৃষ্টি।—সৌহর্যমায়ার্বেদঃ ভৈষজ্যবেদমাদিশেৎ শাস্বতঃ।

আদিতে বেদ একাটাই ছিল, পরে বেদ বিভক্ত হয় চারভাগে। সমগ্র বেদের দ্বারা ই জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

শতং হাস্যভিষজঃ সহস্রং বিরুদ্ধঃ (অথর্ববেদ ২।৯।৩)—তুমি ভিষকরূপে এবং সহস্র সহস্র ভেষজ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতারূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হও।

বেদের সূক্তি অবলম্বন করিয়া ভারতে ভূরি ভূরি আয়ুর্বেদগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

যদিও সেই সব প্রাচীন গ্রন্থ বহুলাংশে দুর্লভ তথাপি পরবর্তীকালে ভেল, ক্লারপাণি, অগ্নিবেশ, নবনীতক প্রভৃতির রচিত কয়েকখানি সংহিতাগ্রন্থে তাহাদের সারসংকলন দেখিতে পাই।

কালের বিবর্তনে আলো, মাটি, জলের ন্যায় আয়ুর্বেদসংহিতাগুলিতেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে। এইসকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'। এই গ্রন্থে অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতীয় বনৌষধিগুলির পর্যালোচনা সম্পর্কে সমীক্ষাও করা হইয়াছে। প্রতিটি ভেষজের রাসায়নিক সংযুতির (Chemical composition) আলোচনার দ্বারা ভারতের বনৌষধির রস, গুণ, বীৰ্য বিপাক প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কতখানি কার্যকর তাহা এই গ্রন্থে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহকারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বিজ্ঞান অতিদেশের অভিব্যক্তিও (extended knowledge from Ayurveda) এই গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে, যে জ্ঞানের পরিণতি টোটকা ঔষধ।

সত্য কথা বলিতে কি, বর্তমান নববিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এইসব গাছ-গাছড়ার তৈয়ারী টোটকা ঔষধ রোগনিরাময়ের উপায় বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হয় না, কিন্তু এই পুস্তকে টোটকা ঔষধগুলির গুণাগুণসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাই করা হইয়াছে। দেহের কোন খাতুর বিকারে কি ধরনের রোগোৎপত্তি হয় তাহার সংবাদ দিয়া এই আলোচনা এক নতুন পথের সম্ভান দিতেছে।

গ্রন্থপরিশেষে “রোগ ও পথ্য” একটি সুচিন্তিত রচনা। চিকিৎসক কিংবা জনসাধারণ সকলেই অসুখ-বিসদুখের সময় পথ্য বিবেচনা বিষয়ে সমস্যায় পড়েন। যে কোন অসুখ হউক সাগু-বাঁলি আর হরলিক্স্ এবং আপেল-ন্যাসপাতি ছাড়া আর যেন কোন খাদ্যই আমাদের ভাবনায় আসে না। কিন্তু রোগের সূচনা হইতেই তাহার নিদান ও বিকাশের এবং রোগ নিরাময়ের সময়েও যে প্রচলিত ভারতীয় খাদ্য হইতে পৃথক পৃথক পথ্যের নির্দেশ দেওয়া যায় সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার নিজের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পাম্চাত্য এবং প্রাচ্য বৈজ্ঞানিকতার, প্রজ্ঞার সঙ্গে রস-বোধের এক মেলবন্ধন এই গ্রন্থটি।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের চিরাচরিত ধারাকে এই গ্রন্থ যেমন স্বমহিমায় দীপ্ত হইতে সাহায্য করিবে, সেইরূপ নব্য বিজ্ঞানীকেও অনেক নতুন তথ্যের সম্ভান দিবে। সাধারণ মানুষও এই গ্রন্থপাঠে রোগমুক্ত জীবনযাপনের পথ খুঁজিয়া পাইবেন।

এই গ্রন্থটি সকল দিক হইতে আমাদের হিতকারী ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থকার কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য আয়ুর্বেদাচার্য সদৃশী সদুৎসাহী লাব্ধ করিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধন করিতে থাকুন, ইহা সর্বথা কাম্য।

শ্রী অমরেন্দ্র চাকর



## গ্রন্থশংসন

বীজে অঙ্কুর হলেই গাছ হতে পারে এটা ভাবা সত্য, তবে ক্ষেত্র ও কাল তার উপযোগী হওয়া চাই।

এই গ্রন্থ-প্রকাশের একটা ইতিহাস আছে, যেটায় আমার বৈদ্যকজীবনে দু'টি কথা মনে দানা বেঁধে ছিল, সেটি হলো—কি ও কেন? এই নিয়েই আমার অনুশীলন-পরিক্রমা, গ্রন্থোক্ত প্রাতিটি নিবন্ধ পাঠ করলে সে অনুভূতিটা আপনারও হবে।

আমার বৈদ্যকজীবনের এক-একটি স্তরে ধাক্কা খেয়ে থেয়ে এক-একটি ক্রমের অভিজ্ঞতা এসেছে।

একবার দিল্লী থেকে সমৃদ্ধ ভেষজ কর্মটি এসেছিলো। সেই কর্মটির সদস্যরা ছিলেন সমগ্র ভারতের বাছাই করা বিদগ্ধ বৈদ্য, অন্য শাস্ত্রও পণ্ডিত; কলকাতায় অধিবেশনকালে তাঁদের সঙ্গে, আলোচনায় অংশগ্রহণও করেছিলাম। তাঁরা তারিফও করলেন বটে, কিন্তু আমার একটা ইন্‌ফিরিওরিটি কমপ্লেক্স (Inferiority complex) এসেছিলো তখন; যেহেতু পাশ্চাত্য বোটানিটা আমার অধিগত ছিল না।

নতুন করে ছাত্রজীবন আরম্ভ হলো আমার—শিবপুর বোটানিক্যাল্‌ গার্ডেনে। সকালে রুটি নিয়ে কলকাতা থেকে যাত্রা করতাম, সমস্তদিন গাছতলায় ঘুরি, নাম মধুস্ব করি, নতুন নতুন গাছের সঙ্গে পরিচিত হই। উত্তর বয়সে আমার উৎসাহ ও আগ্রহটা অনুকম্পার সঙ্গে দেখতেন ওখানকার জ্ঞানবৃদ্ধ আমার যোগীন্দ্রা (নস্কর), আর মহাদেববাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে ঘুরতাম; ওখানকার কতাব্যক্তি যারা, সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য আপনাদের জানাই—দিল্লী থেকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজে যে কর্মটি এসেছিলেন, তাঁরা প্রথমেই দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের হার-বোরিয়াম; তখন বেয়াকুবের হাসি হেসে বলতে হয়েছিলো—না, ওটা তো আমাদের নেই। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—নাঃ, এ অভাবটা আমাকে পূরণ করতেই হবে, করেছিও; আজ সেটাই আমার গ্রন্থ সংকলনের গাঠনিক কাজে লেগেছে। এই গ্রন্থে সম্মিবেশিত বনৌষধির ছবিগুণি তারই প্রতিচ্ছবি।

একবার বড়বাজারে মশলার দোকানে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক (সাম্প্রায়ার) মশলার ফর্দ দিচ্ছেন, উল্ভট উল্ভট নাম শুনে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এগুলি কি মশাই? উত্তর তো দিলেনই না, মনে হয়তো ভাবলেন—বেয়াকুবের সঙ্গে কি কথা কইবো! দোকানদার ভাবটা বুঝতে পেরে আমায় জানানলেন—এসব হেঁকিম জিনিষ। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম—নাঃ, এটা আমাকে জানতেই হবে। ৩ বৎসর হেঁকিম রেখে ওঁদের



কি কি আছে বনৌষধি এবং ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র থেকে কতগুলি তাঁরা গ্রহণ করে তাঁদের ঐ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেটার হিসাবও এইসঙ্গে হয়ে গেল। এ সবই সংগ্রহ করে চলেছি, এই সংগ্রহের বাতীক আমার বৈদ্যকজীবনের ৪০ বৎসর।

তারপর একদিন দেখা হলো—পাহাড় ঘুরে বেড়ানো মিঃ এ. সি. দে মহাশয়ের সঙ্গে; ইনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর হিমাচল প্রদেশের উত্তরাখণ্ডের পরিব্রাজক অফিসার। আমার স্দৃবধে হলো—হিমালয়ের গাছের সম্বন্ধের ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আহরণের। এই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে।

### দ্বিতীয় পর্ব

আনন্দবাজার পত্রিকা পাড়—কলকাতার কড়চায় বহু উদ্ভটের সম্বন্ধ দিয়ে থাকেন লেখক, আমিও তার শিকার ছলাম। তিনি হলেন সাংবাদিক গৌরীকিশোর ঘোষ—আমার সংগৃহীত ৮০০ শত (বর্তমানে ১০০০) বনৌষধির মধ্যে বেছে নিলেন ‘বিশল্যকরণী’; আমায় পরিচিত করলেন দেশের, দশের কাছে। ওখানকার কতাব্যক্তিদের ঔষুদ্য জাগলো, আরও সম্বন্ধ নিতে আসলেন সাংবাদিক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তিনিও মন্ত্র-মুগ্ধের মত সব শুনলেন, দেখলেনও সব খুঁটিয়ে। তাঁর লেখনী বাস্তব সত্যকে রূপায়িত করলো—আরম্ভ হলো আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার লেখা।

এই বনৌষধিগুলির লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। তখনই এই নিবন্ধ বিশেষ দ্রষ্টব্য বলে ব্যাখ্যাত হলো।

দূরদর্শী প্রখ্যাত সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী মহাশয় আয়ুর্বেদের ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আমার এই ফিচারটাকে ৬ বৎসর স্থান দিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

পরে বহু আবেদন আসতে লাগলো যে—এই লেখা দীর্ঘদিন ধরে চলছে, সব আমি পাইনি, হারিয়েও যাচ্ছে, এসব গ্রন্থাকারে প্রকাশ করুন। আজ তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর এম, এ; পি, এইচ ডি প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃত বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, মালা গাঁথায় পট্টরকম ফুল দিলে তবেই দেখতে ভাল হয়, সেইরকম এই “চিরঞ্জীব বনৌষধি” গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন ডঃ ফকিরচন্দ্র ঘোষ এম. এস-সি; পি, এইচ, ডি. (কলিকাতা), তিনি সংকলন করেছেন ভেষজের (Chemical Composition) অংশটি; ডঃ এস. আর. দাস এম. এস-সি., পি, এইচ, ডি, তিনি দেখেছেন বোটানী অংশটি; ডঃ নিরঞ্জন বসু এম. বি. (কলিকাতা) মহাশয় দেখেছেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্পর্কীয় তথ্যগুলি, আর লোকায়তিক কিছু কিছু ঔষধের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন কবিরাজ শ্রীমান্ স্দুবলকুমার মাইতি, আয়ুর্বেদতীর্থ; এ ভিন্ন লোকায়তিক ঔষধ সংকলনের আদি পর্বে আমায় সহায়তা করেছেন অনুরাধা (দাশগুপ্তা) এম. এস-সি।

এই গ্রন্থটি আপনাদের তৃপ্ত করলে আরও সেবা করার প্রয়াস পাবো।

বিনীত—

শিবকালী ভট্টাচার্য



## ভৈষজ্য দীক্ষার শ্রুতি (বেদ) পরম্পরা

পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডের আকাশ, বাতাস, জল, আগুনের তারতম্য খুব সহজেই উপলব্ধ হয়। ঋতুগুলিতে কালের একা থাকলেও তাদের স্বরূপগত এবং গুণ বৈশিষ্ট্যও পরিষ্কার অনুভূত হয়। ভাব, ভাষা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিও এক হয় না, এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই। এই সহজ বাস্তব রূপ উপলব্ধি করেই ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক সূত্র প্রণেতারা আমাদের অন্যতম নিকট প্রতিবেশী বৃক্ষলতাাদিও যে এমনি ছু, অগ্নি, বারি, আকাশ, বাতাসের তারতম্যের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সত্তায় অবস্থান করে এবং তারাও যেন স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় এবং অপরের ইচ্ছায় ভূতরের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা বদলে নিজেরা এবং তাদের সন্তানদের জন্য প্রিয় ভূমি যে নির্বাচন করে—এটার রূপ দিয়েছেন ঋক্ যজু, অথর্ববেদে এবং সংহিতার যজুগের বৃক্ষায়ুর্বেদে।

যজুর্বেদের মাধ্যম্ভিন শাখার ১২ অধ্যায়ে ৮০ সূত্র থেকে সুদীর্ঘ সম্পূর্ণ অধ্যায়-টিতে, ঋক্বেদের কয়েকটি মণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং অথর্ববেদের বৈদ্যককল্লেপের প্রায় সর্বত্রই বৈদ্যকগুরু সোমের কাছে বৃক্ষ লতাদির সমাগম এবং তাদের প্রত্যেকের কি কি রোগ দূর করার সামর্থ্য আছে তারই আলাপন।

সেই সূত্রটি এই—

“ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।

যস্মৈ কৃনোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজানং পারয়ামাসি।”

এখন দেখা যাচ্ছে সেই বৈদিকযুগে কথোপকথনচ্ছলে দ্রব্যগুলিকে অনুশীলনের সূত্র দিয়েছেন; পরবর্তীকালে অর্থাৎ সংহিতার যুগে সেটা গুরুশিষ্য সংবাদে রূপান্তরিত, সেইটাই আবার পরবর্তী যুগে ‘তদ্বিদ্যাসম্ভাষা’, যাকে বর্তমানের ভাষায় বলা হয় ‘সিম্পোসিয়াম’।

সেই বৈদ্যকগুরু সোমের কাছে মানবের কল্যাণে তাদের (অর্থাৎ বৃক্ষরাজির) কার কি রোগ নিরাময়ের দক্ষতা আছে সেটাই যেন তারা জ্ঞাপন করেছে। কেউ বললে—‘ষয়ধনঃ গৃভুচী’, আমি গৃভুচী, ফলো দূর করতে পারি; আবার কেউ বললে—‘নাশয়িষী বলাসস্য পৃশ্নিঃ’, ক্ষয়রোগ দূর করতে পারি আমি—পৃশ্নিপণী এই রকম ‘অশ্বসঃ অপামাগ’। আমি গৃদজাত অশ্ব দূর করতে পারি। ‘পাকায় নিগদুভীঃ’

আমি মদুখপাক, ক্ষত, বাতরোগ দূর করিতে পারি, আমি 'নিগদুন্দী'। সোম তখন ডাকলেন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃক্ষাদিকে; 'পলাশ-ধব-তমালানাঃ' অর্থাৎ পলাশ ধব তমাল অসন প্রভৃতিকে। সেখানে বলা হইয়াছে 'তামদুং মসোষধে বৃক্ষাঃ পরম্পরা উপন্তিরন্তু'।

অর্থাৎ উত্তম বৃক্ষগণ! তোমরা পরস্পর বলো কে কোন্ কোন্ ব্যাধি দূর করিতে পার? এমনি কল্পপ্রশ্ন তুলে বলা হইয়াছে যে, এরাও নিজের নিজের রোগনাশক যোগ্যতার কথা বললে—সোম তখন সকলকে একত্র করে বললেন—আপনারা সকলের কল্যাণের জন্য কি সর্বত্র যেতে পারেন? সেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে, কোথায় অর্থাৎ কোন্ কোন্ দেশে কোন্ গাছটি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে তারও ইঙ্গিত কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন—এমনকি কোন্ প্রাণীর ভক্ষ্য সে হ'তে পারে অর্থাৎ কোন্ প্রাণীর সে খাদ্য, সে কথাও বলা আছে।

ওষধির গুণ সম্পর্কে আরও কয়েকটি সূক্তের উল্লেখ করছি—

শর-শণ-অর্ঘ্যম্বষ্ঠা দেবজাতা বীরুং শপথরোপণী।

বদ্রো অর্জুনস্য কাণ্ডস্য যবস্য তেলাল্যা তিলস্য তিলপিপ্প্য।

এই যে শর, শণ এরা মদুখ পাপ দূর করে। এই দৈবশক্তি বীরুং অর্থাৎ লতাগুলি, এরা গ্রন্থি, ক্ষত প্রভৃতি রোপণ করে, অর্জুন পত্র, অর্জুনের কাণ্ড এরা হৃদয়বল সঞ্চার করে। এই যে যব, তিল, এরণ্ড, ক্ষার, উদ্ভরের তিমির দূর করে।

আর একটি ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে—

দশবৃক্ষ মদুগমাং রক্ষসো গ্রাহ্যা,

শং নো দেবী পশ্নিপর্ণ্যাশম্।

পাঠামিন্দ্র জলায় ভৈষজ্য

ইদং হিরণ্যং গদুগ্গদলুঃ।

অর্থাৎ অদৃশ্য অথচ ত্রিাশালী রাক্ষসগণ যে ইতস্তত বিচরণ করে সর্বপ্রকার প্রাণীদের অহিত সাধন করে (বৃক্ষলতাাদিরও), পশ্নিপর্ণীদেবী সকলের হিত সাধন করেন। ইন্দ্রবীজ, পাঠা এরা জলের অমৃতশক্তির মত হিত সাধন করে, এই যে গদুগ্গদলু এও হিরণ্যের শক্তিসঞ্চার করে। এর শক্তি সকলের হিতকর; ইনি জলের মধ্যে আত্মগোপন করে সকলের সুখায় বর্ধন করেন। এরপর সেই উদ্ভিদগণ সোমকে বললেন, 'ভূতার্ঘ্য প্রাণিনাং প্রাণাঃ বয়ং' অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে প্রাণিগণের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করুন। তাদের এই প্রেরণা বাণী শ্রুনে ওষধিরাজ সোম ঋষিদিগকে বললেন—'ভূতার্ঘ্য চিন্তাংচোদয়েৎ'; আপনারা জীবের কল্যাণের জন্য এই ভৈষজ্যগুলিকে উৎসর্গ করুন, এ'রা স্বভঃপ্রণোদিত হ'য়ে ব'লছেন, আমরা দেহ ও প্রাণ দিয়ে ভূত কল্যাণ করব।

এইভাবে ভারতে ভৈষজ্যদীক্ষা দান করা আছে বৈদিক সূক্তগুলিতে।

এই বক্তব্য থেকে এইটিই পরিষ্কট হ'য়ে উঠেছে যে, ভৈষজ্যবিদ্যার পারদর্শী হ'তে গেলে তাকে সৌম্যবিদ্যা অধিগত করতে হবে অর্থাৎ ভৈষজ্যের রাজা হ'লেন সোম। এবং সেই সোম আবার সৌরশক্তির অধীন; অর্থাৎ সর্বোর্ধ্ব সৌরবিদ্যা, মধ্যে সৌম্যবিদ্যা, পরে জানতে হবে রাজ্যবিদ্যা। অপরপক্ষে আমাদের কাছে একান্ত শিক্ষণীয় গ্রন্থীবিদ্যা অর্থাৎ সৌম্যবিদ্যা হ'লো দেহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান শিরোমধ্যস্থ মস্তিস্ক।

এখানকার শারীরবৃত্ত অধিগত না হ'লে বল, আরোগ্য এবং পুষ্টিদানকারী ভৈষজ্যশাস্তিকে তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন না, আর রাজবিদ্যা না জানা থাকলে দেশ, কাল, অবস্থা, পাত্র বিচার করে ভৈষজ্য প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না; এখানে কিন্তু দ্রব্যের আহাৰ্য্য রস ও বীৰ্যবতার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সামান্য বিচারটাও এই বিদ্যার অন্তর্গত। আর তৃতীয় হ'লো সৌরবিদ্যা। এর ম্বারা প্রতিটি ভৈষজের দ্রব্যশক্তি সোমধর্মী না সৌরধর্মী এবং গ্রহ, তিথি নক্ষত্রের প্রভাব কবে এবং কখন সেটাতে প্রভাবিত হয়, তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এই বিদ্যার অন্তর্গত। এর মধ্যে আছে তাদের বসতিস্থানের পৃথ্বীগুণ বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো। জলজ কুসুম বহু থাকলেও পশ্ম কেবল দিনেই ফোটে আর কুমুদ ফোটে রাতে, এই যে তার ভৈষজ্যশক্তির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, এর ম্বারা তার গুণগত বৈশিষ্ট্য কোন ক্ষেত্রে এবং রোগ নিরাময়ে তাকে বিপরীতভাবে কি করে প্রয়োগ করা যায় সেটি সৌরবিদ্যার অন্তর্গত।

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সূক্তের মধ্যে সোমবিদ্যা, রাজবিদ্যা এবং সৌরবিদ্যাই সংহিতার-কালে এসে 'ত্রিষাভূ বিদ্যা'। সেই ত্রিষাভূ বিদ্যা বা ত্রিষাভূ বিজ্ঞান বেদের কোনও সূক্তে স্পষ্ট ভাষায় নেই, তবে ওটি আমরা পাই ব্যাসকৃত চরণব্যূহের একটি অংশে এবং ঋকের ১।৩।৬ সূক্তে—

“ত্রিণো অশ্বিনা দিব্যানি ভৈষজাং শং যো সোমা, তেজসা যং  
সদন্তং ত্রিষাভূ শর্ম বম্বতাং।”

এই সূক্তের ভাষ্যে আচার্য সায়ণ বলেছেন—

‘ত্রিষাভূরিতি বাত পিত্ত শ্লেষ্ম ধাতু গ্রনোপশমনং শর্ম বহতাং—

অর্থাৎ সূক্তোক্ত ত্রিষাভূর অর্থই বায়ু, পিত্ত, কফ এবং তারাই সোম, তেজস এবং অপ্।

পরবর্তীকালে আরও বিশদীভূত হয় অখিল জগতের স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি ধাতুকে তাঁরা পণ্ডিতেরই সম্পদে (পেটিকা) রূপে দেখেছেন, অর্থাৎ বায়ুর আকার প্রকার ও প্রকৃতি বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত; পিত্তের এবং কফেরও; মানবান্দি প্রাণীর মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফের স্বাভাবিক প্রকৃতির মতোই বৃক্ষ লতাদিরও আকৃতি প্রকৃতিতে সাম্য দেখেছেন; তাঁরা এমনকি ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ, ব্যোমের মধ্যেও বায়ু, পিত্ত, কফের কোন গুণের আধিক্য আছে, তারই সঙ্গে সাম্য দেখেই নির্বাচন করেছেন যে বিশ্বব্যাপে রয়েছে ত্রিষাভূর প্রধান্য অপ্রাধান্য।

মানব দেহের দীর্ঘ, শ্বেত, কৃষ্ণ, মধ্যম, খর্ব এবং গোর, শ্যাম, কৃষ্ণ, রক্তাভ প্রভৃতি বর্ণের সাম্য দেখেছেন বৃক্ষলতাদির মধ্যেও, এই সাম্যজ্ঞানই তাঁদিকে প্রকৃতি বিকৃতির সাম্য অসাম্য জ্ঞানের প্রেরণার অনুশীলন জাগিয়েছে।

তাই বৃক্ষ-লতাদির সূক্ষ্মতা আর প্রাণীর দেহের সূক্ষ্মতার মধ্যে ঐক্য দেখেছেন বলেই স্থাবর জঙ্গমের মধ্যেই গুণগত, রূপগত, কর্মগত ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে ঐক্য দেখেছেন তাঁরা।

আবার সেই ঐক্য অনেকা বোধটির মধ্যেই দেখেছেন কালগত তারতম্যে অনৈক্যেরও সন্দিগ্ধ হচ্ছে। একের অনৈক্যে অপরের অনৈক্য না হওয়ার কারণও প্রাকৃত বৈষম্যের তারতম্যের জন্য, অনেকাই ব্যাধি সৃষ্টির মূল, একাই সূক্ষ্মতা। এইরূপ আদর্শবাদই আয়ুর্বেদের মৌল ভিত্তি।

www.boirboi.net



## সূচীপত্র

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| চৌদ্দশাক (১৪ প্রকার শাক) | ... | ১   |
| কলম্বী (কলমীশাক)         | ... | ৬   |
| বাস্তক (বেতোশাক)         | ... | ১০  |
| উপোদকী (পুঁইশাক)         | ... | ১৪  |
| গ্রীষ্মসুন্দরক (গিমেশাক) | ... | ১৯  |
| ছাণ্টী (থানকুনী)         | ... | ২৪  |
| শোভাজন (সজিনা বা সজনে)   | ... | ২৮  |
| পটোল (পলতা)              | ... | ৩৩  |
| নিম্ব (নিম)              | ... | ৩৭  |
| সুকন্দক (পেঁয়াজ)        | ... | ৪২  |
| রসোন (রসুন)              | ... | ৪৭  |
| আদ্রক (আদা)              | ... | ৫৫  |
| অলাবু (লাউ)              | ... | ৫৯  |
| কুম্ভাণ্ড (চালকুমড়া)    | ... | ৬৪  |
| সুনিষলক (সুবুণীশাক)      | ... | ৬৮  |
| তুলসী                    | ... | ৭৩  |
| শ্বেতচন্দন (সাদা চন্দন)  | ... | ৭৯  |
| রুদ্রাক্ষ                | ... | ৮৪  |
| হরিদ্রা (হলুদ)           | ... | ৮৮  |
| দুর্বা                   | ... | ৯৩  |
| সিন্দুবার (নিসিন্দা)     | ... | ১০০ |
| বিল্ব (বেল)              | ... | ১০৬ |
| আম্র (আম)                | ... | ১১১ |
| জম্বু (জাম)              | ... | ১১৬ |
| হরীতকী                   | ... | ১২০ |
| ধাত্রী (আমলকী)           | ... | ১২৪ |
| উদম্বর (যজ্ঞডম্বর)       | ... | ১২৯ |

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| বাসা (বাসক—শ্বেতপদ্ম)                 | ... | ১৩৪ |
| বাসা (বাসক—তাম্রপদ্ম)                 | ... | ১৩৯ |
| মুদ্রাস্তক (মুদ্রা)                   | ... | ১৪২ |
| উদ্দানক (শিরীষ)                       | ... | ১৪৬ |
| বংশ (বাঁশ)                            | ... | ১৫২ |
| কদম্ব (কদম)                           | ... | ১৫৭ |
| পদ্ম                                  | ... | ১৬২ |
| বুড়িগুয়াপান (ইন্দুরকানী ও মূষাকানী) | ... | ১৬৭ |
| অর্জুন                                | ... | ১৭০ |
| রক্তচন্দন (লাল চন্দন)                 | ... | ১৭৪ |
| জলজমানী (ছিলিহিষ্ট)                   | ... | ১৭৮ |
| মদয়ন্তিকা (মেদী বা মেহেদী)           | ... | ১৮২ |
| অন্তমূল                               | ... | ১৮৭ |
| যমদূতিকা (তেতুল)                      | ... | ১৯১ |
| তাম্বুল (পান)                         | ... | ১৯৭ |
| অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী)                  | ... | ২০১ |
| লবলী (নোয়াড়)                        | ... | ২০৭ |
| দারুহরিদ্রা                           | ... | ২১২ |
| সহদেবী                                | ... | ২১৭ |
| বব্বর (বাবলা)                         | ... | ২২৩ |
| প্রসারণী (গন্ধভাদুলে বা গদিাল)        | ... | ২২৯ |
| চণক (ছোলা)                            | ... | ২৩৩ |
| আঢ়কী (অড়হর)                         | ... | ২৩৭ |
| তর্বাদক (খেসারী)                      | ... | ২৪১ |
| দাড়িম্ব (দাড়িম)                     | ... | ২৪৬ |
| শারিরা (অনন্তমূল)                     | ... | ২৫২ |
| এরুণ্ড (রেড়ী)                        | ... | ২৫৭ |
| গুড়ুচী (গুলুগ)                       | ... | ২৬৪ |
| ভৃগুরাজ (ভীমরাজ)                      | ... | ২৭১ |
| শ্রীহস্তিনী (হাতিশুড়ো)               | ... | ২৭৬ |
| ধূতর (ধূতরা)                          | ... | ২৮০ |
| তিন্দুক (গাব)                         | ... | ২৮৬ |
| গন্ধনাকুলী (বড়চাঁদড়)                | ... | ২৯০ |
| সপ'গন্ধা (ছোটচাঁদড়)                  | ... | ২৯৫ |
| রুদ্রান্তিকা                          | ... | ৩০০ |
| তিথিভেদে খাদ্যে বাছ-বিচার কেন?        | ... | ৩০৫ |
| রোগ ও পথ্য                            | ... | ৩১১ |
| রোগানুসারিণী সূচী                     | ... | ৩৫৭ |





## রোগ ও পথ্যের সূচী

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| প্রকৃতি বিচার                                | ...  | ৩১১ |
| বায়ুপ্রধান ব্যক্তির প্রকৃতি ও খাদ্যাখাদ্য   | ৩১২, | ৩১৩ |
| পিত্তপ্রধান ব্যক্তির প্রকৃতি ও খাদ্যাখাদ্য   | ...  | ৩১৩ |
| শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির প্রকৃতি ও খাদ্যাখাদ্য | ...  | ৩১৪ |
| জ্বরের পথ্যাপথ্য                             | ...  | ৩১৫ |
| নবজ্বরে                                      | ...  | ৩১৫ |
| জ্বররতিসারে                                  | ...  | ৩১৬ |
| গ্রহণীতে                                     | ...  | ৩১৭ |
| অশরোগে                                       | ...  | ৩১৮ |
| অগ্নিবিকারে (অগ্নিমান্দ্য)                   | ...  | ৩১৮ |
| ক্লিমরোগে                                    | ...  | ৩১৯ |
| পান্ডু ও কামলা রোগে                          | ...  | ৩২০ |
| রক্তপিণ্ডে                                   | ...  | ৩২১ |
| যক্ষ্মারোগে                                  | ...  | ৩২২ |
| কাসরোগে                                      | ...  | ৩২৩ |
| শ্বাস ও হিক্কার                              | ...  | ৩২৪ |
| স্বরভঙ্গে                                    | ...  | ৩২৫ |
| অরুচিতে                                      | ...  | ৩২৫ |
| হৃদিতে (বমি)                                 | ...  | ৩২৬ |
| তৃষ্ণা (পিপাসা) রোগে                         | ...  | ৩২৭ |
| উন্মাদে                                      | ...  | ৩২৭ |
| অপস্মারে                                     | ...  | ৩২৯ |
| বাতব্যাধিতে                                  | ...  | ৩২৯ |
| বাতরক্তে                                     | ...  | ৩৩০ |
| আমবাতে                                       | ...  | ৩৩১ |
| শূল রোগে                                     | ...  | ৩৩২ |

|                                                     |     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| উদাবর্ত ও আনাহে                                     | ... | ৩৩৩ |
| গদ্বন্দ্ব রোগে                                      | ... | ৩৩৪ |
| হৃদরোগে                                             | ... | ৩৩৪ |
| মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে                                   | ... | ৩৩৫ |
| মেদোরোগে                                            | ... | ৩৩৬ |
| উদর রোগ, প্লীহা-যকৃত রোগ ও শোথ রোগে                 | ... | ৩৩৬ |
| বৃন্দ (হাইড্রোসিস) রোগে                             | ... | ৩৩৭ |
| গলগণ্ডে                                             | ... | ৩৩৮ |
| শলীপদ বা গোদ রোগে                                   | ... | ৩৩৮ |
| ভগন্দরে                                             | ... | ৩৩৯ |
| কুষ্ঠ রোগে                                          | ... | ৩৩৯ |
| অম্লপিপ্ত রোগে                                      | ... | ৩৪০ |
| বিসর্প, অগ্নিবিসর্প, কদম্ববিসর্প ও<br>গ্রন্থিবিসর্প | ... | ৩৪১ |
| বসন্তরোগে                                           | ... | ৩৪২ |
| ক্ষুদ্র রোগে                                        | ... | ৩৪৩ |
| উর্ধ্বজঘদ্রুগত রোগে                                 | ... | ৩৪৪ |
| মুখ রোগে                                            | ... | ৩৪৪ |
| কর্ণ রোগে                                           | ... | ৩৪৪ |
| নাসা রোগে                                           | ... | ৩৪৫ |
| নেত্ররোগে                                           | ... | ৩৪৫ |
| শিরোরোগে                                            | ... | ৩৪৬ |
| অঙ্গদর বা রক্তপ্রদরে                                | ... | ৩৪৭ |
| যোনিব্যাপদে                                         | ... | ৩৪৭ |
| গর্ভিনী রোগে                                        | ... | ৩৪৮ |
| শিশুরোগে                                            | ... | ৩৪৮ |
| বিষরোগে                                             | ... | ৩৪৯ |
| মস্তিস্ক ও স্নায়ুরোগে                              | ... | ৩৪৯ |
| বিরুদ্ধাচরণে বিপর্যয়                               | ... | ৩৫০ |
| সংযোগ-বিরুদ্ধের দ্বারা কি                           | ... | ৩৫১ |



## চৌদ্দশাক

চৌদ্দশাক খেলে নারিক কার্তিকের টান থেকে রেহাই পাওয়া যায়; কারণ এই মাসে যমের বাড়ির ৮টি দরজা খোলা থাকে,—এই প্রবাদটি আজও গ্রামের মানুষের মনে মনে ফেরে।

যদি এটিকে গেলো বাচস্পতি শাস্ত্রের কথা বলে উড়িয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু এ কথাটার যে একটা মৌল কারণ আছে এবং তার পিছনে বিজ্ঞানও যে আছে, সেটার অনুসন্ধান অগোচরেই বা থাকে কেন? এটা তো ঠিক যে তখনকার যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এদিকে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে, এবং ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দনের গ্রন্থাবলীতেও।

ঋতুজ ব্যাধি প্রতিরোধার্থে কালোপযোগী ব্যবস্থাও তখনকার দিনে প্রচলিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুজ ব্যাধির আগমন হয়, তবে বাংলায় ঋতুগুলি প্রকট হয় বেশী, তাই তাঁদের মতে আশ্বিন-কার্তিকের সময়টা যমদংশু কাল বলে উল্লেখিত।

তদানীন্তন কালের বাংলার নব্য-স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন (১৬ শতাব্দী) তাঁর অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অন্যতম গ্রন্থ “কৃত্যতত্ত্বে” এগুলিকে উল্লেখিত করেছেন “নির্ণয়া-মৃতের” (একটি প্রাচীন স্মৃতির গ্রন্থ) অভিমত অনুসরণ করে—

“ওলং কেমুকবাস্তুকং, সার্বপংচ নিম্বং জয়াং।

শালিগুণীং হিলমোচিকাণ্ড পটুকং শেলুকং গড়ুচীলিত্থা।

ভণ্টাকীং সূনিষম্বকং শিবিদিনে খাদান্তি যে মানবাঃ,

প্রেতং ন চ যান্তি কার্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিত্থৌ।”

অর্থাৎ এই চৌদ্দটি শাক কাতিৰ্ক মাসে ভূত-চতুর্দশীর দিনে (দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্বদিন) যিনি সেবন করেন, যমের আশ্রয় তাঁর কাছ থেকে অনেক দূর।

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্মার্ত পণ্ডিতদের মতভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু ভূত-চতুর্দশীর কৃত্য হিসেবে বাংলার রঘুনন্দনের মতে যা উল্লেখিত সে সম্বন্ধে বাস্তব বিজ্ঞানোচিত ধারার এগুনের স্বভাব প্রকৃতি প্রকাশ করা হলো। এই শাকগুলির প্রচলিত নাম— (১) ওল (*Amarphophallus campanulatus*), (২) কেউ (*Costus speciosus*), (৩) বেতো (*Chenopodium album*), (৪) কালকাসুন্দে (*Cassia sophora*), (৫) সরিষা (*Brassica campestris*), (৬) নিম (*Azadirachta indica*), (৭) জয়ন্তী (*Sesbania sesban*), (৮) শালিগু (শাণ্ডে) (*Alternanthera sessilis*), (৯) গুড়ুচী (গুলগু পাতা নেওয়া হয়) (*Tinospora cardifolia*), (১০) পটুক (পটোল পত্র) (*Trichosanthes dioica*), (১১) শেলুকা (*Cordia dichotoma*), (১২) হিলমোচিকা (হিণ্ডে) (*Enhydra fluctuans*), (১৩) ভটাকী (ঘেঁটু বা ভাঁট) (*Clerodendrum infortunatum*) (১৪) স্দুনিষলক (স্দুদুনী শাক) (*Marsilea quadrifolia*).

এদের কোনটার বা সমগ্র, কোনটার বা পাতা শাক হিসেবে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করার উপদেশ, কিন্তু এর প্রতিটিই ওষধি-গুণসম্পন্ন। এদের মধ্যে ওলের শাকটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তার চরিত্রগুণে, তাই আমরা উপমা দিয়ে থাকি— “চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল প্রামাণিক”—এহেন ওলের শক্তি কম নয়, সে অশ রোগের বড় ঔষধ—তাই তার এক নাম অশৌষ্য। যা অর্থে নাশ করা। ক্রিমিকে প্রতিহত করে কেউ ও ঘেঁটু পাতা; লিভারকে শাসন করে বেতো শাক; কাসকে মর্দিত করে কালকাসুন্দে, তাই তার নাম “কাসমর্দ”, পিত্তজ চর্মরোগকে নষ্ট করে নিম। সঞ্চিত পিত্তদোষকে সংশোধন করে পটোল পত্র (পলতা)। বায়ুবিকার দূর করে গুলগুপত্র। ঋতুপরিবর্তনজনিত তরুণ সর্দির হাত থেকে বাঁচায় জয়ন্তী পাতা; এদের মধ্যে এক সরষে শাকের বদনামই বেশী; তবে সে মলমূত্রের সারল্য আনে (অবশ্য সংস্কার সাধন করলে) স্দুস্থ থাকতে গেলে এরও তো প্রয়োজন যথেষ্ট। শেলুকা (কোন কোন মতে শুল্ফা) এটি ক্লেদাবধক ও রুচিকারক। সর্বশেষে স্দুদুনী শাকের কথা বলি— এটি দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে স্নিগ্ধ করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

চৌদ্দটির প্রতিটি গাছ সন্মিলিত বা এককভাবে বহু রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

এই শাক শব্দটির অর্থ আয়ুর্বেদে ব্যাপক, যেমন—

‘পঠং পুত্ৰং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।

শাকং ষড়্‌বিধমুদ্ভিদং গুরুং বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্।’

আমরা যতরকম সজ্জ ব্যবহার করি, এগুলিকে ৬টি পর্বায়ে ভাগ করা হয়েছে। (১) পালং, নটে, পুইশাক, বাঁধাকপি ইত্যাদি পত্রশাক। (২) ফুলকপি, মোচা, বকফুল ইত্যাদি পুষ্পশাক। (৩) লাউ, কুমড়া, বেগুন, ঢেঁড়স, পেঁপে হচ্ছে ফলশাক। (৪) ওল, কচু, লাউ, কুমড়া, শালুক ফুলের ডাঁটাগুলি নালশাক। (৫) আলু, ওল, কচু, মলো—এরা কন্দশাক। (৬) পাতালকোড়ি, ভূইছাতা (*Agaricus campestris*) হচ্ছে সংস্বেদজ শাক। এগুলি উত্তরোত্তর গুরুপাক অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক

প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে সব থেকে লঘু হচ্ছে পর-জাতীয় শাক। তবে বর্ষাকালের শাকে বিসর্গকালের স্বভাবে বেশী বর্ষণ-জন্য তেজোগুণ সমৃদ্ধ হতে পারে না, তার উপর বর্ষা ঋতু তার স্বভাবধর্মের পরিপাক শক্তিকে কমিয়ে দেয়, সেজন্য মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব বর্ষাকালে শাক কম খাওয়া উচিত। পক্ষান্তরে শরতের শাক তেজোগুণান্বিত হয়ে খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ হয়। এই শরৎকালেই শাক খাওয়ার প্রারম্ভিককাল বলা যেতে পারে।

চৌদ্দ শাক খাওয়ার মধ্যে আর একটি অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে চরক সংহিতার একটি শ্লোক বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য, যথা—

‘বর্ষাশীতোচিতাঙ্গনাং সহসৈবাক’ রশ্মিভিঃ।

ততনামাচিতং পিত্তং প্রায়ঃ শরদি কুপ্যতি॥’

ভাবার্থ হচ্ছে—বর্ষাকালের শীতান্ত দেহ শরদাগমে সহসাই সুবর্ষাশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত হওয়াতে শরৎকালে প্রায়ই পিত্তের প্রকোপ হয়। এইহেতু এই দ্রব্যগুলির একক অথবা সমষ্টিগত ব্যবহার ধর্মের অনুশাসনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর সঙ্গে আসলে স্বাস্থ্য-ধর্মের সম্পর্ক আছে বলে মনে করি।

এ সম্পর্কে একটা কথা—চৌদ্দ শাকের সেবন কি শুধু একদিনের জন্য? তাতেই কি অকালজ প্রেতমুক্তি?

হ্যাঁ প্রশ্নের মত প্রশ্ন। তার উত্তর এই—বৎসরে এক চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই ছাতু খাওয়া, একদিনই বনভোজনের রীতি প্রচলিত; একদিনই কুল বেতো খাওয়া, তিনদিন অম্বু-বাচীর বিধি-বিধান—এগুলি পূরণ বাচী নয়, সংখ্যা বাচী অর্থাৎ এদিন থেকে সূর্য। কিন্তু অতীতের উল্লেখ অতীতের জন্যই নয়, বর্তমানের জন্যই অতীতের বাণী, অর্থাৎ তাঁরা ক’রে ছিলেন ভবিষ্যদ্বাণী।

বর্তমান যুগে আমাদের এসব চিন্তাধারা মন থেকে মুছে যাচ্ছে। ছোটবেলায় দেখেছি—ঠাকুমা, পিসিমার মুখে মুখে ছিল চৌদ্দ শাকের ফর্দ; এখনও দেখা যায় পুরাতনী ধারায় চলা মানুষেরা এই সব শাক যোগাড় ক’রে চৌদ্দশাক খেয়ে থাকেন। যারা নবীন তাঁরা হয়তো এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনেকে জানেন না এবং জানার চেষ্টাও করেন না, আমরা অনেকে তাই তাকে আখ্যা দিয়ে থাকি কুসংস্কার। ভূতচতুর্দশীর দিনটি প্রারম্ভিক সূচনা, আসলে ঐ একটি দিন মাত্র খেয়েই ব্রতপালনের উদ্ঘাপন নয়, নিয়তই এদের দুটি-তিনটি বা কয়েকটি মিলিয়েও খাওয়া যায়।

শাক—এই নিবন্ধে শাক-প্রসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যতগুলি বৈদিক ও লৌকিক খাদ্য রয়েছে, সকলের মধ্যেই শাক শব্দটির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কোন না কোনটি জড়িয়ে আছে। বৈদিক সংস্কৃতি ঋক্বেদের ৬।২৪।৪ সূক্তে দেখা যায়—শাক নামে একটি দ্বীপে অর্ষদের অনেকে গোষ্ঠী-বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেন। এইখানে ঋক্বেদের “শাকল” পক্ষান্তরে বাস্কল শাখার জন্ম হয়। এখানের বাসিন্দারা শাক আহার করতেন। তাঁরা যখন আরও ছড়িয়ে পড়েন, তাঁদের পরিচয় “শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ”, কথাটা এই যে প্রাণীজ মাংসপ্রধান আহাৰ্য অপেক্ষা শাকাহারেই তাঁদের পরিচয়।

শাকদ্বীপটি জয় করেছিলেন মহাবীর অর্জুন—এ প্রসঙ্গ আছে মহাভারতের সভা-পর্বের ২৬ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে—

স তেন সহিতো রাজন্ সবাসাচী পরন্তপঃ।

বিজিগ্যে দ্বীপং শাকং তি প্রতিবিন্ধ্যা চ পার্থিবম্॥

এই ম্বীপটি ভারতের পূর্বদিকে। তারপর ঐ ম্বীপেই আর একটি ভূখণ্ড আছে, কালান্তরের নাম তার ‘শাকম্ভর তীর্থ’। এই তীর্থে এসেছিলেন যদুধিষ্ঠির প্রভৃতি। এই তীর্থের নাম প্রসঙ্গে একটি চমৎকার প্রবাদ আছে। এটি আছে মহাভারতের বনপর্বের ৮৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে। সেখানে পুন্সত্য বলছেন—যদুধিষ্ঠিরকে—আপনি তারপর শাকতীর্থে যাবেন। ঐখানেই দেবীর শাকম্ভরী নাম। ওখানের অধিবাসীগণ শাক আহার করতেন এবং দেবী শাকম্ভরী হয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন এবং শাক আহার করেছিলেন। তাই তাঁর নাম শাকম্ভরী। তিনি যখন আগমন করেন ঋষিবৃন্দ তাঁকে শাকাহারের দ্বারা অভ্যর্থনা করেছিলেন।

‘শাকম্ভরীতি বিখ্যাতা হিষু লোকেষু বিশ্রুতা।  
দিবাং বর্ষসহস্রং হি শাকেন কিল সুব্রতা॥  
আহারং সা কৃতবতী মাসি মাসি নরাধিপাঃ।  
ঋষয়োহভ্যাগতান্তত্র দেব্যা ভক্ত্যা তপোধনাঃ॥  
আতিথ্যং চ কৃতং তেষাং শাকেন কিল ভারত।  
ততঃ শাকম্ভরীতি বৈ নাম তস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম॥  
হিরাদ্রং মূষিতং শাকং ভক্ষয়িত্বা নরঃ শৃচিঃ।  
শাকাহারস্য যৎকিঞ্চিৎ বর্ষে দ্বাদশভিঃ কৃতম্॥  
এবং যৈ স্তু কৃতং পুণ্যং চতুর্দশ্যাং মহাতিথৌ।  
তৎফলং তস্য ভবতি দেব্যাশ্চন্দেন ভারত॥’

অর্থাৎ সেই দেবী যেমন শাকের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে শাকাহার ক’রে তপস্যা করেছিলেন, তেমনি ক’রে কেবল শাকের দ্বারাই যিনি দেবীকে চতুর্দশীদিনে তৃপ্ত করেন, তিনি অশেষ পুণ্যলাভ করেন। দেবী শাকম্ভরী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অত্যুত্তম বর দেন। তাছাড়া শৃঙ্গ শাকাহার ক’রে একমাস ব্রত করলে অশ্বমেধ ফললাভ হয়—

‘যদি তত্র বসেন্মাসং শাকাহারো নরাধিপ।  
সন্ধানং লভতে পুণ্যং বাজিমেষ ফলং তথা॥’

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়—ঋক্বেদের বাস্কল বা শাকম্বীপী ব্রাহ্মণগণই এই শাক-চতুর্দশীরতের প্রবর্তন করেছেন। তাও আবার ভারতের পূর্বদেশে এই বাংলাতেই বেশী প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণের আচার চতুর্দশীতে দেবীকে শাক নিবেদন করা।

ভৈষজ্যগুণাবলীর প্রসঙ্গে পত্র এবং সংস্বেদজ শাককে নিরামিষ আহার বলা হয় না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের শাকের বিশেষ ভৈষজ্য-শক্তি নিহিত আছে যড়প্রকার শাকের মধ্যে। এ অভিমত ভাবপ্রকাশের। কিন্তু অমর সিংহ তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন—দশবিধ শাক।

মনু তাঁর সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২২৬ শ্লোকে শাকাহারকে ‘নিরামিষ বাঞ্জন’ বলেছেন—‘গুণাংশ্চ সূপ শাকাদ্যান্ পয়োদধি-ঘৃতান্ মধু।

শাকের বলবীৰ্য্য সম্বন্ধে চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা প্রচুর তথ্য দিয়েছেন—ওখানে আমিষ-নিরামিষের প্রভেদ নাই। অবশ্য শাকের সাধারণ নামেই তার তাৎপর্য।

এদিকে চণ্ডীনামক একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে—‘ভবিষ্যামি সূরাঃ শাকৈঃ আবৃষ্টিঃ

প্রাণধারকঃ।—বৃষ্টি হোক না হোক, কেবল শাকের দ্বারা প্রাণধারণ করেই আমি লোক-জগতে আবির্ভূত হব। এখানে পর শাকই বস্তু নয়।

চৌদ্দশাকের তালিকায় যে নামগুলি পাওয়া যায়, চরক-সুশ্রুতের যুগে সেগুলির দ্ব্যর্থাক্তি চরমভাবে নিরূপিত হয়েছিল।

শাকে প্রাণপ্রাচুর্য সাধিত হয়। হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতির প্রচুর প্রাণবীৰ্য শাকাহারের দ্বারাই সাধিত হয়।

ভারতের মাতৃভূমির সাধকগণ দুর্গার কৃষিকল্প মূর্তির পূজায় তাঁকে শাকিনী বলেছেন। দেবীর আরাধনায় যত রীতি এবং ক্ষেত্র আছে, তাদের মধ্যে যারা তাকে কৃষিলক্ষ্মী বলে আরাধনা করেন, তাঁরা তাঁকে শাকিনী অর্থাৎ শাক নৈবেদ্য দ্বারা প্রসন্ন হন বলে জানবেন। মনসার অপর নাম শাকিনী—তাঁর পূজার প্রধান উপকরণ শাক। ওখানেও শুদ্ধ পত্রশাক নয়।

চরকের হরিতবর্ণের মধ্যে শাকের পাঠ আছে—

শাক শব্দটি কিন্তু কেবল লতা বা বৃক্ষের পাতাকে বোঝায় না। শক্তি+ঘঞ্+ন—অর্থাৎ পাতা, ফল, ফল, নাল, কন্দ এবং পুরাণ পচা মাটিতেও যে গাছ জন্মে (ছত্রাক), সবই শাক। ওল ভাতে, মান সিদ্ধ, পটোল সিদ্ধ, বকফুল ভাজা, কাঁচাকলা সিদ্ধ, লাউ-কুমড়োর ডাঁটা খেলেও তাকে শাক খাওয়াই বলা হবে। অথবা আমরা যেসব ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি তাও শাকাহারেরই বিভিন্ন রূপ।

এখানে চৌদ্দশাক খাওয়ার মধ্যে পাতাশাক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ওইসব ভেষজ-গুণসম্পন্ন—সকলেই শাক পর্যায়ে। সেইজন্য শাকাহার, শাকম্বীপ, শাকম্ভরী, শাকিনী ইত্যাদি নামের মধ্যে কেবল পাতা শাকই আমাদের আহাৰ্য—এটা সেখানে বস্তু নয়।



## কলম্বী

“হ্যাঁরে, বর্ষাকালে কি কলমীশাক খেতে আছে? এখন যে গ্রীষ্মের শয়ন হয়েছে।”  
—পিসিমার এই কথা হয়তো একটা নিছক অশ্বসংস্কার থেকে, কিন্তু এই নিষেধের মধ্যেই যে সাবধানবাণী নিহিত রয়েছে, তা তো দেখাচ্ছ সেই বৈদিক যুগেই উচ্চারিত।  
পরবর্তীকালে হয়তো বা সেটা স্মার্তসংস্কারের মাধ্যমে তাকে জনমনে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছিল। বর্তমানে আলোচ্য সেই কলমীশাক—

অজ্ঞানার যুগে

‘প্রাবৃষেণ্যা যোনাভবাগোঃ কড়ম্বী সংবিদানান্ জন্তুন্।  
অসদ্বন্ স্তেনাস্যোতান্ পদুরীষ্য মণিং রয়িং যোনিমিহাষদঃ’ ॥

(—অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প—৮৫৩/৬৩/৬)

মহীধর ভাষ্য করেছেন—

প্রাবৃষেণ্যা=বর্ষাস, জাতা

কড়ম্বীতি=কে=জলে

ডম্বতে=লম্বতে, যা সা যোনাভবা গোঃ=গবাং

সংবিদানান্=জন্তুন্ ধারয়ন্তীতি যোনাভবা=বধাশ্রিকা—

ভবা, অপিচ যে জন্তবঃ স্তেনাস্যোতা সন্তঃ

অসদ্বন্=প্রাণান্ ধৃত্ব তান্ ধারয়সি। পদুরীষ্য

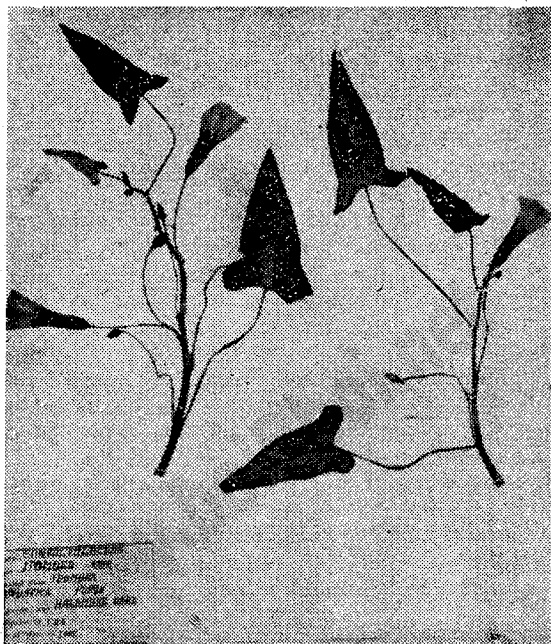
অগ্নিং রয়িং অন্নপ্রাণঃ=শুদ্ধঃ তং আষদঃ

আবসথ। রয়িং লবং চ যোনেঃ স্নেহবর্ধনাং

যোনেরপি ত্বং ইহ আষদঃ বলং তন্ধারণ্যসি।



সূক্ত আর ভাষ্যের অর্থ হলো—তুমি বর্ষা ঋজে জলে বিম্বিত হয়ে ভ্রমণ কর, তাই তুমি কড়ম্বী (কে অর্থে জলে, তাতে যে লম্বা হয়ে লাতিয়ে ভ্রমণ করে)। ওই বর্ষাতেই গো-সকলের প্রাণঘাতী জন্তুগুলিকে তুমি তোমার দেহে স্থান দাও। আর যেসব জন্তু চুরি করে মানবদেহের পদরীষে প্রবেশ করে, তাদিকেও তুমি ধারণ কর। তুমি অশ্বের প্রাণ শত্রু ও স্নেহের বর্ধনে ঘোনির বলকেও ধারণ কর।



উপরি-উক্ত সূক্তে কাব্যিক ভাষার মাধ্যমে দোষণদূণের পরিচয় দিয়ে ভেজষ লতাটির নামকরণ কড়ম্বী; আবার সেই কড়ম্বীই ব্যাকরণের সূত্র ধরে কলম্বী হয়ে গেল, পরবর্তীকালে লোককথায় এসে কলমী নামে পরিচিত হলো; অবশ্য চরক সংহিতায় একে বলা হয়েছে ‘কলম্ব’।

#### আয়ুর্বেদবেত্তার বিচারে—

যা আমাদের তরকারি তার প্রাচীন পরিভাষা শাক, অর্থাৎ বাজ্ঞন যতই হোক সবই তরকারি—এটা হিন্দী থেকেই এসেছে। এর কোনটা ফলশাক—যেমন লাউ, কুমড়া; কোনটা পত্রশাক—যেমন পালং, নটে। এই রকম পুতুপ, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ—মোট ৬ প্রকার শাকের ভেদ। যে কোন তরকারিই হোক শাক, সেটা এই বাংলা ছেড়ে পশ্চিমের দিকে গেলেই জানা যাবে।

দ্বয়ামাত্রেরই রস গৃহণ, বীৰ্য, থাকবেই, তার সঙ্গে থাকে রসের দোষ বিকার, সেই দোষ অংশকে সরিয়ে তার গুণের অংশ কি করে গ্রহণ করা যেতে পারে, এবং তার পদ্ধতিই বা কি, সে সম্পর্কেও প্রাচীনগণ একটি নির্দেশ দিয়েছেন। এই নিবন্ধোক্ত কলমীর আরও একটি বিশেষ অবস্থা ‘ঋতু কালজ’ রস বিকার। এ সম্পর্কে বৈদিক সমীক্ষার ভাষ্যেও আর একটি সূত্র পাওয়া যায়,—

স্তেনোতি পিচ্ছিকা কাল—সংযোগাৎ শাল্লীনিষ্যাসবৎ ক্রিমিকরোন্মভবাত্তু  
স্তেনাস্তে ক্রিময়ঃ তত্র তে চ শারদাগমে অপসৃয়ন্তে’

অর্থাৎ বর্ষাকালের ধর্ম শিমুলের আঠার মত এক প্রকার আঠা কলমীলতায় জন্মে, তাতেই ঐ কীটগুলি জন্মগ্রহণ করে। সেগুলি আবার শরৎ ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অপসৃত হয়। এই জন্য শয়ন একাদশী থেকে (উল্টোরথের পরদিন থেকে) উত্থান একাদশী (রাসপূর্ণিমার পূর্বের একাদশী) পর্যন্ত কলমীশাক খাওয়া নিষেধ আছে। প্রবাদ কল্পনায় আছে—এই সময় গ্রীহারি কলমীলতার বিছানায় মাথার ও পাশের বালিশ হিসেবে পটোলকে রেখে শুয়ে পড়েছেন; তাই বাংলাদেশের সংস্কার বিশিষ্ট অনেকে কলমীশাককে আহাৰ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। আসলে এ সংস্কারটা পুরোহিত সম্প্রদায় প্রভৃৎ বিস্তারের জন্য প্রচার করেন নি; এটা আমাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই সমাজহিতৈষীগণ সংস্কারে তাকে বেঁধে দিয়েছেন। নিম্নোক্ত কলমীশাকের এই রস-বিকারটি কালজ; কিন্তু সর্বকালেই নয়, যেন বর্ষাকালেই কলমী অভিশপ্ত হয়; অন্য কালে তার গুণ প্রচুর। সে ক্ষেত্রে বেদের সমীক্ষা হ’লো—স্নেহ সংযোগে গুণবর্ধক হয়।

এ যেন একদিকে ভাস্করঠাকুর অন্যদিকে আস্তাকুড়; সেই রকম প্রকৃতির ঋতু-বিবর্তনের পথে মাঝের অবকাশ এই বর্ষাকাল। ফেলে আসা গ্রীষ্মকাল শ্লেষ্মার ক্ষীণাবস্থা হ’লেও তার স্বধর্ম জাঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করা; তার উপর সামনে রয়েছে ঋতু-বিকার, শরতের পূর্ব আক্রমণ, মাঝে পড়লো বর্ষাকাল; এইকালে বায়ুর হয় ওষ্ঠাগত প্রাণ, তার প্রকোপ তো বাড়বেই, তাইতো প্রাচীন বৈদ্যগণ বলতেন—আকাশে মেঘ হ’য়েছে, পেটে বায়ু তো হবেই। এই হ’লো তথ্য কথা; আর এই দুই ঋতুর চাপে পড়ে আসে অগ্নিমান্দ্য, এরই ফসল হ’লো—রং কাল হ’য়ে যাওয়া, অক্ষুধা, আর সব থেকে ভয়াবহ হ’লো আমাশার প্রকোপ; আবার কারও কারও আসে মূত্রকৃচ্ছ্রতা, সূতরাং এই কালে খাওয়া দাওয়া খুব হিসেব করেই করতে হয়।

বামনের ছেলে হ’লেই কি বামন হয়?—তার উপনয়ন সংস্কার হ’লেই বামন হয়; তখন সে ম্ভিজ। সেই রকম শাককে সংস্কার করে খেলে সে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বিশেষ ধাতু দুটিকে পুষ্ট করে, তখন সে জন্মে ম্ভিজ আর সংস্কারেই তার ম্ভিজত্ব।

কি করে খেতে হবে—

‘পত্র শাকং গুরু রুক্ষং প্রায়োবিষ্টম্ভঃ জীৰ্যতি।

স্বিন্নং নিষ্পীড়িত রসং স্নেহাঢ্যং তৎ প্রশস্যতে॥ (চরক-সূত্র)

অর্থাৎ পত্রশাক মাত্রেরই গুরু ও রুক্ষ—তা পেটে বায়ু করে ঠিকই, কিন্তু ওকে একটু সিঁধ করে জলটা ফেলে দিয়ে সাঁতলে নিয়ে খেলে ও দোষটা আর থাকে না, এই তার সংস্কার। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে—বৈদিক সূক্তের অনুসরণ এই সংহিতার যুগের

অনুশীলন। এই শাকটির পরিচিতি নিম্নপ্রয়োজন, এর ব্যোটানিক্যাল নাম *Ipomoea reptans* (Linn.) Poir ফ্যামিলী *Convolvulaceae*.

### লোকায়তিক প্রয়োগ—

১। আফিং-এর বিষক্রিয়ায়:— ঢ'লে পড়েছে, হাতের কাছে কিছু নেই, কলমী শাকের রস ক'রে অন্ততঃ এক ছটাক খাইয়ে দিন; সব সামলে দেবে।

২। প্রথম বয়সের যৌবনের চাঞ্চল্যের কু-অভ্যাসে শরীর হাড়-সার, ঘুমুলেই ক্ষরণ, এর সঙ্গে মাথাধরা, হাত-পা জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য, মুখে জল আসা, পড়াশুনা মনে না থাকা ইত্যাদি—এ ক্ষেত্রে কলমী শাকের রস ২ চা-চামচ, তার সঙ্গে অশ্বগন্ধা (*Withania somnifera* Dunal.) মূল চূর্ণ ১৫ গ্রাম আন্দাজ মিশিয়ে খেতে হয়; অল্প দুধ মিশিয়ে খেলে আরও ভাল। এর দ্বারা তার যেসব উপসর্গ উপস্থিত হয়েছিল সেগুলি তো যাবেই, অধিকন্তু তার শত্রুধারণ ক্ষমতাও বেড়ে যাবে।

৩। কোলের শিশু রাতে জাগে আর দিনে ঘুমোয়:— অনেকের বিশ্বাস—রাত্রি-বেলায় জন্মালেই বৃদ্ধি এই হয়, তা ঠিক নয়; এর জন্য অনেক সময় দেখা যায়—তার মল কঠিন হয়েছে এবং দুধ তোলে সে। এ ক্ষেত্রে অল্প গরম দুধের সঙ্গে ২০।২৫ ফোঁটা কলমীশাকের রস খাওয়ালে এই উপদ্রব চলে যাবে।

৪। বসন্তের প্রতিবেধে:— বাড়িতে জল-বসন্ত ঢুকলে যেতে চায় না, এ ক্ষেত্রে কলমীশাকের রস ২ চা-চামচ একটু গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতাই অন্য সকলের খেলে ভাল হয়; এর দ্বারা অন্যান্যরা রক্ষা পেতে পারেন। এ ভিন্ন আশপাশের বাড়িতেও এটা খাওয়া উচিত।

৫। স্তন্য বর্ধনে:— শিশু-পোষণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুও দুধ নেই, এ ক্ষেত্রে কলমীশাকের রস ৩।৪ চা-চামচ মাত্রায় একটু ঘিয়ে সঁতলে খেতে হয়। সকালে ও বিকালে দু'বার খেলেই ভাল হয়। এটাতে দুধ বাড়বেই।

৬। গণোরিয়ায়:— জ্বালা-যন্ত্রণা, তার সঙ্গে পুঁজ পড়া, এ ক্ষেত্রে কলমীশাকের রস ৪।৫ চা-চামচ অল্প ঘিয়ে সঁতলে দুইবেলা খেতে হয়। এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যেই এ জ্বালা-যন্ত্রণা ও পুঁজ পড়া বন্ধ হয়।

৭। ঠুনকো হলে:— কলমী বেটে অল্প গরম ক'রে স্তনে লাগাতে হয় এবং ঐ শাকের রস দিয়ে ধুতে হয়; এর দ্বারা বসা দুধ পাতলা হয়ে নিঃসরণের সুবিধা হয় এবং যন্ত্রণাও কমে যায়।

৮। হুলের জ্বালায়:— বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি প্রভৃতির হুল ফুটানোর জ্বালায় এই কলমী বেটে লাগালে জ্বালা কমে যায়। অগত্যা পক্ষে কলমীর ডগা ঘষে দিলেও উপকার হয়।

৯। নিম্নুখো ফোঁড়ায়:— ভেতরে পুঁজ হয়েছে, বেরুতে পারছে না, বসে যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ঐ কলমীর শিকড় ও ডগা একসঙ্গে বেটে ফোঁড়ার উপর প্রলেপ দিতে হয়; এর দ্বারা ফোঁড়ার মুখ হয়ে যায়।

এ ভিন্ন আরও কত মৃদুচিকিৎসা এখনও আমাদের অজানা আছে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Hydrocarbons viz., pentairiacotane triacontane. (b) Sterol.  
(c) Acids viz. melissic acid, behenic acid, butyric acid and myristic acid. (d) Essential oil—0.048%. (e) Different type of resin—7.27%.



## বাস্তুক

সুস্থ মানুষ নড়ে-চড়ে কিন্তু খাটা-খাটুনীতে গাড়মাস, তাকে বলা হয় “গেঁতো”।

এটা দেশীয় উপভাষা হ’লেও এই উপমাটি কিন্তু এক ধরনের যকৃতের কাজ-কর্ম সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে।

কথাটা এই যে, আমাদের কাছে উপেক্ষিত হ’লেও এমন একটি ভৈষজ্যাগুণের শাকের সন্ধান আছে যেটি অমনি সুস্থ অথচ গেঁতো লিভারকে চাঙ্গা করে তোলে।

এটির বিশদ পরিচয় দেওয়ার আগে বৈদিকসমাজে শাকটির স্থান কোথায় ছিল এবং তার আভিজাত্যই বা কি ছিল সে কথা আগে বলি—

**আভিজাত্যের নজির:—**

আয়ুর্ষ্যং বচস্য কংকৈল্লং ঔশ্ণিভদম্। ইদং বচস্য  
জৈয়্য বিশতাদ্‌মাম্ ॥ (ঋক্বেদ—৬।২৪।৪)

বেদ-ভাষ্যকার সাময়্য বলেছেন—কংকৈল্লং হচ্ছে—যবশাক বা বাস্তুক, এটি ঔশ্ণিভদ; শরীরে তেজ বিধারণ করতে হিতকর; ব্যাধির জয়ের জন্য হিতকর; এটি আমাতে প্রবেশ করুক। ম্বিতীরটি—অথর্ব বেদের বৈদ্যক কণ্ঠের ১১।৩৮।৪৭ সূক্তে—

কং কৈল্লং মে অরাতী সহাব পূতনাম্‌তম্।  
সহস্ব সর্বং পাপ্মানং সহমানস্যৌষধে ॥

তার অর্থ হচ্ছে—ওষধি! তুমি কং কৈল্ল, তুমি বাস্তুক, তুমি দেহের শত্রুবর্গকে পরাজিত

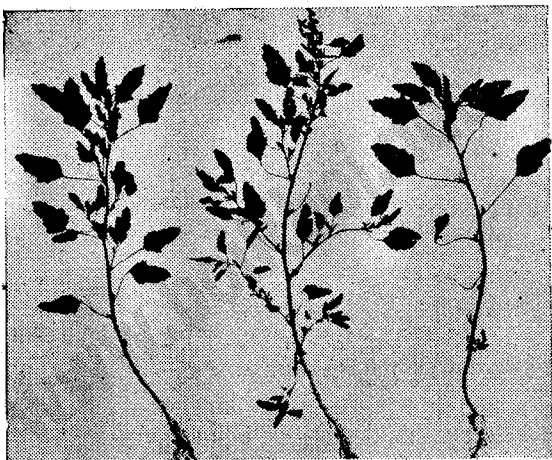
কর; অর্শ, মলরোধ, ক্রিমিজাত শত্রুদিগকে ভূমি অভিভূত কর।

এই দু'টি সূত্রের মূল বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করলে এই পাওয়া যায়—স্বক্বেদ তার জন্মকর্মের বৈশিষ্ট্যটা উপলব্ধি করেছেন। তার ঔন্মিদ্ভদ নামকরণের সার্থকতাও দেখেছেন।

“ভূমিদ্ভদ ঔন্মিদ্ভদ্য জায়তে ঔন্মিদ্ভদঃ” (বৃক্ষায়ুর্বেদঃ)

ভূতম্ভদ্য জায়তে ইতি ঔন্মিদ্ভদঃ (যাস্কঃ)

ভূমি ভেদ করে যে জন্মগ্রহণ করে, সে-ই তো ঔন্মিদ্ভদ; এটি বৃক্ষায়ুর্বেদের অভিমত। ঔন্মিদ্ভদের সাধারণ পরিচয় হিসাবে এটি সাধারণ সূত্র, তা ছাড়াও যাস্কের ব্যাখ্যায় এর বিশেষ পরিচয়—ভূতম্ভদ্য জায়তে ঔন্মিদ্ভদ অর্থাৎ ভূত বস্তুকে ভেদ করে যে ওঠে। চৈত্র বৈশাখে এই ঔন্মিদ্ভদটির বীজগুলি মাটিতে ঝরে পড়ে, আর সমগ্র বর্ষা



ও শরৎকালের মধ্যেও তারা অঙ্কুরিত হয় না, আবার শীত এলেই তবে তাদের আত্মপ্রকাশ। এই বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই এই ঔন্মিদ্ভদটির নামকরণ বাস্তুক; অর্থাৎ জমির বাসিন্দা হওয়ার পর আবার তার জন্মকর্ম, তাই বাস্তুক। পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদ সংহিতাগুলিতে বাস্তুক বা বেতোশাকের গবেষণা আরও ব্যাপকভাবে করা হয়েছে এবং নানাভাবে রোগ প্রতিকারে তাকে কাজে লাগানো হয়েছে।

ষোড়শ শতকের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—‘চৈতন্যচরিতামৃত’ এই শাকটি স্থান পেয়েছে—‘বাস্তুক শাক খাইলে হয় কৃষ্ণভক্তি’—এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্তি বান্ধির সঙ্গে শাকের যোগসূত্রটার সূত্র এই যে—মালিন দেহে কোন ভজন সাধনই যখন সম্ভব নয়, তখন দেহাত্মতন্ত্রস্থ স্থূল মলকে শোধন করার সূক্ষ্ম পথ এই

শাকের ব্যবহার; তারই জন্য এ উপদেশ দেওয়াটা তো অস্বাভাবিক নয়। হয়তো বা মহাপ্রভুর বেতোশাকে প্রীতি এই জন্যই হ'য়েছিলো। তিনি এর গুণপনায় মগ্ন হ'য়ে শরীর শোধনের একটি সহজ ভেষজের উপদেশ দিয়েছেন।

**নাম-ধাম ও পরিচিতি:**—প্রাণী-জগতের মধ্যে সিংহকে আমরা বলি পশুরাজ, আবার শাক-জগতে বেতোকেও বলা হয় শাকরাট বা শাকরাজ। বাংলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষেই এই শাকের জন্ম, বিশেষতঃ যব, গম বা সর্ষের ক্ষেতে; সেইজন্যই কি তার নাম যবশাক? আর বাস্তুভূমির যেখানে সেখানে জন্মে বলেই তা “বাস্তুক”। গুৰ্জর জাতীয় ছোট ছোট গাছ, পাতা তুলসীর পাতার মত কিন্তু ধারগুলি ঢেউ খেলানো; এগুলিকে বলা হয় ক্ষুদ্র বাস্তুকী, এর আর একটি নাম জ্বরঘ্নী অর্থাৎ জ্বরনাশকারী। সম্ভবতঃ অগ্নিবল বৃদ্ধি করে বলেই তার এই জ্বরনাশিত্ব শক্তি বর্তমান। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম—*Chenopodium album* Linn.

আর এক প্রকার বেতো পাওয়া যায়, তার পাতাগুলি লাল; সাধারণ শাক হিসাবে তাদিকেও ব্যবহার করা হয়, এর বোটানিক্যাল নাম *Chenopodium purpurascens*.

এছাড়া আরও একপ্রকার বেতো এ দেশে দেখা যায়, তার নাম চন্দন বেতো, বোটানিক্যাল নাম *Chenopodium ambrosioides* Linn.

এক শ্রেণীর ভেষজ বিজ্ঞানীদের অভিমত, চন্দনবেতোর আদিম বাসস্থান নাকি আমেরিকা; এদের ফ্যামিলী *Chenopodiaceae*.

কে কিভাবে দেখলেন—

ভুক্তবা বাস্তুকশাকে সতর্ক লবণ পিব।

হরীতকীং ভুংক্ষ রাজন নশ্যন্তু ব্যাধয়চ্চ তে॥

—অর্থাৎ হে রাজন, নিতাই আপনি বেতোশাক, ঘোল এবং অল্প লবণ একত্রে মিশিয়ে খেয়ে পরে একটু হরীতকী সেবন করবেন, কখনই কোন ব্যাধি হবে না।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে এই শ্লোকটির অর্থ পরে রূপান্তরিত হয়েছে ‘রায়তায়’ এবং রায়তা সেবনটি সামাজিক প্রথা। আর এই বাংলার কোন কোন অঞ্চলে শিবচতুর্দশীর পরের দিন বেতোশাক ও শুকনো কুল দিয়ে ব্রত-পারায়ণের একটি আহার্য তৈরী হয়, তাকে বলা হয় ‘কুল বেতো’, এটি কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে।

**ব্যবহার ব্যতিক্রম:**—চরক সংহিতায় বলা হয়েছে সব শাককেই অল্প সিদ্ধ ক’রে জলটা ফেলে দিয়ে খাদ্য রূপে ব্যবহার করা ভাল; কিন্তু বেতোশাকের বেলায় তার উল্লেখ নাই; কারণ এটি ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) নাশক; অগ্নিবল বৃদ্ধিকারক। ‘বিদ্যাদ্ গ্রহি ত্রিদোষঘ্নাং ভিন্নবচন্তু বাস্তুকম্॥’ (চরক-সূত্র-২৭।৬৮)

আর ১১শ শতাব্দীর চক্রদত্ত এর আর একটু ফল সম্বন্ধী হয়ে বলেছেন—এই বাস্তুক শাকের গুণ-বীর্ষের কথা। তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায় এতে প্রভাব নামক এক প্রকার শক্তি আছে অর্থাৎ স্পেসিফিক্ প্রপারটি—যে শক্তির দ্বারা এই বাস্তুকশাকের অগ্নিবলবৃদ্ধিকারকতা এবং মেধাবৃদ্ধিকারকতাও নিহিত আছে। তাছাড়া এর ক্ষার-ধর্মতা থাকার জন্য ক্রিমিনাশক শক্তিও বিদ্যমান।

এর ক্রিমিনাশকতা বাহ্য ব্যবহারেও প্রত্যক্ষ হয়। বেতোশাকের রস মাথায় মাখলে এবং কিছুক্ষণ ঐ রসে মাথার চুল ভিজিয়ে রাখলে উকুন থাকে না।

শাকটির গুণ, বীর্ষ ও প্রভাব সম্বন্ধে সুশ্রুতেও অভিমত পাওয়া যায়—

‘কটু বিপাকে কুমিহা মেধাশেন-বলবর্ধনঃ।

সক্ষারঃ সর্বদোষঘ্নঃ বাস্তবো রোচকঃ পরঃ॥

(সুশ্রুত—সূত্র—৪৬ অধ্যায়)

অর্থাৎ যেটি বিপাকে কটু সেটি অবশ্যই আগ্নেয় দ্রব্য।

সুশ্রুতের বক্তব্য অনুশীলন করে ভারতের সব প্রদেশের বৈদ্যগণই এই শাকটিকে নির্দোষ আহার্যের মধ্যে অন্যতম আহার্য বলেই শ্রদ্ধা গণ্য করেন নাই, এর ভৈষজ্যগত শক্তিরও ব্যবহারগত ফল তাঁরা ঘরোয়া মৃদুশিথিলতার তালিকাভুক্ত করেছেন—

১। বেতোশাকের রস ১ চা-চামচ এবং টাটকা ঘোল আধ পোয়া মিশিয়ে খেলে হিকা বন্ধ হয়।

২। বেতোশাকের রস আধ পোয়া, তিল তৈল তিন পোয়া ও জল চার সের, তৈল পাকের রীতিতে পাক করে সেই তৈল ব্যবহার করলে মাথার খুশকী, উকুন, চুলের গোড়ার চাপড়া ঘা কয়েক দিনেই সেরে যায়।

### রোগ-প্রতিকারের উৎস—

১। বেতোশাকে যেমন ক্ষারধর্ম আছে (যার জন্য এর আর একটি নাম ‘ক্ষারদল’), তেমনি এর মধ্যে আছে উল্কা (volatile) তৈল। এর ফলে মলবাহক অন্ত্র ও স্নোতপথকে সহজেই পরিষ্কৃত করে, মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে এবং লিভারের ক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করে।

২। রক্তাশেঁঃ— বেতোশাকের রস ৩।৪ চা-চামচ অল্প গরম করে দুধ (মহিষের দুধ হলে ভাল হয়) মিশিয়ে খেলে অশের রক্তপড়া বন্ধ হয়।

৩। আমাশা রোগেঃ— বেতোশাক শূন্যকিমে গুড়ো করে অল্প দুই মিশিয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে দাড়িমের রস দিতে বলা হয়েছে চরকে।

৪। যাদের শূন্যকো কাসি থাকে (চলতি কথায় বলে বাতকের কাসি,) সেক্ষেত্রে কিছুদিন শাক হিসেবে খেলে উপকার হয়।

৫। শোথেঃ— হাতে-পায়ে শোথ হলে প্রস্রাব পরিষ্কার করানোর জন্যে বেতোশাক সিদ্ধ জল খেতে দিয়ে থাকেন এবং তার সঙ্গে ঐ শাক বেটে গরম করে প্রলেপ দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যরা।

৬। যাদের আহারে রুচি নেই, তাঁরা শাক হিসাবে এটা খেলে মূখে রুচি ফিরে আসবে।

৭। লিভারের যথাযোগ্য ক্রিয়া মৃদু হলে গৌণভাবে (Indirectly) অনেক রোগ উপস্থিত হয়ে থাকে, যেমন—অঙ্গরোগ, কোষ্ঠবন্ধতা, গাঢ়দাহ, আমবাত (Rheumatism) প্রভৃতি; সেক্ষেত্রে এটিকে শাকের মত রান্না করে খাওয়া খুবই ভাল।

৮। যারা ছোট ক্রিমির উপদ্রবে কষ্ট পান, সেক্ষেত্রে সকালে ২।৩ চা-চামচ রস অল্প গরম করে খেলে উপকার হয় অথবা শাক হিসাবে দুগ্ধের বেলা খেতে হয়; মোট কথা যকৃন্দোষজনিত সর্বপ্রকার রোগের উপদ্রবে এটি বিশেষ কার্যকরী।

৯। অতিসারের (পাতলা দান্ত) বেগ খুব অথচ অল্প অল্প মল নির্গত হয় এবং তাতে কুশ্মনও হয় প্রবল, তখন বেতোশাকের রস দধি ও দাড়িমের রসের সঙ্গে তিল-তৈল যোগে পাক করে সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১০। বেতোশাক তিল তৈল যোগে পাক করে লবণ যোগে খেলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়।

১১। বেতোশাক ধারক, এটি প্লীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর।

১২। গাছ বিরেচক ও ক্রিমিনাশক।

খ্যাতি পরিচয়ে সামান্য হলেও বিশেষ গুণসম্পন্ন শাক এটি—আর রোগ-নিরাময়ের দক্ষতায় তার স্থান প্রথম সারিতে; খ্যাতির আড়ালে থাকা এদের চিনতে বা জানতে হলে যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশীয় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকার প্রয়োজন—তা কি আমাদের জাগ্রত? তাই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে ঘরমুখো না করলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও চেনা যাবে না, আর গোলমালে পড়ে থেকে এই রামের মুরগী শ্যামের ঘরে ডিম পেড়ে আসবে, তাও দেখতে হবে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Vitamin viz. carotene, vitamin-C. (c) Sterol viz., ascaridol (40-45%). (d) Inorganic salt viz., magnesium phosphate. (e) essential oil 0.03-0.04%



## উপোদকী

প্রচলিত প্রবাদের অতীত ভিত্তি কোন ঘটনা থেকেই, এটা প্রমাণিত সত্য। ঘটনার পরবর্তীরূপ রটনা, অবশেষে সেই রটনাটিকে জাগ্রত রাখতে হ'য়ে দাঁড়ায় সংস্কার।

এই পুঁইশাককে নিয়ে যত প্রবাদ তারও মূলে আছে ঘটনা ও পরে রটনা। হিরণ্য-কশিপূর নাড়ী এটা, এ রটনার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে আছে হয়তো বা এককালে প্রাক-আর্যদের সঙ্গে খাদ্য নিয়ে কলহ।



পুঁইশাককে হিরণ্যকশিপুৱ নাড়ী বলা হয়েছে, কারণ হিরণ্যকশিপু তো আর্য-বংশীয় ছিলেন না; হয়তো বা এও অসত্য নয় যে, যারা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন তাঁদিকে অপবিত্রও বলা হ'তো।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য আচারে পুঁইশাক অগ্রাহ্য, তবে বিংশশতাব্দীতে সেটা পুনর্নির্গত তথ্য। এটির ব্যবহারগত অপবিত্রতা আছে তাও বলা যায় না। অজ্ঞাত তথ্যের দিক থেকে সর্বজনীন প্রবাদ—“শাকের মধ্যে পুঁই ও মাছের মধ্যে রুই”। এছাড়া আর একটি প্রবাদে শোনা যায়—এটি নাকি আমাশার ঘর; আবার এমন কিংবদন্তীও আছে যে—

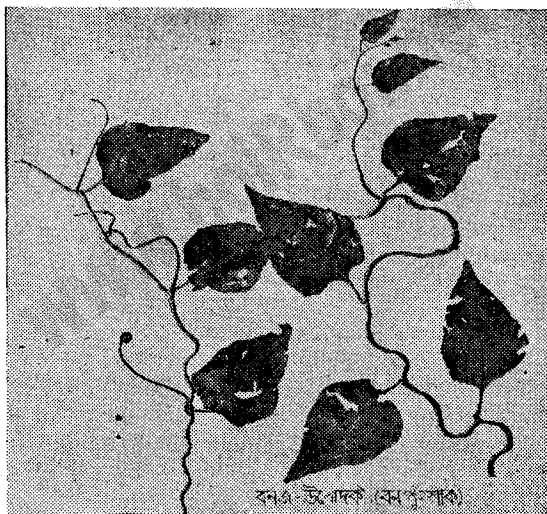
“মসুরং আমিষং জৈয়ং পুঁতিকা ব্রহ্মঘাতিকা”

অর্থাৎ মসুর ডাল খেলে আমিষ খাওয়া হয়, আর পুঁইশাক খেলে ব্রহ্মহত্যার ভাগী।

তাই প্রশ্ন—এই দুবাটির সম্পর্কে পরস্পর বিপরীত যে সব লোকোক্তি তার মূলে কি?

“নহম্‌লা জনপ্রদীতঃ”

অর্থাৎ জনপ্রদীত কখনও অমূলক হয় না। এমনি চিন্তাধারার মধ্যে বস্তুবিজ্ঞানের দিকও তো আছে।



বন্য উপোদকী (বন্য পুঁইশাক)

প্রথমতঃ বলা দরকার যে, সকল প্রদেশের ব্রাহ্মণ বা বিধবারাই যে এটিকে বর্জন করে থাকেন, তা নয়; তবে বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এ সংস্কার বন্ধমূল, এটি ব্যাগ্‌দন সম্পন্ন, আমিষগুণের ভেজ, তাই এটি যেন হিরণ্যকশিপুৱ নাড়ীর মতই অপবিত্র, এমনি আখ্যায় আখ্যায়িত করে তা পরিত্যজ্য অর্থাৎ অনাৰ্য গ্রাহ্য বলেই ও অপবিত্র;

তা ছাড়া সেটা উপমাকেন্দ্র হিরণ্যকশিপু নামটির সঙ্গে জড়িয়ে এই নামকরণের তাৎপর্যও হয়তো হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ আর কশিপু অর্থে বস্ত্র। হিরণ্যকশিপু প্রাক্-আৰ্যজাতির হ'লেও রাজা ছিলেন; তিনি সর্বদা স্বর্ণখচিত বস্ত্র পরতেন, তাই তাঁর নাম ছিল হিরণ্যকশিপু। পুঁইলতা যতই পাকে রং হয় তার সোনার মত। তাই এই লতাগাছটির নামের সঙ্গে হয়তো বা শ্লেষাত্মক শব্দ জড়িত করা হয়েছে।

ম্বিতীয় প্রবাদবাক্যের দৃষ্টিকোণে তার আহার্য রস বিচারে—এটি নিদ্রাজনক, জনন-উত্তেজক, শূক্ৰবর্ধক, রুচিপ্রদ ও তৃপ্তিকারক, তাই আমিষপ্রধান, এবং রুইমাছের সঙ্গে তার তুল্য-মূল্য দেওয়া হয়েছে। আর আমিষ অর্থ লোভনীয়।

তৃতীয় প্রবাদবাক্যের উত্তর পাওয়া যায়—সে যুগের দ্রব্যগুণ-বিশারদগণের দ্রব্যের নামকরণ চাতুর্যে—এই পুঁইশাকের একটি নাম দিয়েছেন “কীটাবাস”, সুতরাং যারা Chronic অ্যামেবিয়াসিস্ (Amaebiasis) বা জিয়ার্ণিডিয়ায় আক্রান্ত, তাঁদের এই শাকটি বিষবৎ, তাই বলা হয়েছে “আমাশার ঘর”; ম্বিতীয়তঃ এটি গুরুদ্রব্য, তাই পরিপাক ক্রিয়ার বিষয় ঘটায়, সেটাও আমাশার একটি কারণ। আর চতুর্থ প্রবাদ বাক্যের অর্থটি দার্শনিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে;—সত্ত্বগুণের অধিকারী হ'তে গেলেই রজো বা তমোগুণের বৃদ্ধিকারক দ্রব্য পরিহার করাই শ্রেয়, সেক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিতে এটি রজো ও তমোগুণ সমৃদ্ধ; পাছে সত্ত্বগুণ নষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মচিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাই একে বলা হয়েছে ‘পুঁতিকা ব্রহ্মঘাতিকা’।

যদিওবা পুঁই অনার্য-ভক্ষ্য, তথাপি বৈদিকযুগে যে তার উপর দৃষ্টি পড়েনি তাঃ নয়—তার প্রমাণ আছে ঋক্বেদের ৬।৪৬।১৪ সূক্তে—

‘সৌবীরং নামিষং ভুংক্ষা ব্যাচক্ষণীত প্রপোদকং’

সায়ণ এই সূক্তটির ভাষ্য করেছেন—

প্রকৃষ্টরূপেণ আপোদকং=উপোদকালীতা তাং সৌবীরং  
মৌরেষং বা আমিষং অন্তরেণ ন ভুংক্ষা।  
ব্যাচক্ষণীত=সূক্ষ্ম কাময়তে

অর্থাৎ উপোদকালীতা এবং সৌবীর বা মৌরেষ মদ্য আমিষ ছাড়া গ্রহণ করবে না, এইটি সূক্ষ্ম কামনা।

এই বৈদিক সূক্তটির অনুশীলনেই পরবর্তীকালে সংহিতা ও পুরাণে দেখা যায়—

ছগ্রাকং গৃজ্ঞনং মাষঃ পুঁতিকা মসুরং তথা।

কন্দশ্যাকানি সর্ষপিণি আমিষং পরিকীর্তিতম্॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ মাটিতে জন্ম নেয় যেসব ভুঁই ছাত্তা এবং গাজর, মাষকলায়, পুঁই, মসুর এবং কন্দশ্যাক—এগুলি আমিষ দ্রব্য।

আমিষ দ্রব্যগুলি যেকোন প্রকার স্নেহ-দ্রব্যের দ্বারা ভাজা হলেই তাতে যে ক্ষার-ধর্মীতার গুরুত্ব সৃষ্টি হয়, সেইটিই হয় রজোগুণবর্ধক। দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখার সঙ্গে এর বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেই যাজ্ঞবল্ক্যের আমিষ-বিচার।

**কুলজিনামাঃ**— এই পুঁইশাকের আয়ুর্বেদিক নাম উপোদিকা। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে তিনটি জাতের পুঁইশাকের কথা লেখা আছে—উপোদিকা, বনজ বা ক্ষুদ্র উপোদিকা ও মূলপোতী। এদের মধ্যে উপোদিকা অর্থাৎ এই প্রচলিত পুঁইশাক। বনজ উপোদিকা অর্থাৎ বনপুঁই—এই দুই রকম সর্বদা দেখা যায়। কিন্তু মূলপোতীর সম্বন্ধ পাইনি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এদের ফ্যামিলী—*Basellaceae*, ব্যোটানিক্যাল নাম—*Basella alba* Linn. এটি সাদা রঙের গাছ। আর ব্যাসেলা রুদ্রা (*Basella rubra* Linn.) হচ্ছে লাল পুঁইশাকের নাম। আকারে, স্বাদে ও গুণে পার্থক্য যথেষ্ট থাকলেও দুই রঙের বনপুঁইকেই সেই একই নাম বলা হয়ে থাকে।

### প্রাচীনেরা একে কিভাবে দেখেছেন—

(১) পুঁইশাক দিয়ে বালি রান্না করে একটু দুই মিশিয়ে খেলে, বেশী মদ খাওয়াতে যে সব দোষ জন্মে, সে সব দোষ সারাতে এই পুঁই আহার এবং ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

(২) অশ্ব রোগীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব দেখা দিলে—এই শাক, কুল ও ঘোল একসঙ্গে সিদ্ধ করে খাওয়ার উপদেশ।

এ দুটি চরক সংহিতায় লেখা আছে।

(৩) এই শাকটির আরও দুটি বিশিষ্ট রসপরিচিতি সম্পর্কে আমাদের আর একটি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ “চন্দ্রদত্তের” শ্লোক এখানে তুলে দিচ্ছি—

উপোদিকা রসাভ্যক্তাস্তৎ পত্র-পরিবোজিতম্।

প্রণশ্যন্ত্যচিরং নৃণাং পিড়কাশ্বদ জাতয়ঃ ॥

অর্থাৎ রূপ ও অবদাদিত (টিউমার) পুঁইপাতার রস মাখিয়ে ঐ পাতা দিয়ে দেখে রাখলে নিরাময় হয়। আরও একটি প্রাচীন গ্রন্থেও (বঙ্গসেন) এই একই কথা লেখা আছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি—রক্তবর্ণ পুঁই হলেই ভাল হয়, তবে এই সাধারণ পুঁই-শাকেও উপকার হয়—একথা বলেছেন আমার অগ্রজ কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয়। আর এক কথা বলে রাখি—টিউমার ছোট থাকা কালে লাগালে তাড়াতাড়ি গিলিয়ে যায়।

**স্বভাবীয়তঃ**—পীড়কা অর্থাৎ রূপ সম্পর্কে। এটা গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনদেরও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। এই কথাটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে ‘ওয়াট’ সাহেবের বইতে। তাঁদের আমলে বরিশালের সার্জন এফ্ ডব্লু. মিজেন্স্ দেখেছেন—এটা ফোঁড়া পাকানো ও খটানোর পক্ষে খুব ভাল। অর্থাৎ এর পাতায় একটু গাওয়া ঘি মাখিয়ে গরম করে ফোঁড়ায় জড়ালে ফোঁড়া পাকে, আবার পাকাফোড়ার ঘা শুকোতেও ওই রীতি।

(৪) এও শোনা যায়—এটার রসের সঙ্গে ছাগল দুধ মিশিয়ে ৫/৭ দিন খাওয়ালে হৃদপিণ্ড কাশির প্রকোপ কমে যায়। অপকারের সম্ভাবনা যখন নেই, তখন দেখতে ক্ষতি কি?

(৫) কোন কোন দেশের গ্রাম্য-চিকিৎসকরা গায়ে শীতপিত্ত (যাকে আমরা চলতি কথায় আমবাত বালি, ডাক্তারী নাম *urticaria*) বেরুলে এর চুলকনা নিবারণের জন্য গায়ে মাখতে দিয়ে থাকেন। এটা ‘Indian Medicinal Plants’ বইতে লেখা আছে।

(৬) পুঁই-ডাটা টুকরো টুকরো করে কেটে শুকিয়ে নিয়ে পুঁড়িয়ে (অন্তর্ধূমে) চিরঞ্জীব-২

তার ছাইগুলির সঙ্গে একটু নারকেল তেল মিশিয়ে খোসে ও কাউর ঘায়ে মাখলে অচিরে ওগুলি শুকিয়ে যায়।

(৭) প্রাচীন কবিরাজবৃন্দ আর একপ্রকারে পুইশাকের আশ্চর্য শক্তির প্রত্যক্ষ ফল দেখেছেন—পুইপাতা আধসের। খাঁটি সরিষার তৈল আধপোয়া। পাতার রসটি তেলে জ্বাল দিয়ে (জল শুকিয়ে গেলে) নামিয়ে ঠান্ডা হলে শিশিতে ভরে রাখতেন। এ তৈল দিয়ে নালী ঘা ও পচা ঘা সারাতেন।

(৬) কোন কোন স্থানের গ্রাম্য বৈদ্য রক্তাক্তপতায় পাকা পুইবীজের বেগুনে রঙের রস খেতে বলেন; তাঁদের অভিজ্ঞতা—ফলও হয় চমৎকার।

গত ১৯৩০ সালে ফিলিপাইন ও জার্মানীতে এই পুইশাকের খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে গবেষণা করে পেয়েছেন ভিটামিন 'এ' এবং 'বি'। ১৯৪০-এ এদেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে তার মধ্যে পেয়েছেন প্রোটিন, ক্যালিসিয়াম ও আয়রণ।

চরক—(১) অতিসারে উপোদিকাঃ—পুইশাককে দধি ও দাড়িম্বেরসসহ সিন্ধু করতঃ বহু স্নেহসহ ভোজন করাবে। ইহা প্রবাহিকায় প্রযোজ্য। (চরক চিকিৎসা—১০ অঃ)

সুশ্রুত—(২) শ্লীপদে (গোদে)ঃ—পুইশাকের রস উপকারী। রস খেতে হয় আর গরম করে প্রলেপ দিতে হয়।

বৃগসেন—(৩) বালকের সর্দিতেঃ—পুইপাতার রস ব্যবহার্য। একটু গরম করে। (৪) গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবন্ধতায়ঃ—পুইশাকের পাতার রস বিশেষ উপকারী। অবশ্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসের পর।

Watt (৫) পুইশাকের রস স্নিগ্ধকর, মূত্রকর এবং গলোরিয়াম ও লিঙ্গপ্রদাহে উপকারী।

পায়োরিয়াম—পুইপাতা ও ডাটা পুড়িয়ে ছাই করে তাই দিয়ে দাঁত মাজলে বহুদিনের পায়োরিয়াম চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Vitamin viz. vitamin-A, vitamin-B. (b) Protein (different types).  
(c) Inorganic element viz., calcium, iron. (d) fixed oil (different types).

সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় “উপোদকী” নামটি পরবর্তী লোকসংস্কৃত ভাষায় “উপোদিকা”-র রূপান্তরিত।



## গ্রীষ্ম সুন্দরক

চিমে? নাকি ধীর শব্দের ভ্রংশতায় খিমে? খিমে লিভারে গিমে শাক?

হয়তো বা প্রচলিত প্রবাদেব সবটাই সত্য নয়, আবার অসত্যও নাও হ'তে পারে। গিমে শাকেই প্রবাদেব সত্যাসত্যের দৃষ্টান্তস্থল। গ্রামে ক্ষেতে ময়দানে পুকুরে বা জলাশয়ের ধারে জন্ম নেয় এটি, থাকেও অন্যদূত হয়ে এই গিমে শাক; কিন্তু শাকটি যে আহাৰ্য্যে এবং ঔষধে খুব মূল্যবান ব্যবহার্য্য বস্তু এ কথাটা অনেকের জানা নেই।

এককালে এর প্রাচীন ভারতীয় নাম গ্রীষ্মসুন্দরক। ঋক্বেদে ১।৪৮।৮ এবং ৮।২৯।১ সূক্তে এর নামের উল্লেখ—

“গ্রীষ্মসুন্দরঃ সৰ্বনমসি বৃহচরণে প্রাণঃ প্রাণিনাং ব্যরংহৎ”

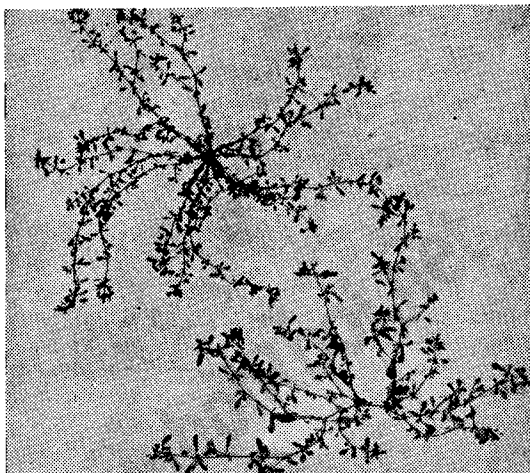
এই সূক্তের সাধারণ ভাষ্যে বলা হয়েছে—

“গ্রীষ্মসুন্দরঃ শাকঃ, গ্রীষ্মসু রসগ্রাহকঃ নিদাঘঃ=  
ঋতুবিশেষঃ, বিষুবরেখায়াঃ পার্শ্বস্থঃ ককট-মকর-ক্রান্ত্যা-  
ভূখণ্ডঃ, তদ্রাজাত শাকঃ, প্রাণিনাং প্রাণান্ ব্যরংহৎ=  
রক্ষকোহসি চতুর্বর্গেষু অগ্নিমঃ”

এই ভাষ্যের অর্থ হ'লো—গ্রীষ্মসুন্দর একটি শাকের নাম। আর গ্রীষ্ম হ'লো রসগ্রাহক এবং নিদাঘ ঋতু বিশেষ। বিষুবরেখার পার্শ্বস্থ ককট ও মকরক্রান্তির দ্বারা আক্রান্ত ভূখণ্ড, সেই ভূমিতে যে শাক জন্ম গ্রহণ করে, সেই শাক প্রাণিগণের প্রাণের শক্তিকে রক্ষা করে, এই শাকটি অন্য চারটি বর্গের মধ্যে অগ্নিম। তাই তুমি পবিত্র।

বেদান্ত সেই মৃন্দর শাকই এখন মৃন্দর নামে আদৃত হয়। বিবর্তনেই বর্ণ-বিপৰ্যয় এমনি হয়। প্রায় সব বনোৰ্ধিই প্রদেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে উচ্চারিত হওয়ার কারণও এই। যেমন উড়িষ্যায় বলা হয়, “পীতা গহম্”। তাঁদের পীতার অর্থ তিল, এবং গিমা হ’য়ে গিয়েছে গহম্। অথবা এর বীজকোষগুলি ক্ষুদ্র গমের মত ব’লেই বা “গহম্”।

ভাষ্যের বিশেষ বক্তব্য—অভ্যন্তরের তাপ দূর করে। তাই দেখাও যায় ভৌগোলিক সংস্থানের খণ্ড খণ্ড ভেদে সূর্য তাপেরও ভেদ হয়, তাই গ্রীষ্মঋতুটি এককালে সমভাবে



সবর্য কিরণ বিকীরণ করে না; যেখানে করে সেখানেই গ্রীষ্মমৃন্দরের অর্থাৎ গিমে শাকের জন্ম।

গ্রীষ্মের উত্তাপে অন্যান্য গাছ যখন মৃতপ্রায় তখন এই গুল্মলতাটির যৌবন যেন জৌলুস নিয়েই জনদৃষ্টি আকর্ষণ করে আর ভূমিশস্যায় স্বল্প গণ্ডীতে ছড়িয়ে থাকে; অর্থাৎ সে তার ভিতরের তাপকে সংহরণ করে ব’লেই অমন রূপ। তেমনি মানুষের শরীরের অন্তরঙ্গির রূপ যে পিত্ত, তার আধিক্যে এ সংযত করে। পরবর্তীষ্মে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ওর ঐ সূত্র ধরেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং তা হওয়াটাই স্বাভাবিক ব’লে মনে করি।

নবায়মে কুলজিনামাঃ— ফিকোইডি (Ficoideae) ফ্যামলীভুক্ত ভূমি প্রসারণী ছোট পাতার শাকটি মলিউগো (Mollugo) গণভুক্ত ৪১টি প্রজাতি (Species) সর্বদা পাওয়া গেলেও সাধারণতঃ মলিউগো স্পারগুল্লা (Mollugo spargula) যার বর্তমান নাম Mollugo oppositifolia Linn.) ও মলিউগো হিরটা (Mollugo hirta) বর্তমান নাম (Mollugo lotoids) ব’লে দুটি প্রজাতি কি আহারে বা ঔষধে সর্বদা ব্যবহৃত হয়, এদের নাম যথাক্রমে গিমে ও কার্কাডিমে। অবশ্য .

দৃষ্টির গুণের সামান্য ইতর-বিশেষও আছে, কিন্তু কোনটি কি—সাধারণের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়। এর আর একটি প্রজাতি আছে, তার প্রাদেশিক নাম জলপাপুড়া বা জ্বরপাপুড়া, যার বোটানিকাল নাম *Mollugo pentaphylla* Linn.; সেটা জ্বরে ব্যবহার করা হয়।

**সংহিতাদ্রুণের সমীক্ষা:**—চরক সূত্রতে ‘গ্রীষ্মসুন্দরক’ নামের উল্লেখ নেই, কিন্তু এমন একটি তিত্ত শাকের উল্লেখ করা রয়েছে—যাকে আমরা এই গিমে শাক বলেই গ্রহণ করছি। এটি চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ৭৫ শ্লোকগুচ্ছের প্রথম শ্লোকটি—

‘মণ্ডুকপর্ণী বৈরাগ্রং কুচেলা বনতিত্তকম্’।

পাঠান্তরং যবতিত্তকম্

কিন্তু কেউ কেউ আবার বলেন কুচেলাই এখানে উদ্ভিষ্ট বনতিত্তকেই গিমে বলার প্রস্তাব; তার অর্থ—পাঠা এবং বনতিত্তক শব্দের অর্থ আকনাদি। এস্থলে ভেদজ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন—চরকের কম্পস্থানের একাদশ অধ্যায়ের ষোড়শ যবতিত্তা, বা নীলী অথবা সপ্তলাই সেখানে গিমেশাক। তবে শিবদাস (চক্রদত্তের উদাবর্ত রোগে) বলেছেন নীলী আর শিথুনীকে ‘কালমেঘ’। এখানে আমাদের উদ্ভিষ্ট গিমের ষোড়শ্বাভাবিক প্রকৃতি, সেটি হলো জলের সঙ্গে একে চটকালে প্রচুর ফেনা হয় এবং এর ফলগুলি যবের আকৃতি হয়। তাই ফেনিলা, যবতিত্তা ও নীলী যখন একই প্রকৃতির পর্যায়ের এসে যাচ্ছে, তখন প্রকৃতি সাম্যে এই গিমে শাককেও সপ্তলা বলে নির্বাচন করাটা প্রসঙ্গাধীন হয়। অবশ্য সপ্তলার স্বভাব সাধর্ম্য শিথুনীতেও দেখা যায়। তাই একই শ্লোকে চরক সংহিতায় উভয়কে একত্র করে গ্রথিত করা হয়েছে। তবে আজও ভেদজটির কোন সমীক্ষা হয়নি। তাই পরবর্তী যুগে নিষট্ট গ্রন্থে (একার্থবাচক বৈদিক শব্দকোষ) একে বলা হয় গ্রীষ্মসুন্দরক, সেইজন্যই পরবর্তীকালে নিষট্ট বিধৃত নামের ওষধিটির আলোচনা হয়েছে শাকবর্ণে। সেখানে তার গুণ বর্ণনায় লিখেছেন

‘তিত্তকম্, লঘুত্বম্, কফপিত্তদোষনাশিত্বম্ রুচিকারিত্বম্’;

অর্থাৎ স্বাদে তিত্ত, কফপিত্তাধিকানাশক ও রুচিকারক, আর রোগারোগ্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—পান্ডু-কামলা (জন্ডিস বা তার পূর্বাবস্থা) ইত্যাদি যকৃত-প্লীহাঘটিত যাবতীয় রোগ প্রতিষেধক ও উপশামক।

**নব্য ভেদজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে:**—এই তিত্ত শাকটিতে সাবান জলের মত কতকগুলো ফেনিল পিচ্ছিল পদার্থ আছে, তার নাম স্যাপোনিন্, তা থেকে বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার দ্বারা কতকগুলো নতুন ধরনের টাইটারপিন্ জাতীয় দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে এই বস্তুটি মানুষের রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার বিশিষ্ট উপযোগিতার ক্ষেত্র কি, তার অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

**আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে শাক-সর্বাঙ্গ:**—যেকোন তরকারী মাগ্রেই শাকপর্যায়ভুক্ত, অবশ্য তার শ্রেণীভেদ করা হয়েছে, যথা—পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ (ছত্রাক শাক) শাক; এই ছয়টি শ্রেণীর মধ্যেই সমস্ত তরিতরকারী। এগুলি উত্তরোত্তর গুরুদ্রব্য, এর মধ্যে পত্রশাকই সর্বাপেক্ষা লঘু। তবে আমাদের পূর্বাচার্যগণ বলেছেন—শাককে স্নেহাভ্যক্ত করে অর্থাৎ অম্প ঘৃত বা তৈল (তিল তৈল এখানে বক্তব্য) দিয়ে সন্তলন করে (সাঁতলে নিয়ে) খাওয়া সমীচীন; এম্বারা শাকের রুদ্ধতা নষ্ট হয়ে হজমের পক্ষে সহায়ক হয়।

বর্তমান সমীক্ষার উপলব্ধ তথ্যঃ— এটি অশুদ্ধমূল্যবোধ, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বিষ-দোষনাশক। এটি যে জ্বরঘাও, সেটা বলেছেন মেজর স্টীওয়ার্ট সাহেব। আর একটি গুণের কথা ওয়াট সাহেবের গ্রন্থে পাওয়া যায়—এটা মাদ্রাজের পাদকোটা অঞ্চলে চুলকণা ও অন্যান্য চর্মরোগে এই শাক বেটে গায়ে মাখিয়ে থাকে। (স্বর্গত কবিবরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এই গিমে শাকের মূল ৫।৬টি গোলমরিচের সঙ্গে বেটে বসন্ত রোগে ব্যবহার করতেন—বিস্ফোটকগুলোকে পাকানো অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বসানোর জন্য।)

এই শাক সম্পর্কে একটি বিধানবিশেষ আছে—যেসব রমণীর কণ্ঠরজঃ (ডিসমেনোরিয়া) আছে, আহাৰ্যের সঙ্গে এটি খেলে তাঁরা সে দোষ থেকে রেহাই পাবেন; আর বাঁদের প্রাবের আধিক্য আছে, তাঁরা এটা খাবেন না। এই তথ্যটি দিয়েছেন ডাইমক সাহেব। এটার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

এই শাকটির বিভিন্ন রোগনাশক গুণ থাকলেও আহাৰ্যের সঙ্গে কালে ভদ্রে শাক-হিসেবে অথবা ফুলদারির মত বড়া করে ব্যবহার করে খেলেও কিছু না কিছু উপকার হবেই। তাছাড়া যেখানে লিভারের ক্রিয়া মন্দীভূত, সেসব ক্ষেত্রে সপ্তাহে ৩।৪ দিন অল্প পরিমাণ শাক হিসেবে যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে যকৃতের ক্রিয়া স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে। কারণ অন্ন-পানের মাধ্যমেই আমাদের অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয় সঞ্চার করে। তাইই আমাদের প্রাণধারণ সূক্ষ্ম হয়। এ আবিষ্কার আজকের নয়—চরক সংহিতার চিকিৎসা প্রচলনের যুগে। এই অভিমত আজও স্বীকৃত ও অপরিবর্তিত।

‘বিহিত-বিধি হিতম্নপান-প্রাণনাং প্রাণ-সংজ্ঞকানাং প্রাণকুশলাঃ।

প্রত্যক্ষ ফলদর্শনাং তদিন্দ্রনাং হ্যন্তরংগৈঃ স্থিতিস্তদেব

সত্ত্বমজ্জর্যতি তচ্ছরীরধাতু ব্যবহল-বর্ণেন্দ্রিয়-

প্রসাদকরং যথোক্তমুপসেব্যমানং বিপরীত মহিতায় সম্পদ্যতে

(চরক-সূত্র—২৭।২)

যেমন বটের একটি ছোট বীজাকুর কালে একটি প্রাসাদকে চিড় ধরিয়ে দিতে পারে—মন্থরগতিতে ক্রিয়াশালী যকৃতও তদনুরূপ।

চরকে বর্ণেন্দ্রিয়ের পোষক রূপে যে শরীরস্থ অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র—এই সপ্তধাতুর যে উপকারিতার উল্লেখ আছে—সে সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত। চরকে বলা হয়েছে, পোষকতা অন্নপানীয়েই সমূহ বিদ্যমান। অতএব শরীরপুষ্টি বা ধাতুসৃষ্টির একান্ত কারকতা যদি কোন একটি বিশেষ ভৈষজ্য থাকে, তাকে সঞ্চেত করেই বলা যেতে পারে ‘সপ্তলা’। অতএব এই গ্রীষ্মসুন্দর বা গিমে শাকের পর্যায় সপ্তলা সংজ্ঞাটিও সার্থক নাম, তা নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ সপ্তধাতুর পোষকতা করে বলেই এই নাম দেওয়া হয়েছে।

‘সপ্তধাতুন্ লাতি=দদতি ইতি সপ্তলা।’

যার জন্য চরকে এটি একটি কল্পের পরিকল্পনা। অর্থাৎ বৈদ্যগণের অভিমত হলো মনঃপ্রিয় বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট এবং বিধিপূর্বক কল্পিত অন্নপানকে প্রাণীদের প্রাণ বলেই নির্দেশ করা হয়। আর প্রত্যক্ষতঃ দেখাও যায় যে অন্নপানই প্রাণীদের অন্তরাঙ্গের ইন্দ্রিয় (জ্বালালির কাঠ) স্বরূপ। এইটিই প্রাণীদের প্রাণধারণের হেতু। এটি যথাবিহিত ব্যবহৃত হলে সেই অন্নপান শরীরের ধাতুসমূহের বল ও বর্ণ এবং



ইন্দ্রিয়দের প্রসঙ্গাতা সম্পাদন করে, আর বিপরীতরূপে ব্যবহৃত হলে অহিতকর হেতু হয়।

এই শাকটি সম্পর্কে উল্লিখিত বৈদিক সূক্তের একটি কথা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য।  
ভাষ্যকার লিখেছেন—

‘সবনমসি’

এই সবন শব্দের তাৎপর্য যকৃতের দুঃখিতাংশকে আঁচড়ে নিষ্কাশন করে দেয়।

লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গ.

১। চোখ উঠলে, চোখ দিয়ে পিঁচুটি পড়লে, গিমে পাতা সেকৈ নিয়ে তার রস ফোঁটা ফোঁটা করে চোখে দিলে, চোখের করকরানি কমে, পিঁচুটি পড়া বন্ধ হয়।

২। অম্লপিত্ত রোগে যাদের বমি হয়, তারা গিমে পাতার রস ১ চামচ এবং তার সঙ্গে আমলকী ভিজানো জল আধকাপ মিশিয়ে সকালে খাবেন, অচিরেই বমি করা কষ্ট দূর হবে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Vitamin viz. carotene. (c) Fatty acid (d) Glucoside (different types). (e) Alkaloid 0.038%. (f) Highly essential oil.



## ছায়া

ব্যক্তি উপকৃত হ'লে তার ফললাভ—সমাজে ও রাষ্ট্রে ছাড়িয়ে পড়ে, তেমনি বার্তাই কালে হয় কাহিনী, আর সেই কাহিনীই আবার কাব্য ও ছড়ায় গাথা হ'য়ে যায়।

এমনি একটি কাল, যে কালে ফলপ্রদ বনোষিধগুলিকেও কাহিনী উপাখ্যানের মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার করা হ'তো, এ রীতি চিরন্তনই এবং বৈদিকযুগেও এটি প্রবর্তিত।

এই বনোষিধিটিও একটি বৈদিক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আছে অথর্ববেদের বৈদ্যক-কম্পের ৪৩২।২।১১ সূক্তে সেখানে বলা হ'য়েছে—

ঔষ্মতী দধৎ শুম্মমিন্দ্রায় বৃক্ষে অপাকো অচিষ্টং যশসে পদ্রুণি।  
বৃষা যজন্ বৃষণং ভূরিরেতা মৃধণ্যজ্জস্য সমনন্তং দেবান্।

অথর্ববেদের ভাষ্যকার মহাধর বলেছেন—

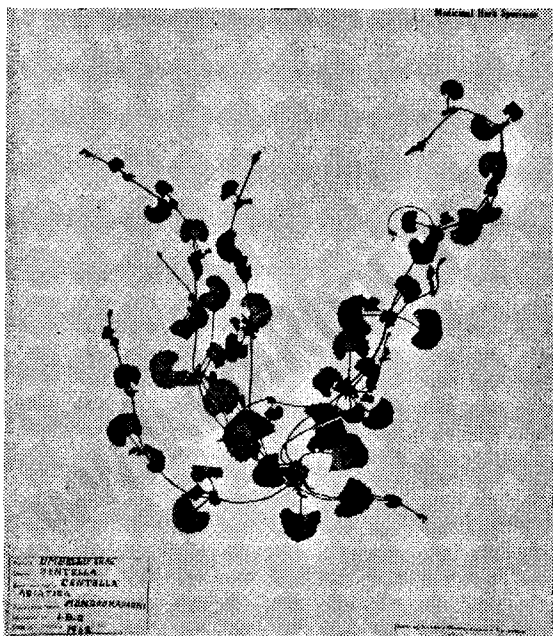
ঔষ্মতী, ঔষ্মে=চিত্রানক্ষত্রে জাতা লতা মাণ্ডুকী।  
ঔষ্ম সমনন্তং ভোজয়ৎ যশসে=যশস্বিনে  
বৃক্ষে সেস্তে ইন্দ্রায় বহু শুম্মৎ=বলং দধৎ।  
তথা অপাকঃ যস্মাৎ সং অচিষ্টং=অচর্নশালী  
বৃষা=ইন্দ্রঃ যজন্=পূজয়ন্ ভূরিরেতা=  
বহুবীৰ্য্যং যস্য সং দেবান্ মৃধণ্যজ্জস্য সমনন্তং=করোতু।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি ঔষ্মতী। তুমি চিত্রা নক্ষত্রে জাতা (জন্ম নাও)। তুমি

মাণ্ডুকী লতা। যে তোমার সেবা করে সে যশস্বী হয়। ইন্দ্র তোমাকে সেবা ক'রে বহু বল লাভ করে। তুমি অপাকী ব্যক্তিকে (অপদুষ্ট মেধা) অর্চনা পরায়ণ কর। ইন্দ্র তোমাকে যজ্ঞ করে। তোমার স্ৱারা বহুবীৰ্য লাভ হয়; দেৱতাদিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, বীৰ্যধারণ ক'রতে তোমাকে নিযুক্ত করেন।

উপরিউক্ত বৈদিকতথ্যে ইন্দ্রকে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে।

এই লতাগাছটি মেধাকরী ও বলবীৰ্যদায়িনী, এইটাই প্রকাশ করা হ'য়েছে। এই তথ্যকে উপজীব্য ক'রে চরকাদি সম্প্রদায়ের বৈদ্যককুল তাকে অনুশীলন ক'রে রোগ প্রতিকারের কাজে লাগিয়েছেন।



### মাণ্ডুকী কি—

আচার্যদের মতে এইটি মাণ্ডুকপর্ণী, যাকে আমরা চলতি কথায় থলকুড়ি বা থানকুনী বলি। কোচবিহার অঞ্চলে একে বলে মানামানি, অবশ্য বাংলা ও মালাবার ভিন্ন এই মাণ্ডুকপর্ণী বা থানকুনী সমগ্র ভারতে “ব্রাহ্মী” বলে পরিচিত। এমনি মত বিরোধ স্মরণাতীতকাল থেকে চলে আসছে।

## নামের পার্থক্যতা—

মাণ্ডুকী বা মণ্ডুকপর্ণী এইটি তার প্রকৃতি-পরিচয় জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা। মণ্ডুক অর্থে ভেক বা ব্যাঙ, “মণ্ডুকবৎপর্ণতে” অর্থাৎ ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়েই লতা থেকে শিকড় বসে নতুন গাছ হয় (এই লতা গাছটির বিস্তৃতির বিন্যাস দেখলেই সেটা অনুমিত হয়)। সেইজন্যই তার এই নামকরণ; এইটাই আচার্যগণের অভিমত। আর বাংলাদেশে ব্রাহ্মী বলে পরিচিত যেটি সেটিকেও মাণ্ডুকী বলা যায়; কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে মণ্ডুবৎ কদমের (কাদায়) ক্ষেত্রেও জন্মে। এই বাংলায় সেটিরই প্রচলিত নাম ব্রাহ্মী; যার বোটানিকাল নাম *Bacopa monniera* (Linn.) Pennell. ফ্যামিলি Scrophulariaceae. তবে এটা দেখা যায় যেসব অঞ্চলের জলবাতাসে একটু লবণের ভাগ বেশী সেই সব অঞ্চলে বেশী পাওয়া যায়।

বিস্তারিতঃ আলোচ্য নিবন্ধোক্ত বনৌষধিটির (ধানকুনীর) যে স্বাদের উল্লেখ চরক সূত্রতে উক্ত হয়েছে তার সঙ্গে মণ্ডুকপর্ণীর স্বাদের পার্থক্য অনুভূত হয়। এখন প্রশ্ন হ'লো স্মৃতিবর্ধক হিসেবে কোনটির প্রাধান্য? সেটা কিন্তু আজও বৈদ্যককুল সম্বেদ্যাতীত হ'লো না।

যাই হোক পরবর্তীকালের গ্রন্থে লেখা হয়েছে, ব্রাহ্মী ও মণ্ডুকপর্ণী সমগুণাবিত। বর্তমান আমার বক্তব্য ধানকুনীকে কেন্দ্র করে।

বৃহৎপত্র ও ক্ষুদ্রপত্র ভেদে দুই প্রকারের ধানকুনী এদেশে পাওয়া যায়; ছোট পাতার ধানকুনী বা ধূলুকুড়ি কোচাবিহার অঞ্চলে জন্মে; সেটিকে ও অঞ্চলে ক্ষুদ্রে মানী বলে।

এটি “আমাশায় ও পেটের দোষে”, বড় ধানকুনীর (টোলা মানী) থেকে বেশী উপকারী। (যদিও বলা যায় আমাতিসার কখনও প্রচলিত আমাশা শব্দের ব্যাচ নয়)। এই বড় ধানকুনীর বোটানিকাল নাম *Centella asiatica*. (Linn.) urban. এবং ছোট ধানকুনীর (ক্ষুদ্রে মানী) বোটানিকাল নাম *Centella japonica*. দাঁটেরই ফ্যামিলি Umbelliferae. দেখতে অনেকটা ধানকুনীর মত। আর একপ্রকার লতাগাছকে অনেকে ধানকুনী বলে ভুল করেন। এটির বোটানিকাল নাম *Ipomoea reniformis* Choisy, ফ্যামিলি Convolvulaceae একে দেশীয় ভাষায় ভুইকামড়ী বলে।

## লোকায়তিক ব্যবহার—

(১) ধানকুনীপাতার রস ৫।৬ চামচ (চা-চামচ) একটু গরম করে ১ কাপ দুধের সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে খেতে হয় (অম্লরোগ থাকলে চিনি নিষিদ্ধ)। এটাতে দেহের লাভণ্য ও কালিত ফিরে আসে। আয়ুর্বেদিক পরিভাষায় বলা হয় এটা রসায়নগুণ সম্পন্ন।

(২) কেশপতনে— দেহের অপদৃষ্টির কারণে যাঁদের চুল উঠে যায়, উপরিউক্ত নিয়মে ব্যবহার করলে তাঁদেরও বিশেষ উপকার হয়।

(৩) কৃশতায়— উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে চেহারার পরিবর্তন হয়, একটু শাঁসে জলে লাগে।

(৪) অস্বাভাবিক ঘাম হলে— যাঁদের বেশী ঘাম ও তজ্জনিত গায়ে দুর্গন্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ ভাবে খাবেন। তবে একটু বেশীদিন খেতে হয়, এ সব ক্ষেত্রে দু-এক দিন খেয়েই বাস্তবে মিলিয়ে নেওয়ার প্রবণতাটা কিন্তু সংযত করতে হয়।

(৫) পেটের দোষে— লেগুয়া বা কফ সংযুক্ত মল, বারে বারে যেতে হয়, ভাল পরিষ্কার হচ্ছে না, পেটে বায়ু, কোন কোন সময় মাথাটা ধরা; এ ক্ষেত্রে অল্প গরমকরা

থানকুনী পাতার রস ৩।৪ চামচ সমান পরিমাণ গোদুগ্ধ (কাঁচা) মিশিয়ে খেতে হয়। এটাতে উপকার নিশ্চয় হবে; তবে একটু সময় দিতে হবে বৈকি।

(৬) বিস্মরণে— মনে আজ আছে কাল নেই; ইচ্ছে করলেও মনে থাকছে না; এসব ক্ষেত্রে উত্তর বা পশ্চিম ভারতের বৈদ্যকব্দ্দ এই থানকুনী রস ২।৩ তোলা আধাকাপ দুগ্ধ ও এক চামচ মধু মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মী বলে তাঁরা এইটাই ব্যবহার করেন। তবে বেশী টক, কাল, লবণ, ঘি, ডিম, তরকারী খাওয়ায় উপকার না পাওয়ারও হেতু হয়।

(৭) বাক্ স্ফূরণে— বাচ্চাদের কথা বলতে দেরী হচ্ছে, হয়তো পরিষ্কার বলতে পারছে না, সে ক্ষেত্রে ১ চামচ করে থানকুনীপাতার রস গরম করে ঠান্ডা হ'লে ২০/২৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে ঠান্ডা দুধের সঙ্গে কিছদিন খাওয়ান, ওই অসুবিধেটা চলে যাবে।

(৮) ডাক-হারা কোকিল— বসন্ত ফিরে যাচ্ছে অথচ সে নির্বাক, এ ক্ষেত্রে থানকুনী পাতা খুব কুচি করে কেটে ছাতুর সঙ্গে খাওয়ান; ও ডাকতে সুরু করবে।

(৯) অনিয়মিত খত্ব দোষে— থানকুনীপাতার রস কিছদিন খেলে ওটা স্বাভাবিক হয়। অবশ্য মেদস্বিনীর ক্ষেত্রে নয়।

(১০) দূষিত ক্ষতে— মূল সমেত সমগ্র গাছ নিয়ে সিদ্ধ করে সেই জলে ধোওয়ালে কিম্বা ঐ সমগ্র গাছটি শিলে পিষে নিয়ে সেটার সঙ্গে ঘি পাক করে সেটা ছেঁকে ঐ ঘি লাগালে উল্লেখযোগ্যভাবে ওটা কমে যাবে।

(১১) পীনস রোগে— নাক বন্ধ এবং জ্যাব্জ্যাবে, আর সর্দিও থাকে, প্রায়ই গন্ধ হয়। তাঁরা থানকুনীর শিকড় ও ডাঁটার মিহি গুঁড়োর নস্য নিলে ওটা কমে যাবে।

(১২) সাধারণ ক্ষতে— সে যেখানেই হোক না কেন, থানকুনী পাতাকে সিদ্ধ করে সেই জল দিয়ে ধুইয়ে দিলে উপকার হবেই আর এই পাতার রস দিয়ে তৈরীকরা ঘি লাগালে নিশ্চয়ই নিরাময় হয়।

(১৩) মূত্রে ঘা— অনেক কারণেই হয়, তবে অম্লপিণ্ড রোগে বেশীদিন ভুগতে থাকলে এটা প্রায়ই দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে এই পাতাসিদ্ধ গারুগেল (Gargle) করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(১৪) জ্বর ও আমাশয়— (এখানে আমাশয় মানে আমাতিসার) দুটোই হয়েছে (সাধারণতঃ বাচ্চাদেরই বেশী দেখা যায়) সে ক্ষেত্রে এই গাছের পাতার রস গরম করে ছেঁকে খাওয়ানো হয়।

(১৫) আঘাতে— থেঁতলে গেলে থানকুনীগাছ বেটে অল্প গরম করে সেখানে প্রলেপ দিলে ওটা সেরে যায়।

আজ আমাদের আমলের ছোটবেলাকার পাঠশালার গণ্ডাকিয়া পড়ার কথা মনে পড়ছে। সবটা না পড়ে শেষের কলিটা এলেই সুরে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠতাম। আজও কি বিনা বিচারে সেই পদ্ধতিটি অবলম্বন করবো?

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Acids viz. pectic acid, centotic acid, centellic acid. (b) Alkaloids viz. hydrocotyline, vellarine. (c) Sterols viz. betasitosterol, gamasitosterol. (d) Glycosides viz. asiaticoside. (e) resinous substances. (f) Fat.



## শোভাজন

‘যাহা মৃদুস্কল, তাহাই আসান’ এদেশে এমনি একটা আকাশাভিত্তিক প্রতিশ্রুতির লোককথার প্রচলন আছে; কিন্তু কথাতার মূলে আছে একটা কৃত্য সমীক্ষা। সেটি হচ্ছে—স্থান, কাল পাত্র ভেদে প্রকৃতি বিকারে দেহে রোগও যেমন হয়, তার প্রতিষেধকও তেমন প্রকৃতি সৃষ্টি করে আশেপাশে। তাই চরকে বলা হয়েছে—‘যস্য যদেশ জন্ম তজ্জং তস্য ভেষজম্’ অর্থাৎ যাহার জন্ম যেখানে, তাহার ভেষজও সেখানে জন্মগ্রহণ করে; তাই বলা হয়ে থাকে—যাহাই মৃদুস্কল তাহাই আসান। প্রাচীনমতে মৃদুস্কল অর্থ ভয়, অর্থাৎ ভয় যেখানে ভয়ের নিবারণও সেখানে। যেকোন প্রকার ভয়-নিবারকতাই ভেষজ। (ভেষ্+জি+ড, ঋক্বেদ ২।৩৩।২) সেটি যেন যমজ হ’য়েই জন্ম নেয় সুখ-দুঃখের মত। অর্থাৎ ভয়ের কাছে নিভয়কারীও কাছেই থাকে। এইজন্য কুষ্ঠরোগের প্রাক্ প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই কুষ্ঠরোগের ওষধিগুলির মধ্যে ভল্লাতকের (*Semecarpus anacardium* Linn.) ব্যবহার খুব বেশী, যার প্রচলিত নাম ভেলা; এই ভেলার গাছ সব থেকে বেশী ছিল ও আছে মোদিনীপুত্র, বাকুড়া, পুর্নুলিয়া, বীরভূম ও তমিকটবর্তী জেলায়; আবার দেখা যায় সেই অঞ্চলেই এ রোগের প্রাদুর্ভাবও বেশী। ব্লাকওয়াটার ফিভার (Black water fever) আসামের একটি ভয়াবহ রোগ; এই রোগের নিশ্চিত কার্যকরী বনোষিও ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হ’য়েছে; ওটির স্থানীয় নাম “আলুই”; বোটানিকাল্ নাম *Vitex peduncularis* Roxb. ঠিক কাল সম্পর্কে এমনি কথাই বলা চলে। বসন্তকালের প্রভাবে (একে মধুকালও বলা হয়) শরীরে পিত্তশ্লেষ্মার যেমন উপদ্রব—তেমনি আবার বায়ু ও পার্থিবশক্তির প্রাধান্যজনিত কালধর্ম ব্যাধিও আবির্ভূত হয়—এই যেমন আসে হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগ; আবার এ সময়ে দেশের ভেষজ সজ্জী সজিনার ফুল ও তার খাঁড়া (ডাঁটা), এঁচাড় (কাঁচ কাঁঠাল) উচ্ছেও প্রকৃতি প্রসব করায়, পাতাকরা নিমগাছে আবার নতুন পাতাও আসে; এরা এই

কালোশুভ্র রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক; আয়ুর্বেদমতে এগুনি কফপিত্তের আধিক্য দূর করে। এইসব দ্রব্য ওষধিজ্ঞানেই এ সময়ে খাওয়া উচিত। শরীরে ঋতুকাল প্রসূত দ্রব্যের অনুকূল প্রয়োজন সর্বদাই থাকে এবং ভালও লাগে। অবশ্য এটাও ঠিক যে প্রকৃতি বিচারে স্থূল দৃষ্টিও অনেক সময় বিপদ ঘটায়। এই গাছটির বহুলাংশেই গুণের অভাব নেই, তবুও আমরা কটাক্ষ করে তুলনা দিয়ে থাকি যে, 'লোকটা যেন সজ্জনে কাঠ', কারণ এই গাছটি যতই বিশাল ও প্রাচীন হোক না কেন, গাছে এতটুকুও সার হয় না; তথাপি তার আভিজাত্য বৈদিক সাহিত্যের সূক্তে বিধৃত হয়েছে। [www.boyRboy.net](http://www.boyRboy.net)



### বৈদিক সন্নিধি—

অয়ং স্ব অগ্নিঃ আক্ষীব দধে জঠরে বাবশানঃ

সসবানঃ স্তূয়সে জাতবেদ শৈশিরেণ (শব্দরত্ন ১২ ১৪৬-৪৭)

অক্ষীবস্বং আক্ষং=মত্তকরং তদাক্ষীতি শিগ্রুঃ, শিজ্জতি ইতি=দারয়তি ইতি উট্। স্বং শৈশিরেণ জাতবেদঃ অসি বহির্নিব।

অতস্বং জঠরং প্রবিশ্য জাতবেদঃ সন্ বাবশানঃ স্বং স্তূয়সে।

এই সূক্তটির মহাধর ভাষ্য করেছেন—হে আক্ষীব! (যার নাম শিগ্রু বা সাজিনা বৃক্ষ) তুমি শিশিরে প্রাণবান হও। তোমার শক্তি অগ্নিবৎ। জঠরে প্রবেশ করে অগ্নি প্রকাশ কর। তোমাকে স্তব করি।

এছাড়া অথর্ববেদেও একে বলা হয়েছে—এই সাজিনা দেহজ শত্রুর বিনাশ সাধন করে, সে শত্রু অশ্রু ও ক্রিমি।

ভাষ্যকারের আক্ষীব শব্দের আর একটি অর্থ “মাতাল”। এটি যাস্কের অভিমত। ক্ষীব ও আক্ষীব দুইই মত্ততাবোধক শব্দ।

বেদের এই ইঙ্গিতটি প্রাক-আর্যগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারীদের এক বিশেষ ব্যবহারের সঙ্গে খুব মিল হয়। বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তারের বহুপূর্বেই এই জাতির বসবাস এই ভারতে। তারা অদ্যাবধি সাজিনার রসে মদ্য প্রস্তুত করেন। এতে তাঁদের মত্ততা নাকি বেশ তীব্রই হয়। এই সাজিনার ছালের মদ সাঁওতাল, মন্ডা, ভীল, লোথা প্রভৃতি খুব আগ্রহের সঙ্গে পান করেন।

এই মদ তৈরী করতে সাজিনার ছাল, অনন্তমূল (*Hemidesmus indicus*) R. Br. শতমূল (*Asparagus racemosus* Willd.) শিমূলমূল (*Salmaal malabaricum* (DC.) Schott & Endl.) ও মৃদা (*Cyperus rotundus* Linn.) —এ পাঁচটির মাত্রা প্রথমটি তিনসের, বাকীগুলি আধসের করে নেয়; মাত্র ২০দিন পচায়। তারপর শুকনো মহুয়া এবং গুড় মিশিয়ে প্রয়োজন মারফক জল দেয় এবং দেশীয় পদ্ধতিতে চুইয়ে নিয়ে যে মদ প্রস্তুত করে, তাকে বলে ‘হাঁড়িয়া খেরী’ (এই মদ ওদের কাছে পবিত্র এবং মূল্যবান। বিশুদ্ধ ভৈষজ্যের কিংব এতে থাকে বলেই ভাষাটা সূচিন্তিত।

বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়—অসুরদের মধ্যে সাজিনারসের মদ্যটি গৃহীত হ’য়েছে। তবে বৈদিক ঋষিগণ সাজিনার মধ্যে মদ্য-শক্তি ছাড়া, এর পাতা, ফুল, ফল, বীজ, এবং মূলের ও গাছের ছালেরও যে বিশেষ গুণ-বীৰ্য আছে—সে সম্বন্ধেও তারা গবেষণা করে দেখেছেন।

তাঁদের সেইসব সূক্তের অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের সংহিতাকারগণের ব্যবহার-গত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রাক-আর্যবংশীয়গণ আজও এই বৃক্ষের ছালের রস দিয়ে বাহ্য অবদিকে Tumour পাকায়, ফাটায় এবং পরে তাতে নিসিন্দা *Vitex nigundo* পাতার গুঁড়ো দিয়ে সে ঘা শুষ্ক করে।

সংহিতার যুগে:—এ বৈদিক সূক্ত দু’টির সূত্র ধরে চরকে, সূত্রদ্বয়ে যেমনি, তেমনি বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত, বঙ্গসনেও এই গাছটির বিভিন্নাংশকে বহু দুরূহ রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছেন। এই গাছের মূলের রস যে অন্তর্বিদ্রুপ (শরীর-ভ্যন্তরস্থ দ্রুত ব্রণ) নাশক—এ তথ্যটি নব্য বৈজ্ঞানিকগণ কতৃক সমর্থিত। সে সমীক্ষা-টির দ্রষ্টা কিন্তু মহামতি বাগ্‌ভট এবং চক্রদত্ত। এই শিগ্রু নামটির অর্থই হ’ল—প্রবেশ করে বিদীর্ণ করা। তার উপর বিভিন্ন প্রদেশের লৌকিক ব্যবহার—এসব তো আছেই; আমরা সীমিত বক্তব্য কেবলমাত্র সাধারণের জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য এখানে প্রকাশ করছি।

জাতি ও জ্ঞাতি:—বৈদিকযুগে এক প্রকার সাজিনারই উল্লেখ; পরবর্তীযুগে শ্বেত, রক্ত ও নীল পুষ্প-বর্ণভেদে আরও তিন প্রকার সাজিনার উল্লেখ দেখা যায়। তবে নীলফুলের সাজিনাগাছ বর্তমানে দুলভ। সাদাফুলের সাজিনাগাছই সর্বত্র। বারোমাস যেটা পাওয়া যায়—তাকে নাজনা বলা হয়, কিন্তু এরা প্রজাতিতে একই, বোটানিক্যাল নাম *Moringa oleifera* Lam. আর রক্তপুষ্প সাজিনা বাংলার মালদহ অঞ্চলে পাওয়া



যেহেতু, কিন্তু বর্তমানে সেটা পাওয়া যায় কিনা আমার অজ্ঞাত; তবে *Moringa concanensis* Nimmo প্রজাতির এক প্রকার সজিনা রাজপুতনায়, সমগ্র দাক্ষিণাত্যে, এমনকি বেলুচিস্থান ও সিন্ধু প্রদেশেও পাওয়া যায়; এর ফুল ও ফল (ডাঁটা) গুলি রক্তাভ। পুষ্পের বর্ণ ভেদে গাছের গুণেরও পার্থক্য আছে—একথাও প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে।

**দিল্লীরও লোভনীয় সজনেফুল:—** এই জন্যেই চাষ করা হয়েছে দেবাদুনের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। গাছে ফুল হলেই ডালগুলি কেটে ফেলা হয়, তারপর ঐ ফুল শুকিয়ে চালান হয়ে থাকে দিল্লীর ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে।

### বিভিন্ন অংশের ব্যবহার:—

(১) **সজনের পাতা:—** শাকের মত রান্না করে (কিন্তু ভাজা নয়) আহারের সময় অল্পপরিমাণে খেলে অগ্নিবল বৃদ্ধি হয় ও আহারে প্রবৃত্তি নিয়ে আসে; তবে পেটরোগাদের—ঝোল করে অল্প খাওয়া ভাল। তবে হ্যাঁ, এটা গরীবের খাদ্যই বটে, কারণ—তার মধ্যে আছে ভিটামিন এ, বি, সি, নিকোটিনিক এসিড, প্রোটিন চর্বিজাতীয় পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট এবং শরীরের পোষণ-উপযোগী আরও প্রয়োজনীয় উপাদান; এসব তথ্য কিন্তু নব্য বৈজ্ঞানিকের সমীক্ষার। এই শাক কোল, ভীল, মূন্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের নিত্য প্রিয় ভোজ্য শাক। তারা কিন্তু গুণ জেনে খাচ্ছে না—আদিবাসীদের সংস্কারেই থায়।

(২) **সজনের ফুল:—** শাকের মত রান্না করে বসন্তকালে খাওয়া ভাল। এটা একটা বসন্ত-প্রতিষেধক দ্রব্য। তবে ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায় ফুল (শুদ্ধ) ব্যবহার করেন সর্দি-কাশির দোষে, শোথে, প্লীহা ও যকৃতের (Liver) কার্যকারিত্ব শক্তি কমে গেলে, ক্রিমির আধিক্য থাকলে এবং টাইফের একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে।

(৩) **সজনের ফল (ডাঁটা):—** ‘ধূকড়ির মধ্যে খাসা চালের’ মত আমাদের দেশে সজনের ডাঁটা। নব্য বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ বিচারে পাতা ও ফল (ডাঁটা) অস্পৃশ্যক সমগুণের অধিকারী হলেও ডাঁটগুলি Amino acid সমৃদ্ধ, যেটা দেহের সাময়িক প্রয়োজন মেটায়। সর্বক্ষেত্রে সব দ্রব্যেরই ব্যবহার করা উচিত পরিমিত ও সীমিত। ইউনানি চিকিৎসকগণের মতে—বাতব্যাধি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ও যাঁরা শিরাগত বাতে কাতর, তাঁদের আহাৰ্যের সঙ্গে এটি ব্যবহার করা ভাল।

(৪) **বীজের তেল:—** এদেশে সজনের বীজের তেলের ব্যবহার হয় না, তাই পরীক্ষাও তেমন হয়নি, তবে আমাদের এ দেশের বীজের তেমন তেল পাওয়া যায় না, আমদানী হয় আফ্রিকা থেকে—নাম তার ‘বেন অয়েল’। ঘাড়ি মেরামতের কাজে লাগে, বাতের ব্যথায়ও মালিশে নাকি ভাল কাজ হয়। এ ভিন্ন গাছের ও মূলের (ছক) গুণের অন্ত নেই। এই গাছের গুণের কথায় অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচিত হয়।

### রোগ-নিরাময়ে—

১। **হাই ব্লাড প্রেসারে (High Blood Pressure):—** নাফেন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের একটি সংবাদে প্রকাশ—বার্মিজ চিকিৎসকগণের মতে—সজনের পাকা পাতার টাটকা রস (জলে বেটে নিংড়ে নিতে হবে) দুইবেলা আহারের ঠিক অবাবাহিত পূর্বে ২ বা ৩ চা-চামচ করে খেলে সপ্তাহের মধ্যে প্রেসার কমে যায়। তবে যাঁদের প্রস্রাবে

বা রস্তুে সুগার আছে, সেক্ষেত্রে এটা খাওয়া নিষেধ করেছেন। এটির সত্যাসত্য বৈজ্ঞানিক-গণকে দেখতে অনুরোধ করি।

২। অর্বুদ রোগে (Tumour):— ফোঁড়ার প্রথমাবস্থায় গ্রন্থিস্ফীতিতে (Glandular swelling) অথবা আঘাতজনিত ব্যথা ও ফোলায়—পাতা বেটে অল্প গরম করে লাগালে ফোঁড়া বা টিউমার বহুক্ষেত্রে মিলিয়ে যায় এবং ব্যথা ও ফোলার উপশম হয়।

৩। সাময়িক জ্বর বা জ্বরভাবে:— এর সঙ্গে সর্দির প্রাবল্য থাকলে অল্প দু'টো পাতা ঝোল করে বা শাক রান্না করে খেলে উপশম হয়।

৪। হিক্কা (Hiccup):— হিক্কা হতে থাকলে পাতার রস ২।৫ ফোঁটা করে দুধের সঙ্গে ২।৩ বার খেতে দিলে কমে যায়।

৫। অর্শে (Piles):— অর্শের যন্ত্রণা আছে, অথচ রক্ত পড়ে না—এক্ষেত্রে নিম্নাঙ্গে তিলতৈল লাগিয়ে পাতা-সিন্ধু ক্রাথ দ্বারা সিক্ত করতে বলেছেন চরক।

৬। সন্নিপাত জন্য চোখে ব্যথা, জল বা পিচুটি পড়়া:— এসব ক্ষেত্রে পাতা-সিন্ধু জল সেচন করতে বলেছেন বাগ্‌ভট্।

৭। দাঁতের মাড়ি ফোলায়:— শ্লেষ্মাঘটিত কারণে দাঁতের মাড়ি ফুলে গেলে পাতার ক্রাথ মূখে ধারণ করলে উপশম হয়।

৮। কুষ্ঠে (Leprosy):— কুষ্ঠের প্রথম অবস্থায় বীজের তৈল ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়। অভাবে বীজ বেটে কুষ্ঠের ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলেও চলে (এটি সূত্রদ্বয়ের অভিমত)।

৯। অপচী রোগে (Scrofula):— সজনেবীজ চূর্ণ করে নস্য নিতে হয়। এটি সূত্রদ্বয়ের ব্যবস্থা—

(১০) দাড়ে (Ring worm):— সজনে মূলের ছালের প্রলেপে এটার উপশম হয়। তবে এটা প্রত্যহ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

নব্য বৈজ্ঞানিকের কাছে যদি এসব তথ্য একেজো জিনিসকে আঁকড়ে রাখার পাগলামি মনে হয়, তবু সময় অবসরে দ্রব্যের মৌল বিচারের তথ্য বিশ্লেষণের পর নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটনে অগ্রসর হ'লে পুরাতন তথ্যের বিনিয়াদের উপর নূতন হর্ষ গড়ান না, কারণ তাদের মৌলিক গঠনপদ্ধতির বৈচিত্র্যে ক্ষিত, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঞ্চভৌতিক উপাদানের যে স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় একটা স্বাভাবিক তথ্য দেওয়া আছে, তাদের থেকেই তো মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়—এই ৬টি রসের উদ্ভব হয় এটা তো আজও সর্ববাদিসম্মত সত্য। তাছাড়া এইসব রসই তো জীবনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে, এবং এদের মধ্যে রোগকারিষ ও রোগনাশিষ শক্তিও নিহিত আছে; সেই দৃষ্টি-কোণ থেকে দ্রব্য প্রকৃতি বিচার করলেই তাদের প্রকৃত স্বধর্ম জানা যাবে, সুতরাং এদের বদ্ব্যবহার বা কাজে লাগাতে হলে মত ও পথের একটা নূতন সমীক্ষা হয়তো অনুকূলই হবে।

## CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz. moringine, moringinine. (b) Certain amorphous bases. (c) Antibiotic pterygospermin active against both gram-positive, gram-negative and acid-fast bacteria.



## পটোল

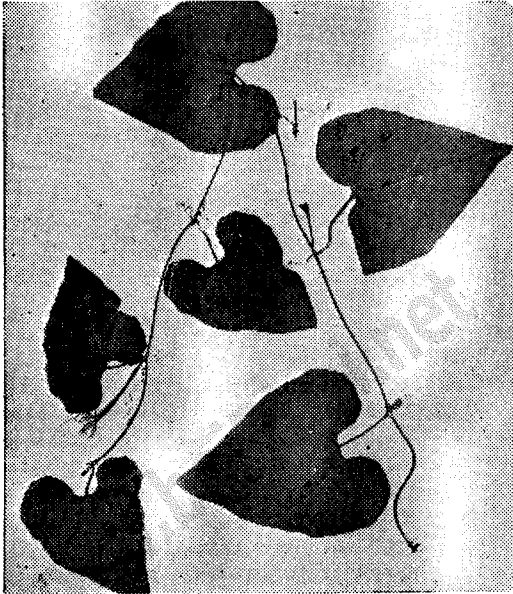
পটোল তোলার আতঙ্ক বাঙালী মাদ্রেই, কারণ এ ভাষায় সংকেত আছে লোকান্তর প্রাপ্তির; কেই বা চায় পটল তুলতে? এ যেন সেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা—কাঁচা খাও পাকা খাও নাহি তাহে জ্বালা। তুমি খাও বলিলেই হয় বড় জ্বালা, অর্থাৎ এই কলা ফলটি কাঁচায় পাকায় সবারই খাদ্য; কিন্তু ভাষায় “কলা খাও” বললেই তা কটাক্ষ, পটল তোলার ইংগিত তার চেয়েও ভয়ঙ্কর, তাই ভাবতে হচ্ছে—এ ভাষার এই আতঙ্কের জট ছাড়ানো যায় কিনা।

সত্যিই জট পাকিয়ে আছে তো ওকারে অর্থাৎ পটল আর পটোল এই দুটি শব্দের প্রাতিধ্বনির সামোই হয়েছে এই বিপত্তি। পটলের অর্থ অক্ষিপটল অর্থাৎ চোখের কৃষ্ণ তারকা সহ সাদা অংশটির নাম। অক্ষিপটলের এই কৃষ্ণ তারকাটি যখন উর্ধ্বদিকে ওঠে, তখন সেটা মন্মুর্ষের পূর্ব সংকেত বলে ধরা হয়; অর্থাৎ প্রায় মৃত্যু এসে গিয়েছে বলা হয়; তাকে বৈদ্যের ভাষায় সংগে গ্রামীণ ভাষায় বলা হয়ে থাকে, ও তো “পটল তুলেছে।” এটাতে আছে আক্ষরিক পার্থক্য, কিন্তু এমনি ধরনের আরও তো কত আশ্চর্য রকমের ভ্রমাত্মক শব্দের প্রচলন—যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মা ছিলেন আর্ষদের বৈদিক দেবতা। তিনি এখন আমাদের কাছে পতঙ্গে রূপায়িত; তাই বিবাহের প্রতীক একটি কীটের চিহ্নে তিনি পরিণত হয়েছেন অর্থাৎ প্রজাপত্যে নমঃ, তার প্রতীক হ'ল ফাড়াং আকৃতিতে প্রণতি জ্ঞাপন।

বর্তমান নিবন্ধ খাদ্যোষধি পটোল সম্পর্কে। আজকের দিনে যারা গৃহপালিত পশুপক্ষী—কিংবা বনজ বৃক্ষ লতা তারা যে এককালে বন্য ছিল—এটা ইতিহাসলব্ধ প্রমাণ। এইরকম বহু খাদ্য আমাদের পথ্য দ্রব্যও একদিন বন্য দ্রব্য ছিল; কালান্তরে কৃষি উৎকর্ষের দ্বারা সেগুলা ওষধি ও খাদ্য হিসেবে সমাজ-কল্যাণে লাগানো হয়েছে। সেইরকম বন্য তত্ত্বপটোলকে মিষ্ট স্বাদে পরিণত করা হয়েছে, এইটাই প্রাচীন গ্রন্থের চিরঞ্জীব-ও

অভিব্যক্তি। এই বন্য পটোল পূর্বে কোচবিহার অঞ্চলে যেখানে সেখানে দেখা যেতো; পটোলগুলি আকারে ক্ষুদ্র; বীজবহুল ও স্বাদে তিক্ত; এটা উল্লেখিত হয়েছে বনৌষধির স্থানীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ 'বনৌষধি দর্পণে'।

**বৈদিক যুগের নিরীক্ষা:**—বৈদিক বনৌষধির পরিচয়ে কোথাও প্রত্যক্ষতঃ এই পটোল শব্দটির উল্লেখ দেখা যায় না; তবে শত্ৰু-যজুর্বেদের একটি ভাষ্যে মহীধর এই ওষধির নামোল্লেখ করেছেন। মূল বৈদিক সূক্তে আছে—



কুলকোলিকা যে অগ্নয়ঃ সমনসো অন্তরা বাসন্তিকা অভিসংবিশন্তু।  
তয়া আগ্নিরসঃ সদধ্বং সীদতম্'

সেখানে ভাষ্যকার বলেছেন—

'কুলকং=তিক্ত পটোলং ওলিকা=আকর্ষণী'  
অন্তরা অন্তরগ্নেঃ। অন্তঃ আগ্নং বর্ধয়ন্তী য়া লতা,  
বাসন্তিকা বসন্তেষু চীযমানা অর্থাৎ বর্ধিতা।

**যুগান্তরের সমীক্ষা:**— উপরিউক্ত বৈদিক সূক্তগুলির শব্দবিন্যাসের অন্তর্নিহিত তথ্য-গুলির উপলব্ধি বাস্তব জ্ঞানই লিপিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন আর্যবৈদিক গ্রন্থে। সেখানে পটোলিকা (সংস্কৃত নাম) শব্দের বাদ্ধপত্তিগত অর্থ—পট অর্থে গমনবোধক, আর ওলিকা

অর্থে আকর্ষণী শক্তি যার আছে; তার সঙ্গে অনুশীলন করার ফল হলো পাণ্ডুরোক্ত গুণসম্পন্ন সব দ্রব্যের মধ্যেই রোগপ্রতিষেধক ও প্রতিরোধক শক্তির আধার রস, বীৰ্য, বিপাক ও প্রভাবের অস্তিত্ব রয়েছে। এই পটোলিকা নামটিও তার গুণের বাস্তব দর্শন।

**দ্রব্যগুণ বৈচিত্র্য:**— সর্বজনবিদিত এই লতা গাছটির অংশবিশেষে রস ও গুণের পার্থক্যও বর্তমান। এখন বিস্ময়বিষ্ট হয়ে ভাবতে হয়—কী ক’রে এই ভেষজটির অংশবিশেষে রস গুণের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছিল যে ‘পটোলপত্র পিত্তঘ্ন নাড়ী তস্যাঃ কফাপহা। ফলং তস্যাঃ ত্রিদোষঘ্ন মূলং তস্যাঃ বিরচনম্॥’ অর্থাৎ এই লতা গাছটির পাতা পিত্তনাশক, নাল অর্থাৎ ডাটাটি কফনাশক, তার ফল অর্থাৎ পটোল ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) নাশক এবং মূল তীর বিরচক। এই লতাগাছটিকে আমরা চলতি কথায় পলতা অর্থাৎ পটোল লতা বলে থাকি। প্রাচীন কালে তিস্ত পটোলকেই ওষধি হিসেবে ব্যবহার করা হতো বলে মনে হয়।

**নব্যমতে পরিচিতি:**— এই লতাগাছটির বোটানিক্যাল নাম *Trichosanthes dioica Roxb.*, এটি *cucurbitaceae* ফ্যামিলীভুক্ত।

**উপযোগিতা:**— চরকে এই বনৌষধিটির ব্যবহার করার ক্ষেত্র—রক্তপিত্ত (Haemoptysis), শোথে, মদ্যপান জন্য বিভিন্ন পিত্তবিকৃতিজনিত রোগে, সর্বপ্রকার বিষদোষে, পিত্তলেম্বাজনিত জ্বরে। তবে এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ব্যবহার করাই শ্রেয়।

**অম্লপিত্ত রোগে পলতা:**— বাঙ্গালীর সমাজে আরও একটি কথা প্রচলিত আছে যে, “মুড়ি আর ভুড়ি সব রোগের গুড়ি”, অর্থাৎ রোগের উৎস মাছ ও পেট। আমার ধারণা শোষোক্ত স্থানটি প্রায় রোগেরই মূল ক্ষেত্র। আহাৰ্য গ্রহণের পর পিত্তক্ষরণের অসমতা সৃষ্টিতে অম্লপিত্ত রোগের উদ্ভব হয়। অসম বা অতিরিক্ত আহাৰ্য দ্রব্য গ্রহণ জন্যও এই অসমতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই অম্লপিত্ত রোগকে আমরা চলতি কথায় ‘অম্বল রোগ’ বলে থাকি। পালিভাষায় ‘অম্বল’ এবং মারাঠী ভাষাতেও অম্ব। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আহাৰ্য থেকে আহৃত রসে সৃষ্ট রক্তাদি ধাতুর (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শূক ইত্যাদি) পোষণের দ্বারা দেহধর্ম প্রতিপালিত হয়। সুতরাং মূলে গলদ থাকায় যেকোন প্রকার Constitutional রোগ আসাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বহু রোগ আসেও; সেই জন্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই অম্লরোগকে প্রশমিত করা। পলতা সে ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

**ব্যবহারবিধি:** কাঁচা ডাটা ও পাতা আন্দাজ ৪।৫ গ্রাম খেঁতো ক’রে গরম জলে (আধকাপ) ভিজিয়ে বা সিদ্ধ ক’রে আধ কাপ রেখে সকালে খালি পেটে খেতে হয়। দান্ত পরিস্কার না থাকলে ঐ সঙ্গে একটি হরীতকীর শাঁস (বীজ বাদ) দেওয়া ভাল কোন কোন প্রাচীন বৈদ্য এই পলতার সঙ্গে ২।১ গ্রাম ধনেও (যেটা আমরা তরকারীতে বেটে দিই) দিয়ে থাকেন। পলতা শুকিয়ে গেলেও চলবে, তবে পাতা ৩।৪টি ও ডাটা ৫।৬ ইঞ্চির বেশী নয়।

যাঁরা কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাঁদের পূর্ব ইতিহাস নিলে দেখা যায়, তাঁদের অধিকাংশেরই এই অম্লপিত্তরোগের জের ছিল। সুতরাং কোন কঠিন রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে গেলে এই অম্লরোগকে প্রতিহত করা বিশেষ প্রয়োজন; এমন-কি যারা ব্রাডপ্রেসারে ভুগছেন, এগুলি ব্যবহার করলে তাঁদেরও কিছু উপশম হবে।

দুই তিন টুকরো শুকনো আমলকীও রাতে ১ গ্লাস গরম জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় জল হিসেবে ঐ জলটা খেতে হয়। এক্ষেত্রে কাচের গ্লাস ব্যবহারই

শ্রেয়। এইভাবে পলতা ও আমলকী ভিজানো জল খেলে এ রোগ নিশ্চিত প্রশমিত হবে।

### এইবার পটোল সম্পর্কে বলি—

(১) বসন্তের মামড়ি শুকিয়ে গিয়েও পড়ছে না, আর পড়ে গেলেও কালো দাগ থাকছে—সেখানে পটোল পুড়িয়ে তার রস গায়ে মাখালে মামড়িগুলি পড়েও যাবে, কালো দাগও থাকবে না।

**শিশুর দুধ ভোলায়:**—পাতার আঁকসী বা আকর্ষণী (যেগুলির দ্বারা ধরে সে লতিয়ে ওঠে) ২। ৩টি দুধের সঙ্গে বেটে শিশুকে প্রত্যহ ১ বার সকালের দিকে খাওয়াতে হবে, তবে স্তনদুগ্ধ হলে ভাল হয়।

(২) ফোঁড়ায়:—না পাকা না কাঁচা অবস্থা, যাকে বলা হয় দরকচা, এক্ষেত্রে পোড়ানো পটোলের শাঁস ন্যাকড়ার লাগিয়ে ফোঁড়ার উপর বসিয়ে দিলে ওটা পেকে ফেটে যাবে।

(৩) তরুণ জ্বর, হাতে-পায়ে জ্বালা, মাথায় ঘন্টা, গা-বমি অথবা বমনেচ্ছা—এ ক্ষেত্রে খোসা ছাড়ানো পটোল উন্মুনে সেক্রে সেটা রস করে ২।৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে এ সব উপদ্রবই থেমে যাবে।

(৪) নখ ছিঁড়ে ফুলে গিয়েছে, বিষয়ে আঙ্গুলহাড়ার মত অবস্থা—এক্ষেত্রে খোসাসমেত পটোল সেক্রে খানিকটা কেটে বীজশূন্য করে আঙ্গুলটা পুরে রাখুন। এটাতে ওটা সেরে যাবে।

(৫) **মুখদৌর্গন্ধ:**—যাদের মুখের ভিতর হেজে গিয়ে দুর্গন্ধ হয়—সেক্ষেত্রে পটোল পোড়ানো রস ও মধু অথবা তিল তৈল মিশিয়ে কবল ধারণ করতে হবে অর্থাৎ মুখে খানিকক্ষণ করে রেখে ফেলে দিতে হবে। এটাতে ঐ অসুবিধে চলে যাবে।

**বৈশিষ্ট্য পটোলমূল:**—এই গাছের গুণের প্রসঙ্গে গ্রাম্য ছড়ায় শোনা যায়—‘বনে ছিল পটোলরে! তাকে ঘরে আনলো কে। পায়ে পড়ি পটোল রে! কাছা খুলতে দে।’ কথাটা আসলে পটোলমূলের বিরেচক ক্রিয়াশালিতার আতিশয্য বর্ণনা। এই গাছের মূলগুলি স্বাদে তিক্ত ও মাংসল; শুকিয়ে গেলে ৩ মাসের পরে আর কার্যকর থাকে না, ঘুণে খেয়ে যায়। তবে তাকে বেশীদিন অবিকৃত রাখতে গেলে বাষ্পস্বেদ বা ভাপ্রা দেওয়ার পর তাকে শুকিয়ে রাখতে হবে।

আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে উদরী রোগে (ascites) এই পটোলমূল চূর্ণের ব্যবহার করা হয়েছে অন্য কয়েকটি দ্রব্যের সঙ্গে। এক্ষেত্রে এটির প্রধান কাজ peritoneal cavity থেকে উদরের সিঁগত জল আকর্ষণ করে মলের সঙ্গে নির্গত করায়। শুধু এক্ষেত্রে বলেই নয়, এর লতা ও পাতার ব্যবহারে রোগোৎপাদনকারী যাবতীয় সিঁগত দোষকে সে নিঃসরণ করায়। এই পটোলিকা নামকরণের সার্থকতা এইখানেই।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Hydrocarbons viz. pentriacontane. (c) Sterols viz. betasitosterol, gamasitosterol. (d) Glycoside. (e) Small amount of essential oil. (f) Traces of tannins.



## নিম্ন

পার্থিব প্রকৃতি হয়তো কামনা করে তার বয়সে যেন বার বার বসন্তঋতুর সমাগম ঘটে, আর আমাদের দেহেরও শ্রেষ্ঠ কামনা থাকে যৌবন-বসন্তের উদয় যেন অন্তিমিত না হয়, কিন্তু অরসিক চিকিৎসকই একটি মাত্র প্রাণী যিনি এই প্রকৃতি বসন্তঋতুর আর দেহে বসন্তের আবির্ভাবে বড়ই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন; তিনি প্রচার করেন এই বসন্তই সর্বপ্রকার অতিসার রোগের আকর, খুব সাবধান। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—

বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ অথবা নিম্বভোজনম্ ।

অথবা যদ্বতী ভাষ্যা, অথবা বহিসেবনম্ ॥

অর্থাৎ বসন্তকালে ভ্রমণ, নিম্বভোজন ও তন্দ্রার সান্নিধ্য—এই তিনটির অভাব হ'লে তার মরণই ভাল। দ্রাবিসহ বসন্তে নিম্বের প্রশস্তির মধ্যে যে তথ্য নিহিত আছে—তারও পূর্বে এই বৃক্ষটির উল্লেখ রয়েছে অথর্ববেদের বৈদ্যকপের ৩৫।৬।২৭ শ্লোকে—

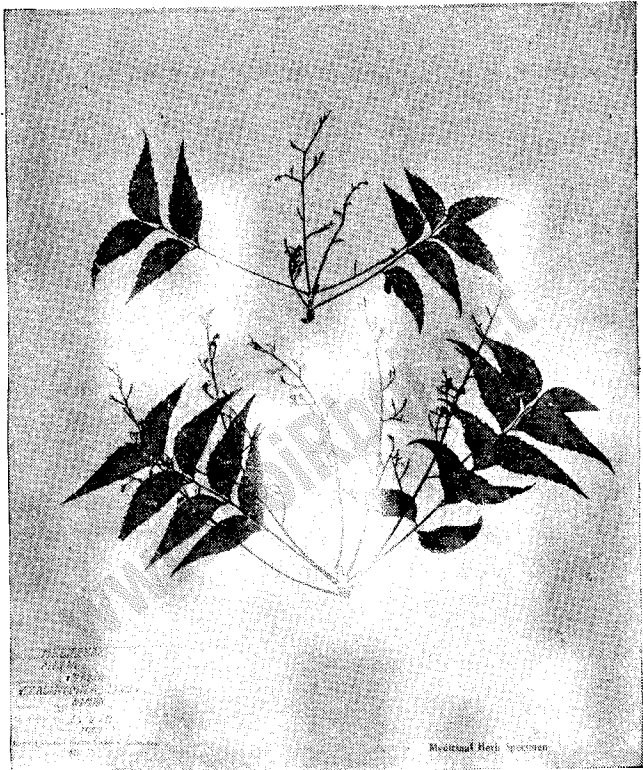
যো বঃ সর্বতোভদ্রঃ বসন্তস্য ভাজয়তে হনঃ ।

হৃদয়ভূমিং জাতবেদসং অযক্ষ্মায় হা সংস্জামি প্রজাভ্যঃ ॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য হলো—

সর্বতোভদ্রঃ=নিম্বঃ, অরিষ্টশচ। সর্বতোভদ্রাণি=হৃদয়ানি যস্য,  
নিম্বতি=সেচতে, রসেণ স্বাস্থ্যং;

রিষ্+ক্তঃ=রিষ্টঃ=শুভেতি, তদ্ অশেষেণ জ্ঞাপয়তি দূরাং।  
 তস্য রসঃ হৃদয়ভূমেঃ জাতবেদসং=পিত্তবৎ অগ্নিং,  
 তস্য দাহ শান্তিকৃৎ, অযক্ষ্মায়=ক্ষয়রোগায়=সংজাত-  
 ক্রিমিসমদম্ভুতায় বা সংসৃজামি প্রজাভ্যঃ।



এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—তুমি সর্বতোভদ্র, তোমার নাম নিম্ব ও অরিষ্ট। সর্বপ্রকারেই তোমার মধু প্রসারিত। তোমার রস স্বাস্থ্যপ্রদ। রিষ অর্থে শুভ, দূর থেকে শুভ সঞ্চারিত হয় এইজন্য নাম অরিষ্ট। তোমার রস হৃদয়ভূমির দাহ দূর করে, তাই তুমি অ-যক্ষ্ম। ক্ষয় রোগের তুমি হন্তা; আর ক্রিমি সমদম্ভুত ক্ষয় রোগকেও তুমি অপসারণ কর, তোমাকে প্রজাদের জন্য সৃজন করছি।

এর দ্বারা খুব পরিষ্কার ধারণা করা যায় বসন্তঋতুতে কেন নিম্বের প্রশস্তি গান।



প্রতিটি ঋতু এবং কালের গতির সঙ্গে দেহের ক্ষয় বা অতিসার দেখেই নিম্বের ক্ষতি-  
পূরক সামর্থ্য আছে জেনেই তাঁদের সমীক্ষণ—

### বেদান্তের সমীক্ষা

এই বৈদিক সূত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেল—

(১) এই বৃক্ষের হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ।

(২) তোমার রস হৃদয়ভূমির অগ্নিদাহ দূর করে।

(৩) সর্বোপরি একটি বিশেষ ইঙ্গিত যে—যক্ষ্মারোগটি জীবানুজ। এই সূত্র  
ধরেই বিভিন্ন প্রতিভাবান ঋষি তাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রোগপ্রতিকারের কাজে  
লাগিয়েছেন—এটা বিশেষভাবে চরক সংহিতায় প্রতিভাত। এটি আছে সূত্র স্থানের  
২৩ অধ্যায়ে, এবং বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ও শারীরস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে গভ-  
সংক্রান্ত আলোচনায়। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে—সেগুণি বৈদিক সমীক্ষারই অনুশীলন।  
তাঁদের প্রথম অনুশীলন হচ্ছে—ব্যাধির রূপ অনন্ত হতে পারে কিন্তু তার মৌলিক  
প্রকাশ দু'টি ধারায় 'সন্তপর্ণ' ও 'অপতপর্ণ'—যেটা শরীরের পক্ষে গ্রহণোপযোগী  
এরূপ দ্রব্য এবং শরীরের সহনোপযোগী যে ধরণের বিহার, এই দু'টিকে বিচার করে  
যাঁরা চলেন, তাঁরাই নীরোগ থাকতে পারেন; যাঁরা এইসব দ্রব্যের সেবনে বেশী আসক্ত  
হন, তাঁরাই এই সন্তপর্ণপোষক দ্রব্যের মাধ্যমেই শরীরকে বিকারগ্রস্ত করে রোগকে  
ডেকে আনেন। আবার শরীরে যদি সন্তপর্ণোপযোগী আহারের ও বিহারের ন্যূনতা  
আসে, তবে তার দ্বারাও রোগাণুপত্তি হয়, একেই বলা হয় অপতপর্ণজনিত রোগ। স্নেহ,  
মধুর ও অম্ল প্রভৃতি দ্রব্যের অত্যধিক সেবনে শরীরে যে রসধাতুর আধিক্য সৃষ্টি  
হয়ে থাকে, তার দ্বারাও সমস্ত রসবহ স্রোতের পথ অবরুদ্ধ হয়ে বহুরোগের সৃষ্টি হয়।  
এইসব ক্ষেত্রে প্রতিবেদক ও প্রতিরোধক দ্রব্য হলো কটু-তিক্ত-কষায় রস বিশিষ্ট ভেষজ।  
বিশেষ করে তিক্তরস প্রধান ভেষজ। তাদের মধ্যে আবার নিম্ব একটি প্রধান ভেষজ।

বৈদিক সূত্রের আর একটি উপদেশ—এটি অশুভ দূর করে। এই তথ্যটির বাস্তব  
পন্থা কি তা চরক সংহিতায় আলোচিত হয়েছে। (শারীরস্থান) শিশুর জন্ম-মাত্রেই  
স্মৃতিকাগ্নাহে কোনপ্রকার দূষিত বায়ু প্রবেশ বা অন্য কোন কীটের উপদ্রব থেকে রক্ষা,  
এ ভিন্ন ধাত্রীর বস্ত্র, দেহ প্রভৃতিতে বিষাক্তদ্রব্যের স্পর্শের আশঙ্কাকে দূর করতে নিম্ব-  
পত্রের ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন।

### ঋতুভেদে নিম্বের অংশবিশেষের ব্যবহার

আগ্নেয়কালে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্বের ছাল ও কাণ্ড ব্যবহার করা  
প্রশস্ত। এই সময়ে দাহজনিত রোগে এটি বিশেষ কার্যকরী। বিসর্গকাল (অর্থাৎ  
আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র)—এটি অগ্নি ও বায়ুর সংকরকাল, এই সময় মূলের ছালের রস  
বেশী কার্যকরী।

আদান ও বসন্তের সন্ধিকালে ও বসন্তে অর্থাৎ বসন্তকালে ব্যবহার করা উচিত  
কিচি পাতা।

প্রধানতঃ শরৎ ও বসন্তঋতুতে পিণ্ডের ভূমিকা যেখানে রুর বাঘের মত আর শ্লেষ্মার  
ভূমিকা যেন নাছোড়বান্দা ফেউ; এরাই যোগসাজসে সৃষ্টি করে রোগ। এইসব ক্ষেত্রে

নিম্ন বিশেষ কার্যকরী, তবে রোগ বিশেষে নিম্নের অংশবিশেষের ব্যবহারের নির্দেশ তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন।

**কোথায় কোল রোগে এবং কিভাবে এটাকে ব্যবহার করা যায়—**

(১) **অজীর্ণে:**— যেক্ষেত্রে পাকস্থলীর রস উদরব্যোপে পাক দেয়, মূখে জল আসে, সেখানে নিম্নের ছাল ৪।৫ গ্রাম ১ কাপ গরম জলে রাখে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে খালি পেটে খেতে হয়।

(২) **স্বপ্নদোষে:**— সে যে বয়সেই হোক না কেন—নিম্নের ছালের রস ২৫।৩০ ফোঁটা কাঁচাদুধে মিশিয়ে খেতে হয়।

(৩) **শর্করা রোগের ফোঁড়ায়:**— স্থূলদেহী, গায়ের ঘা সারতে চায় না, নিম্নের আটা এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় দুধে মিশিয়ে খেতে হয়।

(৪) **পরিমাপে বেশী প্রস্রাব হয় ও তার সঙ্গে আশেপাশে চুলকায়:**— এক্ষেত্রে ৩।৪টি নিম্নপাতা ও কাঁচাহলুদ এক টুকরো (এক গটি আন্দাজ) একসঙ্গে বেটে সকালে খালিপেটে খেতে হয়।

(৫) **রক্ত-শর্করায় (Blood-sugar):**— ১০টি নিম্নপাতা ও ৫টি গোলমরিচ সকালে খালিপেটে চিবিয়ে খেতে হয়। তবে আহার ও বিহারের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

(৬) **শ্বক্‌তের ব্যাধায়:**— নিম্নের ছাল আন্দাজ ১ গ্রাম, কাঁচাহলুদ ২ গ্রাম, আমলকীর গুড়ো ১ গ্রাম একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে সকালে খালিপেটে খেতে হয়—এটাতে সপ্তাহের মধ্যে উপশম হয়।

(৭) **বমিতে:**— অনেক সময় এটা বেশীবার হলে তার সঙ্গে রক্তের ছিটও আসতে পারে, সেক্ষেত্রে পাতার রস ৫।৭ ফোঁটা একটু দুধে মিশিয়ে খেতে দিলে ওটা বন্ধ হয়।

(৮) **চোখ ঝাপসায়:**— অকালেই যদি এটা আসে কিংবা পিচুটি হতে থাকলে পাতার রস ৫।৭ ফোঁটা দুধ ও জলের সঙ্গে খেতে হয়।

(৯) **শুষ্কার্শে:**— বলি আছে, রক্ত পড়ে না, সেক্ষেত্রে নিম্নের বীজের শাঁস ৩।৪টি সকালে-বিকালে ২বার চিবিয়ে বা বেটে জল দিয়ে খেতে হয়। এটির ব্যবহারে ঐ বলি চূপসে যাবে।

(১০) **চাপা অশ্মরোগে:**—নিম্নপাতার গুড়ো আন্দাজ ৩৭৫ মিলিগ্রাম সকালে খালিপেটে জলসহ খেতে হয়।

(১১) **রাত কাশায়:**— নিম্নের ফুল ভাজা মানুষের সহজপ্রাপ্য, তাই গ্রামের বৈদ্যগণেরও এটি একাটি বিশেষ মৃদুচিযোগ।

(১২) **যে ক্ষত কুষ্ঠের রূপ নিচ্ছে:**— সেক্ষেত্রে নিম্নের ছালের কাথ খাওয়া আর সেই জলে ক্ষত ধোওয়া—এটিতে প্রতিরোধ নিশ্চয়ই হয়।

(১৩) **রক্তদৃষ্টিতে:**— রক্ত অনেক কারণেই দূষিত হয়, আর তার জন্য গায়ে লাল বা তামাটে দাগ এবং তার সঙ্গে চুলকানি ও অল্প ফুলো—সেক্ষেত্রে নিম্নপাতা ৪।৫ গ্রাম সওয়া সের জলে সিদ্ধ করে ১ সের থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সমস্ত দিনে অল্প অল্প খেতে হয়।

(১৪) **কামলা রোগে (Jaundice):**— নিম্নপাতার রস ২৫।৩০ ফোঁটা একটু মধু মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেতে হয়।

(১৫) **সর্দি-গর্মিতে:**— সর্দি-গর্মিতে অথবা কোন দুর্গন্ধ বমি হলে বা বমি

আসতে থাকলে নিমপাতার রস ৫।৬ ফোঁটা দুধ বা জল সহ খাওয়ালে ওটা প্রশমিত হয়।

(১৬) যক্ষ্মযক্ষ্মে জ্বরে:— নিমপাতা চূর্ণ আন্দাজ ২৫০ মিলিগ্রাম, তার সঙ্গে ১/১২ রতি মকরদ্বজ মিশিয়ে মধুর সঙ্গে খেতে দিলে ওটা সেরে যায়।

(১৭) লালস্নেহ রোগে:— নিমের গাছের রস (তবে মূলের হ'লেই ভাল) ও কাঁচা দুধ মিশিয়ে খেতে হয়।

(১৮) ক্রিমিতে:— ছোটক্রিমির উপদ্রবে নিমপাতার ২।৩ রতি গুড়ো সকালে খালিপেটে জল দিয়ে খেতে হয়। এটার প্রত্যক্ষ ফল দেখতে পাওয়া যায়।

(১৯) অরুচিতে:— যে অরুচিকে কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সূজির হালদুয়ার সঙ্গে নিমপাতা চূর্ণ ২৫০/৩০০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই ওটা উপশম হয়।

(২০) শিশুদের কেশদাহে:— নিমের বীজের তৈল লাগালে সেরে যায়।

(২১) মূত্রে বা মাড়িতে ঘা (ক্ষত):— পিত্তবিকারে যদি এই ক্ষতের উদ্ভব হয়, তাহলে নিমবীজের তৈল লাগালে সেরে যায়।

(২২) অকালপক্কভায়:— নিমবীজের তৈলের নস্যা নেওয়া এবং ঐ তৈল মাখা— এটাতে মাথাধরাও সারে—এটা পরীক্ষিত।

(২৩) আর একটা কথা বৈজ্ঞানিকগণকে জানিয়ে রাখি—এই নিমতৈলের বাহ্য-প্রয়োগে (external application) জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এ ভিন্ন হয়তো এর কত গুণের কথা আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে। বৈদিক সূক্তের আর একটি ইঙ্গিত আছে—এটি অশুভ দূর করে। আর একটি ঘটনা আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন—রাজস্থানী বণিকসম্প্রদায়ে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিবাহে একটি নিমের ডালকে বরানুগমন করাতে হয় এবং সেটি বরকেই ধরে রাখতে হয়। আবার এই বাংলায় শ্মশানযাত্রীকে বাড়ি ফিরে এসে নিমের পাতা দাঁতে কাটতে হয়। দু'দেশের চিন্তাধারার কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা আছে। তবে সেটাকে সংস্কারের বাঁধনে ধরে রাখা হয়েছে। তাই একে বলা যেতে পারে—এটি সে যুগের যেন বৃক্ষ-পুৰোহিত।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) alkaloids viz. nimbin, nimbinin, nimbidin, nimbosterin nimbecetin, bakayanin. (b) Fatty acids (different types). (c) Highly pungent essential oil.



## সুকন্দক

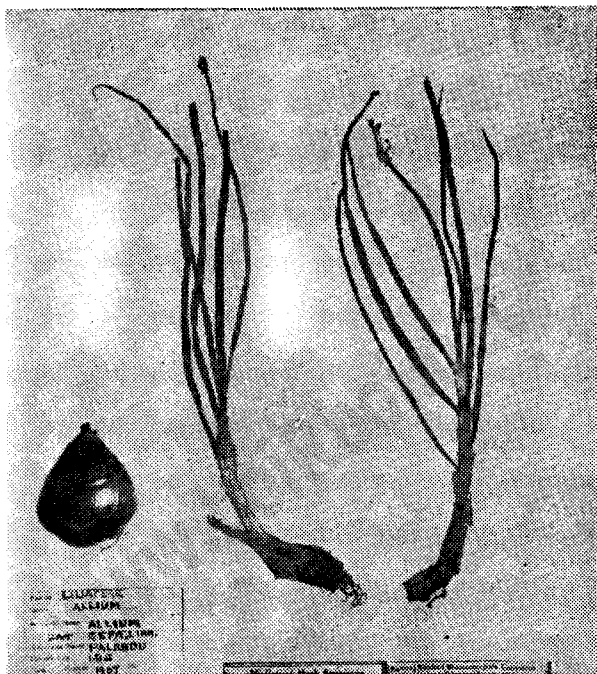
স্মরণাতীত কালে ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব সমাজ-ব্যবস্থায় একটা প্রধান অঙ্গ ছিল, পাশাপাশি ছিল প্রাক-আর্যদের সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শৌদ্র—এই চারটি শ্রেণীই তখন বৈদিক সংস্কৃতিকে ধারণ পোষণ করতো। একই সঙ্গে পাশাপাশি থাকার মধ্যে, প্রত্যেকের পেশা হিসাবে আচার ব্যবহারের পার্থক্য মেনে চলার রীতিটি আদর্শ হিসেবে যে সামাজিক ব্যবস্থার একটি চিত্র তাতে দেখতে পাই, সে ব্যবস্থায় প্রত্যেক গোষ্ঠীর আহাৰ্য ও বাদ পড়ে না; সেই আহাৰ্যের বাছ-বিচারে ব্রাহ্মণের কাছে যেগুলি ছিল নিষিদ্ধ, সেগুলিই আবার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্ষেত্রে বাধা ছিল না, কিন্তু শূদ্রের আহাৰ্যে তেমন বিধি-নিষেধের গন্ডী টানা হয়নি। প্রাক-আর্যজাতির শূদ্র সংস্কারের সঙ্গে প্রায় অভিন্নই হয়ে গিয়েছিল।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুর চিন্তাধারা হলো—আহাৰ্যই শরীর মন ও দেহ প্রকৃতি এবং আয়ু গঠনে অনেকটা সাহায্য করে; আবার ক্ষত্রিয়ের কাছে সেই আহাৰ্যের উপকরণ তাঁদের ক্ষত্র শক্তি জাগ্রত করার এবং বজায় রাখার জন্য সেগুলি উপযোগী। ক্ষত্র ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির আহাৰ্য দ্রব্যের মধ্যে সুকন্দক ছিল অন্যতম; এর সঙ্গে প্রায় সমধর্মী বলে যমজ ভাইএর মতই রসোনকেও ধরা হ'য়েছে। তবে নিরপেক্ষ স্বাস্থ্য-চিন্তক আয়ুর্বেদবেত্তা ঋষিগণ এই সুকন্দকের এবং রসোনের প্রকৃতিগত সত্তার ভৈষজ্যগত শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে রোগ-প্রতিকারে এবং দেহপোষণের জন্য তাদের উপযোগিতা কতটুকু দেখিয়েছেন—সেইটাই বিচার্য।

### বৈদ্যক-কুলের গবেষণার উৎস

ব্রহ্মদর্শনাভিলাষী হয়ে এগিয়ে যাওয়ার মত এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে উপবহন

সংহিতা, সেখানে যে নামকরণ করা হয়েছে, সে নামটির সঙ্গে যুক্ত দেখা যাচ্ছে ঋক্ বেদের ৫-৮-৩৪ সূক্তের একটি কাহিনী। সেই কাহিনীর নায়ক সেই যুগের দুজন বিখ্যাত দস্যু—নাম নম্দিচ ও শম্বর। তাই কি এই দ্রব্য দুটির প্রকৃতিগত প্রভাবশক্তিও আমাদের প্রবৃত্তিকে দস্যুরূপে পরিণত করে? নাকি নম্দিচ ও শম্বরই ঐ সুকন্দক ও রসোনের প্রতীক নাম?



### উপবর্হণ সংহিতায় কি পাওয়া গেল

নম্দিচ শম্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ সুকন্দকঃ সুদ্রায়ৈ কিল্বতঃ কিংহঃ  
ধানাবন্তং করম্ভিনং অপদং বলবন্তং পুরোডাশান্।  
ব্রাত্যো চ সম্যগ্ণো চরতঃ সহলোকং।  
প্রজ্জিব যদেবো সহ্যাপ্নিনা

(৭-১৭৫-১৭৬ সূক্ত)

এই সূক্তটির উবট্ ভাষ্য হলো—

স্বং সুকন্দকঃ। মৃদে সুকন্দঃ মূলতঃ=রসোনপলাশেডা,  
স্বং নম্দিচশম্বরপ্রিয়ঃ। স্বঃ অন্তঃসারং কিল্বতঃ সুদ্রায়ৈ

কিং জাতং। ধানাবন্তং করম্ভিনং, অপূপং পুরোডাশান্  
বলবন্তং করোমি। যদ্বাংচ স্নাত্যো=মলসম্পন্নো,  
সম্যগ্ণৌ চরতঃ, যদেবা অগ্নিনা সহ গচ্ছন্তি যদ্বাং  
তদ্রপ্তেব প্রজনীথঃ জাপয়থঃ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'ল—তোমার কন্দই সূত্র (প্রীতিউৎপাদনকারী) তাই তুমি সূত্রদক। তুমি নন্দাচি ও শম্বরের প্রিয় (এই নাম দুটিই বৈদিক যুগের দু'জন দন্দ-দলপতির)। তোমার অন্তর মদ্যের সার। যে ধনবান, যে শস্যবান, যে পিণ্টকবান—সে পুরোডাশ সম্পন্ন, তাকে তুমি বলদান কর। এই ভাষ্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হচ্ছে—পিণ্টকাদি গুরুপাচ্য ভোজ্যের সঙ্গে পলাণ্ড ও রসোনের ব্যবহার ছিল।

উপরিউক্ত সূত্রটির উবট ভাষ্য দেখা যাচ্ছে—সূত্রদক বলতে পলাণ্ড ও লশুন বা রসোন—এই দুইকেই ধরা হয়েছে; এই পলাণ্ডকে আমরা চলতি কথায় পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ বলি। এক্ষেত্রে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু ঐ পেঁয়াজই।

সুপ্রাচীন তথ্য থেকে তিনটি ইঙ্গিত আমরা পেলাম—

(১) তোমার কন্দে সূত্র (২) তোমার অন্তর মদ্যের সার, (৩) যে পুরোডাশ সম্পন্ন, তাকে তুমি বলদান কর। প্রথম উক্তিটির দ্বারা এইটি প্রতীয়মান হয় যে, এই কন্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তর্পিত করে, যার দ্বারা দেহের সমস্ত শক্তিকে প্রাপবন্ত করে থাকে। দ্বিতীয়টির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হলো—এটাতে আছে মদ্যের সমস্ত গুণ, নেই কেবল মাদকতা দোষ। তাই পরবর্তী যুগে এটাকে গৃহিণ গৃহণ করলেও স্মার্ত-সম্প্রদায় তাকে দূরে রেখেছিলেন; তাঁদের মতবাদ হলো—যেহেতু এটি উগ্রগন্ধ এবং অনিয়ত উত্তেজক। আর তৃতীয় হলো—যজ্ঞকার্যের শীর্ষভাগের উপচার যেমন দুগ্ধ ঘৃত ও যব এই তিনটির দ্বারা দেহের যে বল ও কান্তি দান করে, কেবলমাত্র তোমাতেই সেটি বর্তমান।

উপবহণ সংহিতার তথ্যের ভিত্তিতে এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এটা কোন সম্প্রদায় বিশেষের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করিনি বা অন্য কোন দেশ থেকে আসিনি। তবে এটাও ঠিক যে আর্ষভূমির পরিধি তো এখনকার মত নিশ্চয়ই তিন বিষে জন্ম ছিল না; আর যুগোত্তীর্ণ আজকের ধর্মীয় সংস্কারের পূরণবেস্তার রূপও তখন এত টুকরোও ছিল না। ভাবা চলে তখনকার আর্ষভূমি কি বিরাট ছিল; সুতরাং সে যুগের সূত্রদক সেই বৃহত্তর আর্ষভূমির হৃদা ও ভৈষজ্য সম্পদ।

বৈদিক যুগ থেকে যুগান্তরে কত আচার-ব্যবহার ও ধর্মের ধারা বদলেছে—সেটা ইতিহাস বলে দেয়। এই ভৈষজ্য-সম্পদ নিয়ে চরক-সুশ্রুত সম্প্রদায়ের অনুশীলন আজও আমাদের পাথেয়।

### পরিচিতি

বর্ষজীবী কন্দমূলের গাছটি ও তার পেঁয়াজ নামটি সর্বজনপরিচিত। অবশ্য পেঁয়াজ নাম ফারসি 'পয়াজ' থেকে এসেছে। এটির বীজ থেকেও গাছ হয়, আবার ছোট ছোট কন্দমূল রোপণ করেও চাষ হয়। ছোট এক প্রকার পেঁয়াজ দেখা যায়, এরা কিন্তু প্রজাতিতেও ওই; একে চলতি কথায় বলে ছাঁচ পেঁয়াজ। ওষধিটির বোটানিক্যাল নাম *Allium cepa* Linn. ফ্যামিলি *Liliaceae*। ভিম্বাকৃতি এই কন্দমূলটি সিদ্ধ করলে মাংসের মত থলথলে হয়। তাই এর নাম পলাণ্ড (পল অর্থ মাংস); পরবর্তী যুগে সেইটাই পলাণ্ডু নামে পরিচিত হয়েছে।

## আছে কোথায় ?

চরকের হরিৎবর্ণে। এই বর্ণের ওষধিগুণের বৈশিষ্ট্য হলো—যারা সূর্য-কিরণের শক্তিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে, তাকেই হরিৎবর্ণে গ্রহণ করা হয়। সূর্য-কিরণের এক নাম হরিৎ। এটি বৈদিক সূক্ত ও আর্যভাষ্যের কথা। এই কন্দমূলের প্রকৃতি-বর্ণনায় বলা হয়েছে—এটি শ্লেষ্মাকারক, বায়ুনাশক, অল্প পিত্তবর্ধক, আহাৰ্যের সহযোগী, বলকারক, গদ্রু, বৃষা, রোচন ও জঠরানলের উদ্দীপক। অর্থাৎ—পৃথ্বী ও অগ্নিপ্রধান ভেষজ। এই পলাশু সম্পর্কে সূত্রদ্বয়ের সমীক্ষাও ঐ একই। বাংলার কোন কোন সম্প্রদায়ে এটির কাঁচা বা তরকারির সঙ্গে ভূঁর ব্যবহার প্রচলিত। এই পেঁয়াজের সবুজ গাছ ও কলি (পদ্মপদম্ভ) শাক হিসেবে কাঁচা ব্যবহারের কথা বলা আছে, তবে সেগুদলি ব্যবহারের বিধি হলো—অল্প লবণ মাখিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দেওয়া।

## লোক-সংহিতায়—

(১) **তরুণ সর্দিতে:**—মনে হয়—যেন জ্বরই আসছে, সেইরকম সব লক্ষণ দেখা দিলে—নাক বন্ধ, কপাল ভার; সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস ক'রে নাস নিলে সর্দিও বেরিয়ে যায় এবং জ্বর ভাবও চলে যায়।

(২) **যেকোন কারণে শরীর গরম হয়ে প্রস্রাব কষে গিয়েছে,** সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস ১ চা-চামচ ঠান্ডা জলের সঙ্গে খেলে ঐ অসুবিধেটা চলে যায়। তবে রস বেশী খেলে ঘেমন বমি হওয়ার ভয় থাকে, আবার অল্প খেলে তেমনি বমি বন্ধও হয়।

(৩) **দান্ত অপরিষ্কারে:**—দান্ত হয় বটে কিন্তু খোলসা হয় না, সেক্ষেত্রে এক বা দেড় চা-চামচ পেঁয়াজের রস সম-পরিমাণ গরম জলে মিশিয়ে খেলে সে অস্বস্তির লাঘব হয়।

(৪) **ধরপে অক্ষমতা:**—প্রস্রাব চাপলে আর দাঁড়াতে পারা যায় না, প্রায় বেসামান্য—এক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস এক চা-চামচ ক'রে কিছুদিন খেয়ে দেখুন; ওটা সামলে দেবে।

(৫) **রক্তস্রাবে:**—শরীর গরম হয়ে অনেক সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের রসের নাসা নিলে তা বন্ধ হয়ে যায়।

(৬) **অর্শে:**—কোন কারণে যদি রক্তের অতিস্রাব চলতে থাকে, সেক্ষেত্রে রক্ত বন্ধ না করলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় পেঁয়াজের রস এক চা-চামচ ক'রে সমপরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিত খেলে ওটা হঠাৎ বন্ধ না হয়ে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে।

(৭) **নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকলে** দুই এক ফোঁটা পেঁয়াজের রসের নাসা নিলে বন্ধ হ'য়ে যায়।

(৮) **হিক্কায়ে:**—হাতের কাছে কিছু নেই— ২৫।৩০ ফোঁটা পেঁয়াজের রস একটু জলে মিশিয়ে ২।৩ বারে একটু একটু ক'রে খাওয়ালে ওটা বন্ধ হয়।

(৯) **অত্যধিক গরমে:**—উৎকট গরমে পথে পিপাসা পেলে হঠাৎ জল খাওয়া গর্হিত কার্য, সেইজন্য পশ্চিমাঞ্চলে ঐ সময় পেঁয়াজ বেশী করে ব্যবহার করে। এটাতে নাকি লু (Loo) লাগে না। সেই সময় প্রত্যহ একটু ক'রে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে পথ-ঘাটে বিপর্যয়ের ভয় থাকে না।

(১০) **বেরসিক পেঁয়াজ:**—তার সব ভাল, মানুষের শরীরে যে ছয়টি রসের (মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু, কষায়) প্রয়োজন, সব কয়টি দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে; কিন্তু ব্যবহারের অন্তরায় তার গন্ধ। একে উড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি রাতে তাকে চোঁচির ক'রে

কেটে টক দই-এ ভিজিয়ে রাখা যায়। তখন সে সমাজে চলে যাবে, অথচ গুণটাও পাওয়া যাবে। এইটাই বৈদ্যকুলের পেঁয়াজ কোলিন্য সৃষ্টি।

(১১) কানের পুঁজেঃ—অনেক সময় কানের বাইরে ঘা হয়, এক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস গরম করে ২।১ ফোঁটা কানে দিলে ওটা সেরে যায়।

(১২) বমি নিবারণেঃ—পেঁয়াজের রস ৪।৫ ফোঁটা অল্প জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়।

(১৩) বিষ ফোঁড়ায়ঃ—টন্‌টন্‌ করছে (সে যেখানেই হোক না কেন), এক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস করে একটু গরম করে লাগিয়ে দিলে ঐ বিষুনিটা কেটে যায়।

(১৪) মাথা ধরায়ঃ—সর্দিজনিত মাথা ধরায় ২।৩ ফোঁটা এর নস্য নিলে তৎক্ষণাৎ কমে যায়।

(১৫) স্তনের ঠুনকো ও ফোঁড়ায়ঃ—পেঁয়াজের রস গরম করে লাগাতে হয়।

(১৬) মূত্ৰ রোগেঃ—পেঁয়াজ কাঁচা খেলে দাঁতের ও মূত্ৰের অনেক রোগ থেকে বাঁচা যায়। এর অন্য একটা নাম মূত্ৰদূষক। আবার অনেকের অভিমত—এটাতে মূত্ৰ গন্ধ হয় বলেই এটির নাম মূত্ৰদূষক।

(১৭. পচা ঘায়েঃ—জলে পেঁয়াজের রস মিশিয়ে সেই জলে ক্ষত পরিষ্কার করলে ক্রিমি (পোকা) হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো—প্রদেশ বিশেষের স্মার্ত-সম্প্রদায়ের এটাকে বর্জন করার গুঢ় রহস্য কি তার গন্ধ, না আর কিছ্?—এ যেন ‘গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।’

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Organic sulphide viz., alkylsulphides, allyl propyl disulphide.  
 (b) Phenolic constituents viz., catechol, protocatechuic acid  
 (c) Amino compounds viz., different amino acids. (e) Essential oil.





## রসোন

‘বলা মদ্য আর চলা পা’ও যেমন,—আমাদের ‘মর্ত্যের অমৃত’ শব্দটাও তেমনি, এই মর্ত্য শব্দটাই তো মরণধর্মী, এখানে মৃত্যু তো থাকবেই, সুতরাং এই শব্দটা অনির্দিষ্ট জীবনেরই তো নির্দেশক; হ্যাঁ—তবে সেই নির্দিষ্টকালটিতে যেন নীরোগ থাকি—তারই জন্য আমাদের ওষধি। আর এই যে ‘অমৃত’, এটিও গম্ভীরা শব্দ, এই শব্দটি চিরকালই আমাদের স্তোভ দিয়ে আসছে। তবুও বলবো—আমাদের আমি থাকার যে চেষ্টা সেইটাই তো আমাদের ‘অমৃত’, এমনি আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণীয় বস্তুই বুঝি মর্ত্যের কোন কিছু; তাই গালগল্প যেমন এ যুগে চালু তেমনি অতীত ভারতেও কম চালু ছিল না, সবই সেই অবিবশ্বরের আকাঙ্ক্ষায়। অবশ্য গল্প চিরকালই সমাজের কোন বিশেষ ঘটনা থেকেই উদ্ভূত হয় এবং আগামী দিনে সেই ঘটনাটিকে সমাজে হিত-অহিতের দিকটা আলোচনার বিষয় করে রাখা হয়—এমনি একটি প্রাচীন কাহিনী—ইন্দ্রের পত্নী শচী দেবীকে নিয়ে। প্রথমে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান, তাঁদের ধারা বজায় রাখার জন্য ঋষির পরামর্শে ইন্দ্র আনলেন অমৃত, সেই অমৃতবস্তু খাওয়ার সময় শচীদেবীর হ’লো উন্মাদ (ডেংকুর), কিন্তু ভক্ষিত অমৃতটির অংশ পড়ে যায় মর্ত্যে (ধরণীতে), সেই মর্ত্য সত্তা থেকেই যেন জন্ম অমৃত রসোনের। এই কাহিনীটি কাশ্যপ সংহিতার—

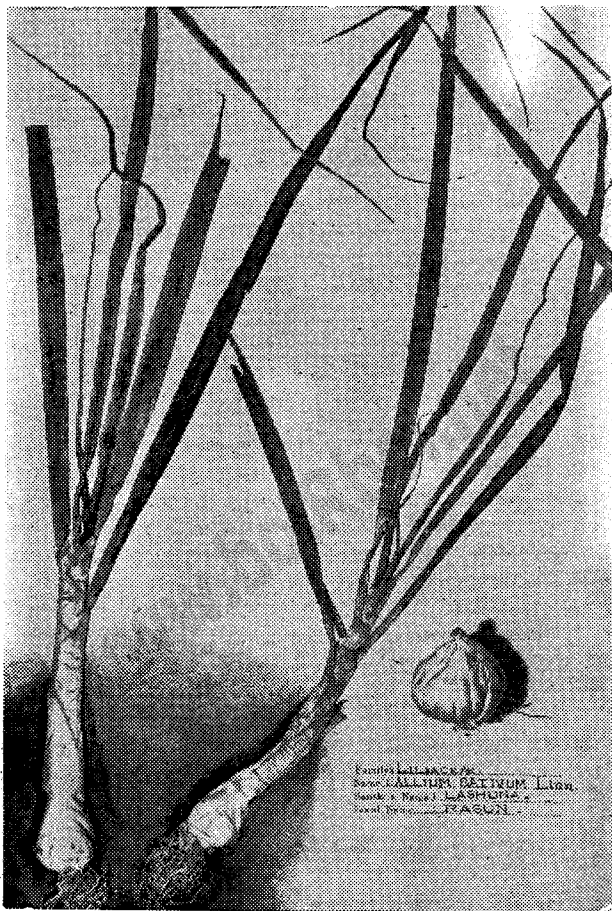
‘এতচ্চাপ্যমৃতং ভূমৌ ভবিষ্যতি রসায়নম্’

অমৃত হ’লেও সে ভূজন্মা, তাই ভূমিজাত দোষ তাতে বর্তালো, সেই দোষেই তা’তে দুর্গন্ধের সম্ভার।

দ্বিতীয় কাহিনী—চোরের উপর বাটপাড়ি ক’রেই যেন এক অসদর অমৃত পানে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা ক’রেছিলো, ব্যাপারটা জানতে পেরে তাকে হত্যাও করা হয়;

পরে তারই অস্থি থেকেই রসোনের উৎপত্তি, তাই তার রসে দুর্গন্ধ। এটা নাবনীতকের উপাখ্যান।

এর দ্বারা এইটাই বোঝানো হয়েছে যে—এটি মর্ত্যের মাঝেই বস্তুসত্তায় অমৃত।



তারও পূর্ববর্তীকালে রসোনের উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদিক উপবহণ সংহিতার ৭।১৭৫।১৭৬ সূক্তে। যেখানে রসোন ও পেঁয়াজ একই পর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে; কিন্তু পরবর্তী সংহিতার যুগে (চরক-সুশ্রুতাদি) এসে তাদের পৃথক সত্তার অনুশীলন।

এই রসোন পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও ঋক্বেদের ৫।৬।৩৪ সূক্তের একটি কাহিনী বিধৃত করা আছে; সেটি হ'লো আর্ষদের গবাদি পশুগুলিকে জোর করে অপহরণ করতে রাভ্য ব্যস্তিরা, এরা দল বেঁধে আসতো, কক'শ কথা বলতো, এদের দলপতির মধ্যে দুজন দুর্ধ্ব'র রাভ্যের নাম ছিল নমুচি ও শম্বর, পরে তাদের দাস অর্থাৎ বশ ক'রেছিলেন আর্ষরা। তারা যে কন্দ ভক্ষণ করে অসীম বলশালী হ'য়েছিলো, সে সম্প্রদায় লাভ ক'রেই সেই কন্দের বৈদিক নামকরণ সুকন্দক। এই নামকরণের তাৎপর্য এইভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই উপবহ'ণ সংহিতায় বর্ণিত সূক্ত ও তার ভাষ্যটি সুকন্দকের (পেঁয়াজ) বর্ণনাতেও পাওয়া যায়।

পৌরাণিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী— যে যুগে পুরোহিত তন্ত্রের হাতে ভারতের প্রতি প্রদেশের সমাজ নিয়ন্ত্রণের অধিকার; তাই কড়া হাতে সমাজকে নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা হ'চ্ছে, তখনও কিন্তু এই সুকন্দকের গুণগণাকে তাঁরাও হীন করতে পারেননি। তারও একটি উপাখ্যান সুকন্দপুরাণে পাওয়া যায়।

এক সময়ে প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়, তাতে বহু মর্দন-ঋষিসহ জনসাধারণ মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়েন; কিন্তু দুজন ঋষি খুব হুঁট ও পুঁট হ'য়ে থাকার পিছনে কি কারণ? এঁরা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু তাঁরা সেই হুঁটপুঁট হওয়ার প্রকৃত ব্যাপারটা গোপন করে রাখেন; তাই প্রশ্নকর্তারা রুদ্ধ হ'য়েই অভিশাপ দিলেন যে—“আপনাদের খাদ্য সকলের অভক্ষ্য হবে”—অবশেষে ভীত হ'য়েই তাঁরা অকপটে স্বীকার করলেন—আমরা সুকন্দক ভক্ষণ ক'রেই এত হুঁটপুঁট; এতে কিন্তু ঋষিরা আর অভিশাপ প্রত্যাহার করে নিলেন না, সেই থেকেই এটি সংস্কারানুগ ব্যক্তিগণের অভক্ষ্য হ'য়ে আছে।

এইসব বৈদিক ও পৌরাণিক কাহিনীর বস্তবের লক্ষ্য কিন্তু সেই একই, তাদের গুণগণার শ্রেষ্ঠত্ব জনসমাজে তুলে ধরা, অপরদিকে এও ঠিক যে—ভারতে বিহরাগত অহিন্দুদের আহাৰ্য থেকে নিজেদের স্বাভাবিক বজায় রাখা। অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে (আয়ুর্বেদিক একটি প্রাচীন গ্রন্থ) পেঁয়াজ রসুনের সুখ্যাতি প্রচুর।

### অচ্ছৃত পর্যায়ে ফেলার অন্তরালে

পৌরোহিত্য সংস্কারের প্রাধান্য বজায় রাখতেই এই পেঁয়াজ-রসুনকে একঘরে করা আছে—

এই হিসেবে যুক্তিও নিরূপণ করা হ'লো যে—আহাৰ্যই মানবের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করে; পাছে তার সত্ত্বগুণ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, তাই রজঃ বা তমোগুণধর্মী আহাৰ্যবস্তু বর্জনের প্রধান হেতুই এইটি; কিন্তু তার বহু পূর্ব থেকেই সদাগ্রাণত চিকিৎসককুল জানেন যে—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র যে কোন ব্যক্তিরই দেহ যখন রোগাক্রান্ত হয় এবং হওয়াটাই যখন স্বাভাবিক, তখন তাঁরা এই বস্তু দুটিকে মর্ত্যে অমৃততুল্য দ্রব্যের অন্যতম বোধে অনুশীলন যথাযথই ক'রেছিলেন, তাই চরক-সুশ্রুতের যুগে এই দ্রব্য দুটির প্রকৃতি পরিচয় তাঁরা কম করেননি।

বৈদিকযুগে এই সুকন্দকের (পেঁয়াজ-রসুনের) গুণ একই পর্যায়ে ধরা হ'লেও ঋষি চিকিৎসকগণ (চরক-সুশ্রুতের কালে) তার পৃথক সত্ত্বার অনুশীলন ক'রেছেন বটে, তবে তার বিশেষ পার্থক্যের কথা তাঁরা বর্ণনা করেননি; তবে ব'লেছেন একটির আকৃতি মাংসের পিণ্ডের মত, ঐ মাংসপিণ্ডাকৃতি কন্দটিতে আয়ুর্বেদোক্ত ৬টি রস (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) রস বর্তমান। চরক-সুশ্রুতে এই দুটি ভেষজের বৈদিক নাম ব্যবহৃত হয়নি—এ দুটিকে হরিতবর্ণের অন্তর্গত ক'রেছেন, এই হরিত শব্দের চিরঞ্জীব-৪

অর্থ হু+ইতি অর্থাৎ সুর্ষের কিরণ থেকে যারা (যেসব ভেষজ) বর্ণ সপ্তয় ক'রে বিশিষ্ট তেজোগুণধর্মী হয়, তাদেরকেই হরিত বর্ণে ধরা হ'য়েছে। পলাশু রসোনের প্রথম পরিচয় তার হরিত পত্রের দ্বারা। পলাশু ও রসোনের গুণ এবং রোগনাশিত্ব সম্বন্ধে চরকের সুত্রস্থান ২৭ অধ্যায়ে ১৪৯।১৫০।১৫১ এবং ২৭৬ শ্লোকে বর্ণনা ক'রেছেন।

### পেঁয়াজ ও রসোনের তুলনামূলক দোষ-গুণ বিচার

পেঁয়াজ খুব বায়ুনাশক, পরোক্ষভাবে সামান্য শ্লেষ্মাকর, পিত্তবর্ধক, আহার্য দ্রব্যের সহযোগী, খুব বলকারক, একটু গুরু, তবে বৃষা (শুক্লশক্তি বর্ধক) এবং রুচিকারক।

রসোন সম্বন্ধে ঐ গুণগুলি তো আছেই, এ ভিন্ন জ্বি, কুষ্ঠ ও কিলাসের (ছত্রি, শ্বেতী প্রভৃতি) ক্ষেত্রে অহিতকর নয়, এবং গুল্মরোগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার ক'রতে উপদেশ দিয়েছেন; তা ছাড়া এই রসোন যেমনি স্নিগ্ধ তেমনি উষ্ণ, তবে সেটা নির্ভর করে রোগাক্রমণের ক্ষেত্রে কোন দোষের প্রাবল্য বর্তমান, তার ওপর উষ্ণতা ও স্নিগ্ধতা গুণের প্রভাব বর্তাবে।

এই কন্দটি সম্পর্কে সুশ্রুত সংহিতার মতবাদ প্রায় একই, তবে হয়, চরকে একটি নতুন কথা বলা হ'য়েছে; পেঁয়াজ রসোনের পাতার গুণ সম্বন্ধে ব'লেছেন—অন্যান্য শাক-সিদ্ধ জল যেমন ফেলে দিয়ে তাকে রান্না ক'রে খাওয়ার বিধি বলা হ'য়েছে—এই পেঁয়াজ রসোনের গাছ বা পুষ্পনালকে (কলি) সে পশ্চিতিতে রান্না ক'রে খাবে না; ওটাকে অল্প ভাঁপিয়ে নিয়ে অথবা কাঁচা গাছ বা পুষ্পনাল অল্প লবণ দিয়ে খাবে। আর পেঁয়াজ-রসোন কন্দ কাঁচা খাওয়াই ভাল, তবে পরিমিত। তারপর সুশ্রুত সংহিতার সুত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়ে ২৫৫—২৫৭ শ্লোকে এদের গুণপনার কথা বলা হ'য়েছে, তবে এই দুটির মধ্যে স্নেহভাব পলাশু অর্থাৎ পেঁয়াজেই বেশী আছে। আর রসোন, ঔষধার্থে ও আহার্য হিসেবে গাছের কন্দ থেকে বীজ পর্যন্ত সমগ্র অংশেরই ব্যবহার হয়, এবং এর প্রতিটি অংশই পৃথক পৃথক গুণের অধিকারী; সেখানে বলা হ'য়েছে—কন্দে কটু, পাতায় তিক্ত, পুষ্পনালে (কলিতে) কষায়, তার অগ্রে (আগায়) লবণ এবং বীজে মধুর রস; এই উল্লিখিতটির মধ্যে নেই ছয়টি রসের বাকী একটি, সেটি অম্লরস, তাই সে রসে উণ অর্থাৎ একটি কম, তাই তার নামকরণ করা হয়েছে রসোন। অম্লরস যে নেই তার প্রমাণ—দুধে রসোনের রস দিলে দুধ কাটে না, কিন্তু পেঁয়াজের রসে কেটে যায়।

### পরিচিতি

কন্দ বা বীজোন্মব বর্ষজীবী উল্লিখিত ভারত বা তৎসমিহিত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তো চাষ হয়ই, তা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও এর চাষ হ'য়ে থাকে।

অতি পরিচিত সাধারণ সজ্জী—এর বোটানিক্যাল নাম *Allium sativum* Linn. এই সজ্জীটির কন্দমূলই প্রধানভাবে ব্যবহার হ'লেও তার পুষ্পনাল (কলি), বীজ, গাছ ও আহার্য ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হ'য়ে থাকে। এর আর একটি প্রজাতির সর্বদা ব্যবহার হ'য়ে থাকে, সেটা দেখতে অনেকটা ধানী পেঁয়াজ অর্থাৎ ছোট জাতের পেঁয়াজের মত। সাধারণ রসোন যেমন বহুকোষ (কোয়া) বিশিষ্ট হয়, এটাতে সে রকম হয় না। এর বোটানিক্যাল নাম *Allium ampeloprasum* Linn. রসোনের চল্লি ডাকনাম রসনু বা লসন।

## রসোনের গুণ (এক নজরে)

দীপন (অগ্নির দীপ্তিকারক), মৃৎশোধক, স্ফুম্প্রোতগামী ও প্রোতশুদ্ধিকর (এটি পারদের মত সর্বশরীরে ব্যস্ত হ'তে পারে ব'লেই গায়ে গন্ধ বেরায়; তা ছাড়া মেধা, স্মৃতি, বল ও আয়ুর্বর্ধক, অগ্ন সৌষ্ঠবের ক্ষেত্রে কেশ ও শ্মশ্রু রক্ষক ও বৃদ্ধিকারক ও গায়বর্ণ প্রসাদক, চক্ষুর জ্যোতি রক্ষক। পদ্রুবেশ পক্ষে—শুদ্ধ ও ওজো ধাতুর বর্ধক, পৌরুষ প্রবৃন্তির ধারক ও বাহক। নারীর পক্ষে—সন্তানপ্রদ ও আয়ুর্স্কর। যুবতী জীবনের অগ্নসৌষ্ঠবের সমতা রক্ষক। কিশোরের পক্ষে—শরীর ও মনের সার্বিক উন্নতিকর। যে সব রোগের ক্ষেত্রে রসোনের ব্যবহার ফলপ্রদ হ'য়ে থাকে—(১) অস্থিচ্যুতি (Dislocation of Bones), (২) অস্থিভঙ্গ (Fracture of Bones), (৩) অস্থি সম্বন্ধীয় রোগ, (৪) বীর্ষ সম্পর্কীয় রোগ, (৫) ভ্রম রোগ (Giddiness), (৬) কাস ও শ্বাস রোগ, (৭) কুষ্ঠ রোগ, (৮) কৃমি রোগ, (৯) গুল্ম রোগ, (১০) চর্ম রোগ ও চর্মের বিবর্ণতা, (১১) নেত্র রোগ ও দ্রাব্যন্ধতায় (রাতকানায়), (১২) জীর্ণজ্বর এবং চাতুর্থক জ্বর (পালা জ্বর) প্রোতরোধজনিত উন্মূত রোগ সকল, যেমন—মূত্র সম্বন্ধীয় রোগ প্রভৃতি।

## সংহিতাগ্রন্থোক্ত ও লোকায়তিক ব্যবহার

(১) ঢলা ঘোঁবনে— কোন দিকেই একে ধ'রে রাখা যাচ্ছে না, এক্ষেত্রে দু' কোয়া রসুন গাওয়া ঘিয়ে ভেজে মাখন মাখিয়ে খেতে হয়, খাওয়ার শেষে একটু গরমজল পান করা উচিত। (খ) আটার সঙ্গে রসুন বাটা মিশিয়ে রুটি বা লুচি ক'রে খাওয়া। (গ) ছাতুর সঙ্গে একটু ঘি, চিনি ও একটু রসুন বাটা মিশিয়ে খেলেও হয়।

(২) ঘোঁবন রক্ষায়— কাঁচা আমলকীর রস দুই বা এক চামচ নিয়ে তার সঙ্গে এক বা দুই কোয়া (নিজের শরীরের সহ্যাসহ্য ব'লে) রসুন বাটা খেতে হয়, এটাতে শ্মদী-পদ্রুষ উভয়েরই ঘোঁবন ধরে রাখে। ঘোঁবনের প্রারম্ভ থেকে ব্যবহারে নারী থাকে তত্বী।

(৩) দুই বা এক কোয়া রসুন চিবিয়ে খেয়ে একটু গরম দুধ খেলে এইসব ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়—

(ক) স্বরূপ মেধায় (খ) বিস্মরণে (গ) কৃমিতে (ঘ) রাতকানায় (ঙ) শৃঙ্গ-তারল্যে (চ) চুলকণায় (ছ) পাথুরীরোগে (জ) জীর্ণ জ্বরে (ঝ) শরীরের জড়তায়।

(৪) হাড়সার শিশুর গায়ে মাংস লাগাতে চাইলে, ভাতের সঙ্গে টাটকা ঘোল ও সিকি (৩) বা আধ (২) কোয়া রসোন কিছুদিন খাইয়ে দেখুন।

(৫) পেটের ব্যাদুভে— এর সঙ্গে অনেক সময় শ্লেষ্মারও যোগ থাকে, এ ক্ষেত্রে ঠান্ডা জলে ২।৫ ফোঁটা রসুনের রস মিশিয়ে খেলে অনেকক্ষেত্রে এটার উন্বেগ চলে যায়।

(৬) বাতের কনকনানিতে (মাংসান্নিত বাতে)— গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে দুই/তিন কোয়া রসুন বাটা খেতে হয়; অথবা ৫।৭ ফোঁটা রসুনের রস ঘিয়ে মিশিয়ে খেলেও হয়।

(৭) শরীর ক্ষয়ে— খায় দায়, শূন্যকিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এক বা দুই কোয়া রসুন বেটে এক বা আধ পোয়া দুধে পাক ক'রে সেটা খেতে হয়। এটাতে ক্ষয় বন্ধ হবে; অধিকন্তু আস্তে আস্তে ওজন বেড়ে যাবে।

(৮) মদ্যপানীর পেটে— অনেক সময় শূল ব্যথা ধরে, অথচ তাকে পরিত্যাগ করার

থেকে তাঁর মরাটা সহজ এই মনোভাব, এ ক্ষেত্রে তাঁরা একটা কাজ ক'রে দেখতে পারেন, ওরই সঙ্গে দুই এক কোয়া রসদুন খাবেন, এ অসুবিধেটা আর থাকবে না।

(৯) শুকুতারল্যে— অল্প গরম দুধের সঙ্গে ২/১ কোয়া রসদুন বাটা খেলে শুকু-তারল্য হয় না; অস্থির বল বাড়ে; অস্থির ক্ষয় হ্রাস পায়; শরীরের নিত্য ক্ষয় রুদ্ধ হয়।

(১০) যক্ষ্মারোগে প্রতিরোধক— নিত্য এক কোয়া রসদুন অল্প গরম দুধে মিশিয়ে খাওয়া।

(১১) নরম মাছে (মৎস্যে)— সংসারে অনেক সময় ইচ্ছে-অনিচ্ছয় অনেককিছুই এসে যায়; সে ক্ষেত্রে একটু রসদুন বাটা দিয়ে রান্না ক'রলে শরীরের ক্ষতিকারক দোষ অংশটা অনেক কেটে যায়, এটা কিন্তু আয়ুর্বেদ সম্মত বিধি নয়, এভাবে খেলে রক্ত দূষিত হ'তে পারে।

(১২) কুকুরে কামড়ালে— বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসার ক্রমকে মানতে হবে, তবে যদি তার আদৌ প্রয়োজন না থাকে, তা হ'লেও কিছুদিন রসদুনের রস ২।৫ ফোঁটা অল্প গরম জলে বা দুধে মিশিয়ে খাওয়া ভাল। গ্রীক দেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটা লিপিবদ্ধ আছে।

(১৩) বিষমজ্বরে (প্‌দুরাতন)— জ্বর ছাড়বে না; বাড়ে কমে কিন্তু একটু থেকে যায়, যাকে বলা হয় ঘৃস্‌ঘৃসে জ্বর—এ ক্ষেত্রে ৫।৭ ফোঁটা রসদুনের রসের সঙ্গে আধ বা এক চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে খেলে দুই চার দিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে যাবে।

(১৪) আর্টারিওস্কেলেরোসিস— (Arteriosclerosis)— একটু বয়স হ'লে শৃঙ্খল রক্তবাহী শিরাগুলির স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ ইলাস্টিসিটি (elasticity) ক'মে যেতে থাকে, সে ক্ষেত্রে এটি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ঐ অসুবিধেটা সৃষ্টি হয় না।

(১৫) এম্‌ফাইসিমা (Emphisema) রোগে—এই রোগটি হাঁপানি, তবে অসুবিধে এটাতে নিঃশ্বাস ছাড়তে কষ্ট হয়। ৫।৭ ফোঁটা রসদুনের রস ঠান্ডা দুধে মিশিয়ে রোজ একবার ক'রে খেলে অনেকক্ষেত্রে ঐ রোগের উপশম হয়।

(১৬) মাথা ধরায়— সর্দি হয় না অথচ মাথা ধরে (বায়ুর জন্য)। এই সমস্যা সমাধানের উপায় দুই—এক ফোঁটা রসদুনের রসের নস্য নেওয়া। আর একটা কথা—এর রস গায়ে লাগলে চামড়ার কোন অনিষ্ট করে না।

(১৭) ক্ষতে— ক্রেদ কিছুতেই যেতে চায় না; একটু ঘিয়ের সঙ্গে রসদুন বাটা ক্ষতে লাগালে ওটা কেটে যাবে।

(১৮) বাতের যন্ত্রণায়— সরষের তেলে রসদুন ভেজে সেই তেল মালিশ ক'রলে বাতের যন্ত্রণা কমে যায়।

(১৯) ক্ষতের ত্রিমিতে— অনেক সময় পচা ঘায়ে পোকা জন্মে। বিশেষতঃ গরু মহিষের প্রায়ই এটা হ'তে দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে রসদুন বেটে ঘায়ে লাগালে পোকা হয় না, আর হ'লেও মরে যায়।

এ ভিন্ন গ্রন্থোক্ত অথবা লোকায়িতিক ব্যবহারের বহু মর্দুষ্টিযোগ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মাত্রা সম্বন্ধে বক্তব্য— রসদুনের মাত্রা জঠরাগ্নির বলাবল, কাল (ঋতু ভেদে) ও বয়স এবং সাধ্য অনুযায়ী (অর্থাৎ অভ্যাস বা অনভ্যাসের ক্ষেত্র বিচারে) মাত্রা ঠিক করতে হয়। তবে যে সব মাত্রা নির্দেশিত হ'লো—সেটাই অবশ্য পালনীয় এমন কোন নির্দেশ নয়।

নির্গন্ধ রসদুন— খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় তাল গন্ধটাই বিরসতা সৃষ্টি

করে, এ উপলব্ধি সকলেরই হয়। তাই রসুনের কোয়ার উপরের খোসাটা ছাড়িয়ে, আধখানা করে কেটে টুক দইএ পূর্বদিন রাতে ভিজিয়ে রেখে তার পরের দিন খাওয়ার পূর্বে ওটা ধুয়ে নিলে ঐ অভদ্র গন্ধটা আর থাকে না। এটাও না খেতে পারলে রসুন ঘিয়ে ভেজে শাক কিম্বা তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন। অথবা মাংস বা দইএর সঙ্গে সিদ্ধ করে খাবেন।

নিষেধ— মাছের সঙ্গে, কাঁচা দুধের সঙ্গে রসুন খেতে নেই, এর দ্বারা রক্ত দূষিত হয়।

অবশেষে একটা কথা না লিখলে আমার পূর্বসূরীদের উপেক্ষা করা হবে—তাই অপ্রিয় হ'লেও লিখতে বাধ্য হচ্ছি—আজ এত দৃষ্টিকণ্ঠ্য ব্যাধির প্রাবল্য আমাদের খাদ্যের সংস্কার সৃষ্টিই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী, সে কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হ'চ্ছে—এ কথাটা কিন্তু আমার নয়, কাশ্যপ সংহিতার কথা—যেমন তাঁরা নিষেধ করেছেন মাছের সঙ্গে আদা রসুন এক সঙ্গে খাওয়া বিরুদ্ধ আহারের পর্যায়ে পড়ে।—অথচ আদা রসুন না হ'লে যে আমাদের রান্নাই অচল। সে কালের মতে এটি অহি-নকুল অর্থাৎ সাপ-নেউল সম্পর্ক।

এ তো গেল ভারতীয় ভৈষজ্যবিদ্যার অনুশীলন কিন্তু এ রসুনটিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম ওৎসুকের সৃষ্টি হয়নি—রসুনের বস্তুসত্তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হ'য়েছে, তবে সেটা এককন্দ রসুনের, যার বোটানিক্যাল নাম—*Allium ampeloprasum* Linn.

তাই বলছি আপনার যতই সাবুদ থাক, সরকারের সিলমোহর না থাকলে আপনার দলিল যেমন প্রামাণ্য হয় না, সেইরকম—আমাদের সংহিতায় রসুনকে মর্ত্যের অমৃত যতই বলুন না কেন, তার কোন ওজনই নেই, তাই আমার এই বিশ্বের সাবুদ হাজির করা।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই রসুনকে কেন্দ্র করে একটা সিম্পোসিয়াম হ'য়েছিলো ক্যালিফোর্নিয়া সহরে, সেখানে এসেছিলেন সারা বিশ্বের রসুন প্রেমিকগণ! আমার এক্ষেত্রে বক্তব্য সেই প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে। তবে এটাও ঠিক যে ভূমণ্ডলের অবস্থানান্তরে শীতগ্রীষ্মের ভারতম্যে দেহের উপর দ্রব্যের গুণাগুণ প্রকাশ নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের দেশে সেইসব রোগের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কতটুকু হবে অথবা আদৌ হবে কিনা সেটাও তো বিচার্য। তবে তাঁদের গবেষণালব্ধ সমীক্ষাটাও আমাদের জানা দরকার।

ভক্ত যেমন ভক্তির সূত্র খুঁজে নেয়, বিশ্ব বৈজ্ঞানিকগণের রসোন ভজনাও সেই ধরনের। এক এক দেশে এক একটি বিশেষ রোগের উপর তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। সেইসব প্রতিবেদনের রোগপঞ্জীতে এই ধরনের লেখা রোগগুলির নাম দেওয়া হ'য়েছে—সর্বপ্রকার ফোড়ায়, বিষ ফোড়ায় ও বোলতা বিছের কামড়ে বাহ্যপ্রয়োগ (External application), ধমনীর সংকোচন (Arteriosclerosis), হাতে পায়ে খিল ধরা, কোষ্ঠবন্ধতায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সর্দি-কাসির প্রবণতা ও হাঁপানীতে। রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া মন্দীভূতজনিত রোগগুলিতে, শোথে, গলা-বৃক জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য ও পাতলা দাস্তে, অন্ত্রপ্রদাহে ও পিত্ত পাথুরীতে (Gall-Stone), হাই ব্লাড প্রেসারে (High Blood pressure), অর্শ রোগে, জীবাণুজ সংক্রামক রোগে, যকৃৎ দোষে, স্নায়বিক দৌর্বল্যে, ফেরিঞ্জাইটিস্ (Pharyngitis), গলক্ষত (Sore throat), ও ডিপথিরিয়ায় (Diphtheria), নানা প্রকার চর্ম রোগে, ক্ষয় রোগে, গলগণ্ডে, ক্রিমিতে, হৃদপিণ্ড কাসিতে, বমনে, এমন কি বৃক ধড়ফড়ানিতে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

প্রথমতঃ ব'লে রাখি—এটাতে আছে ভিটামিন্ 'এ' 'বি' 'সি' ও 'ডি' এই হেতু

এটি ব্যবহারে বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

গত মহাব্দুন্দ্রে বৃটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ দেখেছেন যে—আহত সৈনিকদের ক্ষেত্রে বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ করলে কোন ক্ষেত্রেই ক্ষত বিষয়ে যেতো না। এ ভিন্ন এটিতে আছে Potassium, Calcium, ফস্ফরাস্, আয়রণ, আয়োডিন এবং উগ্রশক্তির জীবাণুনাশক acrolein, crotonic aldehyde, allyl sulphide ও volatile terpenes. এটির গবেষক Arthur W. Synder, Ph. D.

রসুনের মধ্যে allyl sulphide থাকায় এই কন্দটিটির সর্বপ্রকার জীবাণুনাশ করার শক্তি আছে, এবং এ কথাও লিখেছেন যে—একটা রসুন থেঁতো করে ঘরে রেখে দিলে ঘর জীবাণুমুক্ত থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পিতৃস্বরূপ হিপোক্র্যাট্‌স্ (Hippocrates) লিখেছেন যে আমাদের বনৌষধির মধ্যে রোগ প্রতিকারে রসুনেরই স্থান প্রথম।

জার্মানিতে ৮০টি রাড্-প্রসারের রোগীকে দেওয়া হয়েছিলো, তাঁরা প্রায়ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার পেয়েছেন।

জাপান দেখেছেন যে—এই দ্রব্যটিতে বি কোলাই এবং টায়ফয়েডের জীবাণু নাশ করার শক্তি আছে।

রাজ্যলের একটি চিকিৎসক সম্প্রদায় এটিকে প্রয়োগ করেছেন এমিবিজ্ ডিসেন্‌ট্রী (Amoebic dysentery) ও টায়ফয়েড্, প্যারা-টায়ফয়েডের ক্ষেত্রে (Typhoid, Para-typhoid).

রাশিয়ান চিকিৎসকগণ ব্যবহার করে বলেছেন যে, এর দ্রব্যশক্তি পেনিসিলিনের তুল্য।

শিশুদের হৃদপিং কাসিতেও ফল পাওয়া যায়—যদি শিশুর পায়ের নিচে কোন স্নেহ-পদার্থ (ভেসিলিন্ জাতীয় জিনিস) লাগিয়ে ২।৩ কোয়া রসুন বেটে তার উপর লাগানো হয়। এর দ্বারা এই রোগ উপশম হয়। যেহেতু রসুনের দাহিকা শক্তি আছে, তারই জন্য পায়ের তলায় কোন স্নেহ পদার্থ (oily substance) না লাগিয়ে এটি দেওয়া নিষেধ। তবে এগুনি পুনরায় আমাদের এই প্রাকৃতিক পরিবেশে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন।

আমাশয় ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায়—ছোট এক কোয়া রসুন সকালে চিবিয়ে খেতে বলেছেন, সহ্য হ'লে সকালে ও বৈকালে এক কোয়া করে দুবেলাই খাওয়া যেতে পারে।

পায়ের তলার কড়ায়—যাকে আমরা চলতি কথায় গুঁপো বলি—রসুন আধখানা করে কেটে, রাত্রে কড়ার উপর চেপে লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) দিয়ে বন্ধ করে রাখতে হয়। এই রকম কয়েকদিন করলে কড়া সেরে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে—রসুন কোন জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া ভাল।

সেই সিম্পোসিয়ামের (Symposium) প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ অনুবাদে একটি গ্রন্থের উপাদান তব্দুও এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হ'লো।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Organic sulphides viz., allyl propyl disulphide, diallyl disulphide, allicin, allisatin-I, allisatin-II. (b) Sulphur bearing amino acid viz., S-(2-carboxy propyl glutathione). (c) Essential oil.





## আদ্রক

অগ্নিগর্ভ আদ্রক (আদা)

বাস্তব জগতের বস্তুসমূহ ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম্ এই পাঁচটি পদার্থের মৌলিক উপাদান গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের অস্তিত্ব নেই এমন প্রস্তাব কেউই করেন না।

তাই মানব-সভ্যতার আদিবিকাশের যুগ সেই বৈদিক যুগে উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে ভৈষজ্য-শক্তির উপাদানের অস্তিত্ব নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক উপাদানের ভারতম্য যে আছে, সেই সময়েই সেটা তাঁদের নজরে এসেছিল। বৈদিক সূক্তে বিবৃত সেইসব ইঙ্গিতকেই আবার অনুশীলন করে কাজে লাগানো হয়েছে—পরবর্তী সংহিতার যুগে রোগ-প্রতিকারে।

এই আদ্রক—যার প্রচলিত নাম আদা, তাকে জনসমাজের শারীর-কল্যাণে কতভাবে যে কাজে লাগানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে—সেইটি আমার বক্তব্য।

লোককথায় একে নিয়ে উপমা সৃষ্টিও করা হয়েছে, যেমন—‘আদা জল খেয়ে লাগা’, ‘আদায় কাঁচ কলায়’, ‘আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি কাজ’, ‘পচা আদায় ঝাঁঝ বেশী’ ইত্যাদি; এই উপমাগুলি ব্যঙ্গাত্মক হলেও উপদেশাত্মক। যেমন আদা পচে গেলে তার দ্রব্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ঝাঁঝটা কমে না বরং বাড়ে, এটা নির্গুণ মানুষের তিন গুণ ঝাঁঝেরই রূপান্তরিত লোককথা। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষার ঝঝর শব্দটি ঝাঁঝ হয়ে গিয়ে সে তীক্ষ্ণ কটুতার বোধক হয়।

## বৈদিক যুগের অনুশীলন

“সৌপর্ণমসি অপাণ্নে অগ্নিমাঙ্গাদং জহি নিষ্কৃত্যাদং সেধ।  
মাদেব যজং বহ। স্বা ক্ষত্র সজাত বনুপদধামি।”

(অথর্ববেদ—বৈদ্যাককল্প—১৩।৩।২৭)



মহীধর ভাষ্য করেছেন—

স্বং সৌপর্ণমসি=সদৃশ পর্ণানি অস্য। বিশ্বং তশ্চেযজং।

(এই বিশ্বই আবার শব্দ আদার একটি নাম।)

অপাণ্ন=ইত্যগ্নেণ পাচং করোতীতি। গ্রয়ো অগ্নয়ঃ সন্তি।

একঃ আমাং। আমং অপক্কং অতীত্য। আমাং লৌকিকঃ অগ্নিঃ।

স্বিতীয়ঃ ক্রবাৎক্রবং মাংসং অস্তি। তৃতীয়ঃ যাগযোগ্যঃ।

তথাবিধান্ গ্রীন্ অগ্নারাণ। উপদধামি স্বাং অগ্নারে স্থাপয়ামি।

স্বং আসাদং অগ্নিং জহি।

**এটির অনুবাদঃ**—তুমি সুদর্পণ। তোমার পত্রগুলি সুদৃষ্ট। তুমি বিশ্ব। ভেষজ। তুমি তিনটি অগ্নিকে পক কর। তুমি মাংস ভক্ষণ কর। তোমাকে অগ্নারে স্থাপন করি।

বৈদিক সূক্তটির গূঢ়ার্থ ব্যাঞ্জনা বিচিত্র; অন্যান্য গ্রন্থে অগ্নির বিভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রে বেদ বলেছেন তিনটি অগ্নির কথা, অগ্নির এই তিনটি সংখ্যাকে সামনে রেখে সংহিতার যুগে সংহিতাকারগণ তার স্বরূপ উন্মোচন করে বলেছেন—কায়াগ্নি, অন্তরাগ্নি, বহিরাগ্নি। কায়াগ্নির অবস্থান তিনটি ক্ষেত্রে—ব্রহ্ম-রশ্মি, মূত্রগহবরে ও গূহ্যদেশে; অন্তরাগ্নির তিনটি স্থান—আমাশয়, পচ্যমানাশয় বা অগ্ন্যাশয় ও গ্রহণীনাড়ী; আর বহিরাগ্নির তিনটি স্থান—ভেষজ, মহানস বা রন্ধনশালা ও যজ্ঞভূমি। পরবর্তী যুগে বেদোক্ত এই তিনটি অগ্নির অস্তিত্ব নয়টির দ্বারা বর্ণনা করেছেন। সেই বহিরাগ্নির অন্তর্গত যে ভেষজাগ্নি, তাদের মধ্যে আদ্র্ৰকই হলো অপর একটি। আরও একটা ইংগিত—“অগ্নারে তোমাকে স্থাপন করি”—এই কথাটির অন্তর্নিহিত তথ্য হলো—আমাশয়, পাকশয় ও গ্রহণী নাড়ীর অগ্নি মন্দীভূত হলে যে সমুদয় রোগের উদ্ভব হয়—এই ভেষজাগ্নি আদ্র্ৰকই সেই নিভস্ত অগ্নিকে উদ্দীপিত করে। আর একটি কথা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়—সেই বৈদিক যুগে আদ্র্ৰককে মাংস-ভক্ষক বলা হয়েছে, অর্থাৎ আদার রসে মাংস নিজে জীর্ণ হয়, এবং এর দ্বারা সেই খাদ্যও সুপাচ্য হয়ে যায়। সেটাও সমীক্ষার বিষয় হয়েছিল সেকালে।

**পরিচিতিঃ**—এটি কন্দজাতীয় উদ্ভিদ—ভারতের সর্বত্র হরিদ্রার (*Curcuma domestica*) মত চাষ হয়, তবে কম-বেশী। গাছ ২।৩ ফুট উঁচু হতে দেখা যায়; সুবিন্যস্ত পত্র ১/১৫ ইঞ্চি চওড়া, ১২।১৩ ইঞ্চি লম্বা। এর পাতাগুলি সুন্দর ভাবে সাজানো দেখেই বৈদিক যুগে তার নাম সৌপর্ণ; এতে একটি সুমিষ্ট-গন্ধেরও অস্তিত্ব থাকে। গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Zingiber officinale* Rosc. ফ্যামিলি *Zingiberaceae*। এই গাছের মূলই (কন্দ) গ্রহণ করা হয়; আবার তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে নেওয়া হয়, তখন তার নাম হয় শৃষ্ঠ বা শৃষ্ঠী। আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে ঔষধার্থে শৃষ্ঠের ব্যবহারই বেশী, তাই প্রায় সর্বত্র শৃষ্ঠের নামের উল্লেখ দেখা যায়; এ ভিন্ন তার আরও নাম আছে—বিশ্ব, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র, নাগর প্রভৃতি। তার আদ্র্ৰক নামকরণে তাৎপর্য হ'ল—জন্মক্ষেত্র স্মৃতিস্মৃতিতে ভূমিতে (আদ্র্ৰ ভূমিতে)। এই হিসেবে তার নাম আদ্র্ৰক। তবে সে নিজে তেজোগুণে ভরপুর—সোমগুণে নয়। এখানে দ্রব্য-সংগঠনে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে তেজ বা অগ্নিগুণেরই আধিক্য।

### রোগ-প্রতিকারে আদ্য ও শৃষ্ঠ

(১) **অক্ষুধায়ঃ**—মধ্যাহ্ন-আহারের অব্যবহিত পূর্বে সৈন্ধ্য লবণ দিয়ে একটু আদ্য চিবিয়ে খেলে ক্ষুধা বাড়ে; মূত্থের বিরসতা, জিভের ও গলার কফের জট এবং জড়তা দূর্ই নষ্ট হয়। অধিকন্তু এটি হৃদগ্রন্থির বলকারক।

(২) **নতন সর্দি ও জ্বর ভাবেঃ**—আদার রসে একটু মধু মিশিয়ে খেলে এটার যে উপকার হয়, সেটা তো সকলেরই জানা।

(৩) **শীতপিত্তেঃ**—শরীরে চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠার চিহ্ন লক্ষিত হয়, যাকে চলিত কথায় আমবাত বলে—সেক্ষেত্রে পুরাণো গুড়ের সঙ্গে অল্প আদার রস মিশিয়ে খাওয়ালে উপশম হয়। তবে দান্ত পরিষ্কার না থাকলে এটা যেতে চায় না।

(৪) **বসন্তেঃ**—আদার রস ১ চা-চামচ ও তুলসী পাতার রস ১ চা-চামচ এক-

সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন। যারা বসন্ত চিকিৎসা করেন তাঁরা বলেন—এর স্ফারা বসন্তের গদুটিগদুলি তাড়াতাড়ি বোরিয়ে পড়ে।

(৫) **অরুচিতে:**—সিকি কাপ জলে ২ চা-চামচ আন্দাজ আদার রস ও সামান্য লবণ মিশিয়ে ১০।১৫ মিনিট মৃদু পুরে রাখতে হয়, তারপর ফেলে দিতে হয়; এতে খাওয়ার রুচি ফিরে আসে। আর লবণ না দিয়ে ঐ জল মৃদু রাখলে সাম্মিপাতিক দোষ-জনিত দাঁতের মাড়ি ফোলা আরাম হয়।

(৬) **নেফ্রাইটিসে (বৃক্কশোথে):**—রোগীর আহাৰ্য্য দ্রব্যের সঙ্গে একটু আদার রস বা শর্টের গদুড়ো মিশিয়ে খেতে দিলে চমৎকার কাজ পাওয়া যায়, তবে মাত্রা ঠিক করতে হয় বয়সানুসারে, পূর্ণ মাত্রা ১ গ্রাম।

(৭) **পুরাণো আমাশয়:**—পুরাণো ‘আমাশা’ হাঁদের আছে, তাঁদের উচিত—আন্দাজ ১ গ্রাম মাত্রায় (সহ্যমত) শর্টের গদুড়ো গরম জলের সঙ্গে খাওয়া, এর স্ফারা আম পরিপাক হয়।

(৮) **অতিসারে:**—খুব পাংলা দান্ত হচ্ছে, থামানো যাচ্ছে না, তখন নাভির চারিদিকে একটু শক্ত করে আমলকী বেটে আল্ দিয়ে তার মাঝে আদার রসে ভেজানো ন্যাকড়া দেওয়া, আর একটু একটু করে আদার রস ওতে ঢেলে দিতে হয় এবং খেতেও দেওয়া হয়। এর স্ফারা ওটা থেমে যায়—এ মর্নিটযোগ আজকালের নয়, ৮।৯ শত বৎসর পূর্বেরকার (চক্রদত্ত সংগ্রহ)।

(৯) **হিকায়:**—হাগলের দৃশ্যে অল্প আদার রস মিশিয়ে খেলে ওটা থেমে যায়।

আজ হয়তো অনেকেই মনে করবেন—এ তো সেই পুরাণো কাসন্দ্রি। হ্যাঁ, এর জ্যোত্স নেই সত্যি, কিন্তু বিজ্ঞান আছে—তাই তো কাসন্দ্রি ঘাঁটা।

(১০) **কেটে গেলে:**—কোন জায়গায় কেটে রক্ত পড়ছে—ওখানে একটু শর্টের গদুড়ো টিপে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ি জুড়ে যাবে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Terpenoids viz., camphene, betaphenandrene, cineol, citral, borneol gingerol, shogaol. (b) Salt viz., potassium oxalate. (c) Traces of essential oil.



## অলাবু

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যখন আমাদের বলা হয়—এখন এটা খেতে নেই তখন সেটা খেতে নেই, তখনই এ প্রশ্ন মনে জাগে—কেন? এই নিষেধের মূলে কি কোন বলিষ্ঠ যুক্তি আছে? না নিছক উদ্দেশ্যমূলক সংস্কার?

সাধু ভাষায় দুটি প্রবাদ আছে—

‘নহাম্‌লা জনশ্রুতিঃ’।

যাকে বলে জনপ্রবাদের মূলে কিছ্‌ না কিছ্‌ থাক্‌বেই; আবার

‘স্মার্ত্তা হি বেদ গন্তারঃ’।

স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশীলক যাঁরা, তাঁরা বেদকেই অনুশীলন ক’রেছেন।

### আদ্যি নাড়ী

অপরিচিতের ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতি হ’লো—প্রথমতঃ প্রশ্ন, মহাশয়ের নিবাস? আপনার নাম কি? আপনি কোন্‌ কুলের? সেই রকম কোন দ্রব্যও আমাদের দেখতে হয় এটা ঘোরো না বেরো, তাই খুঁজতে হয় বেদ; সেখানে দেখা গেল—এই অলাবু সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সমুদ্রং তে হৃদয়ং অপস্বন্তঃ দ্রাপ তুম্বঃ বিশ্বোষধিরুতাপঃ।

স্দর্ম্মিগ্রীয়া ন আপঃ দ্দর্ম্মিগ্রীয়া অগ্নিঃ যো

অস্মান্‌ ম্বেজি যং চ বয়ং ম্বেষ্মঃ॥

এই সূক্তটির মহাধরের ভাষা হ'লো—

তুম্বস্যা দ্রাপঙ্কং শ্বেষ্যং চ বিদধাতি। তুম্বতি=রুচিং অর্দতি ইতি,  
অলাবদুরিতি বা, ন লম্বতে যঃ, ন লোপঃ। তস্য দ্রাপঙ্কং=দারিদ্র্যং  
অশ্নেঃ শ্বেষ্যৎ চ। ধরামদং=রত্নাদিকং গৃহীত্বা যঃ রাজতে স  
সমৃদ্ধঃ। স এব তে হৃদয়ং অপ্সদ অন্তঃ বিশতুঃ আপঃ ওষধীঃ  
স্বাং বিশতু, দর্শমিঠয়া বয়ং শ্বেষ্মাঃ স্বাং চ অগ্নিঃ শ্বেষিতি।  
অগ্নিঃ=সোরতেজঃ অস্য নাড়িকায়ং প্রবিশ্য যথোক্তপাকান্তঃ  
প্রভূতেন বাতেন নাড়িকানাম্ চ জায়তে, ততো শ্বেষিতি অগ্নিরিতি।



ভাষাটির অনুবাদে বন্ধা যায়—তুম্ব বা অলাবদুর প্রতি শ্বেষ্যৎ বিধায়ক সূক্ত এটি—  
তুম্বের অর্থ রুচিকে যে পীড়িত করে। ধরার রত্ন ও মদ্রা নিয়ে যে গম্ভীর হ'য়ে থাকে  
তার নাম সমৃদ্ধ। সেই সমৃদ্ধেই তুম্বের হৃদয় নিহিত থাকে। জল ও ওষধি তোমাতে  
প্রবেশ করুক। তুমি সন্মিত্র ও দর্শিত্র হও বলেই আমরা তোমাকে শ্বেষ করি। সৌর  
অগ্নির তেজ তোমার নাড়িকায় প্রবেশ করে। প্রভূত বায়ুর সহায়তায় জাঠর অগ্নিকে  
তুমি শ্বেষ কর। অগ্নিও তোমাকে শ্বেষ করে।

## সূত্রে কি পাওয়া গেল—

অলাব্দ গোল হবে (যার প্রচলিত নাম লাউ), এটি আকারে লম্বাও হয়, তার নাম তুম্ব কিন্তু বৈদিক সূক্তের শাস্ত্রিক অর্থে এটি গোল। দোষগুণের ক্ষেত্রে এটি পাচক অগ্নির শত্রুতা করে। আর তুম্বের অর্থই হ'লো রুচিকে পীড়িত করা। এই রুচি শব্দের তিনটি অর্থ (১) কালিত (২) স্পৃহা (৩) জাঠর অগ্নি, আর গুণ বিচারে দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের মত তার হৃদয়ে ধনরত্ন ধারণ করে রেখেছে। একাধারে দুটি রূপ তার মধ্যে থাকাতে তাকে বলা হ'য়েছে—তুমি সূর্যমণ্ডলও যেমনি, আবার সূর্যমণ্ডলও তেমন। এখানে তার গুণ যে কালাপেক্ষী তারই ইঙ্গিত। তাই কি স্মার্তের বিধান যে—ভাদ্র মাসে লাউ খেতে নেই?

## ক'ট বিচারে

লাউএর ভৈষজ্য বা আহাৰ্য স্বভাব রুচির মৌলিক অর্থকেও (জাঠর অগ্নি বিনাশ) গ্রহণ করে আবার পারস্পর্য অর্থও প্রকাশ করে। সামবেদ সংহিতার ২।১০।৭ ও ১৮৪ সূক্তে বলা হ'য়েছে—

‘বাত আবাতু ভৈষজং শম্ভুময়ো ভুনো হৃদে প্রণ আয়ুর্ষি=তারিষং

অর্থাৎ ভৈষজের সঙ্গে জীবের আয়ুর সম্বন্ধ জানা থাকলে আয়ুর্বেদ জানা যায়। ভৈষজ আয়ু উভয়েই অবস্থান করে জাঠরাগ্নি, অগ্নি ও ইন্দ্রিয়াগ্নিতে; কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না। জাঠরাগ্নির ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লেই তবে আয়ুর ভিত্তি গঠিত হয়। সেই অগ্নিই সর্বক্ষেত্রে সর্বশরীর ব্যাপীই বিদ্যমান, যাকে বর্তমান যুগে বলা হয় মেটাবলিজম (Metabolism); অতএব জাঠরাগ্নিকে রক্ষা করাই প্রথম কাজ। এর থেকে পরিস্কার হ'য়ে যায়—যে সব দ্রব্য জাঠর অগ্নিকে মন্দীভূত করে তা থেকে দূরে থাকা। এই অগ্নির পারিভাষিক রূপ হ'লো পিত্ত, এটির সমতার পোষণ, আধিক্য বা ন্যূনতায় রোগ সৃষ্টি। তারই সামগ্রিক পরিণতিতে আসে Metabolic disorder.

আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায়—বাহ্যতঃ যেমন ঋতু ও কালগত অবস্থায় সৌরতেজের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; দেহগত অবস্থাতেও তেমন পিত্তের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। স্বচ্ছ জল যেমন তাড়াতাড়ি শূন্যকরে যায়, কদমাক্ত জল তেমন তাড়াতাড়ি শূন্যকরে যায় না; সেই রকম যে দ্রব্য জাঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে সেই ভুক্তদ্রব্যের স্ট্রটরসে ক্ষয়প্রাধান্য থাকায় ঘনত্ব বেড়ে যায়, এই রসকে দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি তাড়াতাড়ি শূন্যকরে দিতে পারে না, তার উপর পুনরায় আহাৰ্য গ্রহণ করলেই সেইখানেই জীবাণু সৃষ্টিই স্বাভাবিক ধর্ম; তাই জাঠরাগ্নিকে সর্বদা উদ্দীপিত রাখার জন্য আহারের এতটা বাছ-বিচার। এই লাউফল আর জাঠরাগ্নি ও ঋতুপ্রভাবে সূর্যকিরণের হ্রাসবৃদ্ধির মধ্যেই বেদের সূক্ত ও জনশ্রুতির অর্থ নিহিত আছে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে প্রায়ই বর্ষা, জ'লো হাওয়া, সব ক্ষেত্রেই সৌরতেজের শোষণ ক্ষমতা সীমিত; তার উপর লাউএর জলীয়াংশ গাঢ় এবং প্রকৃতিতে গুরু, এটি আহাৰ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ্যের অগ্নিমান্দ্য আসাটাই স্বাভাবিক ভেবেই শাস্ত্রকারের নিষেধ বাণী—এই মাসে লাউ না খাওয়া। এই জন্যই বেদ বলেছেন—তুমি তুম্ব জাঠরাগ্নির পীড়ক ও রুচির বিঘাতক, সেই অর্থেই সে শত্রু; আবার তোমার অন্তরে সমুদ্র, এই সমুদ্র শব্দ নামের বিশ্লেষণাত্মক বৈদিক অর্থ হ'লো পৃথিবীর ধন-রত্ন টেনে নিয়ে তার গর্ভে রাখে বলেই তার এই নামকরণ।

সেই রকম মাস দোষ (ভাদ্র মাস) কেটে যাওয়ার পর প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশে সে হয় তখন গুণের আকর, তাই তখন সে হয় মিত্র। একেই ভিত্তি করে চরক সংহিতার বক্তব্যকে অনুসরণ করে চরদ্রব্য বলেছেন—

‘অলাব্দ নাড়িকা গদ্বর্ষী মধুরা বচঃ ভেদনী’

অর্থাৎ লাউএর ডাটা গদ্বর্ষ গুণান্বিত ও মধুর রস সম্পন্ন, এই জন্যেই এক কথায় বলা যায় এটিতে পৃথিবীগুণ বেশী আছে, তাই সে হয় মলিনিসারক।

### পরিচিতি

এই গাছটি বাংলাদেশ কেন, ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাষ হয়, আমাদের নিত্য আহাৰ্যের তরকারী হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এটির বোটানিক্যাল নাম *Lagenaria vulgaris* Seringe. ফ্যামিলি *Cucurbitaceae*. এই অলাব্দের চলতি নাম লাউ, আবার কোন কোন প্রদেশে ‘কন্দু’ও বলে। এই ফল আকৃতিতে ভিন্ন হলেও এর প্রজাতি (Species) ও গণ (Genus) কোন পার্থক্য নেই, আবার স্বাদে তিক্তও হয়, তাকে বলে ‘কটুতুস্বী’ অথবা তিক্ত অলাব্দ। আমাদের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বনৌষধির গ্রন্থ ‘রাজ-নিঘণ্টুতে’ গোরক্ষতুস্বী ও ক্ষীরতুস্বী, এই দুই প্রকার মিষ্ট অলাব্দের (লাউএর) উল্লেখ দেখা যায়। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল, পত্র, নাল, বীজ ও ফল। বৈদ্যক সম্প্রদায় লাউএর প্রতিটি অংশকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতিতে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন সেইটাই বলি—

(১) পিত্তশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে— তার সঙ্গে গায়ে জ্বালা, বমনেচ্ছা বা বমন হ’তে থাকলে লাউটা ঝুলসে নিয়ে নিংড়ে রস করে (৩।৪ চামচ) তার সঙ্গে আধ চামচ আলদাজ মধু মিশিয়ে খাওয়ালে গায়ের জ্বালা ও বমন বা বমনেচ্ছা চলে যাবে।

(২) চোরা অম্বল (অম্বলরোগ)— কিন্তু ঢেকুর তোলাটাই তাকে ব্যতিব্যস্ত করছে, (রোগী মনে করে কেবল মাত্র তোলাটাই তার রোগ) তার সঙ্গে আবার কোষ্ঠকাঠিন্য, এ ক্ষেত্রে ঐ ঝলসা পোড়া লাউএর রস ২।৩ চামচ একটু মধু মিশিয়ে খেলে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রেহাই হয়।

(৩) দ্বাছে— কি শীত কি গ্রীষ্ম (সব ঋতুতেই) গায়ে হাত দিলেই গরম বোধ হয়, এ ক্ষেত্রে এভাবে তৈরী করে ২।৩ চামচ রস কিছুদিন খেলে ওটা স্বাভাবিক হবে।

(৪) অর্শোষিকারে— দান্ত পরিষ্কার না হওয়ার মত, চট্‌চটে মল নিঃসারণ, তার সঙ্গে ২।৪ ফোঁটা রক্ত, তারপর অসহ্য টন্‌টনানি, এর উপর শৌচক্রিয়ার পরেও কিছুটা পিচ্ছিলতা থেকে যায়—এ ক্ষেত্রে ঐ ঝলসাপোড়া লাউএর রস ও চিনি অমোঘ ঔষধ।

(৫) যাবাবর পিপাসা— এ রোগ আসে প্রাণে, যায় কার্তিকের শেষে, এ ক্ষেত্রে লাউ খাওয়ার বিধিনিষেধ না মেনে ঐ ঝলসা পোড়া লাউএর রসে একটু চিনি মিশিয়ে ১ গ্লাস সরবৎ করে কিছুদিন খেয়ে দেখুন, এ পিপাসা আর থাকবে না।

(৬) পিত্তশ্লেষ্মা বিকারে— হলদে না মেখেও গেজিতে বগলের নিচের অংশটাই হলদেদে ছোপ পড়ে, গায়ের দুর্গন্ধের জন্য নিজেরই অস্বস্তি বোধ হয়। সে ক্ষেত্রে ঐ ঝলসা পোড়া লাউএর রস একটু মধু মিশিয়ে খাওয়া আর শুধু ঐ রসটা স্নানের কিছুক্ষণ পূর্বে গায়ে লাগানো। এর দ্বারাই ঐ দোষটা নষ্ট হয়।



(৭) ন্যাবার লক্ষণ সবে দেখা দিয়েছে— এ ক্ষেত্রে লাউ আর তার পাতা ঝলসানো রস ৫।৬ দিন খাওয়ালেই ওটা রুখে দেবে।

(৮) বিদ্যুৎজীর্ণ— এ রোগের লক্ষণ সকালের দিকে মূখ তৈতো (তিত্ত) হওয়া, দাঁত অপরিষ্কার থাকা অর্থাৎ দাঁতে ছোপধরা—এই ক্ষেত্রেও ঐ লাউ পোড়ার সরবৎ খাওয়া।

(৯) গ্রন্থিক জলে— বৃহৎ অস্ত্র বুলেটের মত শক্ত মল বেরতে চায় না, যেন প্রাণান্ত হয় আর কি, এ ক্ষেত্রে লাউএর ডাঁটা ছাঁচা রস ৪।৫ চামচ একটু জল মিশিয়ে কয়েকদিন খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা দূর হয়।

### বাহ্যপ্রয়োগ

(১০) পায়োরিয়ায়— ঝলসা-পোড়া লাউএর রস মূখে নিয়ে খানিকক্ষণ (১০-১৫ মিনিট) বসে থাকতে হয় (যাকে আয়ুর্বেদের পরিভাষায় বজা হয় কবল ধারণ করা)। তারপর মূখ ধুয়ে ফেলা, এইভাবে কয়েকদিন করলে ওটা সেরে যাবে।

(১১) দূষিত ক্ষতে— ঐ ধরনের রস দিয়ে ধুলে ক্ষতের দোষ-অংশটা নষ্ট হয়।

(১২) মেচেন্ডায়— মূখে প্রায় বন্দীপ সৃষ্টি হয়ে মূখের জন্য লোকসমাজে বেরতে কুণ্ঠা বোধ হয়; এই ক্ষেত্রে এক টুকরো লাউ ঝলসে নিয়ে ঐ জায়গায় ঘষতে হয় রোজ একবার করে। এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যে ঐ মেচেন্ডার দাগটা আর থাকে না। এ ভিন্ন ছোট ছোট কাল দাগ থাকলেও সেটাও উঠে যায়।

(১৩) মূখ লাভণ্যে— সব বয়সেই কার না এটাকে রাখতে ইচ্ছে করে! এর জন্যে এক টুকরো লাউকে নিয়ে রোজ মূখে ঘষতে হয়—ঐ সাদা থলথলে দিকটা। এর দ্বারা মূখের লাভণ্য ফিরে আসবে; তবে হাঁ-পটা ছানায় ভাল চিনি দিলেও তো ভাল সন্দেশ তৈরী হবে না।

(১৪) সিধা রোগে (ছালিতে)— এ রোগ নির্মূল হ'য়ে সারে না সত্যি, তবে অদৃশ্য হয়—এই জন্যেই ঝলসা পোড়া লাউ এক টুকরো নিয়ে সেইখানটায় ঘষে দিন; কয়েকদিন ঘষলেই ওটা মোটামুটি তখনকার মত অদৃশ্য হবে। এটাতে অনেকদিন ভাল থাকতেও দেখা যায়।

(১৫) ছানিতে— চোখে ছানিপড়া সবে সূর্য হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে লাউফুলের সাদা পাপড়ি অংশটা নিয়ে র'গড়ে এক ফোঁটা করে রস যে চোখে ছানিপড়া আরম্ভ হ'য়েছে, সেই চোখে ১ দিন অন্তর দিলে ছানিপড়া বন্ধ হ'তে দেখেছি। তবে একটু বেশীদিন প্রয়োগ করতে হয়। তবে লাউফুলটাকে অল্প গরম জলে ধুয়ে নেওয়াই উচিত আর প্রথম প্রথম ২ দিন অন্তর একদিন ব্যবহার করাটাই ভাল, তারপর ১ দিন অন্তর।

(১৬) শেবতী রোগে— সবে সূর্য, ছোট ছোট সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে, দেবী না করে রোজ একবার করে ঐ জায়গায় লাউফুল র'গড়ে দিতে হয়। এর দ্বারা রেহাই পাওয়া যায়।

আরও কত অজানা গুণাবলী যে আমাদের অগোচরে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখানে কেবলমাত্র মিশ্র অলাব্দের সম্পর্কে কয়েকটি রোগে তার উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এ ভিন্ন কটুত্বশী অর্থাৎ তিত্ত অলাব্দের (যার চলতি নাম তিত্ত লাউ) গুণাবলী আলোচনা করা হ'লো না—তবে আয়ুর্বেদের প্রাচীনগ্রন্থে এই তিত্ত অলাব্দের রোগ নিরাময়ে যথেষ্ট উপযোগিতা আছে সেটা বর্ণনা করা হ'য়েছে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Fatty oil viz., mixture of different fatty alcohols.



## কুস্মাণ্ড

### কাল ও অকালের কুস্মাণ্ড

হতাশা, আক্ষেপ অথবা ঘৃণার পাত্রই যে অকাল কুস্মাণ্ডের বিশেষণ এ সংস্কার সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাওয়া; তাই শিরোনামের শেষোক্ত বিশেষণটিকে শ্লেষ ক'রেই বলে ফেলি, এবং জীবনে অনেককেই হয়তো শুনতে হয়েছে গুরুজনদের কাছে। এ নিয়ে আলোচনাটা তেমনি কিনা?

এ প্রশ্ন মনে আসা খুবই স্বাভাবিক—এই কথাটাই বা কেন বলা হ'য়েছে, আর উপমাটা একটি ফলকে উপলক্ষ্য ক'রেই বা কেন সৃষ্টি করা হ'য়েছে?

এ প্রসঙ্গের আগেই বলি কম্প রূপায়িত শিবদুর্গার বিবাহের রহস্য যে আৰ্য ও প্রাক-আৰ্য সংস্কৃতির মিলনের পর এক কম্পকাহিনী এবং যার থেকে সেটি পৌরাণিক পূজাদির প্রবর্তনের ম্বারা প্রভাবিত হ'লো, তেমনি এই বৈদিক ভেষজটিও প্রাক-আৰ্যদের পূজার উপকরণে স্থান পেয়েও পরে দেখা গেল ওটাকে এই বাংলার বেদাচার মণ্ডিত তান্ত্রিকদের পশুবলির অনুকম্পরূপে হাঁড়িকাঠে। তবে সেই বধযোগ্য ফলটি হওয়া চাই পক্ক ও অক্ষত।

এই নির্ধারণও যেন সেই সমাজ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখেই। অতিবৃদ্ধ প্রপিতা-মহাদির অনুধ্যান—

কুস্মাণ্ডী পাবমানা উদ্ধবমারোহ শতরথা স্তোমা শারদীবীৰ্য্যস্থিষি।  
ওজোহসি হেমন্ত শিশিরাবত্ৰ বর্চো দ্রুবিণং প্রত্যস্তং নমুচেঃ শিরঃ ॥

মহীধর ভাষ্য করেছেন—

ঈং পাবমানা কুশ্মাণ্ডী, কুশ্মঃ ঈষৎ উষ্মা, অশ্বেষদ=বীজেষদ  
অপি পাবমানা=পাব্যতে অনয়া পৰ্বফলা। ঈং উষ্মদং আরোহ।  
শতব্রথা বিস্তৃতিং গচ্ছ। স্তোমা বহুফলা ভব। শারদীতি  
বীৰ্য্যদ্বিষ শরদী বীৰ্য্যবত্তাসি। হেম শিশিরয়োঃ ওজঃ ধারয়সি।  
তে শিরঃ অসুদরস্য মস্তকং প্রস্তুতং ক্ষেপণে প্রতিগৃহ্য  
ক্ষিপ্তমিতি।



উপরিউক্ত ভাষ্যটির অর্থ হ'ল—কুশ্মাণ্ডী, তুমি পৰ্বফলা। তোমার বীজে ঈষৎ তাপ আছে। তাই তুমি কুশ্মাণ্ডী। তুমি উষ্মদং আরোহণ কর, শতব্রথা বিস্তৃত হও। তুমি বহু ফল দান কর। শরৎ ঋতুতে বৃদ্ধি পাবে। হেমন্ত ও শিশিরে তুমি ওজঃ শক্তিকে ধারণ কর। তোমার শিরোভাগের ফলগুলি অসুদের মস্তকে ক্ষেপণ করা হয়।

এই বৈদিক সূক্তোক্ত তিনটি তথ্য বিশেষ অনুধাবন করার যোগ্যঃ—

(১) শরৎ ঋতুতে তোমার বীৰ্য্য বৃদ্ধি পায়।

চিরঞ্জীব-৫

(২) হেমন্ত ও শিশিরে তুমি ওজঃ শক্তিকে ধারণ কর।

(৩) তোমার শিরোভাগের ফলগুলি অসুদের মস্তকে ক্ষেপণ করা হয়।

### রোগে ও ভেষজে ঋতু প্রভাব

সকলেই জানেন—হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই তিনটি ঋতুই আয়ুর্বেদীয় পরিভাষায় আদানকাল, এই তিনটি ঋতুর মাঝখানে হলো শীত ঋতু, এটির আসা-যাওয়ার সান্ধিকালও যেমন আছে, তেমনই বিসর্গকাল অর্থাৎ বর্ষা ঋতুর আসা-যাওয়ারও ঋতুসান্ধি আছে, এই সান্ধিকালের প্রভাবে মানুষ রোগাক্রান্ত হয় বেশী—বিশেষ করে শিশু, গর্ভিণী ও বৃদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে এই ঋতুতে সৃষ্ট ভেষজ বা আহাৰ্যের দ্বারা রোগ-নিরাময় করা সহজ হয়—এটা অবশ্য আয়ুর্বেদের নিজস্ব চিন্তাধারা। এক্ষেত্রে সংহিতা-যুগের মনোবিশ্বাস বিচার করে দেখেছেন যে আদান ও বিসর্গ—এই দুই কালকে আশ্রয় করে যেসব ভেষজ জন্মগ্রহণ করে, তারা এই ঋতু সমূহের সান্ধিকালজ ব্যাধিকে উপশম করতে পারে। এই আহাৰ্য ভেষজটিও সেই পর্যায়ে পড়ে।

### কাল প্রভাবের দোষ-গুণ

আমাদের মনোবিশ্বাস দুটি বিশেষ সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্রব্যবিচার করেছেন। একটি ঋতুজ আর একটি কালজ। আদানকালের কোন ফল বিসর্গকালে পাকলে—সে ফল কোন না কোন দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফের) সাম্য সঞ্চার করে রোগ সৃষ্টি করেই।

এই নিবন্ধোক্ত কুম্ভাণ্ডের জন্মলগ্ন ও বৃদ্ধি বিসর্গকালে, পাকেও বিসর্গকালে; সেই জন্যই সে বিশেষ গুণের অধিকারী হয়েছে থাকে। এই জন্য তাকে নিয়ে কাল প্রসঙ্গে অকাল কথাটাও এসে পড়ে ওইই বিপরীত কালের। এখন অকাল কুম্ভাণ্ড কথাটা কেন হ'ল? এ কথাটার ইঙ্গিত করে—কুম্ভাণ্ড আকৃতি হ'য়েও যেটি অকালে হয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হ'লো—এই কুম্ভাণ্ড আকৃতির ফলটি ঋতুর মৌল কালে না জন্মে সব ঋতুতেই জন্ম নেয়, অর্থাৎ শরৎ ঋতুর প্রভাবেও সৃষ্টি হয় এবং শরতের পূর্বে ও অন্তেও জন্ম নেয়। শরতের বর্ষাবস্তা ও হেমন্ত ওজস্বিতা না পেয়েও সে বেড়ে ওঠে; আর সেই জন্য ঔষজ্যগুণও থাকে না তার। অতএব সে অপদার্থেরই তুল্য। তাই মানুষের ক্ষেত্রে পান্ডিত্য এই উপমাটি উপস্থিত করেছেন, যে ব্যক্তি অন্তর্বিহীনগুণ থেকে বঞ্চিত থেকেও মানুষের আকৃতি লাভ করেছে।

### কবে—কোথায়—কখন

আমরা দাঁখি আদানকালের শেষ মূহুর্তে অর্থাৎ বর্ষা আসার পূর্বে মূহুর্তে (যাকে প্রাবৃট্ কাল বলা হয়) এর বীজ মাটিতে বসানো হয়, বর্ষারম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২।৩ মাসের মধ্যেই এর লতাগাছটিতে ফল ধরে; গ্রামাঞ্চলে তার আশ্রয়স্থল ঘরের চালায় বা বাঁশের মাচায়; তাই তার চলতি নাম চালকুমড়া বা ছাঁচি কুমড়া। আয়ুর্বেদের পরিভাষানুসারে এটাকে বলা হয় ফলশাক। এই লতাটির পবেই ফল হয়, তাই তার বৈদিক নাম পর্বফলা। হিন্দীভাষা অঞ্চলে একে বলে ভতুয়া বা পেঠা। এই লতাগাছটির বোটানিক্যাল নাম *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn. ফ্যামিলী *Cucurbitaceae*. ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয়—ফল, লতাগাছ ও মূল।

### বেদান্তের কালে

এই কুম্ভাণ্ডকে চরকে দিয়েছেন আহাৰ্যে গুরুদ্বয়, আর সূত্রদ্বয়ে দিয়েছেন ভৈষজ্য

গদ্যরূপে (অর্থাৎ রসপ্রাধান্য ও গদ্যপ্রাধান্যের দৃষ্টিতে)। আয়ুর্দক্ষায় উভয়ের দৃষ্টিকোণ কিন্তু একই। আহার আর ওষুধ দু'টিরই বিচার করতে হয়, তবেই হয় আয়ুর্দক্ষা; এই কুস্মাণ্ড সম্পর্কে সূত্রদ্বয়ে আছে—কচি কুমড়ো পিত্ত বিকাররোধক, বাতি কুমড়ো কফ-নাশক আর পাকলে সে হয় লঘু, অগ্নিবল বৃদ্ধিকর, মল-মূত্র রোগ সংক্রান্ত রোগ-প্রশমক, বক্ষাগত রোগেও তার বিশেষ প্রভাব। আর একটি বিশেষ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সে চির্তাবিকার দূর করে।

### বৈদ্যের সমীক্ষায়—

(১) রক্তপিত্তে—রক্ত উঠলেই টি. বি হয়েছে যেমন ধরে নেওয়া উচিত নয়, সেই রকম রক্ত পড়লেই অর্শ হয়েছে—একথা ভাবাও সমীচীন নয়; বৈদ্যকের ভাষায় এটিও রক্তপিত্ত রোগের অন্তর্গত। এরকম ক্ষেত্রে পাকা চালকুমড়োর রস ৩।৪ চা-চামচ একটু চিনি মিশিয়ে খাবেন। রক্ত ওঠা বা পড়া যেটাই হোক না কেন, বন্ধ হবে। আরও ভাল হয় একটু বাসক পাতার রস ঐ সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া।

(২) শরীরের ক্ষয়-ক্ষতিতে মাথা হাল্কাবোধ, মনে কিছু থাকে না, এক্ষেত্রে এর শূদ্রক শাঁস চূর্ণ (জল নিংড়ে শূদ্রকিয়ে নিতে হয়) ২।৩ গ্রাম একটু মধু মিশিয়ে খেতে হয়; এটাতে ঐ দোষটা চলে যায়।

(৩) প্লুর্নিসিতে—প্লুর্নিসি (আয়ুর্বেদ মতে এটি বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি) হয়েছে, এক্ষেত্রে এই কুমড়োর রস একটু চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। প্রাচীনদের উক্তি দেখতে দোষ কী?

(৪) হৃদ্যগত রোগে—হৃদ্যশ্লেষ্মের বিবৃদ্ধি হলে বা ঝুলে গেলে কি অসুবিধে হয়—সব চিকিৎসকই জানেন। এক্ষেত্রে রোগীকে পাকা চালকুমড়োর হালদুয়া খাওয়ানোর অভ্যাস করাবেন; তবে হালদুয়াতে গোদুগ্ধ থেকে ছাগদুগ্ধ দিলে ভাল হয়।

(৫) কোষ্ঠকাঠিন্যে—বালক বা বৃদ্ধ এই দু'জনের একই জ্বালা—অর্থাৎ সব রকম দান্ত পরিস্কারের ওষুধ খাইয়েও ফল হয় না, এ সময় চিকিৎসক বিদ্রান্ত হন। এক্ষেত্রে বৃহদশ্লেষ্মের শূদ্রকতা সৃষ্টি আয়ুর্বেদের নিদান। একে স্বাভাবিক করতে গেলে চালকুমড়োর রস ৪।৫ চা-চামচ গরম দুগ্ধের সঙ্গে খাওয়াতে হয়। এটাতে প্রস্রাব ও দান্ত দুটোই পরিস্কার হয়।

(৬) যক্ষ্মা সন্দেহে—প্রাথমিক লক্ষণ সব মিলে যাচ্ছে—তখন প্রারম্ভিক চিকিৎসা হিসাবে এই চালকুমড়োর রস ৪।৫ চা-চামচ একটু চিনি ও দুগ্ধ মিশিয়ে দু'বেলা খেতে দিয়ে তার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করুন।

(৭) শূল ব্যাধায়—এ ব্যাধি পেটের যে কোন জায়গায় হোক, এই কুমড়োর শাঁসকে শূদ্রকিয়ে পুড়িয়ে (অন্তর্দ্বায়ে) তার চূর্ণ (আধ গ্রাম মাত্রায়) গরম জল খেলে উপশম হবেই।

(৮) শী-শক্তি রক্ষায়—দুধ আর তামাক যেমন একসঙ্গে খাওয়ার বয়স এককালে থাকাটা হাস্যকর, সেই রকম মাথার কাজ করতে হয় অথচ শূদ্রকে ধরে না রাখার মনো-বৃত্তি; এক্ষেত্রে তার পরিপূরক হিসেবে কুমড়োর শাঁস বাটা (জল সমেত) মধুর সঙ্গে সরবৎ করে খেতে হয়; তবে সংযম করে দ্বিতীয়টির সহজ বেগ রুদ্ধতে হয়।

(৯) কামজ উন্মাদে—সব রকম উন্মাদ এক ধারার চিকিৎসায় সারে, এ কথা আয়ুর্বেদ বলেনি। একটি সাধারণ ক্ষেত্র হিসাবে এর বীজের শাঁস বেটে মধুর সঙ্গে খেতে দিতে হয়। যেহেতু উন্মাদের ক্ষেত্র শরীরের অন্যান্য স্থানে হয় না।

(১০) ক্রিমিতে—এর বীজের শাঁস ২ গ্রাম আন্দাজ বেটে জলসহ খেতে হয়।

(১১) পেট ফাঁপা এবং প্রস্রাব ভাল হচ্ছে না—এ ক্ষেত্রে কুমড়োর রস পেটে মালিশ করলে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে দুটোই সহজ হয়।

সর্বশেষ বৈদিক তথ্যের একটি ইংগিত সম্পর্কে বক্তব্য রেখে এই নিবন্ধের ছেদ টানতে চাই।

‘তোমার ফল অসুস্থের মস্তককে চূর্ণ করে’ এই উপমাবোধক ইংগিতকে উপজীব্য করে বাংলার আয়ুর্বেদিক জগতের শেষ সুর্ষ আচার্য গঙ্গাধর মাথার যন্ত্রণায় এই চাল-কুমড়োর রসের সরবৎ খেতে দিতেন। এ সব অনুশীলন আজ অস্মৃতিমত।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Fatty oil. (b) Vitamin viz., vitamin-B<sub>1</sub>.



## অনিষন্ধক

বক্তব্য প্রকাশ করতে গেলে বাক্যবিস্তার অপেক্ষা বাক্য-সংক্ষেপের দ্বারা বক্তব্যটির গাম্ভীর্য সৌন্দর্য সাধিত হয়। তদপেক্ষা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়—যদি বহুদ্রুখী অর্থ নিহিত করার জন্য শব্দপ্রয়োগ করা হয়; তাই এমন একটি যুগ ছিল, যে যুগে মনীষীদের ছিল শব্দভেদী রহস্যবিজ্ঞান।

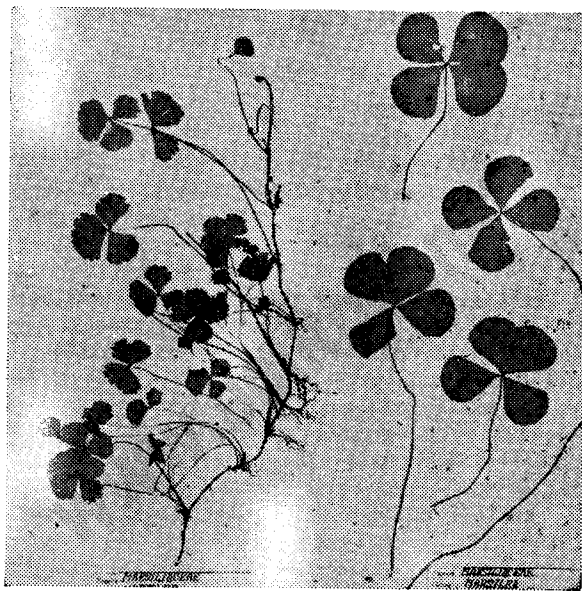
যে কোন শব্দকে ভেদ অর্থাৎ ভেগে ফেললেই তার অর্থ পরিস্ফুট হ’য়ে উঠবে। এই ধরনের শব্দবিন্যাস আর্থসভ্যতার সংস্কৃতি সৌধের স্তম্ভ—সেটা কিন্তু আজও অম্লান। তাই শব্দভেদী এক জলজ পর্ণকে এইভাবে বলা হয়েছে—

‘নিষন্ধং দোঁভিদে সুখং যমকং’ (ঋক্বেদ—১।৫৮।৩ সূক্ত)

ভাষ্যকর সায়ণ বলেছেন—

‘দৌভিদে অর্থাৎ বর্ষাসু যমকং পত্রং নিষলং শাকং  
সুখং স্বপ্নং স্বাপয়তি’

অর্থাৎ বর্ষাকালের যমকপত্র নিষল শাক সুখনিদ্রা আনয়ন করে। আর লীলাবতীর (জ্যোতিষের অঙ্ক শাস্ত্র) দেওয়া একটি উপমার শ্লেষকেও ওই অর্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দেখা যায়। তার ভাবার্থ হচ্ছে—“ঈড়া ও পিঙ্গলা” জুড়ে গিয়ে যেমন মনকে সুদৃষ্টিতে পেঁপে দিয়ে থাকে—সেই রকম যমকপত্র নিষলও মনকে সুদৃষ্টিতে নিয়ে যায়। তাই পরবর্তীকালে শাকটির নাম দেওয়া হ’লো—সুদানিষলক।



**নাম-উপক্রমণিকাঃ**— নিষল শব্দের অর্থই হচ্ছে অবসাদক; আর অবসাদের অর্থ নিয়েই তার নামকরণ। ওখানে আর একটি শব্দ “যমক”; এ কথাটাও বোধ হয় অপ্রাস্ত। দুই জোড়া কচিপাতার মূল-কোরক যেন স্থানদ্রষ্ট হ’য়েই ৪টি পাতায় রূপান্তরিত হয়, তাই তার আর এক নাম “চতুষ্পত্রী”।

**পরিচিতিঃ**— সুদানিষল ভারতের বহু প্রদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল প্রদেশের (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি) জলাসন্ন ভূমিতে, ধানক্ষেতে, পুকুরের বকচরে জন্মে, এর প্রচলিত বাংলা নাম সুদৃশীশাক, গ্রামাঞ্চলে এর ডাকনাম ‘ঘুম শাক’, ওড়িষ্যা প্রদেশের সাধারণ নাম ‘সুদানিষা’, হিন্দি-ভাষী অঞ্চলের নাম ‘চৌপতিয়া’, এই নামটি কিন্তু আসলে সংস্কৃত চতুষ্পত্রী নামের বিবর্তিত শব্দ নাম।

ভূমি প্রসারণী লতা হ'লেও লতানালের পর্ব থেকে শিকড় মাটিতে প্রবেশ ক'রে বিস্তারলাভ করে, এর শিকড়ের মাঝে মাঝে গ্রন্থি আছে, ক্ষীণ পত্রবৃন্তে বিভক্ত ৪টি পত্র একত্র মিলিত। পত্রবৃন্ত নালাটি ৭।৮ ইঞ্চি পর্যন্তও লম্বা হ'তে দেখা যায়। শীতকালে এর Spore বা বীজ হয়। সব প্রদেশে অনেকই আহাৰ্য্য শাক হিসেবে এর পত্র রান্না ক'রে খেয়ে থাকেন। এটির বোটানিক্যাল নাম *Marsilea minuta* Linn. ফ্যামিলি *Marsileaceae*.

**পাশ্চাত্য গবেষণা:—** এই সূর্যগুণী ভেষজগুণ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে গবেষিত হ'য়েছে। এই ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত হ'চ্ছে—অন্যান্য পত্রশাকের মধ্যে যে সব দোষ অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে প্রকাশ পায়, যার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হয়, এই সূর্যগুণীশাকে তেমন প্রতিক্রিয়ায়কশক্তির বিকাশ হয় না।

**প্রাচ্যের দৃষ্টিতে সূর্যগুণী:—** প্রাচীন মনীষীরা ব'লেছেন—

‘সুদানিম্নো হিমগ্রাহী মোহদোষঘ্নাপহঃ’

অর্থাৎ এটি স্নিগ্ধকর, মল সংগ্রাহক, হ্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) জনিত মোহ অপহরণকারী। এই মোহরোগে অপস্মার রোগেরই নামান্তর।

এই জলজ লতাটির আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে ‘মেধাকুৎ’ অর্থাৎ মেধাজনক। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য—এদেশে অপস্মার রোগে বহুলোকই আক্রান্ত হন; সেক্ষেত্রে এই ভেষজ সম্পর্কে প্রাচ্যের চিন্তাধারাটি অনুশীলনের ক্ষেত্রে তো আরও প্রসারিত ক'রেই দেয়। অবশ্য এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা ক'রে অপস্মার রোগেই একে প্রয়োগ করেছেন। তবে এটা ঠিক যে, তাঁদের এ গবেষণাটি আয়ুর্বেদের চিন্তাধারার একটি নব-সংস্করণ। এই শাকটি শুদ্বিকয়ে গুঁড়ো ক'রে অথবা ঐ শাকেরই ঝোল ক'রে খাওয়াতে বাধা কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ এটাও তো স্বীকার করেন যে অ্যালকালয়েড্ (Alkaloid) বা বীৰ্যশক্তিই সব নয়, সামগ্রিকভাবে তার শক্তি যে ভিন্ন হ'তে পারে—এটাকেও তাঁরা অস্বীকার করেন না।

**ট্রানকুইলাইজারের ভাষ্য:—** পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ বলেন—নিদ্রাকারক না হ'য়েও তাঁদের যে শ্রেণীর ঔষধগুলি দেহ ও মনকে উদ্বেগ ও চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখে, সেগুলিকেই ট্রানকুইলাইজার বলা হ'য়ে থাকে। নিদ্রা আনয়নকারী হিসেবে Cerebral Cortex-এ এর কোন বিশেষ প্রভাব নেই। এ জাতীয় ঔষধের প্রভাব শুদ্ধ সার্ভিকুলার স্টেশন-স্ (Reticular formation, Hypothalamus প্রভৃতি)। অভিজ্ঞ চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে তাঁদের এসব ঔষধ অতিমাত্রায় দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য আসে। যা আয়ুর্বেদিক ভেষজে তেমন প্রতিক্রিয়ার অবসরই হয় না। ভেষজটিকে ঔষধ না ভেবে আহাৰ্য্য শাক হিসেবেও ব্যবহার ক'রে দেখুন। যেটি অতি অল্পমাত্রাতেও বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ঋকুবেদের ১।৫৮।৩ নিষিদ্ধ প্রভৃতি সূক্তটিকে যারা অনুশীলন ক'রেছিলেন, তাঁরা সংহিতার যুগের এবং পরে সেটি লোকসংস্কৃতিতেও প্রবর্তিত করেছেন।

এই শাকটির বিকাশকাল বর্ষা; অতএব অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুবৃদ্ধির কালে এর জন্ম। অপরপক্ষে যেকালে স্বভাবতই অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি হয় সেই কালেই এর জন্ম, কারণ বর্ষাকাল বায়ুর সঞ্চারের কাল। যদিও প্রত্যেক দ্রব্যই ঋতুজ প্রভাবের মধ্যে বায়ুরই প্রাধান্য আসে, কারণ সৃষ্টির সঞ্চার বায়ুর প্রাধান্য স্বাভাবিক; আবার সে দোষের প্রকোপও হয়, এবং আধিক্যগতিতে সৃষ্ট দোষের উপশমও হয়। এটি দৈনন্দিন কালকৃত স্বভাব। এই কাল-স্বভাবটির প্রকৃতি ও বিকৃতি নামক দুটি গতি আছে।



সুদৃশীশাকের প্রকৃতিগত স্বভাবেই (বর্ষায়) তার বৃদ্ধি, অতএব প্রকৃতিগত পিস্তের উন্মাদি তার স্বভাবজ গতি। প্রকৃতিগত পাচকপিস্তের উৎসোধন বা জাগরণ করা তার একটি স্বভাব ধর্ম।

এইজন্য চরকের উক্তি—প্রতিটি ভৈষজের জন্ম ও বিলয়কাল দেখে এবং ভূপ্রকৃতির স্বভাব দেখে ভৈষজের গুণ-বীৰ্য-বিপাক-প্রভাবের কল্পনা করবে—‘জন্মানি বৃদ্ধিং বিলয়ং সমীক্ষ্য ভৈষজ্য শক্তিং গুণমাদধীত’। অর্থাৎ প্রতিটি বৃক্ষলতার জন্মকাল, বৃদ্ধি-কাল ও বিনাশের কাল দেখেই তার গুণ-বীৰ্যের অস্তিত্ব চিন্তা করবে।

ভৈষজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই হ'ল চরকীয় ধারা, এই সুদৃশীশাকের জন্ম যেমন বর্ষাকালে, তেমনি পার্বত্য ভূমিতে যে তার জন্ম হয় না—এটাও সমীক্ষা করার ব্যাপার। পুরাতন পাঁক ও স্বল্পকণ্বকর জলাজমি এর জন্মস্থান। রাতে এদের পাতাগুলি ঘূমিয়ে পড়ার মত জুড়ে যায়, যেন চোখের দৃষ্টি পল্লব জুড়ে গিয়েছে। ভৈষজ্য বিধায়কগণের হয়তো-বা এই লক্ষণ দেখে আরও অনুশীলন করার প্রেরণা এসেছে। অর্থাৎ কোন কোন রোগ বায়ুপ্রধান কারণে জন্ম নেয় এবং তার ঔপশমিক হেতুই বা কি, তারই আকরিক ভৈষজ্যবিধান শক্তি এই ভৈষজ লতাটিতে আছে।

### শাকপত্র লতাটির ব্যবহারগত ফলের নিরীক্ষা

সুদৃশী মध्ये ভৈষজ্য এবং আহাৰ্য রস দুইই আছে; এর ভৈষজ্যশক্তির মৌল পরিচয় বীৰ্যগত, এটি শৈত্যবিধান করে ব'লেই মল সংগ্রহ করে অর্থাৎ এটি বিদাহকর নয় বলেই, এবং এই জন্যই সুদৃশী শাকের ব্যবহার পুরাতন জ্বরের পথ্য এবং মেহ ও কুষ্ঠরোগের পথ্য হিসেবে নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা যায়; তাতে ভৈষজ্য ও আহাৰ্য দুই চলে। কারণ ঐ সব রোগে অগ্নিমান্দ্যের জের মেটে না, সে ক্ষেত্রে সুদৃশীশাকের রস তার শীতবীৰ্যতা ও লঘুগুণের জন্য অগ্নিমান্দ্য সত্ত্বর অপসারণ করে, তা ছাড়া এতে আছে অল্প কষায় রস, তারই জন্য পাকস্থলীর ক্রন্দ দূর করে; এর বিশেষ হেতু এটি কষায় রস ব'লেই সে রুদ্ধ। রুদ্ধগুণ শীতবীৰ্যের প্রতিকূল হয় না, কারণ তখন কালজ আদানধর্মিতা এতে সহজেই সংস্কৃত হয় অথচ বর্ষায় এর জন্ম কিন্তু বর্ষার জলে এর পচন হয় না। মূলের সর্বাঙ্গে থাকে তিস্ত কষায় এবং কষায় সেখানে গৌণই থাকে, তাই তিস্ত প্রধানতাটাও এবং পচন নিবারকধর্মী, তা না হ'লে অতখানি সুক্ষ্ম শিকড়ও সামান্য ভাবেও পচে যেতো।

### রোগ প্রতিকারে

১। শ্বাস রোগে (হাঁপানীতে)— কফের প্রাবল্য নেই অথচ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় এটা বায়ুপ্রধান শ্বাস রোগ,—এ ক্ষেত্রে সুদৃশী শাকের রস ৪।৫ চামচ একটু গরম করে অথবা কাঁচা হ'লে ৮।১০ গ্রাম, আর শুদ্ধ হ'লে ৩।৪ গ্রাম ৩।৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় খেলে শ্বাসকণ্ঠের অনেকটা লাঘব হয়, তার সঙ্গে নিদ্রাও ভাল হয়।

২। জ্বরলা মেহে— প্রস্রাবে জ্বরলা, তার সঙ্গে কিছু ক্ষরণও হ'ছে—এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মাত্রায় ও ঐ পদ্ধতিতে তৈরী করে তিন চার দিন খাওয়ার পর থেকেই উপকার বৃদ্ধিতে পারবেন।

৩। অল্প মেদায়— বাল্যকাল থেকে মেধা কম, সে ক্ষেত্রে এই শাক বেশ কিছুদিন অন্ততঃ ৩।৪ মাস নিয়মিত খাওয়াতে হয়; তবে তার মাত্রা বয়সানুপাতে নিতে হবে।

তবে এই শাক শুকিয়ে গুড়ো করে, ছেকে নিয়ে খেলেও চলে; এটার মাত্রা পূর্ণ-বয়স্কের ২ গ্রাম নিতে হয়; জলসহ না খেয়ে অন্ততঃ আধকাপ দুধ আর একটু চিনি মিশিয়ে খেলে খুবই ভাল হয়।

৪। **বিস্মৃতিভেদ**— বয়সের খর্মে এটা আসে; তার কারণ মূর্খা থেকে যে সব বর্ণের উচ্চারণ হয় যেমন র, ড, ল প্রভৃতি বর্ণ যেসব শব্দের আদিতে থাকে, বয়স বেশী হ'লে এগুলি মনে পড়তে চায় না—সে ক্ষেত্রে সুস্মৃণী শাকের রস দিয়ে ঘি পাক করে প্রত্যহ ২।১ চামচ করে কিছুদিন খেলে ঐ অস্মৃতিভেদটা আস্তে আস্তে চলে যায়। এটা বালকদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করানো চলে। ব্রাহ্মী ঘূতের প্রতিনিধিও এটি।

৫। **অনিদ্রা**— কোন কারণ বা অবান্তর কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা, শূয়ে থাকলেও ঘুম আসে না; আবার কারও কারও তন্দ্রা আসার মুখে চমকে উঠে ঘুম ভেঙে যায়, অবান্তর চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত, শরীর উষ্মগগ্রস্ত, সে ক্ষেত্রে কাঁচা হ'লে ১৫ গ্রাম আর শুষ্ক হলে ৩।৪ গ্রাম ৩।৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেকে ২।৪ চামচ দুধ মিশিয়ে প্রত্যহ সম্ভাব্যবেলা খেলে ঐ অস্মৃতিভেদটা চলে যাবে।

৬। **ব্লাড প্রেসারে**—(Blood pressure) বেশী থাকলে কাঁচা শাক আন্দাজ ১২ গ্রাম বেটে, জলে গুলে, ছেকে নিয়ে একটু মিছরি বা চিনি মিশিয়ে সরবৎ করে খেতে হয়; তবে ডায়াবেটিস থাকলে অথবা অস্মারোগ থাকলে কোন মিষ্টি দেওয়া চলবে না; আর শাক শুকিয়ে গেলে (৩।৪ গ্রাম আন্দাজ) ৩।৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেকে ওটাকেই সরবৎ করে খেতে হয়; তবে সিদ্ধ করার পূর্বে একটু খেঁতো করে দেওয়াই ভাল।

৭। **রমণ প্রয়াসের শৈথিল্য**— মেদোবহ স্রোত দুর্ধিত হ'লে এবং তার জন্য অগ্নি-মান্দ্য, অরুচি, পিপাসা থাকলে সুস্মৃণী শাকের রস অথবা শাক বেটে সরবৎ করে খেলে ১৫।২০ দিনের মধ্যে কিছুটা ফল উপলব্ধি করা যায়।

৮। **দাহ রোগে**— শাকের রস অথবা শাক বাটা গায়ে মেখে কিছুক্ষণ বাদে স্নান করলে স্নায়বিক কারণে সর্ব শরীরের দাহ প্রশমিত হয়।

৯। **কীট দংশনে**— বিষাক্ত কীটের দংশনের জ্বালায় সুস্মৃণীর রস অথবা শাক বাটা ওখানে লাগালে কয়েক মিনিটের মধ্যে ওখানকার জ্বালা কমে যায়।

১০। **রক্তপিত্তে**— সুস্মৃণীশাক ঘিয়ে ভেজে খেতে বলা আছে সুশ্রুত সংহিতায়— আবার ভাবপ্রকাশে রক্তপিত্তে এই শাকটিকে প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন (এই গ্রন্থটির প্রণেতা ভাবমিশ্র, এটি ষোড়শ শতকের গ্রন্থ)।

১১। **অপস্মারে**—(Epilepsy) সুস্মৃণী শাক (শুষ্ক) ৪ গ্রাম এবং জটামাংসী ২ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে ২ কাপ থাকতে থাকতে নামিয়ে, চটকে, ছেকে ঐ জল সকালে ও বৈকালে ২ বারে খেতে হবে। এর ম্বারা ঐ রোগ প্রশমিত হয়।

এই ভেষজ দুটি ঘন সারকে উপাদান করেই কোন কোন স্থলে বিশেষ ধরনের অপস্মারহারক বিটিকা নামে প্রচার করার পিছনে ভারতীয় এই ভেষজ দুটি আজ জনসাধারণের গোচরীভূত।

পারিশেষে আমার বক্তব্য হ'চ্ছে—সে যুগে এই সব সম্ভাব্যতার অন্তর্নিহিত কারণটা কি—তা তাঁরা অবগত ছিলেন, যে জন্য বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ছিল তাঁদের, আজ শিক্ষা-সভ্যতার সংকর যুগে ব'সে বানপ্রস্থ আশ্রমের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁদের ট্রানকুইলাইজার (tranquillizers) খুঁজতে হয়। আর সেই দোষে দৃষ্ট হ'য়ে আমরাও খুঁজি সুস্মৃণী শাক।

## CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Ketonic constituents viz., marsiline, 3-hydroxytriacontane.  
 (b) Alcoholic constituents viz., hentriacontan-16-01. (c) Sterol viz., betasitosterol. (d) Mixture of normal hydrocarbons.  
 (e) Nitrogenous compounds viz., methylamine. (f) Saponin.



## তুলসী

মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিতে (খ্রীষ্টীয় ৫ম থেকে ১২শ শতাব্দী) বহু ঘটনাকে যেন সুরস ও রূপক উপাখ্যানের মাধ্যমে ধরে রাখা হ'য়েছে—তেনি আৰ্যসংস্কৃতিতে আরও সংগৃহীত ভাবধারার মধ্যে রূপক উপাখ্যানের বহু গল্পাখ্যান সৃষ্টি ক'রে বিশেষ গুণাবিত অবৈদিক ভেষজগুলিকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এই তুলসীকে গ্রহণই তারই অন্যতম।

**উপাখ্যানের বিষয়বস্তু—** দৈবযুগের কোনও এক সময়ে যেন বিষ্ণু কর্তৃক কোন সতী রমণী তুলসীকে অসতী বলে চিহ্নিত করা হ'য়েছিল, তারপর আবার সেই তুলসী ম্বারাই বিষ্ণুও অভিষিক্ত হ'য়ে পাষণভূত হ'য়েছিলেন; তারই জন্য যেন ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে তুলসীকে মস্তকেও ধারণ করেছিলেন—এমনি এক শৃঙ্গার রসাত্মক উপাখ্যানের মাধ্যমে মর্ত্যে তুলসীপূজার কাহিনীটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায়। হয়তো বা প্রেম কাহিনীর এই সব পৌরাণিক উপাখ্যানকে উপলক্ষ্য ক'রেই আমরা বিদ্রুপ ক'রে বলে থাকি যে—“দেবতার বেলায় লীলা খেলা, আর যত দোষ মানুষের বেলা”।

**সংশয়বাদীর দৃষ্টিতে—** বৈদিক-তান্ত্রিক চিকিৎসা বিপ্লবের সময় মানবকল্যাণকর অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় এমন সব অনেক ভেষজকে উপাখ্যানের মাধ্যমেই সংস্কারের দড়ি বেঁধে আমাদের খুবই সান্নিধ্যে রাখা হয়েছে। তুলসী ভেষজটি কিন্তু অপরিসীম উপকার সাধনের অধিকারী, হয়তো বা এই জন্যই নারায়ণের প্রতীক শিলাপুজার প্রধান উপচার হিসাবে তুলসীকে অপরিহার্য করা হয়েছে, আর নাম দেওয়া হয়েছিল তুলসী— অর্থাৎ যার তুলনা নেই।



এই নামকরণই যেন সে যুগের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রতীক। প্রাক্-আর্য বা অনার্যগণ আজও তুলসীকে তুলসীই বলেন, বিশেষ ক'রে মন্ডারা।

এই ক্ষুদ্র জাতীয় গাছটিতে ব্রহ্মবৈবর্ত পু্রাণের কয়েকটি অধ্যায়েই রাখাক্ষের মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে একীভূত ক'রে আদিত্যে তুলসী যেন মানবী আর নারায়ণ যেন

মানব—উভয়ে শাপাশাপি ক'রে একজন শিলা আর অপরজন বৃক্ষে রূপান্তরিত হ'য়েছেন অর্থাৎ অভিশপ্ত বিষ্ণু হ'লেন শিলা আর অভিশপ্তা তুলসী হ'লেন এই বৃক্ষ। কিন্তু কোথায় এ'রা শিলা ও বৃক্ষ? উত্তরে ব'লেছেন, গন্ডকী নদীতে, এবং সেই তুলসীর মাথার চুলগুলিই রূপান্তরিত হ'লো বৃক্ষের মঞ্জরীতে।

এই উপাখ্যানের মাধ্যমে পাওয়া গেল একটি নদীর নামও, সেটি আজও প্রবাহিতা গন্ডকী নদী। নামটি এসেছে গোন্ড থেকে।

গোন্ডজাতি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী। এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ'দের কয়েকটি শাখা বা উপজাতি আছে। তবে উন্নত শাখা দুটি—তার একটি শাখা মূন্ডা। এদেরই ভাষায় তুলসী শব্দ আজও সদানিবন্ধ। এদের কাছে গন্ডকী নদী এবং তুলসী খুব মাননীয় বা পূজনীয়।

আর একটি দিক—এই গন্ডকী নদীটি উত্তর ভারতের তুম্বারখণ্ড থেকে বাহির হ'লেও নেপালের পার্বত্য উপত্যকাতেই এর উৎপত্তিস্থান বলা হয়। কিন্তু নেপালে এর নাম শালগ্রামী নদী, আর যখন গন্ডক নাম হচ্ছে, তখন এসেছে চম্পারণ, গোরক্ষপুত্র, সারণ, মূজাফরপুত্র এবং পাটনার কাছে অর্থাৎ যেখানে আদিবাসী মূন্ডাদের বাস বেশী; নদীটির প্রান্তভাগে শোণপুত্র। এখানে বাৎসরিক মেলা হয়, এখানে আদিবাসীরাই বেশী আসেন।

### কেশ ও তুলসী প্রসঙ্গে

আমাদের বলবীর্ষের একান্ত নিকেতন শিরোদেশ। তুলসীমঞ্জরী যেন সেই উর্ধ্বভাগেরই প্রতীক। তুলসীর মূল, কান্ড বা স্বকের ব্যবহার নেই যে তা নয়, পরবর্তীষ্মুগে তাকেও রোগ-প্রতিকারের কাজে লাগানো হয়েছে। মানবীয় সৌন্দর্য যেমন কেশে, তুলসীর সমস্ত কাষ'করী শক্তির উৎসও তার শীষ'ভাগে।

পৌরাণিক রূপক উপাখ্যানটির দ্বারা আরও একটি অনুশীলনের আছে, সেটি হলো—অথর্ব-বৈদিক উপবহ'ণ সংহিতার সূত্র। তাতে আছে কীট-সংচ্ছেদী—এই তুলসীর রস শিলাকীটের প্রাণশক্তি বাড়ায়, কিন্তু অন্য যে কোন কীট বিনাশ করে। এমনকি সাপের বিষেরও পচন-ক্রিয়ায় কীট উৎপন্ন হতে দেয় না। সেইজন্য সর্পবিষ শোধনের জন্য তুলসীপাতার রস ব্যবহার করা হয়। শরীরের যেকোনও স্থানে রক্তদোষ এবং পুঁজের জন্য কীট হলেই তুলসীর রস অব্যর্থ কাজ করে কীট বিনাশ করতে।

প্রবাদ আছে—যে বাড়িতে তুলসীর বন থাকে, সেখানে কোন virus infection-জনিত রোগ হয় না।

অনুপ্রবেশ:— রমণীর কুলহীন হলেও যেমন মনুষ্যসম্মত কুলীনা এবং তাকে গ্রহণ করার উপদেশ। আবার মনু'র নীতিবাক্যের অনু'রূপ ভেষজ-জগতেও প্রাক-আর্য'দের আবিষ্কৃত এই তুলসীকে গ্রহণ করা হয়েছে; অর্থাৎ কোন বৈদিক সূত্রে স্বনামে বা বেনামে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং তার বৈদিক কুলমর্যাদাও নেই; তবে তার বহুকাল পরে উদ্ভূত অথর্ববেদের উপবহ'ণ সংহিতায় তুলসী নামের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানের একটি শ্লোক বিশেষ তাৎপর্ষ'পূর্ণ।

‘সুভগা কীট সংচ্ছেদী অন্তঃমার্গং বিশোধয়েৎ’

(উপবহ'ণ ৩।২৪)।

ওখানে ভাষ্যকারের মতে—এই সুভগাই হচ্ছে তুলসী এবং সুরসাও এর অপূর্ণ নাম; এখানে আরও বলেছেন যে, এর মঞ্জরীর পানক অর্থাৎ সরবৎ পান করলে শ্লেষ্মা ও রক্তজব্যাদি দূর হয়।

আয়ুর্বেদ সংহিতার স্বর্ণযুগে—চরকে সুরসা নামে যার উল্লেখ, সেইটিই আমাদের তুলসীরই নাম এবং তারই ব্যবহার করা হয়েছে শ্বাস-কাসের উপশমের ক্ষেত্রে; যার বোটানিক্যাল নাম *Ocimum sanctum* Linn. এবং এটি Labiatae ফ্যামিলীভুক্ত; কিন্তু সুরসাদিগণ (Group) বর্তমানে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার তুলসীর উল্লেখ দেখা যায়; তবে তার নাম-ধাম ও আকারে বর্তমানে সামঞ্জস্য করা কঠিন; এই গ্রন্থের মতে এই তুলসী-গুলি কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস দূর করে এবং রূগশোধক; তবে কোন তুলসী এবং তার কোন অংশ কি রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা নেই।

বর্তমানে আমরা যে কয়েকপ্রকার তুলসীগাছ সাধারণতঃ দেখতে পাই—

১। বাবুই তুলসী— *Ocimum basilicum* Linn. (একে দুলাল তুলসীও বলে)।

২। রাম তুলসী—*Ocimum gratissimum* Linn. এই গাছের বীজ ইউনানি সম্প্রদায় খুবই ব্যবহার করেন। নব্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীগণের মতে এই দু'টির আদিম বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

৩। বনবরীকা— যাকে চলতি কথায় 'বনতুলসী' বলে; বর্তমানে এটির বোটানিক্যাল নাম *Ocimum americanum* Linn.

৪। কপূর তুলসী— ল্যাটিন নাম *Ocimum Kilimandscharicum* Guerke. এই গাছ থেকে কপূর (camphor oil) পাওয়া যায়; এটির আদিম জন্মস্থান নাকি আফ্রিকার কিলিমানজারো পর্বত। এ ভিন্ন এই গাছের আরও ৪টি প্রজাতিও ভারতে পাওয়া যায়। বর্তমান বক্তব্য প্রধানতঃ হিন্দুদের পূজোপচারে ব্যবহৃত তুলসীর দু'টির রঙের সম্পর্কে। একটি কৃষ্ণবর্ণের, অপরটি হরিৎবর্ণের।

### উপযোগিতা—

প্রথমেই বলে রাখি—

‘হরিৎ কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্তিতা’

অর্থাৎ হরিৎবর্ণের ও কৃষ্ণবর্ণের দু'টি তুলসীর একই গুণ।

১। তুলসীগাছের স্পর্শ পাওয়া হাওয়া সংক্রামক ব্যাধিকে দূরে রাখে বলে প্রাচীনকাল থেকে ধারণা। এটির ঔষধিকতার অনুকম্প ব্যবস্থা আমাদের দেশে (অন্ততঃ এতদগুণে) বন্ধমূল হয়ে আছে; যার জন্য সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় খাদ্যে দুই-একটি তুলসীপাতা দিয়ে রাখি। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দুদের মৃত্যুর পর তাদের চোখে-কানে-নাকে তুলসীর পাতা দিয়ে দেওয়ার একটা রীতি আছে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য হয়তো বা সেই দেহে রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। নব্যমতে অবশ্য এটি anti-bacterial.

২। যেসব শিশুদের মধ্যে সর্দি-কাসের প্রবণতা আছে; অতি তুচ্ছ কারণেও সর্দি হয়, তাদের প্রত্যহ প্রাতে ৫।১০ ফোঁটা তুলসীপাতার রস (২।৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে

অথবা শূদ্র) খাওয়ালে সে অসুবিধা থাকবে না। এমন কি এর ম্বারা শিশুদের কোষ্ঠ-কাঠিন্যও দূর হয়; এটা অবশ্য সব বয়সেই ব্যবহার করা চলে।

৩। তরুণ সর্দিসহ যেকোন প্রকার জ্বরে আদা ও তুলসীপাতার রস সেষ্মগে আবাল-বৃদ্ধের সর্বজনীন ঔষধ ছিল; যেহেতু জ্বরের মূল কারণকে (আয়ুর্বেদ মতে) সে দূরীভূত করে।

৪। শিশুদের পেটকামড়ানি, কাসি ও লিভারের দোষে প্রাচীন বৈদ্যগণ এই পাতার রস ও মধু ব্যবহার করে থাকেন।

৫। যাঁদের অকালে শরীর ও মন বড়ো হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা আধ ইঞ্চি পরিমাণ তুলসীর মূল (কালতুলসী হলে ভাল হয়) পানের সঙ্গে সকালে ও বৈকালে চিবিয়ে খেলে কয়েকদিনের মধ্যে উদ্দীপনা উপলব্ধি করবেন; তবে আনুষ্ঠানিক কারণগুলিও নিরসন করার প্রয়োজন আছে। (সুশ্রুতের দৃষ্টিতে ব্যা ও বাজীকর দ্রব্যের গুণ এতে আছে।

৬। তুলসীপাতা ও কাঁচা হলুদের রস একটু আখের (ইক্ষু) গুড় মিশিয়ে খেলে আমবাতের উপশম হয়; এ ভিন্ন এটি রাডসুগারকেও শাসন করে। এটি একজন প্রাচীন বৈদ্যের মূখে শোনা।

৭। প্রায় সব জাতের তুলসীর বীজ জলে ভেজালে পিচ্ছিল হয়, কারণ জলগুণ প্রধান বলে (বিশেষতঃ বাবাই ও রামতুলসীর) এই জলে চিনি মিশিয়ে খেলে প্রস্রাবঘটিত পীড়ায় (প্রস্রাবের জ্বালা-যন্ত্রণার ক্ষেত্রে) বিশেষ উপকার হয়। যেহেতু লেখন গুণ এতে আছে।

৮। এই গাছের পাতা ও দূর্বা কাঁজ দিয়ে বেটে গায়ে মাখলে চুলকণা ও ঘামাচি ভাল হয়।

৯। কোন কোন প্রদেশে যেকোন প্রকার পোকামাকড় এমন কি বোলতা বিছাতে কামড়ালে তুলসীপাতার রস লাগিয়ে থাকেন।

১০। মূখে বসন্তের (নূতন) কাল দাগে তুলসীর রস মাখলে ঐ দাগগুলি মিলিয়ে যায়; এমন-কি হামের পর যেসব শিশুর শরীরে কালদাগ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তুলসী-পাতার রস মাখলেও শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে আসে।

১১। তুলসীপাতা ছেঁচে পট্টলি ক'রে সেই রসের নাস নিলে (নাকে টানলে) নাসারোগের শান্তি হয়।

১২। শ্লেষ্মার জন্য নাক বন্ধ হলে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না—সে সময় শূদ্রক পাতা চূর্ণের নাসি নিলে সেয়ে যায়।

১৩। হাম ও বসন্ত বেরুতে দেবী হচ্ছে; তুলসীপাতার রস খাওয়ালে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

১৪। কোন কারণে রক্ত দূষিত হলে কাল তুলসীপাতার রস কিছুদিন খেলে তজ্জনিত উপসর্গ নিরাময় হয়।

১৫। কানে বাথা ও যন্ত্রণায় (শ্লেষ্মাজনিত) পাতার রস অল্প গরম ক'রে তুলি দিয়ে কানে লাগালে উপশম হয়।

১৬। তুলসীপাতা চায়ের মত তৈরী ক'রে অনেক সাধু, সন্ত, বাবাজী মহাশয়গণ খেয়ে থাকেন নীরোগ থাকার জন্যে।

১৭। তুলসীপাতার রসে লবণ মিশিয়ে দাদে লাগালে উপশম হয়।

এ ভিন্ন আরও বহু রোগনিরাময়ের শক্তি এই সাধারণ গাছটির আছে; তাছাড়া অন্যপ্রকার তুলসীরও রোগনাশক শক্তি কম নেই। এই তুলসীর প্রভাব ইউনানী

চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের উপর কম পড়েন—তাদের গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৈশিষ্ট্য দেখলাম—তারা এটা হৃদরোগেও ব্যবহার করে থাকেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এটা জানিয়ে রাখি—আজ তুলসীর মালাও ভেজাল। বাঁকুড়া জেলার বামিরা বালুসি গ্রামাঞ্চলের এটি একটি কুটির শিল্প; এখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চালান যায় বৎসরে অন্ততঃ ২০।২৫ হাজার টাকার বিভিন্ন ধরনের মালা। এই ভেজাল মালা তৈরী হয় এক ধরনের বুনো শক্ত লতা বা ছোট সরু গাছ থেকে। এ কথা জানালেন মালাব্যবসায়ী জনৈক ভদ্রলোক।

মোট কথা কফের প্রাধান্যে যেসব রোগ সৃষ্টি হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলসী কার্যকরী; তবে এই বিচার—প্রবীণ চিন্তাধারায় (বায়ু, পিত্ত, কফ) না হ'লে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

দুঃখের বিষয়—আয়ুর্বেদের মূল চিন্তাধারাটি সংস্কৃত (reform) হওয়াতে তদুভাবে ভাবিত নব্বীনের মনের সাজ যেন—“গায়ে চাদর পরণে প্যান্টলুন;” এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ও নবীনপন্থী আয়ুর্বেদসেবিগণের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ী মনোভাব, তারই পরিণতিতে আয়ুর্বেদ আজ “গজভুক্ত কপিথবৎ”।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Phenolic constituents viz., eugenol, methyl eugenol, carvacrol, traces of phenol. (b) Terpenoids viz., caryophyllene, citral, citronellal, citronellol. (c) Camphor. (d) Traces of acid viz., acetic acid.





## শ্বেতচন্দন

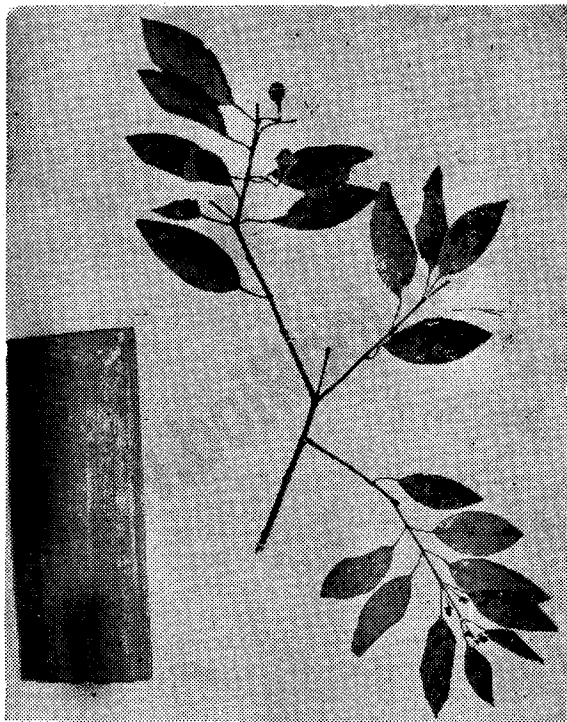
দেবভূমি এই ভারতের সনাতনধর্মী জনসাধারণ গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক তাপ যখন অসহ্য মনে করেন, তখন সর্বাঙ্গে শৈত্য লেপনের প্রয়োজন বোধ করে থাকেন, কিন্তু তাঁরা ভাবতে পারেন না শ্রীনারায়ণের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন না করে নিজের দেহে চন্দন লেপন করা কি চলে? তাই তাঁরা প্রত্যহ স্নানান্তে একটি শিলাকে নারায়ণের প্রতীক করে তাতে শ্বেতচন্দন মাখা তুলসী দিয়ে সেই অর্পিত চন্দনের অবশেষ দিয়ে নিজ দেহে চন্দন লেপন করেন, তা ছাড়া অন্য ঋতুতেও তাঁরা সৃগন্ধ লেপনের মূখ্য প্রসাধন হিসেবে চন্দনচর্চিত তুলসী অর্পণটিকে বলেন, এটি প্রসাদী তুলসী। সনাতনীদেব এই আচারে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—কেনই বা এই আচারকে আর্থ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাঁরা? তা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্যই বা পেলো কি করে? আবার পুণ্যকামিতার ও স্বর্গকামিতার (চন্দন খেন্দুর ক্ষেত্রে) সোপান হিসেবেও দেখি চন্দনের ব্যবহার। এ প্রশ্ন অপরের শৃঙ্খল নয়—বহুদিন থেকে নিজের মনেও জেগেছে আর আজীবন খুঁজে আসছি এসবের বাস্তব সত্তার সূত্র কোথায়? এটা কি পুরোহিতের জীবিকার অন্যতম পথ প্রশস্ত করার একটি উপায় মাত্র? আমি কেন, বৌদ্ধ জৈন নিয়ে আরও ভারতবাসী আছেন, তাঁদের মনেও তো এ প্রশ্ন জেগে আসছে। অবশ্য এ নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরেই পৃথিবীর বস্তুতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মিকতত্ত্বের সামঞ্জস্য নিয়ে অনুসন্ধিৎসু মনীষিগণের কাছে এটা খুবই আকর্ষণের হয়ে আছে। তাছাড়া ভারতের সাধু, সন্ত ও যোগীকুল আর তাঁদের সংস্কৃতি এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও চন্দনকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে, এ উৎসূকা আজও তাঁদের কর্মনি; এখনও অনুশীলিত হচ্ছে। এদের আচরণের মধ্যে এইসব পদ্ধতি গ্রহণের রহস্য কি?

আমার আলোচ্য বিষয়ের নিবন্ধ তারই একটা সূত্র ধরে; আপাততঃ সেটা শ্বেত-চন্দনকেই কেন্দ্র করে।

জাত-কুল-মান—একটা কথা আছে—

## ‘স্ট্রীরক্স দক্ষুলাদপি’

অর্থাৎ নীচকুলের মধ্যেও যদি রমণীরক্স পাওয়া যায় তাকে গ্রহণ ক’রতে দোষ নেই। এটা মনুসংহিতার একটি বিশেষ উক্তি। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই শ্বেতচন্দনকেও পূর্বসূরিরগণ তেমনি দক্ষুলজাত জেনেও গ্রহণ করেছেন; অর্থাৎ মাননীয়ের পর্যায়ে তাকে স্থান দিয়েছেন, কারণ তার বৈদিক আভিজাত্য নেই। বেদ চতুষ্টয়ে তার সম্বন্ধই পাওয়া যায় না, এমন-কি, সূত্র ও সংহিতা নির্মাণের সময়েও কোন গ্রন্থে তার নামোল্লেখ করেননি; তবে দীর্ঘকাল পরে রচিত এমন গ্রন্থে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যে গ্রন্থকে



বলা যায় বেদানুবর্তি সংহিতা; কিন্তু সেটা শ্বেত কি রক্ত তেমন স্পষ্টোক্তি নেই। হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলি—রক্তচন্দনটি কিন্তু অথর্ববেদের যোজিত অংশে স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, সর্বপ্রকার দাহ প্রশমনের জন্য রক্তচন্দনের কাথ পান ও লেপনে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানেই প্রশ্ন আসে যে—কোন পূজার প্রারম্ভে সূর্যদেবকে যখন অর্ঘ্য দিতে হয়—তার উপাচারেও তো রক্তচন্দন অপরিহার্য; তবুও কেন তার বৈদিককোলাহল হয়নি!

তা যাক, সুবর্ষাঘেই বা এটাকে কেন বিশেষজ্ঞ বলে গ্রহণ করা হ'লো—তার রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে? অথবা রোগের দাহিকা প্রশমনের শক্তিকে প্রতীক ক'রে? সংক্ষেপে একটা কথা বলে রাখি—আর্য্যর সুবর্ষপূজার বিধান দেননি; এটা মগ দেশ থেকেই আগত, যার প্রসঙ্গটি মহাভারতে “মগধ” এই নামেই বিধৃত।

**অনুপ্রবেশ—** বারী মনে করেন, প্রাক্‌আর্য্য সংস্কৃতি থেকেই পৌরাণিক যুগে এটাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে তার গুণপনায় মৃদু হ'য়ে, সে কথাও ফেলা যায় না। যাই হোক, জাত-কুল-মানের তাঁরা প্রাধান্য দেননি এর ক্ষেত্রে। তার গুণ সত্যি সমাজকে মৃদু করেছিল বলেই পরবর্তী যুগে কি পূজার অঙ্গে অথবা অঙ্গলেপনে সে প্রাধান্য পেয়েছে। নীতি-নির্ধারণ ক্রিমটীর কার্যের মত আমাদের ঔষধ প্রস্তুতকরণ ও তার উপকরণ গ্রহণের কতকগুলি বিধিনিষেধ সম্বলিত যে গ্রন্থ, তার নাম ‘পরিভাষা’, সেখানে বলা হয়েছে—‘চন্দনে রক্তচন্দনম্’ অর্থাৎ গ্রন্থে যদি চন্দন শব্দের উল্লেখ থাকে, তবে সেখানে রক্তচন্দনকেই গ্রহণ করতে হবে। ঔষধার্থে তৎকালীন যুগে সাদা চন্দনের ব্যবহার হতো কিনা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার গ্রন্থে তেমন উক্তি পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এটি বহু রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্মান পাওয়া যাচ্ছে। নিম্ঘন্টু গ্রন্থকারের (দ্রব্যগুণের) যুগেও অর্থাৎ ১৬ শতকের পর শ্বেতচন্দনের জন্মস্থান ভেদে তার বিভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। যেমন তৈলপর্ণ, গোশীর্ষ, মলয়জ, বেট, সুর্কাড়ি ইত্যাদি। আমার বর্তমান আলোচ্য নিবন্ধটি মহাশূর রাজ্যের মলয়জ চন্দনকে কেন্দ্র ক'রে।

**জন্মভূমি:—** প্রধানভাবে মহাশূর, কুর্ণ, কোয়েম্বাটোর, মাদুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অর্থাৎ ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে সাধারণতঃ ২-৪ হাজার ফুট উঁচু স্থানের মধ্যে এই গাছের চারা বসানো হয়, গাছ বেশি মোটা হয় না, বাড়তে বহু দেরী হয়। ২০ বৎসর বয়সের নিচের কোন গাছ কাটা হয় না। ৩০।৪০ বৎসরের গাছের ব্যাস ৭।৮ ইঞ্চির বেশী মোটা হয় না; তবে তার সারভাগ বেশী হয়। অসার কাঠে বা পাতায় কোন গন্ধ নেই। চিরসবুজ গাছ, ছোট সাদা ফুল হয়; ফলগুলি কাঁচায় সবুজ কাবলী মটরের মত, পাকলে বেগুণে রঙের হয়। আমরা চন্দন বলে যেটা ব্যবহার করি, সেটা কাঠের সারাংশ, এর মধ্যে উষ্মায় তৈল আছে, তার বোটানিক্যাল নাম *Santalum album*. Linn. ফ্যামিলি *Santalaceae*.

**খাঁটি চন্দন কাঠ:—** সকলের একই অভিযোগ—চন্দন কাঠ শুকলে গন্ধ পাই, কিন্তু ঘষলে আর গন্ধ থাকে না কেন? আমার বক্তব্য—দ্রব্যের দুর্মূল্যতার জন্য বহু জিনিষের নকল চলছে, অনেক আসল ভেবে পুরো দামে কিনেও প্রতারণা হচ্ছেন। জনস্বার্থে এগুলি কি বন্ধ করা যায় না? তবে এটাও ঠিক—ঘরের ঢোঁকি কুমীর হলে সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই—তা না হলে নকল সৈন্যবের কারখানা চলে? খাঁটি কোথায় পাবেন?—সরকার পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে চন্দন কাঠ কিনলে প্রতারণা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

**অজ্ঞানার সম্মান:—** বায়ুর চাপে (হাই ব্রাড্-প্রেসারে) কাতর শিশ্যের প্রতি গুরুত্ব উপদেশ—তুমি সকালে তুলসীর পাতা খেয়ো, ভাল থাকবে। এই রকমই আর একাধিক ক্ষেত্রের উপদেশ—তুমি শ্বেত (সাদা) চন্দন ঘষা দূধে মিশিয়ে খেয়ো, ভাল থাকবে। এই কথা দুটি পরস্পরায় আমার কানে আসাতে কোঁতুহলী হয়ে সে কথাটাকে বাস্তবে যাচাই ক'রে দেখেছি, শুধু আমিই নই—দেখেছেন পাশ্চাত্য চিকিৎসকও (cardiologist); তাঁর সমীক্ষা—এটা Benign hypertension এ খুবই আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাচ্ছে; সব থেকে বড় কথা Diastolic প্রেসারটাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু বেশী প্রেসারের ক্ষেত্রে চন্দন ঘষাটা একটু বেশী খেতে দিতে হচ্ছে; তবে আনুষঙ্গিক চিরঞ্জীব-৬

উপসর্গের সুবিধে-অসুবিধেগুলিও খতিয়ে দেখার দরকার হয়; কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয়; আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

**কিভাবে ব্যবহার করতে হয়:—** সকালে খালিপেটে ৭।৮টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেতে হয় (খুব ছোট হলে ১০।১২টি); তার ঘণ্টাখানেক বাদে শ্বেত (সাদা) চন্দন ঘন ক'রে ঘষা এক চা-চামচ আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়, তবে এটা লক্ষ্য করছি যে, তুলসী পাতার ত্রিাশালিতা ক্ষেত্রবিশেষে গোণ; একটি ক্ষেত্রে দেখছি—দু'টি একসঙ্গে ব্যবহারে ব্রাড-প্রেসার স্বাভাবিক হওয়ার পর চন্দনঘষা খাওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়াতে (তুলসীপাতা খাওয়া কিন্তু চলাছিল) কয়েকদিন বাদে আবার একটু প্রেসার উঠেছিল; পুনরায় চন্দন ঘষা খেতে সেটা স্বাভাবিক হ'ল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে—Systolic প্রেসার ১৮০র মধ্যে থাকলে এক চা-চামচ ঘন ক'রে ঘষা চন্দন খেলেই চলে।

**বৈশিষ্ট্য:—** এটাতে Diastolic কমিয়ে দিচ্ছে, তার সঙ্গে প্রস্রাবও পরিষ্কার হচ্ছে, অথচ কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

**বিশেষ ক্ষেত্রে:—** যাদের Chronic Bronchitis (পুরাতন ব্রংকাইটিস) আছে, অথচ প্রেসারে কণ্ট পাচ্ছেন, তাঁরা অল্প পরিমাণে খাওয়া আরম্ভ ক'রে দেখবেন, কারণ এটা একটু শৈত্যকারক, উষ্ণবীৰ্য। তবে তুলসীর পাতা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সর্বক্ষেত্রে দু'য়ের একসঙ্গে ব্যবহার পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করছে কিনা, সেটাও বিচার্য বিষয়।

শ্বেত চন্দনকে নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করার প্রারম্ভে তার একটিমাত্র গুণকে কেন্দ্র ক'রেই অল্প কিছু বলার পরই অন্যান্য রোগ-প্রতিকারে তার প্রভাব কতটুকু এবং প্রয়োগ-বিধিই বা কি—সেইটিই এ ক্ষেত্রে আলোচ্য।

প্রাচীন বনৌষধি গ্রন্থে যে গুণগুলির কথা লেখা আছে, তাদের মধ্যে দাহ প্রশামক, পিপাসার শান্তিকারক, বর্ণপ্রসাদক, মূত্রকারক, গায়ের দুর্গন্ধহারক, হৃদয়-সংরক্ষক ও বিষনাশক প্রভৃতি; অর্থাৎ শৈত্যগুণসম্পন্ন এবং ভূতপরিচয়ে এটি জলগুণসম্পন্ন, এর এই প্রকৃতিটিকে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কেমন ক'রে প্রয়োগ করতে হয়, প্রধানতঃ সেইটিই এখানে আলোচ্য।

১। **জ্বর:**— পিপাসা, শরীরে জ্বালা অথবা শুষ্ক পিপাসা থাকলে চন্দন ঘষা আধ চা-চামচ থেকে এক চা-চামচ (বয়স এবং অবস্থা বিবেচনায়) কাঁচ ডাবের জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে দুই-ই প্রশমিত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরও কমে যায়; তবে সর্দির প্রকোপ বেশী থাকলে না দেওয়াই সমীচীন।

২। যখন পেনিসিলিনের আবিষ্কার হয়নি, তখন গনোরিয়ার (ওপসার্গিক পুষ-মেহের) জ্বালা-যন্ত্রণা, পুঁজ পড়া ইত্যাদির প্রশমনে পাশ্চাত্য চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিশেষ ঔষধি ছিল চন্দনের তৈল এবং তার সঙ্গে আরও দুই-একটা জিনিষ মিশিয়ে 'ইমালসান' ক'রে খেতে দেওয়া। এটাও হয়তো অনেক চিকিৎসকের মনে আছে যে, ফ্রান্স থেকে চন্দন তৈলভরা জিলোটিনের বটিকা আসতো, তার নাম ছিল Santal midi—এটি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ ঔষধ; আর ইউনানি সম্প্রদায় চিনির সঙ্গে ৫।১০ ফোঁটা ক'রে খাঁটি চন্দনের তৈল খেতে দিতেন, আর বৈদ্যকগোষ্ঠী এটিকে ব্যবহার করতেন—অন্যান্য ভেষজের সঙ্গে আসব বা অরিষ্ট ক'রে; তবে চন্দনের কাঠেরই বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে।

এখানে আর একটু বলে রাখি—চর্চকিত ছাঁটা চাল ধুয়ে সেই জলে চন্দন ঘষে ওর সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে খাওয়ালে যে কোনও কারণে প্রস্রাবে জ্বালা অথবা আটকে যাওয়া, এমন-কি রক্তপ্রস্রাবেও উপকার পাওয়া যায়।

৩। নারীর ক্ষেত্রে:— যাঁদের ঋতুপ্রস্রাবে দুর্গন্ধ, পুঁজ বা মজ্জাবৎ প্রাব হতে থাকে— সে ক্ষেত্রে চন্দন ঘষা অথবা ঐ কাঠের গুঁড়ো গরম জলে ভিজিয়ে রেখে সেটা ছেঁকে নিয়ে দুধে মিশিয়ে খেতে হয়।

৪। অপস্মার রোগে (Epilepsy):— প্রাচীন বৈদ্যগণ ঔষধের অনুপান হিসেবে চন্দন ঘষা ব্যবহার করেন; তবে যদি রোগের প্রাবল্য না থাকে, দেখা যায় যে শুধু চন্দন ঘষা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেই অনেকটা ভাল থাকেন।

৫। বমিতে:— আমলকীর রস অথবা শুকনো আমলকী ভিজানো জলে চন্দন ঘষা মিশিয়ে খেতে দিলে বমি বন্ধ হয়ে যায়।

৬। শীতল পানীয়:— গ্রীষ্মকালে শরীরে স্নিগ্ধতা সম্পাদনের জন্য ঘষা চন্দন ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে খেয়ে থাকেন; এটাতে পেটও ঠাণ্ডা থাকে।

৭। হিক্কা:— চালধোয়া জলের সঙ্গে চন্দন ঘষা মিশিয়ে ঐ জল দু' ঘণ্টা অন্তর একটু একটু করে খাওয়ালে হিক্কা বন্ধ হয়। এমন-কি দুধে ঘষে (ছাগদুগ্ধ হলে ভাল হয়) নস্য নিলেও হিক্কা বন্ধ হয়।

৮। বসন্তরোগে:— পিপাসা থাকলে মৌরীভিজান জলে চন্দন ঘষা মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন এ রোগের স্পেশালিষ্ট যারা।

৯। বিষফোড়ায়:— ঘষা চন্দনে গোল মরিচ ঘষে সেটা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার লাগালে বিষানি কেটে যায়।

১০। অস্বাভাবিক ঘর্মে:— ঘাম বেশী হলে এই ঘষা চন্দনের সঙ্গে বেনামূল বেটে একটু কপূর মিশিয়ে গায়ে মাখতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যরা।

১১। ঘামিচি:— সাদা চন্দন ঘষার সঙ্গে হলদেবাটা ও অল্প একটু কপূর মিশিয়ে অথবা চন্দন ও দারুহরিদ্রা একত্রে ঘষে মাখলে মরে যায়।

১২। মাথাধরা:— যখন মাথাধরার ঔষধ বেরোয়নি, তখন চন্দন ঘষার সঙ্গে একটু কপূর মিশিয়ে কপালে লাগাতে হতো।

১৩। শরীরে বসন্ত দেখা দিলে:— হিণ্ডে (Enhydra fluctuans) শাকের রসে শ্বেতচন্দন ঘষা মিশিয়ে খেতে দিলে গুঁটি শীঘ্র বেরিয়ে পড়ে ও তার ভয়াবহতা চলে যায়।

১৪। নাভিপাকে:— শিশুদের নাভি পাকলে ওটা ঘষে পুঁজু করে লাগিয়ে দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায় এবং সারেও।

১৫। হৃপিং কাসিতে (শিশুদের):— শুধু চন্দন ঘষা ২।৪ বিন্দু এবং একটু হরিণ শিং ঘষা (এক মসুর পরিমাণ) তার সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে তৎক্ষণাৎ দীর্ঘশ্বাসী কাসিটা কমবেই, এটি প্রখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় বারানসীনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থা।

১৬। শিশুদের মাথার ঘায়ে:— ২।৩ মাসের শিশুর মাথায় এক ধরনের চাপড়া ঘা হয়—সে ক্ষেত্রে শুধু শ্বেতচন্দন ঘষা লাগিয়ে দিলে আঁচরেই সেরে যায়।

১৭। শূল রোগে:— চন্দন ঘষা এবং বেনামূলের কাথ (প্রত্যেকবার ১০।১২ গ্রাম হিসাবে) ব্যবহার করলে বৃকের আকস্মিক শূলরোগ (বায়ুজন্য) উপশমিত হয়।

রোগ প্রতিকারের এরকম কত অজানা দ্রব্যগুণ এখনও আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে কথাগুলি সর্বসাধারণে প্রকাশ করতে আজও আমরা নারাজ।

## CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Santalol 89-96%. (b) Allo-hydroxyproline. (c) Anthocyanins.  
(d) Phenols. (e) Tannins. (f) Essential oil.



## রত্নাক্ষ

হিমালয়ের দুর্ধর্ষ অসূর ত্রিপুত্র বধের জন্য বহু বৎসর অপলক দৃষ্টিতে রত্নকে (শিব) যত্ন ক'রতে হ'য়েছিল, যার জন্য তাঁর অবসাদগ্রস্ত চোখ থেকে জল ঝ'রে পড়ে, সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার আদেশে তা থেকে যে বৃক্ষের উদ্ভব হ'লো তার নাম দেওয়া হ'লো—রত্নাক্ষ। এটি পুরাণের কথা; তবুও পৌরাণিক উপাখ্যানে যে সব রূপক কাহিনীর মাধ্যমে ঘটনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে, সেগুলির মধ্যে উপমা ও উপমেয়ের সংগে বক্তব্যের লক্ষ্য কি সেগুলির দিকে মনোনিবেশ ক'রলে অনেক তথ্যের সম্ভান পাওয়া যায়। এখানে রত্নাক্ষের বক্তব্যে রত্নের উদ্ভেজনা, অবসাদ ও অশ্রুপাতের উপমার অন্তর্নিহিত রহস্য আছে বলে মনে হয়।

রত্নাক্ষ প্রধানতঃ শৈব, শাক্ত, সৌর গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা মালা ধারণ অথবা মন্ত্রজপের সংখ্যা রাখার জন্য মালারূপে ব্যবহার ক'রে থাকেন। উত্তরকালে সব্যাসী সম্প্রদায়ের ভাবধারার প্রতীকস্বরূপ বহু লাধারণ সংসারী লোকের মধ্যে এটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বাস্তববাদীদের কাছে এসবের উপযোগিতা গৌণ। কিন্তু এটা কি মনে হয় না যে, তাঁরা কি অহেতুক এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়ান?

কিন্তু কেন? আমরা কি কোনদিন একথা ভেবেছি বা অনুসন্ধান ও বিচার ক'রেছি? আর অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এ সম্পর্কে অনুধাবন ক'রেছেন? আলোচনা প্রসঙ্গে এক

“সন্দল (চন্দন) আউর রুদ্রাক্ষ ইয়ে দোনে দিমাগ্ আউর দিল্  
কো কবত্ দেতা হয়”।

2. LAMPROLAMELLE  
 LAMPROLAMELLE  
 CANIBUTELLE  
 LAMPROLAMELLE  
 1900

আয়ুর্বেদের সংহিতাগ্রন্থে রুদ্রাক্ষ নামীয় কোন দ্রব্যের ব্যবহার, এমনকি নামমাত্রের পর্যন্ত দেখা যায় না, তবে অন্য কোন নামে এটি ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, সেটা অজ্ঞও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যদিও সেটা আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, তথাপি এটাও চিন্তনীয়

যে, হিমগিরির সানুদেশের উন্মিদ্গদুলিকেই ঔষধার্থে বারি ব্যবহার করেছেন, এই রুদ্রাক্ষ তাঁদের কাছে উপেক্ষিত হওয়া খুবই আশ্চর্যের বিষয়। তবে এটা দেখতে পাই যে, রসতান্ত্রিকদের ঔষধ (বসন্ত রোগের) “দুর্লভ রস” নামক ঔষধে এই রুদ্রাক্ষের কাথ ব্যবহার করা হয়েছে এবং রাজনিঘণ্ট নামে আমাদের এক বৈদ্যক দ্রব্যভিধানে এই গাছটির গুণাগুণের বর্ণনা লেখা আছে যে, এটি উষ্ণগুণসম্পন্ন; ইহা বাত, কৃমি, শিরোরোগ, ভূতগ্রহ, বিষনাশক এবং রুচিকারক।

### স্বরূপনির্ণয় ও পরিচিতি

এটি এলিওকার্পাস (Elaeocarpaceae) ফ্যামিলিভুক্ত, সমগ্র পৃথিবীতে এর ৯০টি প্রজাতি (species) আছে; তার মধ্যে ভারতবর্ষে ১৯টি বর্তমান। গাছটি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের মাঝারি ধরণের বকুল (Mimusops elengi) গাছের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তার গুচ্ছবদ্ধ ফল আকারে ও বিন্যাসে পিটুর্দিল গাছের (Trewia nudiflora) মত। ফলের শাঁস টক, এই শাঁস মৃগী রোগে উপকারী। নেপালে এটির আচার তৈরী করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। এর বীজগুলি সাধারণতঃ ৫টি কোষ (কোয়া) একত্রীভূত অবস্থায় থাকে, প্রতি দুটি কোষের মাঝখানে একটি রেখা বর্তমান, এই রকম ৫টি রেখাবদ্ধ রুদ্রাক্ষকে “পঞ্চমুখী” বলা হয়, এইটি হচ্ছে স্বাভাবিক। এভিন্ন বীজের গঠনের অস্বাভাবিকতার জন্যে এক থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত রেখাবদ্ধ রুদ্রাক্ষও পাওয়া যায়, তবে তার দামও অস্বাভাবিক।

এটা প্রধানভাবে জন্মে নেপাল, আসাম ও দক্ষিণ কংকনঘাট অঞ্চলে, অন্যান্য স্থানেও কখনও কখনও দেখা যায়, তবে রোপণের প্রয়োজন হয়। এটির বোটানিক্যাল নাম *Elaeocarpus ganitrus* Roxb., (এলিওকার্পাস্ গ্যানিট্রাস্)। আর একটি জাতের রুদ্রাক্ষ জাভা থেকে আসে, ওখানকার সোরাবায়, কাবুমে, সোলো, সামারন ও কাডোরীর পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়; এই জাতীয় বীজগুলি ছোট, উন্মিদ্গ বিজ্ঞানীদের মতে এটির নাম *Elaeocarpus tuberculatus*. নকল রুদ্রাক্ষও বাজারে বিক্রি হয়।

### ঔষধার্থে লৌকিক ব্যবহার—

(১) সংক্রামক রোগ, বিশেষতঃ বসন্তরোগ প্রতিষেধক বলে বহু লোক ধারণ করেন। রাজস্থানের বৈদ্য সম্প্রদায় এই রোগে রুদ্রাক্ষ ঘষে গায়ে লাগাতে দিয়ে থাকেন।

(২) শ্লেষ্মার আধিক্যে যে সব রোগ সৃষ্টি হয়, কোন কোন প্রদেশে এটি ঘষে খাওয়ানো হয়।

(৩) টি, বি, রোগের (ক্ষয়রোগ) প্রথমাবস্থার তুলসীমঞ্জরীর সঙ্গে রুদ্রাক্ষ ঘষে (চন্দনের মত) খাওয়ালে চমৎকার ফল হয়।

(৪) আর একটি বিশিষ্ট শক্তি হচ্ছে, রোগীর নাড়ী ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকলে হৃদযন্ত্রকে সক্রিয় রাখার জন্যে গ্রামবাংলার প্রাচীন বৈদ্যকুলের ‘কোরামিন্’ ছিল রুদ্রাক্ষ ঘষা ও মধু দিয়ে মকরধ্বজ খাওয়ানো।

ভেষজ বিজ্ঞানীগণের কাছে আমার আর একটি আবেদন আছে—আর্যবর্ষের মূল সিদ্ধান্ত হচ্ছে—প্রতি দ্রব্যের মধ্যে ৪টি জিনিসের অস্তিত্ব বর্তমান। যথা—রস, বীৰ্য, বিপাক ও প্রভাব, প্রথমোক্ত তিনটির প্রত্যক্ষতা প্রমাণ করা যায়, শেষোক্ত প্রভাবটি কিন্তু দ্রব্যগুণাদির সম্পর্কশূন্য নয়: কারণ প্রতিটি দ্রব্যের প্রভাবের ক্ষেত্রটিও বিশেষ গুণান্বিত;



অর্থাৎ শ্লেষ্মানাশক দ্রব্যের প্রভাব কখনও বাত পিত্তকে প্রকুপিত করে হয় না, আর বিরোধীও হয় না। অতএব প্রভাব একটি বিশেষ গুণেরই স্বতন্ত্রতার সূচক। ভাল বা মন্দ যাই হোক, এটা স্বাধিসিদ্ধান্ত। সুতরাং যন্ত্রবিজ্ঞানের বিচারে কিছু পাওয়া গেল না বলেই যে সে দ্রব্যের কোন উপকারিতা বা অপকারিতা নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে প্রয়োগের ফলাফল দেখতে অনুরোধ করি।

এ সম্পর্কে একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করছি—

গত ১৯৬৫ সালে অক্টোবর মাসে লস এঞ্জেলস (Los Angeles) ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত Self-Realization নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই রুদ্রাক্ষ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন—ভারতের সম্যাসী সম্প্রদায়ের চিরবিশ্বাস যে—রুদ্রাক্ষে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক প্রভাব বর্তমান। এটি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। “It conveys electro magnetic influences”।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vitamin viz., vitamin-C. (b) Acid viz., citric acid. (c) Traces of fixed oil. (d) Alkaloids viz., elaeocarpidine, (+) elaeocarpiline, (—) isoelaecarpiline, (±) elaeocarpine, (±) isoelaecarpine, (+) isoelaecarpiline.



## হরিদ্রা

সমাজে, সাহিত্যে আচার-আচরণে, মাণ্ডলিক কাজে যেটি অপরিহার্য তাকেই আর একটি প্রতিষ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় 'সর্ব' ঘটে কাঁঠালী কলা' অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রাক্-আৰ্যকাল থেকে এমন একটি ভেষজ ও আহাৰ্যকে আমরা পরমাত্মীয় করে নিয়েছি যেটি আমাদের বহুক্ষেত্রেই অপরিহার্য দ্রব্য, তাই গ্রামাঞ্চলে আজও একটা কথা আছে—'সব বিষয়ে যে মাথা গলায়', তাকে নিয়েই আমরা উপমা দিয়ে থাকি হলুদের গড়ড়োর সঙ্গে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই হরিদ্রার (যার চলিত নাম হলুদ) উপযোগিতার এটি একটি উপমা। লোকসাহিত্যেও তার শ্রেষ্ঠত্বের গাথা দেখা যায়, যেমন বলা হয়েছে "তোদের হলুদ মাথা গা (দেহ), তোরা সোজা রথে যা। আমরা হলুদ কোথায় পাবো, আমরা উন্টোরথে যাবো"। এটি বর্ণের উজ্জ্বলতা ও কান্তি রক্ষার একটি বিশিষ্ট উপাদান বলেই কৃষ্ণকায়ার খেদোস্তি ও অক্ষুট মর্মকথা।

এই হরিদ্রা বা হলুদের ব্যবহার যে এ যুগেই হচ্ছে তা নয়—কি আৰ্য কি প্রাক্-আৰ্য সর্বযুগেই তার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বৈদিক যুগের সমীক্ষা—ঋক্বেদ ১০।৮৬।৩ এবং শত্ৰু যজুর্বেদ ১৩।২০।১৩ এই দুই বেদেই হরিদ্রাকে বর্ণ, রুচি ও দীপ্তির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

হরিতা স্বমিমা ওষধিঃ সোমঃ সাদন্যং বিদুথ্য সভেয়ং।

হিরণ্যগর্ভা ত্রিদিবাসু শোণিতং ইচ্ছন্তি গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ ॥

সাম্বন কৃত ভাষ্যে বলা হয়েছে—

ওষধিষু স্বং হরিতা, হরিদ্রা সোমস্য=চন্দ্রস্য সভেয়ং

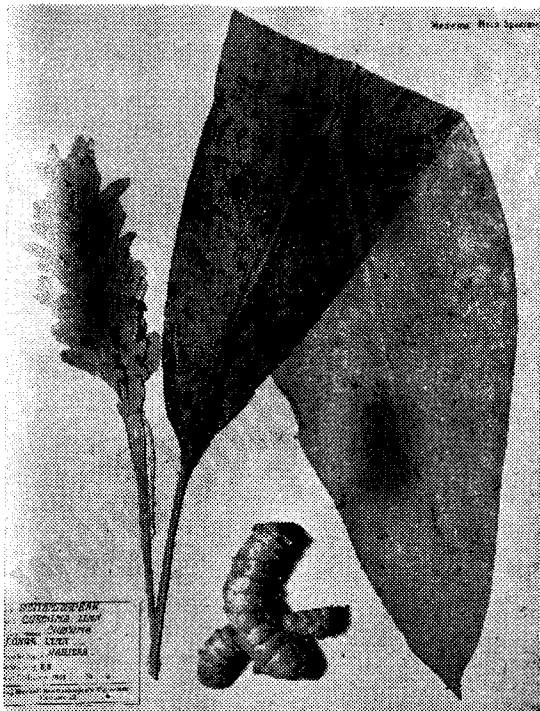
কান্তি=মণ্ডলং দধাতু। ত্রিদিবাসু দেবানাং

শোণিতং গ্রাবাণঃ স্বং সমিধানে অগ্নৌ।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—হে হরিদ্রে তোমার বর্ণ সূর্যের একটি উজ্জ্বল কিরণের মত, তাই হরিৎ; তুমি দেবতাদের দেহ উজ্জ্বল স্বর্ণ-বর্ণ ক'রে দাও। শোণিতের মন্ধান ক'রে তাকে স্বর্ণ-বর্ণ ক'রে দাও।

যজুর্বেদের পরবর্তী আর একটি সূক্ত—

হরিৎ হরিদ্রং প্রতন্ম বিশ্বমস্যা শোণং রুক্ম মাস্যং দেবানাং।



এর ভাষ্যে সাধারণ ব'লেছেন—

হে হরিদ্রং=হরিদ্রে, হুং হরিৎ সূর্য্যাম্শ্ব বর্ণে অস্যা  
শোণং=শোণিতং রুক্ম বর্ণং কুরদ্।

হরিদ্রার শব্দবিন্যাসে বলা হয়েছে—

হৃ+ইতচ হরিৎ তৎ দ্রবতি হরিদ্রম্।

শুদ্ধ যজুর্বেদের আর একটি সূত্র—

“যাস্তে রুচো আত্মবলিত রশ্মিভিঃ তাভিনো  
সৰ্ব্বভৌ রুচে জনায় ন কৃধি হরিদ্রে”

মহীধর ভাষ্য—

হে হরিদ্রে তে যা রুচঃ তিস্তন্তি তাভিঃ=রশ্মিভিঃ  
অস্মাভীরুচো কৃধি”।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—হে হরিদ্রা, তোমার শরীরে যে অগ্নিতুল্য কান্তি রয়েছে সেই কান্তি আমাদের দাও।

এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, বেদভাষ্যকার ষাঁরা, তারা ৩টি ধারাকে অবলম্বন করে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমটি হলো—পরোক্ষ বৃত্তিক, এটা হলো—যেখানে কোন কিছুকে বোঝাতে অপর কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হয় সেইটি হ'লো পরোক্ষ বৃত্তিক। দ্বিতীয়টি হ'লো—অপরোক্ষ বৃত্তিক, এটা হ'লো—যেখানে সোজাসুজি কোন কিছুর অর্থ বোঝানো হয় সেটা হ'লো অপারোক্ষ বৃত্তিক। তৃতীয়টি অধ্যাত্ম বৃত্তিক এটিতে চৈতন বা আত্মাকে বোঝাতে কিছু উপলক্ষ্য করে বলা হয়—এই অধ্যাত্ম বৃত্তিকের নামই “উপনিষৎ”।

বেদোক্ত এই আয়ুর্বেদের অংশটি পরোক্ষ ও অপারোক্ষ বৃত্তিককে অবলম্বন করে বর্ণনা করা হ'য়েছে।

বেদোক্তের মধ্যে— গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ঐ বৈদিক সূত্র, তাকেই বিশ্লেষণ করা হ'লো জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রভেদে মৌলিক উপাদানকে নিয়ে, সেটি তার প্রকৃতিগত পার্থক্যের উপরই বেশী নির্ভর করে। তারপর করা হ'লো তার পৃথক পৃথক নামকরণ। কারণ রস, বীৰ্য, বিপাক প্রভাবও লুকিয়ে রয়েছে দ্রব্যের মধ্যে।

শরীরের উপর দ্রব্যের প্রভাব— দ্রব্য মাত্রেরই মূল উপাদান হ'চ্ছে—পণ্ডমহাভূত, শরীরেরও পৃথক সত্তা তার থেকে অন্য কিছু নেই। মানব শরীরের সেই মূল উপাদানকে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটির মধ্যে সন্নিবেশ করা হ'য়েছে; ক্ষীণ ও অপূ হোলো কফ, তেজ হ'চ্ছে পিত্ত, আর মরুৎ ও ব্যোম হ'লো বায়ু—এরই স্থিতিাবস্থায় নীরোগ দেহ, আর যে কোন একটির অস্বাভাবিকতায় রোগ সৃষ্টি; উপকরণ হিসেবে ঐ পণ্ডমহাভূতজাতক দ্রব্যই তার রোগ প্রতিকারে সহায়ক হয়। কোন ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী দ্রব্যের দ্বারা প্রতিরোধ বা প্রতিষেধ অথবা অভাবের পোষক দ্রব্যের দ্বারা তার স্বধর্ম রক্ষা; এ ভিন্ন আবার সদৃশবাদী চিকিৎসার একটা ধারাও প্রচলিত আছে। রোগের ক্ষেত্রে দ্রব্যের প্রয়োগও এই সদৃশবিধান চিন্তাধারায় স্থিরীকৃত হ'য়েছিলো।

চরক সংহিতায় দেখা যায় হিরদ্রাকে ব্যবহার করা হ'য়েছে মল সণ্ণয়হারিৎ দ্রব্য হিসেবে; আবার রোগের ক্ষেত্রেও তাকে ব্যবহার করা হ'য়েছে লেপনক দ্রব্য হিসেবে, কারণ বিহরাগত সংক্রামক বীজ থেকেও যে বহু রোগের প্রজনন হয়, সেইজন্যই কুষ্ঠ ও বিষদোষ নাশে হিরদ্রার ব্যবহার। সুশ্রুত সংহিতায় তৎকালের সমীক্ষালব্ধ জ্ঞানে হিরদ্রার প্রভাব নামক শক্তির একটি ক্ষেত্র আছে এটা স্বীকৃত হ'য়েছে; বোধ হয় সেইজন্যই আমাদের ব্যঞ্জনাদির উপস্কার বা মশলা হিসেবে হিরদ্রাকে সহযোগী করে নিয়েছি, কারণ আহার্য জীর্ণ হওয়ার পর দেহকে পোষণ করে রস এবং তা থেকে রক্ত মাংস মৌদ প্রভৃতি ধাতুতে রূপান্তরিত হয়, তাই সপ্তধাতুর মধ্যে রসও একটি ধাতু। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমাদেরসারে আমাদেরসের পাচনে, শীতপিত্তে (Urticaria)

ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, শোথ ও সর্বপ্রকার মেহ রোগে, এমন কি শব্দকদোষেও হরিদ্রার ব্যবহার। তা ছাড়া সর্বপ্রকার কফপিত্তজ ব্যাধিতেও।

আয়ুর্বেদের সুপ্রাচীন চিন্তাধারায় বিসর্প, কদমক বিসর্পের মত রোগেও হরিদ্রার ব্যবহার, এ সবই কফপিত্তজ ব্যাধি; এগুনি রস, রক্ত, মাংস এই তিনটি ধাতুকে দূষিত করে এককালে সৃষ্ট হয়, তখন রোগের বিচরণ ক্ষেত্র দেহ জগতে প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রন্থিগুণ্ডালিতে।

### প্রকার ভেদ

বনৌষধির গ্রন্থে চারপ্রকার হরিদ্রার কথা উল্লেখিত হ'য়েছে (১) হরিদ্রা (চলতি নাম হলদুদ), (২) আন্নগন্ধি হরিদ্রা, (৩) বন হরিদ্রা, (৪) কপূর হরিদ্রা। এরা সবই কন্দ জাতীয় (tuberous root.), কিন্তু নব্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের গ্রন্থে এই গণে (genus) বহু প্রকারের উল্লেখ দেখা যায়। আমার বর্তমান নিবন্ধোক্ত হরিদ্রার বোটানিক্যাল নাম *Curcuma longa* Linn. একে বর্তমানে *Curcuma domestica* Valetton বলাও হয়, ফ্যামিলি zingiberaceae.

### কোথায় কি ভাবে কাজে লাগে

১। খাদ্যে— নিত্য আহাৰ্য্য ব্যঞ্জনের রং করার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এটার যে ব্যবহার হয়েছে তা নয়; নিত্য সেবনের ব্যবস্থাও দেওয়া আছে শারীরিক প্রয়োজনে।

২। উষ্মতনে— পূর্বে শিশুদের মাঝে মাঝে 'তেল হলদুদ' মাখিয়ে স্নান করানো হ'তো, এমন কি আমাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীও বাদ যেতো না; ওদের মাথানোর উদ্দেশ্য কোন রকম ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন (Bacterial infection) না হয়, সাধারণতঃ যার দ্বারা চুলকণা, খোসা (পাচড়া) প্রভৃতি হয়ে থাকে। তা ছাড়া এর দ্বারা আরও একটি উদ্দেশ্য সাধিত হ'তো—দেহের রং-এর ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো (বৃদ্ধি করা)। এই জন্যই হরিদ্রার আর একটি নাম “বর্ণ বিধায়িনী”; কিন্তু সে রীতি বর্তমানে উঠে যাচ্ছে, সেটা বেশী লক্ষ্য পড়ে বাংলায়। এখনো অনেকে বরা বয়সেও মসুর ডাল ও কাঁচা হলদুদ বেটে দুধের সর মিশিয়ে মুখে হাতে মেখে থাকেন, মুখের লালিত্য কিছুটা বজায় রাখার প্রয়াসও বলা যায়।

৩। প্রমেহে— প্রস্রাবের জ্বালার সঙ্গে পুঞ্জের মত লালা ঝরলে, কাঁচা হলদুদের রস ১ চামচ একটু মধু বা চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। এমন কি এর দ্বারা অন্যান্য প্রকার মেহ রোগেরও উপশম হয়।

৪। কৃমিতে— কাঁচা হলদুদের রস ১৫।২০ ফোঁটা (অবশ্য বয়স হিসেবে) সামান্য লবণ মিশিয়ে সকালে খালি পেটে ব্যবহার করতে দিয়ে থাকেন গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যগণ। এই জন্যই হলদুদের একনাম ‘কৃমিঘ্ন’ অর্থাৎ কৃমিনাশকারী।

৫। যকৃৎ দোষে— পান্ডু রোগে ফ্যাকাসে রং আসছে বুঝলে হলদুদের রস ৫।১০ ফোঁটা থেকে আরম্ভ করে (বয়স হিসেবে) এক চামচ পর্যন্ত (চা চামচ) একটু চিনি বা মধু মিশিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন প্রাচীনপন্থী বৈদ্যগণ।

৬। ভোতলামিতে (Stammering)—ছোটবেলায় যাদের কথা আটকে যায় অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে দ্রুত কথা বলার অভ্যাসে, সে ক্ষেত্রে হলদুদকে গুঁড়ো করে (কাঁচা হলদুদ শুকিয়ে গুঁড়ো করা চাই); এটা নিতে হবে ২।৩ গ্রাম, সেটাকে ১ চা-চামচ আন্দাজ

গাওয়াঘিয়ে একটু ভেজে সেটাকে ২।৩ বার অল্প অল্প করে চেটে খেতে হয়, এর ম্বারা তোতলামি কমে যায়; এসব খানদানী কবিরাজ গোষ্ঠীর ব্যবহারিক যোগ।

৭। ফাইলেরিয়স— এই রোগটির আয়ুর্বেদিক নাম শলীপদ—এক্ষেত্রে কাঁচা হলুদের রসে (১ চামচ আন্দাজ) অল্প গুড় ও ১ চামচ আন্দাজ গোমূত্র মিশিয়ে খেতে ব'লেছেন আমাদের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্ত। আমবাতেও তাঁর এই ব্যবস্থা।

৮। হামজ্বরে— কাঁচা হলুদকে শুকিয়ে গুড়ো করে সঙ্গে উচ্ছেপাতার রস ও অল্প মধু মিশিয়ে খাওয়ালে হামজ্বরের সেরে যায়।

৯। এলাজ্বতে— খাদ্য বিশেষে অনেকের দেহ চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠে, চুলকোয়, লাল হয়—সেক্ষেত্রে নিমপাতার গুড়ো ১ ভাগ, কাঁচা হলুদ শুকিয়ে গুড়ো করে সেটা ২ ভাগ এবং শুষ্ক আমলকীর গুড়ো ৩ ভাগ একসঙ্গে মিশিয়ে সেটা থেকে ১ গ্রাম (১৫ গ্রেণ) মাত্রায় সকালে খালি পেটে বেশ কিছু দিন খেতে হয়। ক্রিয়া আছে, প্রতিক্রিয়া নেই।

১০। পিপাসায়— পাঁচ/সাত গ্রাম কাঁচা হলুদ থেঁতো করে দেড় কাপ আন্দাজ জলে ৫।১০ মিনিট সিদ্ধ করে ছেকে নিয়ে সেই জলে অল্প চিনি মিশিয়ে এক চামচ করে মাঝে মাঝে খেলে শ্লেষ্মাজনিত পিপাসা চ'লে যায়।

১১। হাঁপানিতে— হলুদ গুড়ো, আখের (ইক্ষু) গুড়ু আর খাঁটি সরষের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে চাটলে একটু উপশম হয়।

১২। চোখ উঠলে— (নেত্রাভিষ্যন্দে) হলুদ-থেঁতো জলে চোখটা ধোওয়া আর ঐ রসে ছোপানো ন্যাকড়ায় চোখ মুছে ফেলা। এর ম্বারা চোখের লালও কাটে আর সারেও তাড়াতাড়ি।

১৩। জোঁকে ধরলে— জোঁকের মূখে হলুদ বাটা বা হলুদ গুড়ো দিলে জোঁকও ছাড়ে রক্তও বন্ধ হয়।

১৪। বিষাক্ত ক্ষতে— বিশেষ করে কার্বাকল জাতীয় (অয়ুর্বেদিক ভাষায় 'বল্মীক স্ফোটক') ফোড়ায় কাঁচা হলুদ বাটায় গোমূত্র মিশিয়ে, সেটি অল্প গরম করে দিনেরান্তে কয়েকবার লাগালে কয়েকদিনেই দূষিত পদ্জগড়া বন্ধ হ'য়ে যায়। এসব ভুক্তভোগীর দেওয়া নাম চা।

১৫। মচকানো ব্যাথায়— কোন জায়গায় মচকে গেলে বা আঘাত লাগলে চূণ, হলুদ ও নুন (লবণ) মিশিয়ে গরম করে লাগালে ব্যথা ও ফুলো দুই-ই কমে যায়। এ কথা তো সকলেরই জানা।

১৬। ফোড়ায়— পোড়া হলুদের ছাই জলে গুলে সেটা লাগালে ওটা পাকে ও ফেটে যায়। আবার গুড়ো লাগালে শীঘ্র শুকিয়েও যায়।

১৭। স্বর ভগ্নে— কোন সাধারণ কারণে গলা ধ'রে (স্বর রুদ্ধ) গেলে ২ গ্রাম আন্দাজ হলুদের গুড়োর সরবৎ (চিনি মিশিয়ে) একটু গরম করে খেলে চমৎকার উপকার হয়।

এ সব ছোট ছোট প্রক্রিয়া করার অর্থ—(১) স্বল্প ব্যয়, (২) অনাড়ম্বর ব্যবহার পদ্ধতির প্রবর্তন, (৩) ঘরিত উপশম, (৪) স্থায়ী নিরাময়।

যদিও এ সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা যেন বালুকার ম্বারা সেতুবন্ধের সাহায্যে কাঠবিড়ালীর ভূমিকার মত; কারণ চিকিৎসা কার্যটির পরিধি ক্ষুদ্র নয়, তবে অনেক ব্যাধিই অকস্মাৎ ব'হু হ'য়েও দেখা দেয় না, সে সব ক্ষেত্রে কু-চিকিৎসা না হ'লে এমনি স্বল্পোয়াস চিকিৎসাতেই সুস্থ হওয়া যায়।

## CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Colouring matter viz., curcumin. (b) Alkaloid viz., zingiberine.  
 (c) Antiseptic oil containing p-toylmethyl carbinol, ketonic and alcoholic constituents.



## দুর্বা

**পুরাণ কাহিনীতে জন্মরহস্য—** ক্ষীর-সমুদ্রে মন্থনের সময় বাসুকীকে নাকি রজ্জ্ব করা হয়েছিলো, দেব আর অসুর উভয় পক্ষই ছিলেন সেই রজ্জ্বর দুটি প্রান্তের ধারক। ঘর্ষণের দণ্ড ছিল মন্দর পর্বত। সেই ঘর্ষণের সময়েই বিষ্ণুর শরীরও ঘর্ষিত হয়, তাতে তাঁর গাত্রের রোমগুলি উঠে যায়; সেগুলি, সমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে ভেসে তীরে লাগে; তা থেকে জন্ম হ'লো দুর্বার। দুর্বার জন্মরহস্যটি এমনি এক রূপকের ঘেরাটোপে ঢাকা। তাতেই মনে হয়—বিশ্বকে বিষ্ণুরূপ এবং তাঁরই দেহ থেকে উদ্ভূত দুর্বাকে তাঁর রোম-স্বরূপে কল্পনা।

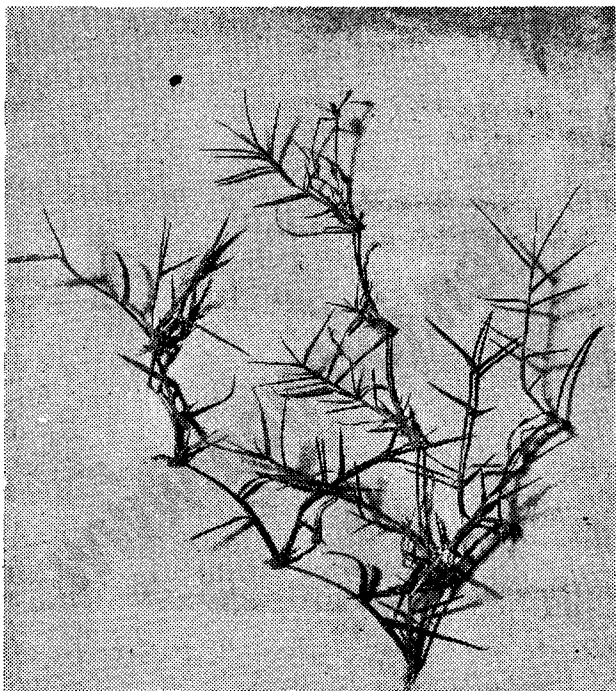
এর অন্তরালে আছে দুর্বা যে সর্বপ্রকার জীবকল্যাণকারী এটিও একটি রহস্যবাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির মন্ডসমাজ পূজা ও ব্রত-পার্বণে তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথিতে, দুর্বাষ্টমী ব্রতান্তে দুর্বাকে অঙ্গে ধারণবিধি, তাই তাঁরা বলেন—

“যথা শাখা প্রশাখাভিঃ বিস্তৃতাঃ মহীতলে।

তথা মর্মাণি সন্তানং দেহি স্বমজরামরম্”।

অর্থাৎ হে দুর্বে, তুমি যেমন পৃথিবীতে শাখা-প্রশাখায় নিজেকে বিস্তৃত কর, তেমনি

কর আমার সন্তান-প্রবাহ, আর কর আমার দেহকে অজর ও অমর। দূর্বার বিস্মৃতি ও স্নিগ্ধতা ভাদ্রের পূর্বে হয় না, মধুর রসের সঞ্চারও ভাদ্রের পর থেকে, ইতঃপূর্বে দূর্বায় থাকে কিছুর কষায়িত্ত্ব রস, তাই এইসব সূত্রের অন্তঃরহস্যকে কেন্দ্র করেই উত্তরকালে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে দূর্বাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বারা তাতে উপলব্ধজ্ঞানটি যে আরও বহু নতুন তথ্যের আবিষ্কারে আবদ্ধ করা হ'য়েছে। বৈদিক তো বটেই, প্রায় লৌকিক সব শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানেই দূর্বাকে উপস্থিত করা এবং তাকে অঙ্গে ধারণ করার রীতি। রসকৌতুকী সাহিত্যিকগণ আর একটু আক্ষেপ বিমর্শের রসান দিয়ে ব'লে থাকেন—



‘এই দ্রব্রো কিন্তু হাড়ে গজায়’ শব্দে কৌতুকবোধ হ'লেও শব্দটি বাস্তবজীবনের তৃতীয় চতুর্থাংকে এসে বোধ করি এমন অনেক হিন্দুই উপলব্ধি ক'রেন যে, সংসার-পারাবার মল্লন ক'রতে অনেকেরই যেন অস্থি চূর্ণ হ'য়ে দূর্বার মত জীবন-সাগরে ভেসে যায়।

উত্তরকালে এমনি প্রশ্ন তুলেই আরও জানতে ইচ্ছে হয়, এত জিনিস থাকতে এই দূর্বাকে কেন হাতে বাঁধা হ'লো? এর তাৎপর্ষ্যই বা কি? কেনই বা সর্বভারতীয় বৈদিক লৌকিক ও মাণ্ডলিক কার্যে যব বা ধানের সঙ্গে দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদের বিধি হ'লো?



তাতে সামাজিক উপযোগিতা না দৈহিক উপকারিতা—না উভয়ই? সেইটাই বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

**ধান-দূর্বা—** ধান, যব ও তিল হ'চ্ছে সমগ্র মানবপ্রণীর প্রাণৈষণার প্রথম উপাদান; আর দূর্বা সেই খাদ্যশস্যগুলির জন্মভূমিকে সবলে ধারণ ক'রে রেখে তার ক্ষয় নিবারণ এবং আধিভৌতিক বিপদ থেকে রক্ষা করে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যক্ষ, রক্ষ, অসুর, গ্রহ প্রভৃতির আধিভৌতিক বিপত্তিকে দূরীভূত করার দৈব প্রয়াসও দেখা যায়; তাই উভয়তঃ এইসব ব্যাপক কল্যাণের প্রতীকরূপে দূর্বাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। এর গঢ় তথ্যটি কিন্তু লুকিয়ে আছে বৈদিক চিন্তাধারার একটি দিকে। আর বাহ্যদৃষ্টিতে ধান বা যব যেমন প্রাণ উজ্জীবনের সম্পদ তেমনি দূর্বাও হ'চ্ছে প্রজাপ্রাপনের (Fecund) বা জননীয় (জননোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিকারী) উপাদান। তাই তাকে “ধনে পদ্রে লক্ষ্মীলাভ হোক” এইটাই প্রতীক স্বরূপ ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদের প্রচলন। কারণ—দূর্বে “বংশো বংশতাম্” অর্থাৎ এই দূর্বার মত তোমার বংশবৃদ্ধি হোক।

**নাম-আহোম্য—**

“দূর্বা ইব তন্তবঃ” (ঋক্বেদ ১০।১০৪।৫ সূক্ত)

মহীধর ভাষ্য ক'রলেন—

“দূরাসদ্ ভূমিষদ্ বায়তে যজতে দূর্বা”

অর্থাৎ দূরের ভূমিতেও যে যায়, সেই দূর্বা। আর অথর্ববেদের ভাষ্যে বলা হয়েছে—

“দূর্বা হিংস্রাশ্রয়া তৃণলতা” অন্যান্ ভূমিজান্ দূর্বায়তে=  
হিংসতে দূর্বা ৫।১২।৩২৭।

উপমা দেওয়া আছে—নারীচরিত্রের সঙ্গে—স্বভাবে সে সমগোত্রীয়? অর্থাৎ সে তার আত্মএলাকায় কোন তৃণকে বিস্তার লাভ ক'রতে দিতে চায় না; তাই দূর্বার একনাম হিংস্রা।

শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার ১০।২০ সূক্তে—

‘কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পদ্রুযঃ পরুযস্পরি।

এব নো দূর্বে প্রতন্দ্ সহস্রেন শতেন চ।’

এই সূক্তটির পরবর্তী সূক্তগুলিতে—দূর্বার ভৈষজ্য শক্তির পরিচয় দেওয়া আছে। যজুর্বেদের ঐ স্থানের আর একটি সূক্ত—

‘যা তে শতেন প্রতনোষি সহস্রেন বিরোহসি।

তত্রাস্তে দেবীষকে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥’

আরও পরে—

যাস্তে অগ্নে সূর্যো রুচৌ দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ।

তাভি নো অদ্য সর্বাভীরুচে জনায় ন স্কৃধি ॥’

আরও পরে—

‘যাবো দেবাঃ সূর্যো রুচৌ গোস্বশ্বেষদ্ যারুচঃ।’

এর পরে পরে ঐ দুর্বারকে নিয়েই কয়েকটি সূক্তের উপস্থাপনা। প্রতিটি সূক্তের সার বক্তব্য—দুর্বার কান্দি, দুর্বার শক্তির সঙ্গে ঘৃতের এবং সূর্যকান্দির যোগের কথা।

এইসব সূক্তের অর্থকে নিয়েই পরবর্তী আয়ুর্বেদ সংহিতার যুগে ভৈষজ্যশক্তির উল্লেখ। দুর্বার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় শক্তি সে পিত্তঘ্যা।

অতএব বিকারপ্রাপ্ত পিত্তের প্রকোপে লাভ্য নষ্ট হয়, শরীরে তাপের মাত্রা বাড়ে, শরীরের দৃঢ়তা নষ্ট করে, ক্লান্তি আনে, উৎসাহ দূর করে। এছাড়া আলস্য, ক্লীবতা, অজ্ঞানতা, বিকৃতি-দর্শন, ক্রোধ, অহর্ষ, মোহ, অশৌর্ষ, অবিপাক (বদহজম) প্রভৃতি আসে। তাই বিকারপ্রাপ্ত পিত্তকে সাম্যস্থায় আনতে দুর্বার তুল্য মিতীয় বস্তু নেই। পিত্ত-বিকারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা 'অন্তর্মাজন'—অর্থাৎ যেসব ঔষধ শরীরে প্রবেশ ক'রে আহারজাত দোষগুলির মার্জনা করে, তারই নাম অন্তর্মাজনী চিকিৎসা। যে দ্রব্য অন্তস্থঃ বিকৃতিপিত্তকে সাম্যস্থায় আনে, তাই অন্তর্মাজনী চিকিৎসা।

এই বিকৃতিপিত্তের প্রভাবে ৪০ প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। (সেই ৪০টি পিত্তবিকার রোগের তালিকা চরকের সূত্রস্থানের ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

শুদ্ধ মানবদেহে নয়—অখিল জগতের প্রাণীর দেহেই পিত্ত-বিকারের দ্বারা সাংঘাতিক সাংঘাতিক রোগের সৃষ্টি হয়।

আজকের আল্ট্রা-ভায়োলেট চিকিৎসার মধ্যে যে বিজ্ঞান—তার আদি সূত্র কিন্তু বেদেই পাওয়া যায়; সে সূক্তিটি এই—

‘সূর্যে রুচৌ দিবামাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ।’

আরও দু'টি সূক্তে দেখা যায়—সূর্যরশ্মি এবং সূর্যের সঙ্গে দুর্বার যোগের উল্লেখ করে তারই সঙ্গে দেওয়া আছে ঘৃতের মধ্যেও সূর্যশক্তি ও দুর্বার শক্তি নিহিত আছে।

কেদে আরও পাওয়া যায়—দুর্বার দ্বারা পুত্রলাভ হয়—শুদ্ধ মানবেরই নয়, গো-অশ্বেরও সন্তানলাভ হয়।

সৌরশক্তির ও খাদ্যপ্রাণ শক্তির আধান রয়েছে দুর্বার। সেই জন্য সংহিতাগ্রন্থগুলির এবং নিঘণ্টু গ্রন্থগুলির বিশেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—দাহ থেকে আরম্ভ ক'রে পিত্তের বিকারে যাবতীয় রোগ এক দুর্বার রস ও ঘৃতের দ্বারাই উপশমিত হয়।

আজকের দিগ্বিজয়ী নূতন বিজ্ঞান আবিস্কৃত হয়েছে ‘ভাইরাস’—ভাইরাস কোনও প্রাণী নয়, অথচ জড় দ্রব্যও নয়; আবার প্রাণীও বটে এবং জড় দ্রব্যও সে। কেবল পরিবেশের অপেক্ষায় থাকে এই ভাইরাস। পরিবেশ পেলেই প্রাণবান, না পেলেই জড়। শেওলাও জড়, আবার সে প্রাণীও। পিত্তবিকার একাধারে জড়, একাধারে রক্তকণায় সে প্রাণ-সঞ্চার করে। ভাইরাসকে দূর করতে পারে দুর্বার, অর্থাৎ বেদের সূক্তে বলা হয়েছে—

‘ইন্দ্রাণীঃ তান্ভীঃ সর্বাভীঃ রুচং নো যন্তে বৃহস্পতে’

(যজুঃ—১৩।২০।২৩)

দুর্বার হরিৎ বর্ণটির দ্বারা জানতে হবে—এতে অদৃশ্য জড়াজড় প্রাণীটি নাই। যেমন সূর্যরশ্মি। যখনই সূর্যের কিরণ মেঘে বা কুয়াসায় অথবা অন্য কোন কুজ্জ্বলিকায় আবৃত হয়, তখনই ভাইরাসের প্রাণশক্তির বিকাশ হবে। সেইজন্য কোন স্থানে ওকে ‘যাতুধান’, কোথাও ক্রিমি, কোথাও রক্ষাংসি প্রভৃতি ভাষায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাতু অর্থে হিংসা, আর ধান অর্থে যে তাকে পালন পোষণ করে। ভাইরাস জড়াজড় বস্তু; হিংস্রাশ্রয়ী প্রাণীকে সে পোষণ করে।

যার দেহে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ কম, তার দেহে লাভ্যও তত কম, প্রভা কম।

তার মানে এই যে—সে দেহে সহজেই ভাইরাসের সঞ্চার হবে। দুর্বার রস সেক্ষেত্রে অমোঘ শক্তির প্রকাশ করে। অতএব দুর্বার মধ্যে পিত্তের সাম্যবিধায়িনী শক্তি, সূর্যের রশ্মি এবং ঘূতের প্রভাধারিণী শক্তি নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে। ভারতে আম্রদুর্বেদ সংহিতার সূক্তগুলির মধ্যে দুর্বার শক্তিরহস্যের বিশেষ উন্মেষই দেখা যায়। যে কোন পিত্তবিকারের ক্ষেত্রে দুর্বা আশ্চর্য শক্তি দেখায়—অন্তঃসর্জজন চিকিৎসাটি দুর্বার দ্বারা ই হয়।

তাই শোণিত-বিকারে দুর্বা যেমন ফলদা, তেমনি রজোবিকারেও। আবার অম্পিপিত্ত, অম্লশূল ইত্যাদি পিত্তবিকারের সর্বক্ষেত্রে দুর্বা অপ্রতিহতবীৰ্য।

যেগুলি ভাইরাস বা যাতুধান অথবা পিত্তবিকারজাত রোগ— হাম, বসন্ত, চোখ-ওঠা, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও প্রভৃতি; এসবই যেমন ভাইরাসজাত, তেমনি অন্য ভাষায় এগুলি পিত্তবিকারদুষ্ট শ্লেষ্মা-সজ্জাত—এটি চরকের ‘জনপদ ধ্বংসনীয়’ অধ্যায়ের ইণ্ডিত। এগুলি ছাড়াও স্বাস্থ্যের আবিষ্কৃততম আরও ৩২টি রোগ পিত্তবিকারজাত।

এসবের ক্ষেত্রেও দুর্বার রসকে ব্যবহারের তারতম্যের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে আরোগ্য করানো যায় এর রসে পাক-করা ঘূতের নস্য, ঐ ঘূতের পান এবং ঐ ঘূতের দ্বারা সিগুন, ঐ রসের প্রলেপন এবং ধৌতীকরণ—উক্ত রোগগুলির নিরাময়ের সহায়ক হয়।

### প্রশ্নোত্তর

পরবর্তী যুগে বৈদ্যক গ্রন্থে নীল, শ্বেত বর্ণের এবং গাউ ও মালা সংজ্ঞার—এই ৪ প্রকার দুর্বার নামোল্লেখ দেখা যায়। এদের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে মতভেদ বর্তমান; যেমন নব্য উন্মিদ্ধ-বিজ্ঞানীদের মতে—শ্বেত-দুর্বা পৃথক প্রজাতি নয়, ওটি এক ধরণের রোগগ্রস্ত। যাহোক, আলোচ্য নিবন্ধ সাধারণ দুর্বাকে কেন্দ্র করেই; যার বোটানিক্যাল নাম *Cynodon dactylon* (Linn.) Pers. এটি Gramineae ফ্যামিলীভুক্ত।

### কুসংস্কার না বৈজ্ঞানিক তথ্য?

এমন একটি যুগও ছিল, যে যুগের বস্তুবিজ্ঞান—বর্তমানের মত চুলচেরা অধ্যয়ন-গুলির যোজনায় নিযুক্ত ছিল না, কিন্তু সে বিজ্ঞান অনুশীলন করলে মনে হয়—তাদের পদ্ধতিগুলি বিজ্ঞানোন্মুখী। তারই একটি পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে এই দুর্বাকে কেন্দ্র করে। এখনও বহু জায়গায় একটা অগভীর পাথর বা পিতলের পাত্রে জল নিয়ে বেশ কয়েকটা দুর্বা দিয়ে সকালে রোদ্দে রাখা হয়। ৩।৪ ঘণ্টা বাদে সেই জলে শিশুকে স্নান করানো হয়, জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত। এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম গ্রামের এক নির্মকরা প্রাচীনাকে—তাই সে উত্তরটা আজও আমার মনে আছে—‘জান না ঠাকুর, এই জলে নাওয়া’লে (স্নান করালে) ওদের পুঁয়ে পায় না’।

উত্তরকালে এই পুঁয়ে শব্দের অর্থ জেনেছি—সেটা বর্তমানের রিকেট রোগ; হয়তো মাটিতে এ রোগের সৃষ্টি তাই ভুইএর অপভ্রংশ পুঁয়ে।

আজ্ঞা, এই সংস্কারের মধ্যে কি কোন বিজ্ঞান নিহিত আছে? অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলেন যে সূর্যের কিরণে উন্মিদ্ধই রঞ্জনরশ্মি বেশী সংগ্রহ করে, কিন্তু এক দুর্বাকেই এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হ’ল? এর ক্রোরোফিলে কিংবা বস্তু-সত্যায় এমন কিসের অস্তিত্ব রয়েছে যার দ্বারা রিকেট রোগের প্রতিষেধক হয়—সেটি গবেষণার বিষয়।

ব্যবহার—কোথায়—কেন ও কিভাবে

১। রক্তপিত্তঃ— এই রোগটির অভিযান্ত্রিক শরীরের বিভিন্ন পথে হয়ে থাকে; মূত্র, নাক ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন স্য়ার দিয়ে রক্তপ্রাব হতে পারে। এমন-কি রোমকূপ দিয়েও ঘর্মবৎ বিন্দু বিন্দু রক্ত নিগত হতেও দেখা যায়। আয়ুর্বেদ মতে—এটা রক্তপিত্তের ক্ষেত্র; এক্ষেত্রে দুর্বীর রস কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাওয়ালে নিশ্চিত উপশম হয়। এ কথা চরকের। শুধু তাই নয়, এটি পুষ্কিত এবং চিরচিরিত। উক্ত ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের শারীরবিদ্যার অন্য একটি বাস্তব দিগদ্রষ্টা সম্প্রদায়ের সংহিতা সূত্রদ্বারা বলা হয়েছে— দুর্বী শূন্যকিয়ে গুড়ো করে মধু মিশিয়ে চেটে খেলে একই কাজ হয়।

২। সন্তান-লাভার্থেঃ— যেকোন কারণেই হোক, গর্ভধারণে অসমর্থ হলে অথবা মৃতবৎসা হ'লে (জীবিত সন্তান প্রসূত না হলে) সেক্ষেত্রে দুর্বী ও আতপচাল একসঙ্গে বেটে বড়া বা ফলদুর করে সপ্তাহে ৩।৪ দিন—২।৩টি করে ভাত খাওয়ার সময় কিছুদিন খেলে—সে অভাব থাকবে না বা গর্ভদোষ নষ্ট হবে। এ ভিন্ন অকালে রক্তঃরোপে অথবা অধিক বয়স পর্যন্ত রক্তঃ অদর্শনেও এইভাবে ব্যবহারেও ফলপ্রসূ হয়।

৩। শ্বেতপ্রদর (Leucorrhoea) জনিত দুর্বীলতায়ঃ— দুর্বী এবং কাঁচা হলুদের রস সমান পরিমাণ মিশিয়ে অথবা শুধু দুর্বীর রস ২ চামচ (২।৩ চা-চামচ) অল্প কাঁচা দুধের সঙ্গে খেতে দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যেরা। তবে বাতগ্রস্ত হলে এটা ব্যবহার করতে দেন না। এ ভিন্ন এই মুষ্টিযোগটিতে পুরাতন রক্ত আমাশাও সেরে যায়।

৪। কেশপতনেঃ— এই একটি রোগ—অনেকক্ষেত্রে যার প্রকৃত হেতু এখনও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়—দুর্বীর রস দিয়ে তৈল পাক করে মাথায় মাখলে চুল ওঠা বন্ধ হয়।

৫। ক্ষতেঃ— দুষিত ও দুর্দৃষ্ট রংগের ক্ষত শীঘ্র পুরে যায়—৪ গুণ দুর্বীর রসে পাক করা ঘৃত লাগালে। এ কথা চরকের।

৬। যক্গত রোগেঃ— স্বেদজ অদৃশ্য জীবাণুর (কোন ছত্রাক জাতীয়) আক্রমণে শরীরের কোন স্থানে দাগ হলে—কাঁচা হলুদ ও দুর্বী বেটে লাগালে সেরে যায়।

৭। কাটা ও ছেঁড়ায়ঃ— দুর্বী খেঁতো করে সেখানে বসিয়ে চেপে বেঁধে দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়ে থাকে, এটা তো সকলেরই জানা।

৮। মূত্র-কৃচ্ছ্রতায়ঃ— প্রস্রাব হ'তে কষ্ট অথচ পাথুরী নয়—সে ক্ষেত্রে দুর্বীর রস দেড়/দুই চামচ দুধ ও জল মিশিয়ে খেলে সুন্দর ফল হয়; তবে অর্শ থাকলে নয়।

৯। পায়োরিয়ায়ঃ— দুর্বীঘাস শূন্যকিয়ে গুড়ো করে সেই গুড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে পায়োরিয়া সেরে যায়।

১০। আমাশায়ঃ— সাদা বা রক্ত আমাশা যাই হোক না—জামপাতা ২টি ও দুর্বীঘাস ৫।৭ গ্রাম একসঙ্গে বেটে সেই রস ছেঁকে নিয়ে একটু গরম করে অল্প দুধ মিশিয়ে খেলে ২ দিনেই সেরে যায়।

১১। বমন নিবারণেঃ— সর্বদা গা বমি বমি করা—এ ক্ষেত্রে দুর্বীর রস আধ চামচ থেকে ১ চামচ পর্যন্ত অল্প একটু চিনি মিশিয়ে খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর একটু একটু করে চেটে খেতে হয়, এর দ্বারা বিবমিষা (গা বমি ভাব) চলে যায়।

১২। রক্তদাস্তে— মলের সঙ্গে মিশে রক্ত পড়ছে, অথবা মলত্যাগের পর পৃথক রক্ত পড়ছে, অথচ জ্বালা ঘটনা নেই, এ ক্ষেত্রে দুর্বীর রস ১ তোলা আন্দাজ, একটু গরম করে, অল্প চিনি, সম্ভব হ'লে ৭।৮ চামচ ছাগল দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে দিনে দুইবার খেতে দিলে রক্তদাস্ত বন্ধ হয়।

১৩। নারীদের অনেকক্ষেত্রে মাসিকের মতই রক্তস্রাব হয়, সে ক্ষেত্রে এই দুর্বীর রসও ফলপ্রসূ হয়।

১৪। **নালা-অর্শে:**— মাঝে মাঝে নাক টনটন করে; আবার নাক থেকে রক্তও পড়ে অথচ হাই-ব্রাডপ্রেসার নেই; সে ক্ষেত্রে দুর্বী ঘাসের নস্য নিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়। এটা চরকের বিধি। প্রাচীন বৈদ্যগণ এর সঙ্গে একটু কাঁচা দুধ মিশিয়ে ব্যবহার করতে বলেন।

১৫। **কঙ্করোগে:**— গায়ে বিশেষ কিছু নেই অথচ চুলকায়, সে ক্ষেত্রে তিল তৈলের সঙ্গে দুর্বীঘাসের রস পাক করে গায়ে লাগাতে হয়। যতটা তৈল তার সিকি ভাগ রস।

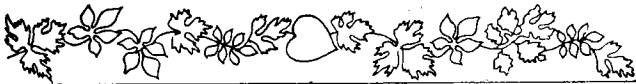
**প্রস্তুত পদ্ধতি:**— সরিষার বা নারিকেল তৈল আগুন চড়িয়ে নিষ্ফেন হ'লে তাকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা হ'লে পর ঐ রস দিয়ে পুনরায় পাক করে নিতে হয়। এমন সময় নামাতে হবে যে রসও থাকবে না অথচ ওর সিটেগুদলি পড়েও যাবে না, তারপর ওকে ছেকে নিতে হবে।

আমার বক্তব্য হচ্ছে—দুর্বীর একটি বিশিষ্ট গুণ যে রক্তরোধক সেটা বহু পরীক্ষিত। এখন প্রশ্ন—কেন রক্তরোধক রয়েছে—স্টিপ্টিক্ (Styptic) হ'য়ে, না রক্তের কোয়াগুলেশন্ (Coagulation) অর্থাৎ জমাট বাঁধার শক্তি বাড়িয়ে অথবা 'কে' (K) ভিটামিনের প্রভাবে?

আয়ুর্বেদের দ্রব্যগুণ বিচারে দুর্বী শীতগুণ সম্পন্ন, জল ধাতুর ভূতগুণ সম্পন্ন এবং মধুর ও ঈষৎ কষায় রস বলেই এটি পিত্তঘ্ন এবং স্তম্ভক। আর এই গুণটি কিন্তু বর্ষার পর থেকেই বৃদ্ধি পায়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Terpenoid constituents, viz. 28 triterpenes and its methyl ethers. (b) Sterols. (c) Fattyol.



## সিন্দুবার

সুবাদে নাম ভালবাসা আর অপবাদের নাম কলঙ্ক, আর সংবাদ মানে খবর, অভিবাদের নাম নমস্কার, আবার প্রতিবাদের অর্থ জবাব—এমান সব বাদের পিছনেই আছে যুক্তি, অতএব প্রশ্ন ওঠে তাহ'লে প্রবাদ মানে কি? 'যেমন নিম্ননিসিন্দে যেথা, রোগ কি থাকে সেথা?'—এই প্রবাদ বাক্যটি যে বাংলায় বহুদিন থেকে প্রচলিত রয়েছে তারও পিছনে কি আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই বলি—ব্যক্তি যেমন বহুগুণের অধিকারী হ'লেই জনাকর্ষী হ'য়ে থাকেন, কোন দ্রব্যও তেমনি বিশিষ্টগুণের অধিকারী হ'লেই সেটি উপমার ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে থাকে, এবং কালে তাকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে প্রবাদ। নিসিন্দের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। এটি একটি প্রখ্যাত ভেষজ হ'য়েও আমাদের দেশের জনসাধারণের একরকম উপেক্ষিত গাছ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা সাধারণের কাছে কেবলমাত্র ক্ষেত-খামারের বেড়ার জীবন্ত খুঁটি হিসেবেই। এই বেড়ার আর একটা সুবিধে হ'চ্ছে গরু বা ছাগলে খায় না, ডাল কেটে বসালেই গাছ হয়। কিন্তু গৃহস্থের মণ্ডলের জন্য এর যে আরও উপযোগিতা আছে এবং বিশেষ ক'রে সমাজকল্যাণে, সেটা কিন্তু প্রায় অজ্ঞাত।

### আভিজাত্যের প্রতীক

অভ্যাবন্ত'স্ব পোলোমী ভিষজা অশ্বিনাশ্ব ভিষং ধেনুঃ ভেষজং পয়ঃ।  
(ঋক্ ১৭।১১২)

মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

পোলোমী সিন্দুবারিকা। ঙ্গ ভিষজাসহ অভ্যাবন্ত'স্ব।  
ভিষজাং ধেনুঃস্থং। ভেষজং পয়রিবাসি'

এই ভাষাটির অর্থ হ'চ্ছে—তুমি পোলোমী (পুলোমার অর্থ পুলোমানামা অসুন্দর, সেই ক্ষেত্রে সে জন্মগ্রহণ করে, কোন যুক্তি না মেনে যে কাজ করে তার নাম পুলোমী)।

এখানে নিসিন্দাকে পোলোমী বলার সার্থকতা এই জন্য যে—মাত্র পৃথিগত যুক্তিতেই তার রসগুণ বীর্ষের শক্তি আবদ্ধ নয়, অথবা কম্পনাসম্বল যুক্তিতেও আবদ্ধ নয়, তার প্রভাব অচিন্তনীয়; যাকে বলা যায় একগুঁয়ে, তাই সে পোলোমী।

হে পোলোমী, তুমি ভিষকের সঙ্গে এসে তাকে সমৃদ্ধ কর। ভিষকবর্গের কাছে তুমি কামধেনুর মত। গো-দুশ্শের মত তুমি জীবন-রক্ষা কর।



সার্থক নামাবলীঃ— এই গাছের তিনটি নাম—(১) নিসিন্দা, (২) সিন্ধুদ্বার, (৩) নিগুন্ডী।

(১) নিসিন্দাঃ— যা থেকে নিসিন্দা নামটি এসেছে। বৈদিক শব্দাভিধান 'যাস্কে' বলা হয়েছে যে—

নিতরাং সিন্ধুরিব বহুদ্রবপত্রাদিমত্ত্বাৎ=নিতরাং  
গজমদস্য ক্ষরণবৎ—

অর্থাৎ যে দ্রব্যের রস শরীরে প্রবেশ করে হস্তির যৌবনের মদক্ষরণের মত করে অথবা বহুপত্রের আচ্ছাদন করলে শরীরস্থ রস ঝরিয়ে দেয়। এই কথার দ্বারা এইটি বোঝানো

হয়েছে যে, সে শরীরের রসের শোধক। এইজন্যই রসগত বাতে নিসিন্দা পাতার সেকেন ব্যবস্থা।

(২) সিন্দূরঃ—

সিন্দূর গজমদং বারয়তি ব্+উন্=

যে দ্রব্য হস্তির ঘোবনের কামোন্মাদনা বন্ধ করে। (অন্য কোন দ্রব্যে তা হয় না।)

(৩) নিগুন্ডীঃ—

নিগুন্ডা গুড়াং বেষ্ঠনাং, গুড়ু=বেষ্ঠনে।

যে দ্রব্য নিষ্পীড়িত করলেও রস বেরায় না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কাজও লক্ষ্য করার মত—কোন ক্রমেই এই গাছের শুকনোপাতাকে সুকুমার্চণ করা যায় না, সেইজন্যও একে নিগুন্ডী বলা হয়েছে।

প্রাক্-আর্যদের তন্ত্রযুগেও নিসিন্দা অজানা ছিল না এবং রসতান্ত্রিকগণ একে জানতেন, কারণ 'নিগুন্ডীকম্প' নামে একটি পৃথক অধ্যায় রচিত হয়েছে 'গৌরী-কাণ্ডিকা' তন্ত্রে। ঋষি যুগেও এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে তার কিছু অংশের আলোচনা করা যায় এবং তার সঙ্গে লৌকিক ব্যবহারও যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে সেইটুকুও।

বিভিন্ন প্রাদেশিক নামঃ— সংস্কৃত—নিগুন্ডী, বাংলা—নিসিন্দা বা নিসিন্দে, হিন্দী—সাম্ভাল, উড়িয়া—বেগুনিয়া (উড়িয়া সন্নিহিতবর্তী পশ্চিমবঙ্গেও একে বেগুনিয়া বলে), আরবি—আসলক (Aslaq), ফারসি—ফানজান্ খিস্ত্ ইত্যাদি। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম Vitex negundo Linn. ফ্যামিলি Verbenaceae.

বনৌষধির প্রাচীনগ্রন্থে পুস্তকভেদে এই গাছটির দু'টি নামকরণ করা হয়েছে—শ্বেতপুষ্পা (সাদা ফুল) নিসিন্দাকে সিন্দূরার এবং নীলপুষ্প নিসিন্দাকে নিগুন্ডী। এছাড়া কোন কোন গ্রন্থে কর্তরী নিগুন্ডী ও অরণ্য নিগুন্ডীর উল্লেখ দেখা যায়। অনেকের মতে—শেফালিকাই (শিউলি—Nyctanthes arbortristis Linn.) ফ্যামিলি Nyctanthaceae, অরণ্য নিগুন্ডীর নামান্তর। কিন্তু বৈদিক নিগুন্ডী নামটির যথার্থ বুঝলে শেফালিকাকে গ্রহণ করা চলে না। এর আরও একটি লোকায়তিক নাম 'কর্তরী' (সংস্কৃত ভাষায় এই কর্তরীটি পরে—কাঁচি)—এর পাতাগুলির আকৃতি কাঁচির ফলার মত। কর্তরী শব্দ 'করাত' নয়। করাতের প্রতিশব্দ ত্রুচ্চ এবং করপত্র। তাছাড়া নীল নিগুন্ডী নামে আর একপ্রকার গাছের উল্লেখও আছে, এর ফুলগুলি ঈষৎ নীলবর্ণের হয়।

### আয়ুর্বেদে ও লোকায়তিক ব্যবহারে

১। স্মৃতিশক্তি বর্ধনঃ— ঘিরের সঙ্গে নিত্য দু'টি নিসিন্দাপাতা ভেজে খেলে স্মৃতির ধারক হয়। অবশ্য এটাও দেখতে হবে, যে ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন কারণে মেমোরিবিয়ারে মস্তিস্কের স্মৃতিকেন্দ্রটির কাজ ব্যাহত হচ্ছে—সেই ক্ষেত্রেই এটির কার্যকারিতা।

২। শিশু ও বৃদ্ধদের তরল পায়খানা হ'তে হ'তে মলম্বারে ক্ষতের উপদ্রব হ'লে—এর পাতার রস ২।৩ দিন লাগালেই সেরে যায়।

৩। ফোড়ারঃ— তিল তৈলের সঙ্গে এর রস মিশিয়ে পাক করলে (তেলের মিশ্রণ রস) সেই তেলে ফোড়া পাকে, ফাটে ও শুকোয়।



৪। খুস্কি ও টাকে:— নিসিন্দা পাতার রসে পাক করা তৈল ব্যবহারে মাথার খুস্কি সারে। এমন-কি অকালের টাকও উপশমিত হয়।

৫। গাঁটের ব্যথার:— নিসিন্দার পাতন অব্যর্থ। যদি তাতে জ্বর থাকে, তবে খুব সুন্দর উপকার হয়। ৩।৪ গ্রাম পাতা সিদ্ধ করে ছেকে সেই জলটা খেতে হয়, তবে তার সঙ্গে হাই ব্রাডপ্রেসার থাকলে খাওয়া উচিত নয়।

৬। পেটে বায়ুজন্য শূল ব্যথার:— নিসিন্দার চূর্ণ (পরিমাণ মত) ২।৩ রতি গরম জল দিয়ে খেলে অনেক ক্ষেত্রে তক্ষুনি ব্যথা কমে যায়, কিছুদিন খেলে আর বায়ুর শূল থাকে না।

৭। মেদবৃদ্ধিতে:— স্থূল দেহ অর্থাৎ পেটমোটা লোক কিছুদিন নিসিন্দাপাতার গুড়ো খেলে (জল সহ) ভুঁড়ি কমে। মাত্রা আধ গ্রাম পর্যন্ত।

৮। গুল্মসীবাতে (Sciatica):— নিসিন্দার চূর্ণ ২ গ্রাম বা ৩।৪ রতি গরম জল সহ খেলে খুব ভাল কাজ করে। এ ক্ষেত্রে বৃন্দ বৈদ্যদের উপদেশ শিউলিফুলের পাতা ৮।১০টি সিদ্ধ করে সেই জল খাওয়া। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Nyctanthes arbortristis*.

৯। শিরোগত শ্লেষ্মার:— ১ চা-চামচ মাত্রায় দিনে ৩ বার (পাতা বা ছালের) রস খেলে শ্লেষ্মাটা বমন হয়ে বেরিয়ে যায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রে বমন করানো উচিত নয়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন এবং মাত্রা বিচারও অবশ্য কর্তব্য।

১০। কুচো ক্রিমিতে:— নিসিন্দাপাতা চূর্ণ সিকিগ্রাম মাত্রায় খেলে ক্রিমির উপদ্রব উপশমিত হয়। (এটি পূর্ণবয়স্কের মাত্রা)

১১। শ্বেতপ্রদর জন্য ষোনিকিতে:— নিসিন্দার কাথ দিয়ে সেচন করলে ২।৪ দিনেই ক্ষত সারে।

১২। অগ্নিমান্দ্যে:— নিসিন্দার চূর্ণ ভাতের সঙ্গে খেলে (আমদাজ সিকিগ্রাম) কিংবা নিম্ন-বেগুনের মত বেগুন দিয়ে ঐ পাতা খেলে ক্ষুধা বাড়ে।

১৩। কুষ্ঠে:— প্রথম প্রথম কুষ্ঠের যন্ত্রণায় নিসিন্দার কাথ সেচন, নিসিন্দার প্রলেপ, নিসিন্দার কাথ খুব ভাল কাজ করে। সেরে যায়, তবে এক্ষেত্রে দুধ-ভাত পথ্য করতে হয়।

১৪। চুলকানিতে:— নিসিন্দার তৈল ব্যবহার করলে চুলকানি সেরে যায়। (তিল তেলের সঙ্গে নিসিন্দার রসের পাক)

১৫। অরুচিতে:— নালতে পাতার মত নিসিন্দাপাতার সুত্তো (ঘিয়ে ভেজে) খেলে (একটি বোঁটায় ৩।৪টি পাতা থাকে, সেই রকম একটি বা দুটি পাতা) পুরানো অরুচি সারে। নিসিন্দার ফুলও ঐভাবে খেলে অরুচি সারে।

১৬। হাঁপানিতে:— নিসিন্দাগাছের ছালের কাথ চাষের মত খেলে হাঁপ কমে যায়। ছাল সিকি তোলা (৩ গ্রাম) থেকে আধ তোলা (৬ গ্রাম) মাত্রার বেশী না হয়।

১৭। ঘুংড়ি কাসিতে:— নিসিন্দাপাতা ও তার গাছের ছালের কাথে নিশচরই তা সারে। বয়সানুপাতে মাত্রা ঠিক করতে হয়।

এইজন্য বেদে একে কামধেনুর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। এর কোন শক্তির দ্বারা এই সব কাজ হয়, তা বৃন্দ্রির গোচরে আনার চেষ্টা করেও তাঁরা বুঝেছেন, এর মধ্যে অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে, তাই এর পদুলোমী নাম দিয়েছেন। এর বীৰ্য ও প্রভাবই নিশচর এতগুলি ক্ষেত্রে অসামান্য ফল দেয়।

তা ছাড়া জলজীবিত কোথায় কোন পরিবেশে কি ভাবে ব্যবহার করা যায়

(১) যখন ন্যাপথসিন্ এ দেশে জন্মেনি, কালীঅরোও আসেনি (আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপে), তখন দামী জামা-কাপড় ও বই পোকার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে

নিসিন্দের শুকনো পাতা বস্ত্রে দিয়ে রাখা হ'ত। এই পাতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কাপড় জ'রে যায় না বা কোন দাগ লাগে না।

(২) গ্রামাণ্ডলে সংগৃহীত ডাল-কলাইয়ের উপর শুকনো পাতা দিয়ে রাখেন, তাহলে নাকি পোকা জন্মে না এবং বাইরে থেকেও আসে না।

(৩) মশা তাড়াতে এর জুড়ি নেই—এ কথা বলেছেন পণ্ডিতপ্রবর এক কবিরাজ বন্ধু। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ধূনোর সঙ্গে দু'টো শুকনো পাতা ছড়িয়ে ঘোঁরা দেন। এই পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে ধূপ তৈরী করাও তো অসম্ভব নয়।

(৪) স্তন্যবৃদ্ধিজনিত শিশুদের পেটের দোষে—গ্রামাণ্ডলে এই পাতা সিদ্ধ জল অল্প গরম অবস্থায় মায়ের গায়ে রোজাকে ঢালতে দেখেছি। এই দু'বাটির গুণ স্তন্যশুদ্ধির সহায়ক।

(৫) সূতিকারোগে—এই পাতা-সিদ্ধ জলে স্নান করলে ভাল হয়—এ কথা বলেছেন উর্দুবিজ্ঞানী মনীষী রস্কবর্গ। তাছাড়া নিম্ন-নিসিন্দার পাতা সিদ্ধ জলে যেকোন প্রকার ঘা (ক্ষত) ধোয়ালে তাড়াতাড়ি বিষদোষ কেটে যায়। এটি আমাদের দেশী antiseptic বলা যেতে পারে।

(৬) গলরোগে—ফেরিন্জাইটিস্ (pharyngitis), টনসিলাইটিস (tonsilitis), যার আয়ুর্বেদোক্ত নাম কণ্ঠশালদ্রু, প্রভৃতি রোগে ও দাঁতের মাড়ির ফুলায় এই পাতা সিদ্ধ জলে অল্প গরম অবস্থায় ২।৪ গ্রেন ফিট্‌কিরির গুঁড়ো মিশিয়ে ৫।৭ মিনিট মুখে রাখলে (যাকে আয়ুর্বেদের ভাষায় কবল ধারণ বলে) বা গারগেল (gurgle) করলে উপশম নিশ্চয়ই পাবেন।

(৭) দেহের কোন জায়গায় অবদূদাকার (আব) (Tumour) হচ্ছে দেখলে এই পাতা বেটে গরম ক'রে একদিন অন্তর বা প্রত্যহ লাগালে কিছুদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। এভিন্ন মাংসগত বাতের জন্য পেশী-বিকৃতিতে শরীরের স্থানে স্থানে মাংস পিণ্ডাকার হ'তে দেখা যায়, সেদূপ ক্ষেত্রে এই পাতা বেটে গরম ক'রে গায়ে রাখলে কমে যায়। তাছাড়া বাতে বা কোন গ্রন্থি (Gland) ফুলাতে অনদূপভাবে প্রলেপ দিলে একদিনেই ফুলা ও ব্যথার কিছু উপশম হবে।

(৮) কানের পুঁজে—পাতার রস বা পাতা বাটা দিয়ে তৈল পাক ক'রে সেই তৈল ২।১ ফোঁটা ক'রে কানে দিলে সপ্তাহ মধ্যে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়, এভিন্ন সর্বপ্রকার ক্ষতে এটি ব্যবহার করা যায়।

(৯) জ্বর বা বাতের ঔষধের অনুপানে পাতার রস সর্বদা ব্যবহার হয়ে থাকে।

(১০) জিভে বা মুখে ঘা (ক্ষত)—কিছুতেই সারে না, এই পাতার রস দিয়ে পাক করা ঘি দিনে-রাত্রে দুইবার লাগালে উপকার হয়। এমন-কি যেকোন দূষিত ক্ষতে বিশেষ উপকারী।

(১১) শয্যামূত্রে—দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনেক ছেলেমেয়েকে নিয়ে মায়ের দুগতে হয়, এ ক্ষেত্রে এই পাতার গুঁড়ো ২ গ্রেন মাত্রায় (৬।৭ বৎসর বয়স হ'লে) বৈকালে জলসহ খাওয়ালে ৪।৫ দিনের মধ্যে এ জ্বালা থেকে মায়েরা রেহাই পাবেন। যদি ৭ দিন ব্যবহারে না কমে, তবে সকালে-বিকালে ২ বার খাওয়ান। এটি ব্যবহারের সব থেকে সুবিধে হচ্ছে যে—কোন প্রতিক্রিয়া (Reaction) নেই।

(১২) বৃদ্ধবয়সে যাঁদের রাত্রে প্রস্রাবের পরিমাণ বা বারে বেশী হয়, তাঁরা ২।৩ রতি মাত্রায় পাতার গুঁড়ো জলসহ বিকালের দিকে একবার খেলে কয়েকদিনেই উপকার পাবেন। প্রয়োজনবোধে ২ বারও খেতে পারেন।

(১৩) বাতের দোষে—শরীরে বাথা ও ঝন্টগায় যাঁরা মাঝে মাঝে কষ্ট পান,

পূর্বাধিকৃত মাত্রায় একটু বেশীদিন ব্যবহার করে দেখুন কি অপূর্ব ফল পাওয়া যায়।

(১৪) মাথার যন্ত্রণা ও সর্দিজনিত কারণে ঘাঁদের প্রায়ই নাক বন্ধ হয়ে যায় অথবা সান্নিপাতিক দোষে গাল, গলা ও কণ্ঠমূলের ব্যথায় কষ্ট পান, তাঁরা এই পাতা শুকিয়ে বালিশের মত করে মাথায় দেবেন।

(১৫) শয্যাক্ষতে (Bedsore)— শুকনো নিসিন্দা পাতার মিহি গুঁড়ো ক্ষতে ছড়িয়ে দিলে শীঘ্র শুকিয়ে যায়। আরও ভাল উপকার পাওয়া যায়—যদি নিসিন্দা পাতার রসে পাক করা তৈল দিনে একবার করে লাগান যায়। এটা বহু পরীক্ষিত।

ঋষিদের গবেষণাঃ— ‘ফণাধারী সর্প কতৃক দণ্ডিত ব্যক্তিকে শ্বেত নিসিন্দার মূলমূক পেষণপূর্বক শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে।’ এ কথা চরকের চিকিৎসিত স্থানের ২৫ অধ্যায়ে দেখা যায়। আর নীল নিসিন্দার মূলের ছাল জলে পেষণপূর্বক নস্য গ্রহণ করলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়—এ কথা বলেছেন চক্রদত্ত নিজের চক্রদত্ত গ্রন্থে (গণ্ডমালা চিকিৎসা)। এ ভিন্ন এই গাছটি যে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়কারী, এ ভিন্ন এই অনায়াসলভ্য গাছটি বহুভাবে আমাদের উপকারে আসতে পারে—যদি এটির আরও গবেষণা হয়।

আজ কালপ্রভাবে পশ্চিমাভিমুখী দৃষ্টি আমাদের মনকে উদ্ভ্রান্ত করেছে। ষরিত উপশমের জন্য আমরা অনেক synthetic ঔষধ ব্যবহার করে যাচ্ছি, কিন্তু এর দ্বারা যে শারীর-ক্রিয়ার অশুভ বিবর্তনও আসছে, সেটা এখন অনেক বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি করছেন। কেন—আয়ুর্বেদোক্ত ঋষিরা কি এ কথা বলেনি?

‘প্রাগোহ্যাত্তরো নৃণাং বাহ্যপ্রাণ গুণান্বিতঃ।

ধারয়তাবিরোধেন শরীরং পাণ্ডুভৌতিকম্’

(সুশ্রুত সূত্রস্থান—১৩ অধ্যায়)

প্রাণের দ্বারাই কেবল প্রাণের তপণ হতে পারে—পাণ্ডুভৌতিক দেহকে পাণ্ডুভৌতিক দ্রব্যই বাঁচাতে পারে।

### CHEMICAL COMPOSITION :

(a) Alkaloids viz., nishindine & unidentified alkaloids. (b) Essential oil. (c) Sterols. (d) Terpenoid constituents.



## বিশ্ব

কোন সং কথা মনোমত না হলেই অনেক সময় আমরা সেটা মানি না এবং তাতে প্রাশ্নাও প্রকাশ করি না, বরং সে সম্পর্কে দু'টো বক্তৃতা মন্তব্য করে থাকি। এটা তো প্রায় গতানুগতিক রীতি।

গ্রামের বৈদ্য অম্বিনী ঠাকুর গুরুদ্বন্দ্বী বিষ্যের দৌড়েই বলেছিলেন—‘পাকা বেগের শাস, শরীরে পাকায় মাস।’ শুনেই গায়ের খুড়ো হোক করে ঠেলে উঠে মন্তব্য করেছিলেন—‘আঃ! তুমি রাখো ঠাকুর, সকালবেলা পেটটা যখন খোলসা হয়, তখন?’

যুগ যুগ ধরে চলছে—পাকা বেগ পেট সাফ রাখে। পুরাতন ছড়া আর যুগ-যুগান্তরের ব্যবহার এই দু'টি বিপরীত মতবাদে কেমন যেন স্থাবির হয়ে যেতে হয়। তাই আজ উত্তর বয়সে তাঁদের অমন ধরণের বিপরীতধর্মী মন্তব্যগুলি মনে করেই আমার এই আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা।

হয়তো কোন অসত্যক মূহুর্তে যে ভুল জন্মেছিল—পরম্পরায় তাই চলে এলে সেটা যে কোন অবিস্মরণ ও অহিতকর পন্থিত হতে পারে, তা সামাজিক জীবনে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, ফলে এটা গবেষণার বিষয়ই হয় না। সেইরকম কোন দোষ যদি আপাতঃদৃষ্টিতে ধরা না পড়ে—তাহলে সেটা নিয়ে কোন কথা বলার অর্থই হয়—একঘরে হওয়া। এই বলেই তার একটি মোক্ষম উদাহরণ। কেন তা বলছি—

অর্থবৈদিক উপবর্হণ সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

‘মা স্থানি বর্ষনীয়ান্ মালদ্রঃ ধূমগন্ধিঃ যঃ।

ইন্টং বাত মভিগগন্তং বষট্কারং বিগাহতু॥’

বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্কের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

মালদ্র! ত্বং মাং শ্রিয়ং পক্বং লুনাতি ইতি লুদ্রক্।  
তৎ সেবনাৎ ত্বক্ কান্তিমপোহতি। অগ্নিং ত্বং বন্ধস্ব। ত্বং ধূমগন্ধিঃ  
ইচ্ছং মণ্ডলং বীতং যৎ তৎ অভিগগদ্বং বষট্কারং বিগাহতু।  
ব্যতিকরং কুরদ্॥



এই ভাষ্যের তাৎপৰ্য হ'ল—তুমি মালদ্র, তুমি ধূমগন্ধি, তাই তুমি শ্রীকে নষ্ট কর; আবার ব্যতিকর হয়ে অগ্নিকে বধন কর এবং যে মণ্ডলস্পর্শ দ্রুত হয়ে যায়—তুমি তাকে স্থাপন কর।

এই ভাষ্যটির অন্তর্নিহিত তথ্য হলো অপর ও পক্ব বিশ্বফলের দোষণের বিচার নিয়ে—

এবারে আর একটি, বেলের নাম-অঙ্কিমা— 'গোদামামী' বললে যেমন মামীর চেহারাটির ধারণা হয়, সেই রকম বিশ্ব বলেই তার আকৃতি-প্রকৃতির বিচার হয়ে যায়। এই বিশ্

অর্থাৎ ছিদ্র, তার উত্তরে বনু প্রত্যয় করে বিল্ব হয়েছে। এই ছিদ্র সম্বন্ধকারী বলেই তার নাম বিল্ব; চলতি কথায় আমরা একে বেল বলে থাকি। পাকা বেল দীর্ঘদিন খেলে অন্তে সুক্ষ্ম ছিদ্র পথ তৈরী হতে পারে। বৈদিক সূত্রে 'বাতিকর' শব্দটির প্রয়োগ করার গুঢ় অর্থই হলো তাই—কাঁচা বেল তার বিপরীত ক্রিয়া করে। অর্থাৎ ছিদ্রগুলি বন্ধ করে, তাই আমাবস্থায় এটি উপকারী।

### পরবর্তী স্মীক্ষা [সংহিতা পর্ব]

এই বিল্ব সম্পর্কে চরকের অভিমত হচ্ছে—

দুর্জরং বিল্বসিদ্ধন্তু দোষলং পদ্বিত মারুতম্।

স্নিগ্ধোক্ষ তীক্ষ্ণং তন্ম্বালং দীপনং কফবাতজিহ্ন॥

অর্থাৎ পাকা বেল হজম হয় খুব কষ্টে এবং বহু দোষের আকর, যার জন্য এটি উদরে দুর্গন্ধ বায়ুর সৃষ্টি করে। আবার বিপরীত গুণ নিয়েও এটি আত্মপ্রকাশ করে—বেলকে কচি বা কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা হলে, তখন সে স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য অথচ তীক্ষ্ণ এবং অগ্নির উদ্দীপক; তার ফলে সে কফ ও বায়ুকে জয় করে।

আর একটি সংহিতার মন্তব্য হচ্ছে—

‘পক্বং বিল্বং বিশোপমম্, আমং তুং অমৃতোপমম্।’

অর্থাৎ পাকা বেল বিষবৎ, শরীরের ক্ষতিকারী আর কাঁচা বেল অমৃতের সমান গুণকর। এ সম্পর্কে সুশ্রুত ও অন্যান্য সংহিতাকারগণেরও ঐ একই প্রতিধ্বনি—

ফলেষু পরিপক্বেষু যে গুণা সমুদাহতাঃ।

বিল্বাদনাথ বিজ্ঞেয়া বিল্বং আমং গুণোত্তরম্।

অর্থাৎ সব ফল পাকলেই তার গুণোৎকর্ষ হয়, বেলের ক্ষেত্রে সেটা উল্টো। এর অর্থ হলো—কাঁচাই গুণকরী।

এই বিল্ব সম্পর্কে প্রাচীন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই বৃক্ষটির সমগ্র অংশেরই ঔষজ্যগুণ প্রচুর। হলে কি হবে, তাঁদের ইচ্ছিতের তাৎপর্য না বুঝেই তো গন্ডলিকা প্রবাহের মত আমরা পাকা বেল নির্বিচারে ব্যবহার করে আসছি—এই ধারণা নিয়ে যে, এটি নিশ্চয় অস্ত্র ও মলভাণ্ডের দোষ নিরসন ও দান্ত পরিস্কার করে। এটা খুবই ভ্রান্ত ধারণা। পাকা বেলের ব্যবহারে যে তার উল্টোফল হয়—এটা আজও আমাদের চিন্তাধারার বাইরে। কাঁচা বেলের স্বভাবগুণ সংগ্রাহী, সংগ্রহী নয়; পাকা অবস্থায় বিপরীত, কারণ—পাকা বেল অস্ত্র বা মলভাণ্ডের দোষকে সংশোধন না করে দান্তকে জোরপূর্বক বের করে দেয়। কিন্তু কাঁচা বেল পাচক এবং অগ্নিবল বাড়িয়ে দিয়ে আমদোষ পরিপাক করায়; যার জন্য কোন জীবাণুই ওখানে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এটা তো আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, ছায়া জায়গায় বিষ্ঠা পড়ে থাকলে সেখানে পোকা হয়, আর রোদ্দে থাকলে সেটা হয় না। সুতরাং মানুষের অনাধিষ্ঠান নাড়িকে বলবান রাখতে পারলেই মানুষের চৌন্দ্র আনা রোগই আসে না। এবার বিষয়বস্তুতে ফিরে যাই।

এই গাছটির পরিচয় ভারতের কোন প্রদেশবাসীর কাছে অজানা নেই। এর আর

একটি নাম হ'ল—'সদাফল'। আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন, কোন কোন গাছে সব বেল তখনও পড়ে না, অথচ নতুন কচিপাতা ও ফুল হয়ে আবার ফলবান হচ্ছে। এইজন্যেই তাকে 'সদাফল' বলা হয়েছে। এইসব নামকরণই ছিল প্রাচীন বোটানী; আর বর্তমানের বোটানিক্যাল নাম Aegle marmelos, ফ্যামিলী Rutaceae. রোগ প্রতিকারে কাজে লাগে—মূলের ছাল, পাতা, ফুল ও কচি ফলের শাঁস।

### উপযোগিতায়

১। পাতাঃ— মেদস্বী যাঁরা, যাঁদের গায়ের ঘামে দুর্গন্ধ হয়, তাঁরা বেলপাতার রস জলে মিশিয়ে সেই জলে শরীরটা মুছলে, তার স্ৱাৱা ঐ দোষটি নষ্ট হয়। তবে বেলপাতা আগুনে সেকৈ নিয়ে ঢেকে রেখে খেঁতো করলেই রস বেরোয়।

২। সর্দির প্রবণতায়ঃ— পাতার রস ১ চামচ (৬০ ফেঁটা) আন্দাজ খেলে (বালকের মাত্রা বয়সানুপাতে) কাঁচা সর্দি ও তার সঙ্গে জ্বর বা জ্বরভাব সেরে যায়। এটি ভারতের পশ্চিমাঞ্জে খুব প্রচলিত।

৩। শর্করা রোগঃ— ৪।৫টি বেলপাতার রস একটু মধু মিশিয়ে খেতে দেওয়া পশ্চিমাঞ্জলের দেহাতী বৈদ্যদের একটি সাধারণ ব্যবস্থা।

৪। যৌবনের উদ্দীপনা রোধেঃ— সহজাত প্রবৃত্তির প্রশমনের জন্য ব্রহ্মচারীদের ১৬ বৎসর বয়স হলে কিছুদিন পাঁচটি ক'রে বেলপাতার রস খেতে হয়। শূনেছি এটি দীর্ঘদিনের ব্যবহারে শক্তির সৃষ্টিও হয়। এটির যথার্থ সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

৫। শোথেঃ— হাত-পা ব্যাঙের মত ফুলে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে বেলপাতার রস ও মধু দিয়ে ঔষধ খেতে দেওয়া সুপ্রাচীন ব্যবস্থা।

৬। বারো বছরের ছেলে পড়াশুনো ক'রেও মনে রাখতে পারে না—সেটা নজরে পড়লো বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের। তিনটি বেলপাতা ঘিয়ে মড়মড়ে ক'রে ভেজে অল্প মিছরীর গুঁড়ো মিশিয়ে ছেলটিকে খেতে উপদেশ দিলেন। অবশ্য-করণীয় নিত্যসন্ধ্যার মতই সে উপদেশ পালন করলো ছেলটি, তারপর তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো—এটির স্ৱাৱা শক্তিরক্ষাও যেমন হয়, স্মৃতিশক্তিও বাড়ে তেমন। হয়তো এই ঔষধের গুণের পরিণতিতেই প্রথর স্মৃতি-শক্তির প্রভাবে সেই ছেলটি তাঁর প্রৌঢ়াবস্থায় বাবাজী মহাশয়ের বিশাল 'জীবনচরিত' লিখেছিলেন।

এ ক্ষেত্রে আমার অভিমত হচ্ছে—এটা কিশোর বয়স থেকে ব্যবহার করাই শ্রেয়, কারণ—প্রকৃতি চাপলা ওই বয়সেই সুরু হয়।

৭। বিশ্বের ফুলঃ— বেলের ফুল ২ গ্রাম আন্দাজ মাত্রায় বেটে ওর সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো ২৫০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে খেলে পিপাসা, বমি ও অতিসার প্রশমিত হয়।

৮। মূলের ছালঃ— ৩।৪ গ্রাম মাত্রায় (আন্দাজ ৪।৫ আনা ওজন) গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে ছেকে তার সঙ্গে একটু বালি বা খই-এর মন্ড ও অল্প চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুদের বমি ও অতিসার বন্ধ হয়।

৯। যাঁরা দীর্ঘদিন আন্তিক ক্ষতে ভুগছেন, তাঁরা কচি বেলের শুকনা টুকরো (৭।৮ গ্রাম) শঠী বা বালি রান্নার সময় একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, পরে ওটাকে ছেকে সেই বালি বা শঠীটা খাবেন।

১০। বেলশুঁঠকে (কচি বেলের চাকা কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই বেলশুঁঠ হয়)

পাঁউরুটির মত সেক্কে গুড়ো করে আধ বা এক চা-চামচ মাত্রায় সদ্যপাতা সাদা দই-এর ঘোলে মিশিয়ে খেলে (দই-এর ৪ গুণ জল দিলে ঘোল হয়) পুরানো আমাশয়ে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক—তরকারী, মসলা কম না খেলে আমাশা সারে না।

আর একটা কথা—যদি এর সঙ্গে রক্ত থাকে, তাহলে বৃন্দ বৈদ্যেরা মৃদুথোর (Cyperus rotundus) রস মিশিয়ে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

১১। রক্তার্শেঃ— কাঁচা বেলপোড়ার শাঁস বাড়িতে পাতা সাদা দই-এর ঘোলে মিশিয়ে খেলে খুব উপকার হয়।

১২। হৃন্দোর্বল্যেঃ— বেলের মূলের ছালচূর্ণ ৬—১২ গ্রেণ মাত্রায় (অবস্থাভেদে) দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ওটা দূর হয়, অধিকন্তু এটিতে অনিদ্রা ও ওদাসীন্যভাবও কেটে যায়।

১৩। শূক্ৰতারল্যেঃ— বিব্বমূলের ছাল ১২—১৪ গ্রেণ ও জীরে ৬ গ্রেণ মাত্রায় একসঙ্গে বেটে গাওয়া ঘিের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

হয়তো বা এসব ছাড়া আরও বহু অজানা গুণ রয়েছে এতে। আজ হয়তো সেই খুড়োর মত লোকে চিন্তা করবেন যে, 'ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি—কি দিবি বল?' অর্থাৎ ঠিক যেন পাকা বেল খাওয়ার উপদেশ।

পরিশেষে জানাই যে, বৈদিক চিন্তাধারায় যে তথ্যটি দেওয়া আছে, সেটি যে অমূলক, এ কথাটা বলার পূর্বে নূতন করে সেটার সমীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সমীক্ষার উৎস আছে কিন্তু সমীক্ষকের তো প্রয়োজন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজের চোখে কবিরাজ মহাশয়দের অবস্থা যেন 'বাসর ঘরে বিধবার প্রবেশের সঙ্কেচ', তবে বৈধব্য প্রাপ্তির মূলে কি তাঁদেরই স্বকৃত দোষ?

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz. dictamine, gamafagarine skimmianine, aegeline, aegelenine, tambamide and haplopine. (b) Coumarins viz. umbelliferone, imperatorine, alloimperatorine, marmin, marmisin, geranyl, psoralen, aegelinol, kanthotoxin, 6, 7-dimethoxy coumarin and scopoletin. (c) Sterols viz. betasitosterol and gamasitosterol (d) Triterpenoids viz. lupeol.





## আম

প্রকৃতির গর্ভে জন্ম সবারই, বিকাশও প্রকৃতির বক্ষে, কিন্তু নিরুপদবে জীবন-সাফল্য লাভ কেবা পায়? এই যে ফল-ফুল তারাও কি সুস্থির জীবনের সুখমা ভোগ করে?

প্রোঢ় শীতের আমকে ধরেই বলি—প্রকৃতির সঙ্গে তাকে বহু লড়াই করেই তো এই ফলটিকে বেঁচে থাকতে হয়। দ্রুণকালেই তাকে মেরে, ফেলতে চায় কুজ্ঝটিকা, শিলাবৃষ্টি, প্রচণ্ড খরা; এদের উপদ্রবে আমের মুকুল বা গুটিগুটি অসময়ে ঝরে যায় বলেই তার নাম রাখা হয়েছে 'চুত'। গ্রামের মানুষ নিশ্চয়ই জানেন যে—আম ভিন্ন অন্য কারও মুকুল বা কাঁচ ফলের জীবন কুয়াশায় যায় না; তাইতো লোককথায় প্রচলিত—“যত কুরো আমের ক্ষয়, তাল তেতুলের কিছন্নয়”। অর্থাৎ সোহাগী প্রাণে যেন কোন ধকলই সয় না।

তা ছাড়া এই ফলটির জন্মের প্রাচুর্য ও অপ্রাচুর্যে প্রকৃতির এমন একটা ইঙ্গিতও নিহিত থাকে যে—এ বৎসর বর্ষণ কেমন হবে, অথবা ধানের ফলনই বা কেমন হবে; এ ক্ষেত্রে সেই খনার বচন “আমে ধান, তেতুলে বান”—এ যেন প্রকৃতির রায়ডারে ঘোষিত হয় মেঘ-বর্ষণের আগাম সংকেত।

ফলটি আর্য-স্বীকৃত কিনা? হ্যাঁ, তার প্রমাণঃ—

উজ্জ্বলানঃ পয়সা পিপ্সমানঃ অস্মৎ সীতে পয়সা ।

পবস্ব মাকন্দঃ অভ্যাবৎ স্ব ॥

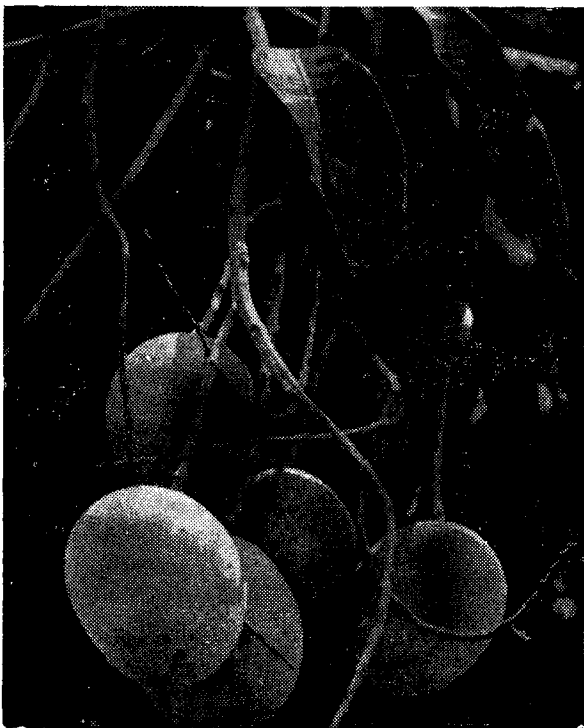
স্বাদিষ্টয়া মদিষ্টয়া পবস্ব সোমধারয়া ।

সমুদায় ভিষক্ পাতবে সূতঃ ঘোনিময় ।

(জৈথর্ববেদ বৈদ্যকল্প ১৫৭।২২-৩)

মহীধর ভাষা—

ত্বং মাকন্দোহসি। মা=পরিমিতো কন্দোহসি আত্ম ইতি। অর্থাৎ সৌরভেণ দূরং গচ্ছতি, ততঃ উজ্জ্বলানঃ=বলমাদধানঃ, সীতে ভূমৌ=অহল্যভূমৌ জাতঃ অসি। ত্বং পিপ্লবমানঃ=পূরয়ন্ পয়সা দংশাদিভিঃ অভ্যাবৃত্ত্ব অস্মদভিমুখং আবৃত্তোভব। অস্মাকং অনুকুলো ভব। তব সৌমধারয়া পকস্য রসধারয়া=স্বাদিষ্টয়া মদিষ্টয়া পবস্ব পূতং কুরু। ভিষক্ সমুদয় আমরসং গৃহীত্বা পাতবে বৃক্ষস্য পত্ররসেণ সূতঃ অভিষদতোসি, যোনিময়ো অপি ভূমিতি গর্ভদোহপি।



#### অনুবাদ

তুমি মাকন্দ, মা=পরিমিত কন্দ তোমার, দূর থেকে তোমার সৌরভ আগমন করে। তুমি বলাধান কর। তুমি অকর্ষিত ভূমিতে জন্মগ্রহণ কর। তোমার রস দংশ সহ যুক্ত

হয়ে আমাদের সম্মুখে এস। আমাদের অনুকূল হও। তোমার পক্ষের খায়া খুব স্বাদিন্ত ও মন্তভাৱক। তোমার বৃক্ষ ও পত্রের রস যোনি ও গৰ্ভদ ব'লেই ভিষক্ গ্রহণ করেন।

অথৰ্ববেদের এই সূক্তটির মহাধরের ভাষ্য বেশ তাৎপৰ্যপূর্ণ। এর মাকন্দ এই বৈদিক নামটির অর্থ সার্থক বলা যেতে পারে; কারণ এর অন্যান্য শিকড়ে চারাদিক থেকে বিস্তৃত হলেও অবশেষে গাছের প্রধান শিকড়টিই পচে যায় এবং গুঁড়ির নিম্নাংশকে কন্দের আকার ধারণ করায় পরিমিত কন্দ—তাই মাকন্দ। আর একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন—আম্র, অর্থাৎ অমতি ব'লেই আম্র। যেহেতু তার ভ্রূণাবস্থা থেকেই দূর থেকে এর সৌরভ পাওয়া যায়; যার জন্য কচি পল্লব থেকেই বিভিন্ন প্রকার মাছি, মৌমাছি, কোকিল—এরা সব ছুটে আসে; তাই এর অপর নাম 'সহকার'। সহ কারয়তি সগময়তি স্ত্রীপদংসৌ, অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা সৌরভ ছাড়িয়ে যে স্ত্রী-পদব্ধ উভয়কে মিলিয়ে দেয়। আমের পুষ্প মধুর রসসম্পন্ন। এই স্বভাব থাকার জন্যই সে সহকার।

আম্র একটি অথর্ব ভাষা হ'লো—দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াকে বলা হ'য়েছে 'সোমধারা'। এই সোমধারার শক্তি বলাধান করা ও শুদ্ধবহ স্রোতকে শুদ্ধ করা। এই জন্যই সে হয় গৰ্ভপ্রদ। তবে হ্যাঁ, এর আঁটিও অবহেলার বস্তু নয়।

### বৃগান্তরের সমীক্ষা

আর এক প্রশ্ন—পক বা অপক আম্র কি সমগুণ?  
এখানে চরক বলেছেন—

“আম্রং বালং রক্তপিপ্তকরং মধ্যং তু পিত্তলম্ পকং বর্ণকরং মাংস-  
শুদ্ধ-বলপ্রদম্।”

অর্থাৎ কচি আম রক্তপিপ্তকর, মধ্য বয়সের (ডাঁসা) আম পিত্তকর এবং পাকা আম বর্ণ, মাংস, শুদ্ধ ও বলদান করে। অর্থাৎ এখানে গুণের প্রসঙ্গে নয়, রসের স্বভাবকেই বিবৃত করা হ'য়েছে, কারণ রস বহুপ্রকারেই পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে।

তাই কাঁচা বা পাকা আমের রস ও গুণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক; যেহেতু দুবোয় রস পরীক্ষাটিই সর্বাগ্রে দেখা হয়। তা ছাড়া আম্রের যে বলাধানের একটি গুণ্ডী আছে, সেটি হ'লো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, অর্থাৎ আপনার পরিপাকশক্তি যদি দুর্বল থাকে, তবে বেশী খেলে উপকারের থেকে অপকারই বাড়াবে। এইজন্যই চরক বলেছেন—

‘হিতং অপি মিতং ভুঞ্জাৎ’

অর্থাৎ ভাল হলেও পরিমিত খাওয়া উচিত। আর একটা সাবধান বাণী সেখানে দেওয়া আছে যে, ‘রাস্তাে ফল খেতে নেই।’

অনেকের প্রশ্ন—আম খেলে ফোঁড়া হয় কেন?

এখানে কারণ দু'টি। যদিও আপনি পাকা আম খাচ্ছেন, সেটি যদি এঁচোড়ে পাকানো অর্থাৎ কাঁচাকে কৃত্রিম উপায়ে পাকানো হয়ে থাকে, তাহলে এটি কাঁচা আম্রের দোষ থেকে মুক্ত হলো না। স্বাভাবিকতঃ অনেকের শরীরে পিত্তবাহুল্য থাকে, তার সঙ্গে এটা বেশী খেলে ফোঁড়া হওয়াটা স্বাভাবিক। এটা চরক, স্দুশ্রুতের সমীক্ষা।

প্রশ্নঃ— পাকা আম গরম না ঠাণ্ডা?

এক্ষেত্রে মন্তব্য হলো—হ্যাঁ, শীতবীৰ্য অর্থাৎ তার মৌলিক শক্তিটি শীতগুণ চিরঞ্জীব-চ

সম্পন্ন, অর্থাৎ ঠান্ডা, অবশ্য স্বভাবে থাকলে তবেই। কৃত্রিম উপায়ে পাকানো আমের দ্রব্যশক্তি সেরে গন্ধ থাকে কি সম্ভব?

এই গাছটির পরিচিতি নিম্নপ্রয়োজন। গাছস্থায়ীভাবে এর উপযোগিতা উপলব্ধি করেই একে কৃষি-লক্ষ্যমূলক পুঙ্জায় বা অন্য কোন মাণ্ডলিক কর্মেরও উপচার হিসাবে চিহ্নিত করা আছে। প্রাচীন বোটানীতে তার বহু পৰ্যায়ও নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের দেওয়া নামটি হলো— *Mangifera indica* Linn., Family—Anacardiaceae.

### রোগ প্রতিকারে

১। আমাশায়ঃ— কচি আমপাতা ও জামপাতার রস (২।৩ চা-চামচ) একটু গরম করে খেলে আমাশা সারে।

২। দাহ ও বমিভাবঃ— বাদির শরীরে দাহ বেশী এবং বমি বমি ভাব প্রায়ই ঘটে, তাঁরা আমপাতা (৩।৪টি) জলে সিদ্ধ করে সেই জলটাকে সমস্ত দিনে একটু একটু করে খেলে দাহ ও বমির ভাবটা চলে যাবে।

৩। অকালে দাঁত পড়ে যাওয়াঃ— আমপাতা (কচি হলে ভাল হয়) চিবিয়ে তা দিয়ে দাঁত মাজলে অকালে দাঁত নড়েও না, পড়েও না। (ওড়িশায় এখনো বাসি বিয়ের দিনে আমপাতা দিয়ে বরের দাঁত মাজাটা রীতি-ঐতিহ্য।

৪। পোড়া ঘায়ে (দংশ রূপে)ঃ— আগুনে পড়ে গিয়ে ঘা হলে আমপাতার পোড়া ছাই (মুখাবন্ধাবস্থায় পোড়াতে হবে, অর্থাৎ—পাত্রের মুখ লেপে-শুকিয়ে পোড়াতে হবে, সেটা কালো হবে) ঘিয়ে মিশিয়ে লাগালে পোড়া ঘা শুকিয়ে যায়।

৫। পা ফাটায়ঃ— বাদির পা (গোড়ালির অংশ) ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তাঁদের ফাটা আরম্ভ হলে প্রথম থেকেই ঐ ফাটায় আমগাছের আঠা লাগালে আর বাড়ে না; তবে আমের আঠার সঙ্গে কিছু ধূনের গুড়ো মিশিয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

৬। নখকুনিতেঃ— যাঁরা নখকুনিতে কষ্ট পান, তাঁরাও আমগাছের নরম আঠার সঙ্গে একটু ধূনের গুড়ো মিশিয়ে নখের কোণে টিপে দিলে, এ থেকে রেহাই পাবেন।

৭। কেশপতনেঃ— আমের কুশি (কচি আমের আঁঠির শাঁস) খেঁতো করে জলে ভিজিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জল শুষ্ক চুলের গোড়ায় লাগালে কেশপতন (চুল উঠে যাওয়া) উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ও সময় মাথায় তৈল ব্যবহার না করাই ভাল।

৮। অকালপকতায়ঃ— খেঁতো করা আমের কুশি ৫।৬ গ্রাম ও শুকনো আমলকী ২।৩ টুকরো একসঙ্গে ১০।১২ চা-চামচ নিয়ে লোহার পাত্রে জলে ভিজিয়ে সেটা ছেঁকে নিয়ে চুলে লাগালে অকালপকতা রোধ করে।

৯। খুস্কিতেঃ— আমের কুশি ও হরীতকী একসঙ্গে দুধে বেটে মাথায় লাগালে খুস্কি কমে যাবেই; তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে উচিত—ওটি ছেঁকে নিয়ে মাথায় লাগানো।

১০। রক্ত পড়তেঃ— আঁঠির শাঁসের রসের বা গুড়োর নস্য নিলে নাক দিয়ে রক্তপড়া বন্ধ হয়। তবে ব্রাডপ্রেসারের রক্তপড়া বন্ধ করা সমীচীন নয়।

১১। প্রদরেঃ— বীজের শাঁসের গুড়ো ১০।১২ গ্রেণ মাত্রায় জল দিয়ে খেলে শ্বেতপ্রদর কমে যায়। আমের ফুল (মুকুল) চায়ের মত করে পান করলে প্রদর সারে।

১২। রক্ত আমাশায়ঃ— আমগাছের ছালের রস ১।২ চা-চামচ মাত্রায় আধ পোয়া দুধে (ছাগলর দুধ হলে ভাল হয়) মিশিয়ে খেলে রক্ত-আমাশা সারে যায়। তবে এর সঙ্গে বৃন্দ বৈদ্যরা একটু চিনি, না হয় মধু মিশিয়ে খেতে বলেন।

১৩। অতিসারে:— আমগাছের ছালের উপরের স্তরটা চেঁছে ফেলে দিয়ে সেই ছাল গো-দাঁধিতে বেটে খেলে পেট গড়্‌ গড়্‌ শব্দ ও পাতলা দান্ত বন্ধ হয় এবং সেজন্য দাহ ও বেদনা নষ্ট হয়। আমের কাঁচপাতা ও কাঁচা কয়েদ্বেলের শাঁস সমভাবে বেটে চালধোয়া জলের সঙ্গে খেলে পক্‌তিসারের উপশম হয়।

১৪। রক্তপিত্তে (হেমোপ্টোসিসে):— এ রোগীর পক্ষে খুব মিষ্টি পাকা আম ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহার করার ব্যবস্থা রয়েছে আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য গ্রন্থ চন্দ্রকোষে।

১৫। প্লীহাবৃদ্ধিতে:— পাকা আমের (মিষ্টি) রস ৭।৮ চা-চামচ মাত্রায় ২-১ চা-চামচ মধু মিশিয়ে খেলে প্লীহাবৃদ্ধি ও তক্তজনিত উপসর্গের উপশম হয়। তবে ঝাড়ুপ্রধান প্লীহা রোগেই ব্যবহার্য।

১৬। অজীর্ণে:— অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার জন্য অজীর্ণ হলে সেজন্য কাঁচা আম সেব্য। অতিরিক্ত মাংস ভোজনে অজীর্ণ হলে আমের আঁঠির শাঁস সেব্য।

১৭। পাঁচড়ামে:— আমের আঠা লেবুর রস অথবা তৈলে মিশিয়ে পাঁচড়ায় ব্যবহার্য।

১৮। উদরাময়ে:— আমবীজের শাঁসের কাঁথ আদার রস সহ সেব্য।

১৯। বহুমূত্রে:— আমের নতুন পাতা শুকিয়ে গুড়ো করে ব্যবহার করলে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

২০। গলাব্যথা:— আমপাতার ধোঁয়া গলা-বেদনা নিবারিত করে।

হারানো দিনের স্মৃতির হিতৈষী ষাঁরা—ভাঁদের অনেকেরই মনে জাগে, আশ্বখণ্ড ঔষধে কবিরাজগণ এককালে কত রোগই না সারাতেন—অম্লপিত্ত, উদারত, শূন্যগর্ভ, গুল্ম প্রভৃতি; সেসব কি শূদ্‌ গম্পকথায়ই প্রচলিত? সেই লোককথাগুলির সঙ্গে তৈষজ্য বিদ্যাটিও কি কোন মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রসূত হয়েছিল?

উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ—প্রতিটি লোককথাকে অনুধাবন করলে তাই পাওয়া যাবে—কোনটাই নিরর্থক নয়। এ সব এককালের সমাজ-জীবনের বাস্তব সত্যের উপলব্ধির ফসল। জনদরদী কবিরাজগণ সত্যই তেমনি ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করতেন। তবে পরিবর্তিত যুগধারায় সে সব আমাদের মনে আজ এখন স্মৃতির সাগরে অবগাহন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা মাত্র। এখন এসবের স্থান যেন—“বন্ধ্যার কাছে প্রসব বেদনার অনুভূতি জ্ঞাপন করানো”।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vitamin viz., vitamin A, B, C and D, ascorbic acid. (b) Carotenoid pigments. (c) Glycosides viz., pesnidin 3-galactoside. (d) Other constituents viz. UDP-glucosepyrophosphorylase, ADP-glucosepyrophosphorylase, UDP-glucose fructose-6-phosphate, nucleoside diphosphate kinase (e) Ethylgallate, phenol, starch



## জম্বু

সমাজে, সংসদে, সভা-সমিতিতে কত কথাই তো শোনা যায়; কোন কথায় ক্রোধ হয়, কোন কথায় পুরাতন স্মৃতি জাগায়, আবার কোন কথায় বৈরাগ্য আসে, আবার এমন কথাও শোনা যায়, যার দ্বারা নূতন এক অভিজ্ঞতার সংবিৎ ফিরে আসে, তেমনি এক জাগরণী স্মৃতি দিয়েই এই প্রসঙ্গ।

সে প্রায় দুই যুগ আগের কথা—ফারেন্দা ফারেন্দা হাঁক শব্দে কোতুহল জেগেছিল ফয়জাবাদ স্টেশনে। মৃদু ব্যাডিয়ে দেখি গাবের মত বড় বড় কালজাম নিয়ে ফেরিওয়ালা হাঁকছে ফারেন্দা। চমক লাগলো এই নামে।

বৈদ্যক জীবনে সদু হ'লো অনুশীলন। শব্দ গবেষণাও ভৈষজ্যবিজ্ঞানের একটি দিক, তাই এর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখি—সেই ফারেন্দাই আমাদের প্রাচীন ভৈষজ্যবিজ্ঞানীর দেওয়া নাম “ফলেন্দার” বিবর্তিত শব্দ—এটির অর্থ হ'লো “ফলশ্রেষ্ঠ”, অর্থাৎ জম্বুই সেই ফলশ্রেষ্ঠ ফারেন্দা।

এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল এই ভূমণ্ডলের পুরাণ পরিচয়ে জানা যায় যে পৃথিবী সাতটি স্বর্গে বিভক্ত; তার মধ্যে এই জম্বুস্বীপাণ্ডলের অন্তর্গত ইলাবৃত, রুক্মবর্ষ, হর্ষ্যবর্ষ (হরিয়ুপা) প্রভৃতি বর্ষের মত ভারতও একটি বর্ষ। আরও দেখা যায় স্বর্গের একটি নাম জাম্বুদ্বীপ, দ্বিতীয়তঃ এই অঞ্চলের উত্তরাংশের একটি প্রদেশের নামও যেমন জম্বু, আবার ওখানকার একটি নদীর নামও কিলাম। কাশ্মীরী ভাষায় কিলামের অর্থই হ'লো স্বর্ণোজ্জ্বল বা স্বর্ণঝরণা; এও সেই প্রাচীন স্বর্ণস্মৃতিরই ঐতিহ্য ধারণা জাগায়; অবশ্য এই নামকরণের ঐতিহ্য যথাযথ কিনা, সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকের বিচার্য বিষয়।

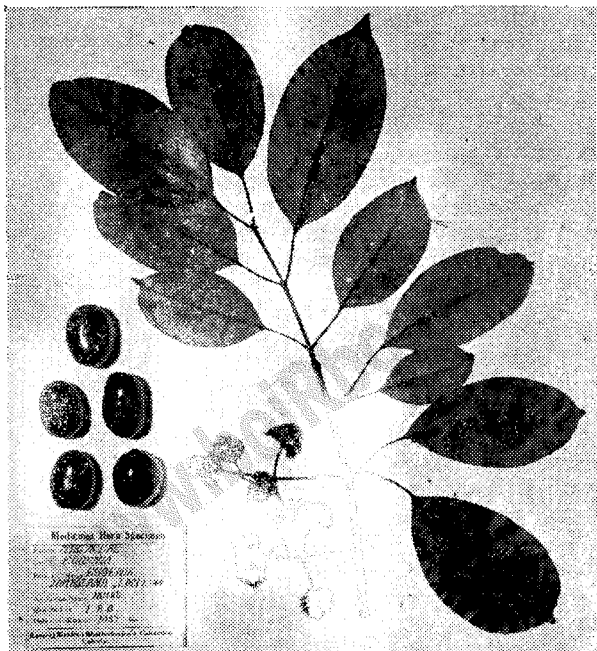
প্রসঙ্গে ফিরে এসে' ভাবছি, পৃথিবীর মধ্যে এই ভারত ভূখণ্ডটি স্বর্ণপ্রসবা বলেই কি জম্বুদ্বীপ তার নামকরণ?

এ সম্বন্ধে বৈদিক তথ্যঃ—

শুনং সূফালা জম্বলঃ শূনা সীরা বপোতহ বীজম্।

তোষমানা সূন্য পক্কেয়াং নাদেয়ম্॥

(অথর্ববেদ ২২৩।৩৬।৫)



এই সূক্তটির মহাধরের ভাষ্য হলো—

স্বং শূনা সীরা শূনো=বায়ুঃ সীরঃ আদিত্যঃ শূনং=আন্তরীক্ষঃ  
নাদেয়ং বীজং তোষমানা সূন্যঃ পক্কেয়াং আদিত্য-বায়ুভ্যাং  
কষায়-মধুরা-শ্রম-পিত্ত-দাহ-কণ্ঠ-শোষণস্থং তোষমানা সফলা=  
শোভন ফলা যুয়ং ভবতঃ। বীজানি নাদেয়ং জল-সংঘাত বহমানানি  
ফলিনো ভবন্তি। জম্=ভক্ষণে বল্=অট্।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হলো—তুমি জম্বল, তুমি বায়ু ও সূর্যের আন্তরীক্ষ শক্তিতে

সফল হও। তোমার বীজ নদের জলে বাহিত হয়ে দেশে দেশে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তোমার অন্তঃশক্তি বায়ু ও আদিত্যের দ্বারা পুষ্ট হয়, তাই তুমি কষায়-মধুর রসে সিক্ত হও; শ্রম, পিত্ত, দাহ, কণ্ঠশোষ (পিপাসা) নিবৃত্ত কর।

### পরবর্তী পর্যায়

সংহিতার যুগে এসে উক্ত বৈদিক সূক্তের ইঙ্গিতটিতে পাওয়া যায়—‘তোমার অন্তঃশক্তি বায়ু ও আদিত্যের দ্বারা পুষ্ট হয়, তুমি কষায় ও মধুর রসমধুরী, এমনি অর্থবহ ইঙ্গিতকে সামনে রেখে রোগোপশমের ক্ষেত্রে হেতুবিপরীত চিকিৎসার যে পদ্ধতি, তাতে তাঁরা জামকে কাজে লাগিয়েছেন, এছাড়া আরও অনুশীলিত হয়েছে যে, এই বৃক্ষের বৃক্ (ছাল), পত্র ও ফলের বীজের দ্রব্যশক্তি স্বতন্ত্র বীর্ষধারণ করে।

চরক সমীক্ষায় পাকা জাম কষায় ও মধুর রস সম্পন্ন। তবে শীতল ও গুরু এবং বিপাকো ও গুরু; কিন্তু কষায় রসের জন্যই পেটে বায়ু হয়। তা হ'লেও এটা কফ ও পিত্তের বিরোধী নয় তবে গ্রাহী। রস ও গুণের সমীক্ষায় সূত্রদ্বয়ের ঐ একই কথা।

চরক সূত্রদ্বয়ে এর ফলগুণের ভৈষজ্যগুণ কতখানি সে সম্পর্কেই আলোচিত হয়েছে বেশী, এর গাছের অন্যান্য অংশের দ্রব্যশক্তি কতখানি সে সম্পর্কে ততটা আলোচনা হয়নি। অবশ্য পরবর্তী অন্যান্য আয়ুর্বেদিক সংগ্রহ গ্রন্থে সেই অনুল্লভ অংশগুলি অর্থাৎ গাছের বিভিন্নাংশের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়।

### জাতিভেদ

অথর্ববেদ, চরক, সূত্রদ্বয়—এমন-কি একাদশ খৃষ্টাব্দের ‘চরুদত্ত’ নামীয় সংগ্রহ গ্রন্থে জামের প্রকারভেদের উল্লেখ দেখা যায় না, তবে ষোড়শ শতকের গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে জম্বু (ফলেন্দ্রা) ও ক্ষুদ্র জম্বুর কথা বলা আছে। আরও পরবর্তীকালে বনৌষধির যেসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে, সে সব তিন প্রকার জামের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—রাজজম্বু, কাকজম্বু ও ভূমিজম্বু; অপর পক্ষে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে—ভারতে এই গণের (Genus) শতাধিক প্রজাতি আছে। তার মধ্যে জামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে—এমন গাছও কয়েক প্রকার আছে। তবে আমাদের বনৌষধির গ্রন্থোক্ত রাজজম্বুর বোটানিকাল নাম *Syzygium cumini* (Linn.) Skeels, কাকজম্বুর *Syzygium fruticosum* আর ভূমিজম্বু বলতে কোনটি তাঁরা ব্যবহার করতেন, সেটা এখনও আমাদের সন্দেহের বিষয় হয়ে আছে। তবে এ সম্পর্কে বাংলার পূর্বাংশের ও উত্তরাংশের প্রাচীন বৈদ্যক সম্প্রদায় ‘হামজাম’ বলে একটা লৌকিক নামের এক শ্রেণীর গাছকে ব্যবহার করেন, তার পাতায় ও ফলে জামের গন্ধ-আস্বাদ পাওয়া যায়, তা হ'লেও সব দিক থেকে সেটি আকৃতিতে ছোট; তার বোটানিকাল নাম *Polyalthia suberosa*. Glossary of Indian medical plants নামক পুস্তকে *Syzygium operculatum* Gamble গাছটিকে ভূমিজম্বু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দিতে তাকে “রাই জামুন” বলে। এই তিন প্রকারের গাছ ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

### রোগ প্রতিকারে

১। সাদা বা রক্ত আমাশয়ঃ— জামের কাচ পাতার রস (সংস্কৃত—কষন্ থেকে কাচি, কষন্=অপক) ২। ৩ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ছেঁকে নিয়ে (অনেকে গরম লোহা ছাঁকা



দিতে বলেন) খেলে ২।৩ দিনের মধ্যে সেরে যায়। সম্ভব হলে একটু ছাগল দুধও তাতে মিশিয়ে নেওয়া ভাল।

২। যাঁদের জ্বরের সঙ্গে পেটের দোষ থাকে, তাঁরা এই পাতার রস ২।৩ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ছেঁকে নিয়ে খাবেন; উপকার নিশ্চয়ই পাবেন।

৩। **শয্যামূত্রে:**— এ রোগে শিশু-বৃদ্ধ অনেকেই অসুবিধায় পড়েন এবং অনেক মা-কেও সন্তানের জন্য ভুগতে হয়। সেক্ষেত্রে ২।৩ চা-চামচ জামপাতার রস (বয়সানুপাতে মাত্রা কম) ই চা-চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে প্রত্যহ ১বার ক'রে খাওয়ালে সপ্তাহ মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকার হবে।

৪। **বমলে:**— পিত্ত-বিকৃতিতে যেখানে বমি হতে থাকে, সেখানে ২।১টা কচি জাম পাতা জলে সিদ্ধ ক'রে ছেঁকে নিয়ে ১০।১৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেতে দিলে বমি বন্ধ হয়।

৫। **রক্তরোধে:**— হঠাৎ হাত-পা কেটে বা ছ'ড়ে গেলে জামপাতার রস সেখানে লাগালে তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ হয়, অথচ বিষয়ে যাওয়ারও ভয় থাকে না।

৬। **পচা ঘায়ে (ঘূত):**— এর পাতাকে সিদ্ধ করে সেই ক্বাথ দিয়ে ঘা ধুয়ে দিলে ২।৪ দিনেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এমন-কি পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও ওটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৭। **ক্ষতে:**— যে ঘা (ক্ষত) তাড়াতাড়ি পুরে উঠছে না, সেখানে জামছালের মিহি গুঁড়ো ঐ ঘায়ে উপর ছাড়িয়ে দিলে তাড়াতাড়ি পুরে যায়।

৮। **রক্তদ্বন্দ্বো:**— জামছালের রস ১।২ চা-চামচ ছাগলের দুধে মিশিয়ে খেতে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এটা চরুদন্তের ব্যবস্থা।

৯। **দাঁতের মাড়ির ক্ষতে:**— যাঁদের মাড়ি আলগা হয়ে গিয়েছে, একটুতে রক্ত পড়ে, তাঁরা জামছালের গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজুন, উপকার নিশ্চয়ই হবে; তবে দাঁতে একটা ছোপ পড়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য ২।১ দিন অন্তর মাজলে এ দাগ হয় না। অনেক বৃদ্ধ বৈদ্য এর সঙ্গে পাতার গুঁড়োও সমান-পরিমাণ মিশিয়ে ব্যবহার করতে বলেন।

১০। যেসব বালক-বালিকার সর্বদা পেটের দোষের জন্য শরীর ভাল থাকে না, তাঁদেরকে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় জামছাল চূর্ণ ৫।১০ ফোঁটা গাওয়া ঘি ও অল্প চিনি মিশিয়ে কিছুদিন খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভাল হয়।

১১। **হাত-পা জ্বালায়:**— পাকা জামের রস মাখলে তৎক্ষণাৎ কমে যায়।

১২। পাকা জাম সৈন্ধব লবণ মাখিয়ে ৩।৪ ঘণ্টা রেখে, সেটা চটকে, ন্যাকড়ার পুটলি বেঁধে টানিয়ে রাখলে যে রস বের পড়বে, সেটা ২০।২৫ ফোঁটা প্রয়োজন বোধে ১ চা-চামচ জল মিশিয়ে খেতে দিলে পাতলা দান্ত, অরুচি ও বমিভাব কমে যায়। তবে লবণ একটু বেশী থাকলে ওটি শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়।

১৩। **ডায়াবিটিসে:**— জামবীজের ব্যবহার বহুদিন থেকে হয়ে আসছে, এ ক্ষেত্রে একটি বক্তব্য আছে—আম্বুবৈদ মতে এটি বায়ুবর্ধক, যেহেতু এটি কষায় রসধর্মী। যাঁদের ডায়াবিটিসের সঙ্গে হাই ব্লাডপ্রেশার আছে, তাঁদের এটি ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

**নিষেধ:**— আধ পাকা (ডাঁসা) জাম খাওয়া উচিত নয়। আর যাঁদের পেটে বায়ু হয়, তাঁদের না খাওয়াই ভাল।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Alkaloid viz., jambesine. (b) Glycoside. (c) Ellagic acid.  
(d) Essential oil.



## হরীতকী

সৎকুলে জন্ম হ'লেও পূর্বসংস্কারের বশে অনেকে ভুল পথে চলে, আবার মন্দকুলে জন্ম পেয়েও সৎ-এর সংস্কারে অনেকে উজ্জ্বল জীবন লাভ করে। অনেক সময় কারও গুণ বিচার না করেই শব্দ নাম শব্দেই শিহরণ কম্পনে গ্রস্ত হয়। ঠিক এমনি “পুতনা” নাম শব্দে আঁতকে উঠি, কারণ পুতনা মেয়ে রাক্ষসী; কিন্তু না, এই শব্দবিন্যাসটি অপূর্ব, তাই বৈদিকযুগের শ্রেষ্ঠফল হরীতকীরই এই নামকরণ করা হ'য়েছিল।

এই হরীতকীর গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেই পশ্চিমতী এক কথায় জবাব দিতেন,

‘কদাচিৎ কুপ্যতি মাতা নোদরস্থা হরীতকী’

এই কথাটির ভাবার্থ হ'লো—হয়তো কখনও মা ক্রোধান্বিত হ'তে পারেন, কিন্তু হরীতকী নয়। এটির সেবনে শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ পৌরোহিত্য সংস্কারে এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এত বড় স্থান দেওয়া হ'য়েছে যে, এটি কাণ্ডন মূল্যের তুল্য। সমাজের স্বাস্থ্য-কল্যাণের প্রয়োজনেও স্বর্ণের সমান এটি; তাই তার এই মর্যাদা? এর অভিজাত্যের নজিরও পাওয়া যায় আয়ুর্বেদের উৎস অথর্ববেদের বৈদ্যককম্প ৪।৩২৩।১১ সূক্তে।

সেখানে উক্ত হয়েছে—

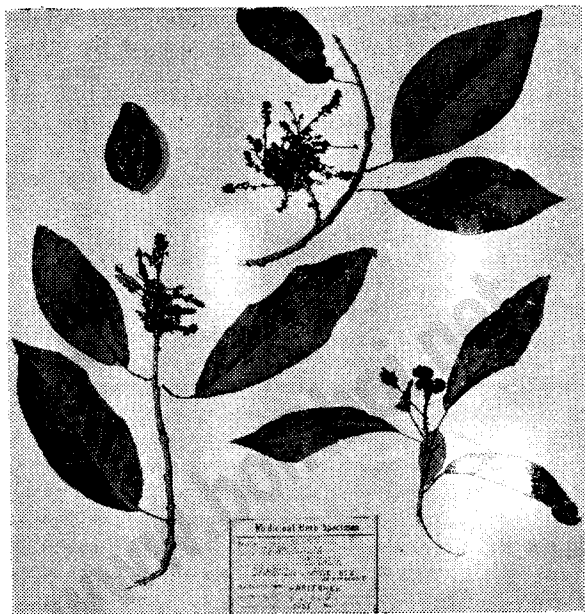
পুতনা পয়্যাংসি সমদধন্তু বাজাঃ সংবৃক্ষ্যান্যভিমাতি সাতঃ।

আপ্যায়মানা অমৃতায় দিব্যা শ্রবাংসদ্বান্তমানি ধিম্ব ॥

মহাধর এই সূক্তটির ভাষ্য করেছেন—

পুতনাসি স্বঃ। পুতং করোতীতি নিচ্ যচ্। পুতমিতি=তাপনীত-  
বদ্যে। স্বগ্ বিরহিতা অভয়া ইতি। তব পয়্যাংসি=রসাঃ পাতব্যঃ।

সং যন্তু=সংগচ্ছতাম্ ততঃপি বাজা=অন্নানি সমুদ্যন্তু, বৃক্ষানি=  
রেতাংসি তে সংযন্তু। কীদৃশস্য তে অভিমাতি বাহঃ। অভিমাতিং=  
পাপমানং। মহতে=অভিভাতি। তে তব পয়ো অন্নবৃক্ষৈঃ আপ্যায়  
মানা=বর্ধমানা সতী অমৃতায়=অমর ধর্ম্মিণ্যে প্রজাতৌ=পুত্রাদি  
বৃক্ষ্যে ভব। দিবী ইতি দিব্যা=উত্তমানি অন্নানি ধর্ম্মব=ধারণ।



এটির অর্থ হ'লো—তোমার নাম পুতনা, তুমিই স্বর্গ-বিরহিতা হ'য়ে অভয়া নামে  
অভিহিতা হও। তোমার রস পান করতে হয়। তুমি অন্নাদিকে ও রেতকে (শুদ্ধকে)  
পাপমুক্ত কর। তুমি অন্নাদিকে বর্ধিত ক'রে প্রজা অর্থাৎ পুত্রাদিকে অমৃতের ধর্ম দান  
কর। তুমি অন্নাদির উত্তম রসকে দিব্যশক্তি দাও।

### কালান্তরে এসে

উপরিউক্ত অথর্ববেদের এই স্তোত্রটি সংহিতার যুগে এসে বিস্ময়কর গবেষণার ক্ষেত্র  
হ'য়ে দাঁড়ায়।

তার বৈশিষ্ট্যের নজরী হ'চ্ছে—প্রায় অধিকাংশ বৃক্ষ-লতাাদি ওষধির বিভিন্নাংশ  
নিজে ভিন্ন ভিন্ন রোগোপশমে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু হরীতকীর ক্ষেত্রে গাছের

ফল ভিন্ন কোন অংশেরই প্রকৃতি পরিচয় সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ কারণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়—তার ১৫।২০টি নাম রাখা হয়েছে, কিন্তু সব নামই “স্ত্রীবাচক”। অথচ ফলশব্দ ক্রীবাচক, কিন্তু হরীতকীর ক্ষেত্রে অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, বয়স্থা, প্রাণদা, অমৃত প্রভৃতি। এখানে স্ত্রীবাচক শব্দ দিয়ে নাম রাখার অন্তর্নিহিত কারণ—এই ফলটি ক্ষতিগুণাত্মক। পরিষ্কার বোঝা যায়—এর অধিকাংশ নামই তার দ্রব্যশক্তির স্বভাবধর্মিতার পরিচয় দিতেই স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগ। প্রতিটি দ্রব্যের মধ্যে দুটি কার্যশক্তি বিদ্যমান থাকে, একটি হ’লো সংযোগের আর একটি হ’লো বিয়োগের। সংযোগশক্তি দেহ সমৃদ্ধ করে এবং বিয়োগ নিষ্কাশন করে।

এই হরীতকীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে—বিয়োগেতেই অর্থাৎ নিষ্কাশনেই এর কার্যকারিতা (সর্বশরীরগত বিভিন্ন রোগোৎপাদক দূষিত মলাংশের নিষ্কাশন অর্থাৎ দোষ দূর করিয়েই দেহে পোষণের উপযোগী উপচয় সৃষ্টি ঘটিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করায়; সেই কারণেই বা মায়ের সঙ্গে তুলনা করে এ উপমার সৃষ্টি। তবে উপচয়ের ক্ষেত্রটিও অর্থাৎ সংযোগের ক্ষেত্রটিও এর গৌণ কর্ম।

### পরিচিতি

বিরাত গাছ, ৭০।৮০ ফুট উঁচু হয়, পাতাগুলি আকারে অনেকটা জামরুলের ছোট পাতার মত, তবে ওর মত চকচকে নয়, ফাল্গুন চৈত্র পাতা পড়ে গিয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই নতুন পাতা হয়। এর পল্লবের উপরিভাগে যে ফুলের শিশ হয়, সেটা ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা—এইটি পুষ্পদণ্ড; তার চারিদিকে নাকচাষির মত ফল হয়, তারপর ফল আসে, অগ্রহায়ণ পৌষে পরিপুষ্ট হয়ে আপনা-আপনি পড়ে যায়; এইটাই তার সংগ্রহকাল। এই গাছের প্রাচুর্য আছে দাক্ষিণাত্য, বিহার, ওড়িশা, মধ্যভারত প্রভৃতি একটু পাহাড়িয়া অঞ্চলে। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র ফল। গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Terminalia chebula Retz.*, ফার্মাসি *Combretaceae* এর আর একটি প্রজাতির উল্লেখ দেখা যায়, সেটা পাওয়া যায় আসাম ও বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে, তার নাম *Terminalia citrina Roxb.* এ সম্পর্কে আর একটি কথা জানার আছে; আর এক রকম হরীতকীর প্রচলন আছে যেটি আকারে ছোট ও রং-এ কালো, যাকে বলা হয় জাঙ্গী হরীতকী। আসলে সেটা এই হরীতকী’ক কাঁচ অবস্থায় সংগ্রহ করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। জাঙ্গী শব্দটিও বহিরাগত; এর অর্থ নিগ্রো অর্থাৎ যেমন কালো, তেমন শক্ত।

### হরীতকীর বিশেষ প্রয়োগ

প্রদেশান্তরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভেদ আমরা একই কালের শীত-গ্রীষ্মাদির হ্রাস-বৃদ্ধি সর্বদা অনুভব করি। এই ভারত ভূখণ্ডে ঋতুকাল গণনার দ্ব-রকমের রীতি প্রচলিত—(১)—অয়নকে কেন্দ্র করে আর (২) অম্ববাচীকে সাযনে রেখ; অর্থাৎ আগ্নেয় ও আপ্য বা সৌম্য ধারায়। এই অম্ববাচী শব্দটি এসেছে ‘অম্ববাক’ থেকে (এটি আপ্য), অর্থাৎ ধরণীতল প্রাকৃতিক নিয়মে জলমণ্ডলীর প্রারম্ভিক কাল; আর জল বর্ধনেও সূচনায় কাল। এই হ’লো বিসর্গকালের আরম্ভ, আর আদান কালেরও শেষ, এই আদান অর্থে গ্রহণ। এতদিন সূর্য কেবল গ্রহণই করছিলেন। এবার বিসর্গ বা বিসর্জন সূর্য করেন। আদানকালে ৩টি ও বিসর্গকালে ৩টি—এই ৬টি ঋতুর

ভোগকাল। তাহলেও বিগত ও আগত ঋতুর প্রভাব উভয়কালে সর্বদাই থাকে। একে বলা হয় ঋতু-সন্ধি। আম্রবেদীয় চিকিৎসার চিন্তাধারায় সেই অম্রবাচী থেকে আরম্ভ করে ২ মাস হরীতকী চূর্ণ সৈন্ধবলবণ মিশিয়ে খেতে হয়। তারপরের ২ মাস চিনির সঙ্গে, এইভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতি ২ মাস অন্তর শর্ট, পিপ্পল ও মধু অথবা ইক্ষুগুড়ের সেবনের কথা বলা আছে। এইবার প্রশ্ন আসছে—তার মাত্রা কতটুকু? তার উত্তরে বলা যায়—অগ্নিবলান্দুসারে ২ গ্রাম থেকে ৪ গ্রাম পর্যন্ত বৈদ্যক-সম্প্রদায় ব্যবহার করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই নিয়মে ৬টি ঋতুতে ব্যবহার করলে বল, বীৰ্য, স্মৃতি ও কান্তি বৃদ্ধি হয়; তবে একটা কথা বলে রাখি—১৬ বৎসর বয়সের নিম্নে ঋতু-হরীতকী ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তবে এটাও ঠিক—মুখে চুমক দিয়েই বল পাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে চলবে না; নিয়ম করেই ৬টি ঋতুতেই খেতে হবে এবং এটি ১ বৎসর কেন—বরাবরই খাওয়াই বিধি। তবে অথর্ববেদে সর্বদাই হরীতকীর উপরের খোসা ও বীজটা বাদ দিয়ে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

### বিভিন্ন রোগ প্রতিকারে

(১) অশ্বরোগে:— হরীতকীর চূর্ণ ৩-৫ গ্রাম (কোষ্ঠকাঠিন্যের অবস্থাভেদে) মাত্রায় ঘোলের সঙ্গে একটু সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে খেলে উপশম হয়ে থাকে।

(২) মৃদু-বিরেচক হিসেবে একটু সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে এটি সর্বদাই ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে ঘিয়ে ভাজা হরীতকী চূর্ণ করে বৈদ্যরা ব্যবহার করেন।

(৩) জাঙ্গী হরীতকী ঘিয়ে ভেজে গুঁড়ো করে মৃদু বিরেচক হিসাবে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মাত্রা দেড় গ্রাম থেকে ৩ গ্রাম।

(৪) শোথে:— হরীতকীর চূর্ণ গুল্মশ্চের রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে যে কোন প্রকার শোথে উপকার পাওয়া যায়।

(৫) রক্তাশে:— ইক্ষুগুড়ের সঙ্গে হরীতকী চূর্ণ মিশিয়ে খেলে অল্প দিনেই ফল পাওয়া যায়।

(৬) পিত্তশূলে:— অল্প গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে এই চূর্ণ খেতে হয়।

(৭) চর্মরোগে:— রক্ত বা পিত্ত বিকৃত হয়ে এই রোগ হলে ১ চা-চামচ নিসিন্দা পাতার রসের সঙ্গে এই চূর্ণ (আম্রাদ্র ৩ গ্রাম) খেলে বিকৃতি নষ্ট হয়।

(৮) পিত্ত-পাথরিতে:— হরীতকী ও গোক্ষুর চূর্ণ একসঙ্গে কুলখ কলাই ভিজানো জল দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা বহুদিন থেকে চলে আসছে; তবে এটাও ঠিক দীর্ঘদিনের হলে দুরীভূত করা সম্ভব হয় না।

(৯) স্তব্রভগ্নে:— মুখা (Cyperus rotundus) ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সঙ্গে চটে খেলে স্তব্র স্বাভাবিক হয়। অথবা ঘোয়ানের সঙ্গে খেলে একই কাজ হয়।

(১০) আণ্ডুল-হাড়ায়:— হরীতকী লোহার পাত্রে জলসহ ঘষে অল্প গরম করে বারে বারে প্রলেপ দিলে ২।৩ দিনেই উপশম হয়। শর্দূ তাই নয়, এটাতে হাজাও সারে।

(১১) হাঁপানিতে:— এর মোটা গুঁড়ো সিগারেটের পাইপে ভরে কিংবা বিড়ির মত পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে টানলে উপশম হয়।

(১২) দেহের কোন স্থানে পুড়ে বা ছুড়ে গেলে হরীতকী শিলে ঘষে রেড়ির তৈলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে তাড়াতাড়ি আরোগ্য হয়।

(১৩) হরীতকীর একটি টুকরো জলে ভিজিয়ে সেই জলে চোখ ধুলে চোখউঠা ইত্যাদি সাধারণ চোখের রোগে উপকার হয়।

(১৪) ক্ষতে:— যে কোন প্রকার ঘায়ে হরীতকীপোড়ার ছাই মাখন মিশিয়ে লাগালে ঘা সেরে যায়।

নিষেধ:— গর্ভিণী, দুর্বল, ক্রান্ত ও রক্ষ প্রকৃতির লোকের হরীতকী ব্যবহার উচিত নয়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tannins. (b) Polyphenolic compounds viz. chebulinic acid chebulagic acid, gallic acid, corilagin, number of unidentified phenolic constituents. (c) Anthraquinone dye stuff.



## শাজী

যে ফল এককালে ব্রহ্মাৰ্ষি ও ব্রহ্মাবর্ত দেশের শ্রেষ্ঠফল, সে দেশ এখন ভারতের নাগালের বাইরে, তবুও অবশিষ্ট ভারতের যে অংশের মধ্যে আমাদের পূর্বসূরীদের পবিত্র পদ-চারণা ঘটেছিল, তার মধ্যে আষাবর্তেরই (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ) শ্রেষ্ঠ ফল বলে আজও চিহ্নিত এবং যে ফলটি তেমনি সমগ্ৰণের অধিকারী কিন্তু কালপ্রভাবে আমাদের কাছে তার মূল্য পূর্বের মত আছে কি?

শীতাগমে তার মন ভোলানো রূপে গাছ আলো করে, সর্বাঙ্গে হরিৎবরা শীর্ণ পল্লবের ওড়নাপরা থাকে আজও। সে বৃক্ষের অটল রূপের মাঝে যে ফলগুলি শোভা পায় তাদের রূপ, রস, গুণ যে অসামান্য তা সে বৈদিক সংস্কৃতিতে সর্বোচ্চস্থান

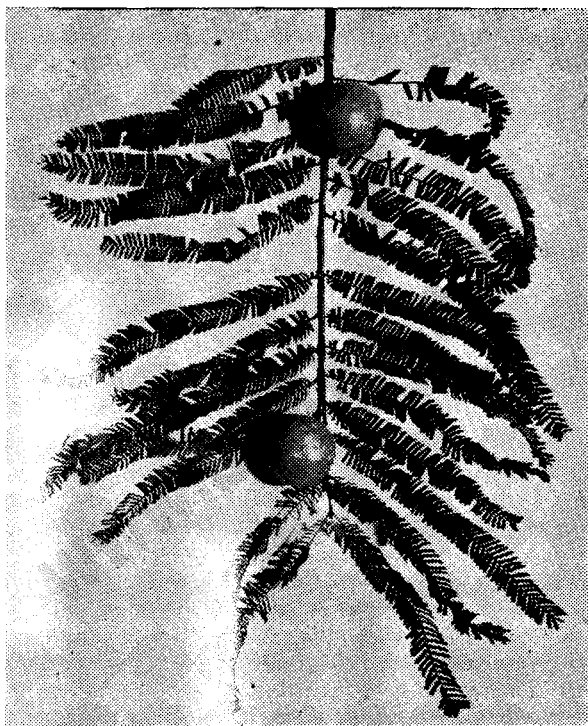
পেয়েছিল, এবং তার নাম দেওয়া হ'য়েছিল “তিষাফলা”; তিষা অর্থ দীপ্তিকারক।  
লোকসংস্কৃতিতে নাম তার আমলক বা আমলকী।

বৈদিক সমীক্ষা—

যক্ষং আজহানঃ ইন্দ্রায় তিষাং

যবৈঃ লাজৈঃ সোমং ঘৃতং বান্ধাজস্য হোতষজ!

(যজুর্বেদ ১১।৩১।৪ সূক্ত)



বেদভাষ্যকার মহর্ষিধর লিখেছেন—

যক্ষং=যজতু। কিং কবন ঋত্বিগ্ভিঃ আজহানঃ=ইডাদীন  
আহবায়ান্। ইন্দ্রায় বলেন বর্ধয়ন্ যবৈঃ লাজৈঃ তিষাং=ধাত্রীফলং  
সোমং ঘৃত চ যোজয়ন্ ওদনং কৃত্বা বীৰ্য্যকরং পিবন্ত হে হোতাঃ  
স্বং চ যজ।

এই বেদভাষ্যটির অর্থ হ'লো—ওহে ঋষিকবন্দ, জনগণের সঙ্গে ইন্দ্রকে বলের দ্বারা বর্ধিত কর। যব, লাজ সহ এই তিষ্যফল গ্রহণ কর। এতে সোম এবং ঘৃত মিশ্রিত ক'রে উৎকৃষ্ট ওদন প্রস্তুত কর। সকলের বল-বীৰ্য বর্ধিত হবে।

তখন বৈদিক সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট আমলক ওদন অর্থাৎ যব, লাজ (খই), তিষ্যফল, ঘৃত ও সোম এই সকল দ্রব্য মিশিয়ে “ওদন” প্রস্তুত করা হ'তো। ভাষ্যকারের মতে তাই তিষ্যফলই আমলকী। সেই তিষ্যফল বা আমলকী শব্দ এই ভারতেই বা কেন, বিশ্বের অন্যত্রও তার গুণগণিতা নিশ্চয়ই নানাভাবে পরীক্ষিত হ'য়েছে, তা তার প্রাতিটি গুণের জন্যই বা হবে।

**নামাবলী—** তাদের মধ্যে প্রাচীন অভিধানগুলিতে যেমন একই ভেষজের বহু নাম দেখা যায়, এই আমলকীর ক্ষেত্রেও কায়স্থা, বয়স্থা, বহুফলা, গ্রীফলী, ধাত্রী, শিবা, শালতা, অমৃতফলা, ব্যায়া, বৃন্তফলা, রোচনী প্রভৃতি আরও অনেক। এগুলি যেন সেকালের থেরাপিউটিক ইনডেক্স (Therapeutic index)

**নামের তাৎপর্য—** (১) আ অর্থাৎ সম্যাকরূপেণ মলতে (মল অপসৃত হয়) এই অর্থেই আমলকী নাম। এই নামটির দ্বারা তার স্বরূপ প্রকাশ করা হ'য়েছে।

(২) **ধাত্রীফল—** যে রস সেবনে পুষ্ট হয়, সেই-ই ধাত্রী। স্বিতীয়তঃ—এই ফলের রস স্তন্য বৃদ্ধি করে; তাই বা তার এই নামটি। হয়তো বা ইতিগতও বহন করে; কারণ মাতৃস্তনেই তো ধাত্রী নামের সার্থকতা।

(৩) **বয়স্থা—** এর রস অকালবার্ধক্য আনতে দেয় না; তাই তার নাম বয়স্থা।

(৪) **রোচনী—** নিজের স্বাদ রুচিকর না হ'লেও অন্যের স্বাদে রুচি বাড়ায় আর অরুচিও নষ্ট করে।

(৫) **ব্যায়া—** ব্যাগুণ সম্পন্ন (Rejuvenative) বলেই তার নাম ব্যায়া—বৃষ্+য্যা অর্থাৎ বৃষ্ বা শব্দের হিতকর, তাই ব্যায়া। এমনি প্রাতিটি নামকরণের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। অবশ্য আরও অনেক নামের অর্থ আমাদের কাছে সুখবোধ নয়। যেহেতু গুরু পরম্পরায় তদ্বিদ্যাসম্ভাষ্যর দ্বারা আজ বিলুপ্ত।

### ভৈষজ্যবিধানে ব্যবহারিক আচারধর্মের প্রবেশ—

বৈদিকসূক্তে পাচ্ছি যে—বৈদিক আর্ষগণ আমলকী সহ ওদন প্রস্তুত (পিণ্ডের মত) ক'রতেন, এবং যজমান সহ সকলে তা গ্রহণ ক'রে দিব্য কাল্টিমান দেহের অধিকারী হতেন। চরক সূত্রতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুশীলনের পরেই আমলকীকেই লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছিলো এর সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের জন্য, তা ছাড়া এর দোষ-গুণ বিচারের উল্লেখও আছে; কিন্তু এই একটি মাত্র ফল—যেটি কেবল গুণেরই আকর।

আমলকীর অন্তর্নিহিত গুণ হ'চ্ছে—সে বায়ু পিত্ত বা কফের যে কোনটির বিকৃতিকে স্বাভাবিক করে দেয়; এবং শরীর রক্ষার জন্য প্রথম এবং প্রধান উপাদানের প্রয়োজন হয় শুদ্ধ রসের, তা ছাড়া দেহে ক্ষয় পূরণের প্রয়োজনে যে পার্থিব সত্তার প্রয়োজন হয় সেটা এই ফলে সৃষ্টি হয়, যেটা কিনা শোণিত সৃষ্টির মূল উৎস।

**পরিচিতি—** আমলকী বৃক্ষ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অস্পষ্টরূপে দেখা যায়, তবে উত্তরপ্রদেশে অনেকে রোপণ করে থাকেন, এই প্রদেশেই সাধারণতঃ এর ফল বড় হয়। এ ভিন্ন মধ্যভারতের জঙ্গলে ও হিমালয়ের পাদভূমিতে আরণ্যক বৃক্ষ রূপেও প্রচুর দেখা যায়। এই গাছের পাতার আকার সরু তেঁতুলপাতার মত। বন্য আমলকীর ফল আকারে ছোট হ'লেও বহু ফল অপেক্ষা গুণবৃত্তায় তারতম্য হয় না। এই গাছটির



বোটানিক্যাল নাম *Embllica officinalis Gaertn.* ফ্যামিলি *Euphorbiaceae*.  
এই ফল ঔষধার্থে ব্যবহারোপযোগী হয় নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে।

### নব্য বৈজ্ঞানিকদের সমীক্ষায়

আমলকী ফলের মধ্যে আছে প্রোটিন বা চর্বিজাতীয় পদার্থ ও মিনারেল, তবে সেটা খুবই ভগ্নাংশে। অবশ্য কার্বোহাইড্রেটও আছে কিন্তু এটি বিশেষভাবে ভিটামিন সি, নিকোটিনিক এসিড ও পেকটিন সমৃদ্ধ। তাঁরাই মন্তব্য করেছেন যে, কমলা-লেবুর রসে যেটুকু খাদ্যপ্রাপ বা ভিটামিন আছে, তার বিশগুণ বেশী আছে আমলকীতে।

বৈদিক সংস্কৃতির ক্রমান্তর যুগেও আমলকী, যব, লাজ ও ঘৃতাদি যোগে ওদন প্রস্তুত করা হ'তো; পরবর্তী যুগে তারই যে পরিবর্তিত সংস্করণ “চাবনপ্রাশ” নামে আয়ুর্বেদের প্রখ্যাত ঔষধ এটা বেশ বৃদ্ধিতে পারা যায়। তবে কিছুদিন থেকে আমলকী ভিন্ন চাবনপ্রাশে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে আরও অন্যান্য বিশিষ্টগুণসম্পন্ন ভেষজ। তবে কালান্তরে প্রায় সেগুণি দুষ্প্রাপ্য ও সন্ধিস্থ; তাই আরও পরবর্তীকালে এসে পশ্চিমা-গণ প্রায় সমগুণ সম্পন্ন অন্য আরও কয়েকটি প্রতিনিধি ভেষজ দ্রব্য গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন চাবনপ্রাশের সঙ্গে। তাতেও যেটুকু উপকার পাওয়ার কথা তাও আজকাল কৃত্রিমতার ধাক্কায় অনুকম্পেরও নকল হ'য়ে পড়েছে, অর্থাৎ নকলেরও নকল হ'য়ে পড়েছে। এখনও দেখতে পাই গ্রন্থোক্ত যথাযথ প্রতিনিধি ভেষজগুলির সমন্বয়ে প্রস্তুত চাবনপ্রাশে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় উপকার উপলব্ধি করতে পারা যায়; কিন্তু এ সবার আসল নকল পরিচিতির ক্ষেত্রেই আজ বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

বৈদিক সংস্কৃতির যুগ থেকে সংহিতার যুগ পর্যন্ত ভারতে ভৈষজ্যবিদ্যার যেসব অনুশীলন হ'য়েছে, তার চরম নিরীক্ষায় তাঁরা জেনেছেন জগ্গম, উন্মিহদ আর পার্শ্ব দ্রব্যেই প্রাণিদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের কারণগুলি যেমন নিহিত রয়েছে—তেমনি রয়েছে তাঁদের মধ্যে ব্যাধি বিনাশন শক্তিও। সেই শক্তি আহরণ করতে হবে ঐ সব উপাদান থেকে। এই আমলকী ভিন্ন আরও যে কয়টি প্রধান ঔষিহদ দ্রব্য আছে তাদের মধ্যে আর একটি হ'লো “হরীতকী”। এই দুটি ফলকে রোগের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে স্বল্পবয়সে বহু রোগোপশম ও নিরাময় করা যায়। সেইজন্য বলা যায় জ্বরহারিত্ব থেকে যে কোন রোগহারিত্বের দক্ষতা হরীতকীর যেমন আমলকীরও তেমনি; কিন্তু একটি গুণের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য জেনে রাখতে হবে। হরীতকীতে লবণ রস ভিন্ন বাকী অন্য ঐটি রস (মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত ও কষায়) বর্তমান। কিন্তু আমলকী একটিমাত্র ফল, যেটি মূখ্য রসে অম্ল হ'য়েও আরও পাঁচটি রসকে (মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) ধারণ করে; সেই হেতু সে অম্লজনিত রোগেরও বিনাশ সাধন করে। তাই তার নাম দেওয়া হ'য়েছে “অমৃতফল”।

চরক শাস্ত্রাদি প্রাচীন গ্রন্থে আমলকীকে একক অথবা মূখ্য উপাদান ক'রে অন্যান্য দ্রব্যের সমন্বয়ে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উল্লেখ দেখা যায়, যেমন কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগের উল্লেখ করা হ'ছে।

(১) অম্লরোগ (Acidity) একে আয়ুর্বেদের ভাষায় বলা হয় অম্লপিপ্ত রোগ। এ রোগে সহযোগিতাপে আশ্বপ্রকাশ করে পিত্তবিকৃতি। সে ক্ষেত্রে শূদ্রক আমলকী ৩।৪ গ্রাম এক গ্লাস গরম জলে পূর্বদিন রাতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন ভাত খাওয়ার সময় সাধারণ জলের পরিবর্তে এই জল খেতে হয়। তবে এই আমলকী কোন ধাতুপাতে

ভিজানো উচিত নয়। এর দ্বারা সেই পিত্তবিকৃতি নষ্ট হয়; এটি বহু পরীক্ষিত।

(২) যাঁরা প্রস্রাব সংক্রান্ত কোন রোগে আক্রান্ত (এমন কি ডায়াবেটিস diabetes পর্যন্ত) তাঁরা ৩।৪ গ্রাম আমলকী কোন না কোন আকারে সেবন করবেন। কাঁচা রস করেই হোক আর মৃদুশুদ্ধি হিসেবেই হোক।

(৩) **বিসপঞ্জর**— কোন প্রকার Sepsis- এর জ্বর; কিছতেই ছাড়ছে না—সে ক্ষেত্রে আমলকীর রসে অল্প ঘি মিশিয়ে খেতে বলা হয়েছে চরক সংহিতায়।

(৪) **হিক্কা**— আমলকীর রস আন্দাজ ১ চামচ অথবা শুষ্ক আমলকী ভিজানো জলে ১০।২০ ফোঁটা মধু ও ২।১ গ্রেণ পিপড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ার কথাও চরকীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে লিখিত হয়েছে।

(৫) **বমন (বমি)**— বন্ধ হচ্ছে না—সে ক্ষেত্রে শুষ্ক আমলকী (৩।৪ গ্রাম) ১ কাপ জলে ভিজিয়ে রেখে ঘণ্টা দুই বাদে ছেকে নিয়ে সেই জলে শ্বেতচন্দন ঘষা (আধ চামচ আন্দাজ) ও একটু চিনি মিশিয়ে অল্প অল্প করে খেতে দিতে হয়।

(৬) **শ্বেতপ্রদরে (Leucorrhoea)** যে রোগটি আজকাল মাতৃজাতির মধ্যে কৈশোরারম্ভ থেকেই প্রায় ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে, এ রোগে একটা (বীজ সমত) অথবা ছোট হ'লে দুটো কাঁচা আমলকী রস করে একটু চিনি বা মধু মিশিয়ে খেতে হবে। অভাবে আমলকী চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম আন্দাজ মধু দিয়ে খেলেও কাজ হবে না তা নয়।

(৭) **পিত্তশূলে (Biliary Colic)** আমলকীর রসে (১।২ চামচ) অল্প চিনি মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

(৮) **শীতপিত্ত**— যাকে আমরা চলতি কথায় আম্বাত বলি (যদিও প্রকৃত আম্বাত পৃথক রোগ), এ ক্ষেত্রে আমলকীর সিকি ভাগ নিমপাতা মিশিয়ে (দুটোই গুঁড়ো) ১২ গ্রেণ (এক গ্রামের একটু কম) মাত্রায় প্রাতে খালিপেটে খেতে হয়। কিছদিন ব্যবহার করলে এ রোগ প্রশমিত হবেই।

(৯) **দৃষ্টি ক্ষীণতায়**— অল্প বয়সে যাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে, যার জন্য কিছদিন অন্তর চশমার শক্তি বাড়তে হচ্ছে; এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিয়মিত বেশকিছদিন এই আমলকীর রস ২।৩ চামচ এক চামচ মধু মিশিয়ে সকালের দিকে খেয়ে দেখুন। তবে পুরাতন অজীর্ণদোষে প্রথম প্রথম কোন কোন ক্ষেত্রে অম্বল বা গলা ও বৃক-জ্বালা দেখা দেয়—সে সব ক্ষেত্রে প্রথমে মাত্রা কম করে খেয়ে অভ্যাস করতে হয়।

(১০) **অনিদ্রায়**— কাঁচা বা শুষ্ক আমলকী কাঁচা দুধে বেটে একটু মাখন মিশিয়ে মাথায় লাগালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। এর সঙ্গে অনেকে শতমূলীর রস মিশিয়ে ব্যবহার করেন।

(১১) **আমলকী ও থুলকুড়ি** (প্রচলিত নাম থানকুনি, Centella asiatica) এক সঙ্গে বেটে চন্দনের মত পেটে লাগালে আমজনিত কামড়ানি কমে যায়।

(১২) **তলাপেটে বায়ু** হ'লে আমলকী বেটে (চন্দনের মত) নাভির নীচে প্রলেপ দিলে সুন্দর কাজ হয়। এবং বায়ুর প্রশমন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে সব ক্ষেত্রে প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

(১৩) **চোখ উঠলে**— ছোট ২ টুকরো আমলকী গরম জলে ধুয়ে নিয়ে ৪।৫ চামচ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে ছেকে নিয়ে ৩।৪ ফোঁটা চোখে দিতে হবে। এইভাবে ২।৩ দিন চোখে দিলে চোখ ওঠা সেরে যাবে।

## CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vitamin viz. ascorbic acid. (b) Aminoacid viz. glycine. (c) Tannin. (d) Polyphenolic compounds viz. corilagin, ellagic acid, terchebin, gallic acid, chebulic acid, chebulagic acid, chebulinic acid. (e) Fixed oil. (f) Lipids viz. phosphatides. (g) Essential oil.



## উদ্ভাস

শুধু প্রাক-আর্যজাতির জীবন-ইতিহাসের ক্ষেত্রেই বা বৃক্ষপুঞ্জের অনুষ্ঠানকে ঐকান্তিক করি কেন? আর্যোত্তর অথবা আর্যপুরুষদের জীবনেই কি বৃক্ষপুঞ্জাদি সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি? হ'লেই তো যজ্ঞভূমির এককালের কম্পতরু বৃক্ষ বলে গণ্য। তাই বৈদিক সংস্কৃতিবান ভারতবাসীর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম সংস্কার “স্মৃতিকা হোমে” (স্মৃতিকা গৃহে হোমের ব্যবস্থা) প্রয়োজনীয় উপাদান যজ্ঞভূমির পল্লব। অবশ্য পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যেন এই ব্যবস্থা, কিন্তু আসলে স্মৃতিকা গৃহের মধ্যে দূষিত আবহাওয়া বিতাড়ন। সেই হোমের প্রধান আহুতির উপাদান সমিধ (যজ্ঞভূমির শাখার অগ্রভাগ); তারপর সেই যজ্ঞভূমির আরও প্রয়োজন থাকে—অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদির হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য। আবার মরণোত্তরকালে পারলৌকিক শ্রাদ্ধকৃত্যের এবং বৃষোৎসর্গের হোমাহুতিতে এই মহাবৃক্ষ-টির সর্বগুণ অপরিহার্য উপচাররূপে গণ্য হয়। অপরপক্ষে এর ভৈষজ্যগুণ আমাদের বহু-রোগকে প্রতিরোধ ও নিরাময় করে।

এইভাবে ভূম্বরের যে উপযোগিতা সৃষ্টি, তা কেন? এর উত্তর পাওয়া যায়—জাতির ঐতিহ্যের ধারাসূত্র বেদে অনুসন্ধান করলে। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব—এই তিনটি বেদেই এই উদ্ভবের বৃক্ষটির নাম উল্লেখিত হয়েছে ‘উম্বর’—একথা বলেছেন বেদের প্রাচীন ভাষ্যকার সায়ণাচার্য।—

বৈদিক তথ্য—ঋক্ ১৭।২।৪২

‘উম্বর স্বমসিপাপ্মানং বলাসং শতস্য পাকারোরসি পৃশ্নিনশ্মমা  
বিচক্রমে।’

এই সূক্তটির সায়ণ ভাষ্য করলেন—

‘ত্বং উম্বরঃ, বর্ণাগমাং উদ্ভবঃ। বিদারণপূরকঃ। পাপমানং রোগং  
অন্তঃক্ষতং তথা শতস্য পাকক্ষতস্য পাকারোরসিঃ, শোণিত পাকঃ।  
উপশামক ইতি, স্ব অশ্মা বিচক্রমে, পৃশ্নিন ঝসি। অর্শসাং বলাসং  
চ বল্যাদিকং পৃশ্নিনঃ=ছেস্তাসি।’

অনুবাদঃ— তুমি উম্বর। বর্ণাগমের এই আখ্যা অর্থাৎ বিদারণ করার সামর্থ্য  
আছে তোমার, তারই বর্ণ বিপর্যয়ে তোমার এইরূপ, অর্থাৎ উম্বর থেকে উদ্ভব।  
উদ্ভবের অর্থই হোলো বিদারণ শক্তি সম্পর্কে যার কৃতিত্ব। এই উদ্ভবের পাপরোগ  
অর্শাদির নাশক। শোধক, অন্তঃক্ষত এবং পাকক্ষতের শোধক। এসব পাপজ রোগের  
তুমি ছেদনকর্তা।

আজও মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে এটি উম্বর বলে পরিচিত।  
ঋক্বেদে বলা হয়েছে উম্বর হ’লো রক্তদূষ্টির অপহারক এবং ক্রিমির অপসারণকারক।  
শুক্র যজুর্বেদে বলা হয়েছে—এই বৃক্ষের ত্বক্ ক্রিমিনাশক আর অথর্ববেদে এই বৃক্ষটির  
ভেষজ পরিচয়ই বেশী লেখা আছে। এটি ত্বক্‌রোগ, অন্তঃক্ষত (সাইনাস), শোথ,  
রক্তদূষ্টি ও ক্ষতবিকার নাশক, অধিকন্তু এর দ্বারা কুষ্ঠ ও অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তির  
দেহের শোধন ও তার প্রতিকার সাধিত হয়, একথা বলা আছে।

আজকের বস্তুনিষ্ঠ যুগে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মানুষের কাছে বোধ হয়  
অবিশ্বাস্য যে, কোন অশরীরী শক্তির জীব এবং অতি সূক্ষ্ম শরীরী প্রাণী আছে,  
এবং তারাও যে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এটা আজ সূক্ষ্মতম শক্তির দূর-  
বীণের দ্বারা তা লক্ষিত হচ্ছে; কিন্তু এরূপ শক্তিসম্পন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব সেই স্মরণা-  
তীত কালের বৈদিক ঋষিগণ কত আগেই তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তা ছাড়া তন্ত্রাভিধানের  
আভিচারিক ক্রিয়াতে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাদের দ্বারা রোগবিস্তার শক্তির  
দূরীকরণের জন্যই তাঁদের এই সব প্রক্রিয়া। সেই বিজ্ঞান কি আমাদের প্রাচীনতম  
দৃষ্টিকেই সমর্থন করে না?

আরও একটি আশ্চর্য তথ্য এখানে লিপিবদ্ধ করা হ’য়েছে যে, পিপ্পল (অম্বথ),  
বট, শিখণ্ডী, ময়ূর, উদ্ভবের প্রভৃতি বৃক্ষ ও পাখী যেখানে সেখানে ওদের স্পর্শলাগা  
বহমান বায়ুদ্বারা দূষিত রোগের সংক্রামণ দূর হয়।

বৈদিকযুগের ভেষজগুলি কালান্তরে মাততান্ত্রিক ও পৌরাণিক মূর্তিপূজার  
উপচার হিসেবেও গৃহীত হ’য়ে সেকালের মনীষীদের দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন ক’রে  
আসছে মনে করি। যাতে জনপদে এই জীবকল্যাণকর গাছগুলির অবলম্বিত না ঘটে,

তারই পরিপ্রেক্ষিতে পশুপল্লবরূপে বট, অম্বথ, পাকুড়, যজ্ঞভূমুর ও আম—এই গাছগুলির শাখা মাতৃতান্ত্রিকদের দেবীর পূজার্নায় অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে।

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় উদ্ভিদ সম্পর্কে—যাকে বাংলায় যজ্ঞভূমুর বলা হয়, একে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে গুলর বলে, ওড়িয়া রাজ্যের চলিত নাম যজ্ঞভূমুরী; পাশ্চাত্য মতে এটি Moraceae ফ্যামিলীভুক্ত, ল্যাটিন নাম *Ficus racemosa* Linn. ফ্যামিলী Moraceae; এর পাতাগুলি ককশ (খসখসে) ও আকারে যজ্ঞভূমুরের পাতার থেকে বড়। অতি সাধারণ গাছ। আমরা কথায় কথায় উপমা দিই 'ভূমুরের ফুল', কিন্তু



দেখা না গেলেও ফুল তার হয়, ফলটি কাটলেই দেখা যায়—তার ভেতরে বহু ফল; ভূমুরটি হচ্ছে পুষ্পধি, এইজন্য একে অন্তঃপুষ্পও বলা হয়। এই ভূমুর পাকলে লাল হয়, খেতে অল্প মিষ্ট রসাম্বাদ। এটায় খুব পোকা হয়, তাই তাকে বলা হয় জন্তুফল। বট, অম্বথ, পাকুড় সকলেই এক জাতীয়। আয়ুর্বেদের অন্য একটি পরিভাষায় এগুলিকে ক্ষীরবৃক্ষ বলা হয়, অর্থাৎ এসব গাছে ঘন দুধের মত আঠা (নির্বাস) আছে। বর্তমানে এদেশে আরও কয়েকটি জাতের ভূমুর দেখতে পাওয়া যায়—যেমন, কাকভূমুর (*Ficus hispida* Linn.f.)—এগুলিকে আমরা তরকারি হিসেবে খেয়ে থাকি, বলাভূমুর

(*Ficus heterophylla* Linn.f.), জয়াডুম্বর (*Ficus cunia* Ham.ex Roxb.), কালিফোর্ণিয়ার ডুম্বর (*Ficus carica* Linn.), আরবে এটি আজির নামে পরিচিত। এর মধ্যে আমাদের ভৈষজ্য নিষফ্টুতে তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়—উদুম্বর, কাকো-দুম্বর ও নদীউদুম্বর। একে অন্তঃপুষ্প বানস্পত্য সংজ্ঞায় বৃক্ষ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ ছেদন করলেও এটিতে আবার শাক্ষা-প্রশাখার উদ্গম হয়।

**উপযোগিতাঃ**— বেদের যুগে রোগগুলির শব্দনাম দেখে বর্তমান যুগে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার সদর্থ না জানলে তার প্রয়োগ করার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন, যেমন লেখা আছে ‘অন্তঃক্ষত নাশক’, সেই অন্তঃক্ষতের সংজ্ঞার্থ উপলব্ধি করে তার ক্ষেত্রটি বিচার করে ওষধি প্রয়োগ করা খুবই সমস্যা, তবে তৎকালীন গবেষণালব্ধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যে ধারাগুলি লিপিবদ্ধ করা আছে বিভিন্ন সংহিতায়, সেইসব সূত্র থেকেই আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানও পরম্পরাক্রমেই চলে আসছে ধরে নিই, তারই অংশ-বিশেষ এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে।

এই গাছটির ফল, মূল, পাতা, গাছের ও মূলের ছাল (বৃক) ও ক্ষীর (দুধের মত আঠা বা নির্যাস)—সব অংশই ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**ক্ষীর (দুধের মত নির্যাস বা আঠা)ঃ**— শরীরের কোন জায়গায় গ্রন্থিস্থফীতিতে (Gland inflammation) লাগিয়ে দিলে প্রদাহ ও ব্যথা কমে যায় এবং বসেও যায়, গ্রামাণ্ডলে এটা লাগিয়ে তার উপর লবণ ছড়িয়ে দিতে দেখেছি এবং অশ্রুরোগে ও অতিসারে খাওয়ার জন্য একে ব্যবহার করা হয়, এটা লেখা আছে ওয়াট সাহেবের সংগ্রহ গ্রন্থে।

**পল্লবঃ**— এই অংশটি পল্লবী বাসির ও চিকিৎসকগণের বিশেষভাবে কাজে আসবে, এ থেকে ঘনসারও Semi-solid extract তৈরী করে রাখা যায়।

**ঘনসার প্রস্তুতিবিধিঃ**— ৫।৭ ইঞ্চি সরু ডাল সমেত কাঁচা পাতা ছেঁচে নিয়ে সিদ্ধ করে সেই জল ছেঁকে নিয়ে নরম জ্বালে আবার পাক করতে করতে ঘন হয়ে চিটে গুলেড়ের থেকেও একটু মোটা বা ঘন করে (লেই বা কাই) রাখুন। এটা করে রাখলে মাত্রা মত ব্যবহার করার সুবিধে হবে। এতে অল্প মাত্রায় সোহাগা থৈ মেশালে নষ্ট হয় না।

### ব্যবহারিক ক্ষেত্রে

১। কোন জায়গায় কেটে রক্তপাত হ’তে থাকলে—ঐ ঘনসার লাগালে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যথা হবে না এবং ওটাতেই সেরে যাবে।

২। বিড়াল, ইঁদুর, বোলতা, ভীমরুল বা কোন জানা-অজানা বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ে অথবা কুকুরের আঁচড়ে (আঁচড়ে দিয়েছে এমন ক্ষেত্রে) ওটা লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হবে এবং বিষাবে না।

৩। দেহের কোন জায়গা খেঁতলে গেলে বা আঘাত লেগে ব্যথা হলে ওটায় ২ গুণ জল মিশিয়ে পেণ্টের মত লাগালে ব্যথা ও ফুলা দুই-ই কমে যাবে।

৪। **ফোড়ায়ঃ**— এই ঘনসার ৪ গুণ জলে গুলে ন্যাকড়া বা তুলোয় লাগিয়ে বাসিয়ে দিলে ওটা ফেটে পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে যাবে। এইভাবে ব্যবহারে কয়েকদিনেই সেরে যাবে।

৫। **মুখের দুর্গন্ধ, দাঁতের গোড়া বা মাড়ী ফোলা ও ব্যথা, গলায় বা মুখের ক্ষতে** এই ঘনসারে আটগুণ জল মিশিয়ে কবল (Gargle) করলে অথবা মুখে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ২।১ দিনেই উপশম হবে এবং এইভাবে ব্যবহারেই সেরে যাবে।

৬। ক্ষেত্র হিসেবে ৮—১২ গুণ জলে গুলে দুস দিলে স্ত্রীরোগজনিত প্রাব নিশ্চিত প্রশমিত হয়।

এবার আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ (Internal application) সম্বন্ধে জানাই—উদ্ভিদ রক্তপিণ্ডে (Haemoptysis), রক্তাশে (Bleeding piles) ও রক্তপ্রাবে ১২ গ্রেণ আন্দাজ মাত্রায় ২ আউন্স বা এক ছটাক জলে মিশিয়ে দিনে ২।৩ বার খেলে বিশেষ উপকার হয়।

এই পাতার গুণ সম্পর্কে অনুসন্ধানসূ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের ২।১টি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি।

পাশ্চাত্য গবেষকগণও পরীক্ষিত ঔষধ হিসাবে বলেছেন যে, ডুমুরের পাতার গুড়ো মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তবিকৃতিজনিত রোগ (Bilious affections) নিরাময় হয়। আর একটি—এই ষষ্ঠডুমুরের পাতার উপর যে অবদ (Gall) হয় (একে আয়র্বেদের ভাষায় বলা হয় শূন্যগর্ভ), সেটা দৃঢ়ে ভিজিয়ে মধুর সঙ্গে বসন্তে (Small pox) ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার হয়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করি—এই পাতার অবদটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন—সায়েন্স কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

বৃক্ষটির অন্যান্য অংশে বহুরোগ উপশম ও নিরাময় হয়। ভারতের প্রান্তে বিভিন্ন রোগ-নিরাময়ে এই পত্রের ব্যবহার হয়তো হচ্ছে, কিন্তু তার ফল কতখানি কাজে লাগে সেটা অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে আদান-প্রদানের অভাবে এবং পুরাতন সংস্কারে গোপন করে রাখার স্বভাব আজও প্রচুর বলেই এ সম্পর্কে বহু তথ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে। কালপ্রভাবে তা ক তুলে নেওয়ার আগ্রহ এখনও কারও আসছে না।

### CHEMICAL COMPOSITION :

- (a) Dichlorobenzoic acid. (b) Dihydropsoralen. (c) Hydroxy-coumarin. (d) Enzyme.



## বাসা (শ্বেত পুষ্প)

অতীত ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক মানে সর্বপ্রকার রোগেই বিশেষবিদ, মধ্যযুগে এসে তাঁরা হ'লেন মাত্র কার্যাচিকিৎসাবিদ, আবার ইংরেজ আমলের মাত্র ৩শত বৎসর পূর্ব থেকে হ'লেন নাড়ীজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ কবিরাজ; সেই সময় থেকেই তাঁদের পূর্ব-গৌরবের গাম্ভীৰ্য্য মালিন্য দেখা দেয়।

ইংরেজ জাতির উত্থানের সঙ্গে তাঁদের জাতীয় চিকিৎসাবিদ্যারও উন্নতি হয়, তাঁরা সাধারণভাবে চিকিৎসাবিদ্যাটিতে প্রতিভার সর্বতোমুখী অভ্যাস ঘটিয়েছেন, তার সঙ্গে এক একটি দিককেও বিশেষ গবেষণার মাধ্যমে প্রভূত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চ'লেছেন, এ'দের এই রীতিটিকে দেখে আমরা আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন ক'রে বুঝেছি যে, আয়ুর্বেদের সংহিতার যুগেও এ রীতির অবশ্য প্রবর্তন হ'য়েছিলো; তখন এইসব রোগের প্রতিকারের জন্য তাঁরা যেসব বৃক্ষলতাদির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার ক'রে-ছিলেন—তাদের অন্যতম বনৌষধি এই ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ বৃষ। এর প্রকৃতি পরিচয়ের আবিষ্কার সেই বৈদিক যুগে; এবং ব্যবহারের নির্দেশও শরীরের উদ্ভেদভাগের রোগে অর্থাৎ যে রোগগুলির আয়ুর্বেদোক্ত নাম উদ্ভেদজহৃৎ রোগ।

এই বনৌষধিটির গুণ উপরিউক্ত তিনটি অঙ্গের রোগের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকলেও তার আর একটি বিশেষ কার্যকারিতা প্রকাশ পায় ফুস্ফুস-সংক্রান্ত (Pulmonary diseases) বিভিন্ন রোগেও।

অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫।১১৩।২৭০ সূক্তে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে—

বিষ্মা তে বৃষ ত্রেধা। বিষ্মা তে ধাম বিভূতা পুরুত্বা। বিষ্মা তে  
নাম গৃহা তমুৎসংযৎ রুক্ম উর্ব্যা শ্রিয়ে রুচানঃ।



এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্যে বলা হ'য়েছে—

বৃষ তে ত্রিধা বিদ্মা বয়ং ত্রিস্থানানি জানীমঃ। বৃষঃ সেচনে  
অটরুশকোহয়ং। অটরুশকঃ=ভ্রমন্তি যে দোষাঃ তান্ হিনস্তি ইতি  
অটরুশকঃ। তে ত্রিস্থানানি উরঃ কণ্ঠঃ শিরঃ এতানি ত্রিস্থানানি  
বিদ্মা বয়ং। তে ধাম বিভূতা বিহৃতানি উরঃ কণ্ঠঃ শিরঃ এতানি  
ত্রিস্থানানি বিদ্মা বয়ং। তে ধাম বিভূতা বিহৃতানি ধামানি বয়ং  
বিদ্মা গৃহামর্মসু গোপ্যং যদস্তি কক্ষ-পিত্তশোণিতং তদপি অজগন্ত্ব  
বৈদ্যকস্মৈ বিদ্মা। উর্ব্যা-শ্রিয়ে সাম্যং বিদধাসি ত্বং রুচানঃ  
ক্ষয়্যাপহশচ।



এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—ওহে বৃষ, তুমি অটরুশক (অর্থাৎ যে দোষগুলি দেহে ভ্রমণ  
করে তাকে যে হিংসা করে, তারই নাম অটরুশক), আর বৃষ মানে সেচন করা। তোমার  
তিনটি স্থান কি কি তাও যেমন জানি, তেমনি তোমার যে তিনটি গোপন গৃহায় নিবাস  
তাও আমরা জানি।

## যুগোত্তরের সমীক্ষা

বৈদিক সূত্র যেন সমুদ্র আর ভাষাগুলি যেন জাহাজের দিকনির্ণয় যন্ত্র; এইটাই সংহিতায়ুগের গবেষকদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

এই বনৌষধিটি সম্পর্কে ভাষাকারের ভাষ্যে মামলার আরজির “ইসদুর” মত পাওয়া গিয়েছে এই সব তথ্যরাজ।

- (১) বৃষ ও অটরুষক নামকরণের রহস্য—
- (২) কোন্ তিনটি মমস্থানে বৃষের আধিপত্য—
- (৩) কোন্ তিনটি ধাতুর অসাম্য নিরসন করায়—
- (৪) এর যোগফলে কি পাওয়া যাবে—

ভাষাকারদের আকার ইঙ্গিতে বলা এইসব কথার দ্বারা চিকিৎসাক্ষেত্রে বস্তুসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করানোর অনুশীলন, এইটাই সংহিতা যুগের বিশেষ দান। এ যেন পেটের কথা টেনে বার করে মামলা সাজানো। যেমন বলা হয়েছে বৃষ=সেচনে=আদ্রীকরণে এটি কিন্তু বনৌষধিটির গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞানাম, আর অটরুষকও তাই। বৃষ বা অটরুষকের দ্রব্যশক্তি শরীরের ৩টি মমস্থানের (উর, বক্ষ, শির ও কণ্ঠ) বিকৃত কক্ষ, পিত্ত ও শোণিতজ দোষের সংশোধনের রাস্তা সে পরিষ্কার করে, যার দ্বারা স্বাভাবিক-ভাবেই শারীর-ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। সংহিতার যুগে সেই সব দোষাভিভূক্ত রোগের ক্ষেত্রে একে প্রয়োগের পর তাঁদের উপলব্ধি জ্ঞানকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে।

## স্থান সম্পর্কে বক্তব্য

শরীরের শ্লেষ্মা (অপ্ ধাতু) তিনটি স্থানে তিনটি পৃথক নামে থেকে জীবনকে ধারণ করে। উর বা বক্ষে থাকে “অবলম্বক” শ্লেষ্মণ ধাতু, এর সন্ধি বা মিলন স্থান আমাশয়। শীতে, দিবসের প্রথমে এবং ভোজনের পরেই, আর বসন্তকালে এ স্থানটি স্বভাবতই কুপিত হয়; তার ফলে সৃষ্টি করে জড়তা, কণ্ডু (চুলকানি) ও মূখে লবণাক্তভাব, এর থেকে রেহাই পেতে এই বৃষের রস খুব প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় স্থানঃ— শিরঃস্থান—এখানকার শ্লেষ্মণ ধাতুর নাম “তপক”। এটি বিকৃত না হ’লে শিরোভাগের সমস্ত কাজই সুষ্ঠুভাবে চলে; এখানের কাজ হ’লো চিন্তা, স্থৈর্য, প্রতিভা এবং সমগ্র দেহের ক্রিয়াশক্তির শৃঙ্খলা রক্ষা করা; আবার বিকৃত হ’লেই বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বৃষের শক্তি আছে তাকে স্বভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসার।

তৃতীয় স্থানঃ— কণ্ঠ—এখানে অবস্থানের সময় অপ্ ধাতুর নাম “বোধক”; এটি রসনার (জিহবার মূল স্থানে থেকে ক্রিয়া করে)। উর্ধ্বজন্মগত সমস্ত স্রোতের এই স্থানটি হ’লো সংযোজক; গলরোগের কারক; শ্বাসরোগের প্রকাশক, কাসরোগের বাহক। বৃষ এই বিকারগ্রস্ত বোধক শ্লেষ্মণ ধাতুকে স্বাভাবিক করে। এইভাবে চিহ্নস্থানগত ব্যাধিতে বৃষ নামক বনৌষধিটির ক্রিয়া সুপ্রশস্ত হয়। তারপর বৃষ বনৌষধির তিনটি স্থানের উল্লেখও বৈদিকসূত্র থেকে নিয়ে মূলে, ত্বক্, (বক্ষ ত্বক্) ও পিত্ত—বৃক্ষের এই তিনটি অঙ্গের গবেষণার ফল চরক, সুশ্রুত সংহিতায় এবং পরবর্তীকালে মনীষী-বৃন্দের রচিত বা সংগৃহীত গ্রন্থে এমন কি সপ্তদশ শতকেও এর ফল নিয়ে গবেষণা হয়েছে।

## কে এই বৃষ?

গঙ্গাতীরে বসবাসকারীর গঙ্গাভক্তি যে পর্যায়ে, আমাদের কাছে এই বৃষ বনৌষধির কদরও সেই পর্যায়ের, কারণ আমরা ভারতবাসী, আমাদের সর্বভাষার জননী সংস্কৃত-ভাষাকে অনেকদিন থেকেই উপেক্ষা করে আসছি, তাই সেই বৃষ এখন আগাছারই সমিল হ'য়ে থাকে আমাদের বেড়ার ধারে, নাম তার বাসক। যাকে সাধুভাষায় বলা হয় “বাসা”। বাসক গাছটি শুধু বাংলায় কেন, ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এর হিন্দি নাম আড়ুয়া, এটি অটরুষকের বিবর্তিত শব্দনাম।

ক্ষুদ্রজাতীয় গাছ হলেও প্রায় ৫।৬ ফুট উঁচু হয়; আষাঢ়-প্রাৰ্ণে সাদা ফুল হয়। এর বোটানিক্যাল নাম *Adhatoda vasica* Nees.। সাদা ফুলের বাসক ছাড়াও অপেক্ষাকৃত নবীন বনৌষধির নিষণ্টু গ্রন্থে তাম্রপদুস্পী বাসকের উল্লেখ দেখা যায়; এর ফুলগুলি হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ; এটির বোটানিক্যাল নাম *Phlogacanthus thyrsoiflorus* Nees. এদের ফ্যামিলি *Acanthaceae*. এই দুটি ভিন্ন বর্তমানে এদেশে এই ফ্যামিলির আর একপ্রকার বহিরাগত ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ বাসক বলে প্রচলিত হয়েছে; তার ফুলগুলি লাল। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Jacubinia tinctoria* Hemsl.

## ভিতর বাহরের উপদ্রবে

প্রথমেই বলে রাখি বাসক, নিম্ন প্রভৃতি কয়েকটি ভেষজকে কাঁচা ব্যবহার করতেই বলা হয়েছে; তবে হাওয়ায় শুকিয়ে নিলে একই গুণ পাওয়া যায়।

(১) **অম্লপিত্ত রোগে**— এ রোগে দীর্ঘদিন ভুগতে থাকলে আসে অম্লশূল, হৃদরোগ, রাউপ্রেসার এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত। এই অম্লপিত্তকে দমিত করতে গেলে ৭।৮ গ্রাম বাসক ছাল ৪ কাপ আন্দাজ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জলটা দুই তিন বারে নিত্য খেলে বিশেষ উপকার হয়।

(২) **ক্রিমিতে**— বয়সানুপাতে মাত্রামত উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বাসক ছালের ক্রাথ করে খাওয়ালে ক্রিমিও মরে যায়।

(৩) **রক্তপ্রতিতে**— রক্তপিত্তজনিত যে কোন জায়গা থেকে রক্তস্রাবে বাসক ছাল ও পাতা (১০।১১ গ্রাম) একসঙ্গে সিদ্ধ করে সেই ক্রাথের সঙ্গে চিনি বা মিছরির সিরাপ মিশিয়ে খাওয়ালেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৪) **শ্বাসরোগে**— নতুন বা পুরাতন যাই হোক না, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ক্রাথ প্রস্তুত করে সিরাপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শ্বাসের উপদ্রবেরও উপশম হয়। অনেকক্ষেত্রে শ্বাসরোগের সঙ্গে শরীরে একজিমাও থাকে; কারণ ঔপসর্গিক রক্তদৃষ্টির দ্বারা ঐ দুটি রোগ এককালেই দেখা দেয়; এটার দ্বারা সে দু'ক্ষেত্রের প্রভাবও কমে যায়।

(৫) **হাঁপের টানে**— বাসকের শুষ্ক পাতার চুরুট বানিয়ে বা বিড়ি করে অথবা কলকেতে সেজে ধোঁয়া টানলেও বেশ উপশম হয়।

(৬) **গাত্র-দৌর্গন্ধে**— গায়ের স্থানবিশেষের ঘামে দুর্গন্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে বাসক পাতার রস লাগালে ওটা হয় না।

(৭) **গায়ের রং ফসাঁ কে না চায়**— এই বাসক পাতার রসে দুই-এক টিপ শঙ্খ-

ভক্ষ্ম মিশিয়ে স্নানের দুই-তিন ঘণ্টা পূর্বে গায়ে লাগাতে হয়, এর দ্বারা শ্যামবর্ণ ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হয়।

(৮) খোস পাঁচড়ায়— গোমুত্রে বাসক পাতা বেটে লাগালে নিশ্চিত নিরাময় হয়।

(৯) অর্শের বলির যন্ত্রণায়— খেঁতো বাসক পাতা অল্প গরম করে পুটুটি বোঁধে মলম্বারে সেক দিলে যন্ত্রণা ও ফুলো দুইয়েরই উপশম হয়।

(১০) বসন্তের সংক্রমণে— পাড়াজুড়ে বসন্ত, এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে বাসক পাতা সিদ্ধ জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ খেতে হয়, তাহলে আর সংক্রামিত হওয়ার ভয় থাকে না। আরদুর্বেদ মতে এর দ্রব্যশক্তিটি রোগ হওয়ার কারণটাকেও প্রতিহত করে।

(১১) জীবাণু নাশে— এক কলসী জলে ৩।৪টি বাসক কুচি করে কেটে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে সেই জল জীবাণুমুক্ত হয়। শুধু তাই বা কেন, পুকুরের পোকা-মাকড় মারতেও সেকালে বাসক পাতা জলে ফেলা হতো।

(১২) টিউমার না গর্ভ— চরকসংহিতার যুগে বাসক পাতার রস খাইয়ে নির্ণয় করা হতো।

এই নিবন্ধের ইতিহাস একটি কথা বলে রাখি—দূষিত রক্ত ও শ্লেষ্মাজনিত যে সব রোগ আসতে পারে, সে সব ক্ষেত্রে বিচার করে বাসক প্রয়োগ করতে পারলে বেড়ার ধারে বসেই অনেক রোগ সারানোর ব্যবস্থা করা যায়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vasicine. (b) 1-peganine. (c) Small amount of essential oil.



## বাসা (তাম্র পুষ্প)

এটা নতুন কথা নয় যে, ভারতীয় মানুষই কেবল বৃক্ষলতাদির গুণাগুণ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল; বিশ্বের সব মানুষই তাদের জন্মভূমির গাছগাছড়ার গুণদোষ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন, এমনকি কুকুর-বিড়ালও জানে তাদের শারীরিক ল্যাঘবের জন্য কোন্ কোন্ তৃণ, কোন্ কোন্ লতাগুল্ম নির্দিষ্ট করা আছে; তাই তো আমরা পরিষ্কার ধারণা ক'রতে পারি, কেন এই গাছটি জ্যোতিষ-সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ পরিচিত হ'য়ে আছে। ওঁরা জানেন শত্রুগ্রহের কোপদৃষ্টি ও তজ্জনিত রোগ প্রশমনের জন্য সিংহপদুচ্ছীর মূল ধারণ অবশ্যকরণীয়। এ কথা জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। বাংলায় এই সিংহপদুচ্ছীর প্রচলিত নাম “রামবাসক”।

এই ভেষজটি কয়েকটি বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী হ'য়েও আজও আর্যবেদীয় ভেষজ-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টিতে এখনও আসেনি। তথাপি রামবাসকের মধ্যে যে বিশেষ রসশক্তি নিহিত আছে, সেই অজ্ঞাত শক্তি সম্পর্কে কিছুটা আলোক-সম্পাত করার জন্য বর্তমান আলোচনা ও তার স্বরূপনির্ণয় করাই (identification) এখানকার প্রাসঙ্গিক।

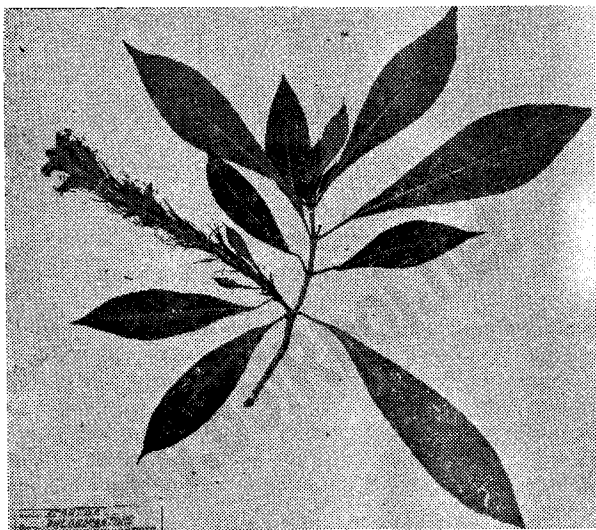
এ সম্পর্কে জানাই যে, বনৌষধির প্রাচীনগ্রন্থে শ্বেত ও তাম্র বর্ণের পদুপভেদে দুই প্রকার বাসকের উল্লেখ আছে, কিন্তু বেদে বৃষ বা বাসক সম্বন্ধেই যেটুকু উল্লেখ আছে, তাতে নানান ভেদের উল্লেখ নেই, অথচ দুটি অংশবিশেষের পার্থক্য বর্তমান।

ভারতের কবিরাজবৃন্দ একমাত্র শ্বেতপদুপ বাসকেরই ঔষধার্থে ব্যবহার ক'রে থাকেন, কারণ এটি ভারতের প্রাতি প্রদেশে যত্রতত্র পাওয়া যায়। আর তাম্রপদুপ বাসক, যার অপর এক নাম সিংহপদুচ্ছী বা রামবাসক, সেটি কিন্তু বিদ্যমান থেকেও ব্যবহারগত পরিচয় (ঔষধার্থে) তার নেই।

এটি হিমালয়স্থ গাড়োয়াল থেকে ভূটান পর্বন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণভাবাপন্ন অঞ্চলে

এবং আসাম ও খাসিয়া পর্বতে প্রচুর পাওয়া যায়, তবে এতদগুণে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনেই এর চাষ বা রোপণ করা হয়। এটির বোটানিক্যাল নাম *Phlogacanthus thyrsoiflorus* Nees. ফ্যামিলি *Acanthaceae*.

বাসকের এক নাম 'সিংহাস্য'—আস্য অর্থে মদুখ; এই গাছের তাম্রবর্ণ ফুলের গঠন দেখতে কতকটা সিংহের হাঁ করা মদুখের মত, অনেক ক্ষেত্রে অনেককিছুর উপমা নিয়ে ফুলের নামকরণ হ'য়ে থাকে। অবশ্য *Acanthaceae* ফ্যামিলির সব গাছেরই ফুলের গঠন বিন্যাস এই ধরনের। তা ছাড়া তাম্রপুষ্প বাসকের আর একটি বিশিষ্ট নাম "সিংহ-



পুচ্ছ" বলা হ'য়েছে, এখানেও নামকরণের উপমাটা তার পুষ্পদণ্ডের বিন্যাসটিকে দেখেই; সিংহের পুচ্ছের (লেজ) মত, এবং সেই পুচ্ছে থাকে সূক্ষ্ম তন্তুগুলির সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ স্তবকিত পুষ্প। হয়তো এই কারণেই সার্থক এই নামকরণ। তবে এই বাসকের সঙ্গে রাম শব্দটির সংযোগ কেবল বাংলাতেই দেখা যায়। হয়তো বা এই রাম শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের ও বৃহত্ত্বের নির্দেশক। সেইজন্যই সম্ভবতঃ এই নামে তাকে ভূষিত করা হ'য়েছে। এই গাছগুলি বেশীরভাগ গাড়োয়াল অঞ্চলেই ৬।৭ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, মিতীয়তঃ স্বাদে অত্যন্ত তিক্ত। এটি কলিকাতার সায়েন্স কলেজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে জানানো হ'য়েছে যে, প্রচলিত শ্বেত বাসকের সমধর্মী দ্রব্যশক্তিগুলিও এই গাছে বর্তমান। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের বর্তমান প্রামাণ্য যে সব গ্রন্থ আছে, সে সব গ্রন্থের মধ্যে এই ভেষজটির গুণাগুণ সম্পর্কে কোন আলোচনা দেখা যায় না। তবে কোন কোন প্রদেশে শ্বেতপুষ্প বাসকের স্থলে এই বাসকের ব্যবহার হয়, এটা লেখা আছে।

এই রামবাসকটি ফলদায়ক হয় স্ত্রীরোগের অতিরিক্তঃ ব্যাধির ক্ষেত্রে। আয়ুর্বেদে

একে অস্‌গুদর বা রক্তপ্রদরে ব্যবহারের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে মেনোরিজিয়া (Menorrhoea) বলা হয়। এই রোগ সম্পর্কে আয়ুর্বেদের নিজস্ব চিন্তাধারার চিকিৎসা পদ্ধতিও ভেষজগুণের সমন্বয় সাধনেই এই রোগোপশম সম্ভব হয়ে থাকে। এই রোগ সম্পর্কে আয়ুর্বেদের সংহিতাকারগণ বলেছেন—

‘রক্তপিপ্ত বিধানেন প্রদরাংশ্চাপদ্যপাচরেৎ’।

অর্থাৎ এই রোগ অধোগত রক্তপিপ্তের ন্যায় চিকিৎসা করার বিধি। রক্তপিপ্তের চিকিৎসায় (চক্রদণ্ডে) ঔষধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেই অধ্যায়ে লেখা আছে—

“বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।

রক্তপিপ্তী ক্ষয়ী কাসী কিমথম্বসীদতি”,

অর্থাৎ বাসক বিদ্যমান থাকতে রক্তপিপ্ত, ক্ষয় ও কাস রোগী কেন মুষড়ে পড়বেন? এইভাবে এর প্রশস্তির উল্লেখ ভেষজটির বিশেষ গুণের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায়। মেনোরিজিয়া রোগে রামবাসক প্রয়োগের এই সূত্র ধরেই করা হয়। এই রোগ সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের অভিমত হচ্ছে যে, নারীদেহে অবস্থিত ডিম্বকোষ (ovary) থেকে দু’টি হরমোন নিঃসৃত হয়, যাদের Estrogen ও Progesterone বলা হয়। এই Estrogen-এর মাত্রাতিরিক্ত ক্ষরণ এবং Progesterone-এর স্বল্প ক্ষরণই অতিস্রাবের মূখ্য কারণ। এখন দেখা দরকার বনৌষধিটির এই দু’টি হরমোনের উপর কোন প্রভাব আছে কিনা, অথবা (রক্ত তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যাওয়ার শক্তি) (coagulation) বৃদ্ধি করে রক্তস্রাব রোধ করে কিনা?

হুপিং কাসিতে এই রামবাসকের সিরাপ দুরারোগ্য হুপিং কাসিকে সংযত করে। এটা ২।৩ দিনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়।

আরও একটি কথা জানা দরকার যে, ভেষজটির মাত্রাবিচারের উপরই এর ক্রিয়ার প্রকাশ নির্ভর করে। এটাও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, একটু বেশী মাত্রায় ব্যবহার করলে তন্দ্রার ভাব আসে, তবে কোন ক্ষতিকারক নয়। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বনৌষধির প্রয়োগের জন্য ব্যাপকভাবে গবেষণার প্রয়োজন।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a)  $\beta$ -sitosterol—Sito. (b) Lupeol. (c) Betulin. (d) One diterpene lactone. (e) A number of other terpene type compounds have also been isolated.



## মুক্তক

শ্লেষাত্মক শব্দবিন্যাসে বক্তব্য প্রকাশ করার রীতি অতীত যুগের লেখার ধরণ ছিল, তাই বলা হ'য়েছে—

‘অভদ্রাণং ভয়াক্রোভাৎ নিমিত্তাৎ পশুপক্ষিণাম্।

ভদ্রাণং সংহতির্নিত্যা কল্যাণায় জনৈষিণাম্॥’

অর্থাৎ অভদ্রগণ ভয় ও লোভের বশীভূত হ'য়ে সংঘবদ্ধ হয়; প্রাকৃতিক বিপর্ষয় ঘটলে (ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প) পশু, পক্ষী, সিংহ, মৃগাদিও সংঘবদ্ধ হয়, আর ভদ্রগণ সংহতি সাধন করেন জনকল্যাণে। আমার আলোচ্য সেই ‘ভদ্র’ নামের বনৌষধিটি; সেটি জন-কল্যাণের সংহতি সাধক।

আমাদের সমাজে প্রচলিত বহু সংস্কৃতিরই উৎস বৈদিক সূক্ত। এই বনৌষধিটির ভৈষজ্য-উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। গুণ-কর্ম বিভাগানুসারে তার নামকরণ এবং তার পাণ্ডুর্ভৌতিক দেহগঠনের যে মূল উপাদান এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধি—এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচারের সঙ্গে বনৌষধির পরিচিতি এবং আরও পরবর্তীকালে আবার এসবের তদ্বিদ্যাসম্ভাষায় (সিম্পোসিয়াম্); তারই ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে ‘সংহিতা গ্রন্থ’, যাকে সে যুগে বলা হতো গুরুসূত্র ও শিষ্যপ্রবচন।

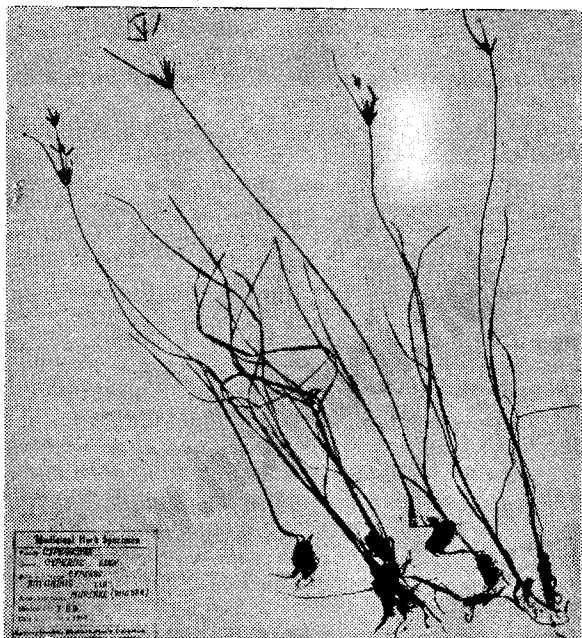
### বস্তুবাদের পূর্বরূপ

“আকাশাদ্ বায়ুর্ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অম্ভাঃ পৃথিবী জায়তে।”

স্বস্ত্যাস্ত সৃষ্টির এই মূল সূত্রটির অর্থ হলো—আকাশ থেকে বায়ুর সৃষ্টি, বায়ু থেকে



অগ্নির সৃষ্টি, অগ্নি থেকে জল, তারই ঘনীভূত পরিণতিতেই ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবীর বাস্তব রূপ! এর পরই পঞ্চ মহাভূতের (উপরিউক্ত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) পঞ্চীকরণ অর্থাৎ একটির মধ্যে অপর চারটির অনুপ্রবেশ এবং অবস্থান। যেকোন দ্রব্যই হোক, এদিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিই হয়নি বা হয় না; তবে দ্রব্যের জন্মলগ্নে এই পাঁচটি মূল উপাদানের সংযোগ বিভাগের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো জরুরি। স্বাদে ও গুণে পার্থক্য হয়। পরবর্তী যুগে এইসব দ্রব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলিত হয়েছে।



### বনৌষধিটির বৈদিক সমীক্ষা

“অপস্ৱ সাধিঃ স্বং স্তনয়িষ্ৱঃ অনুরূপসে গৰ্ভে ভদ্রং ভূতস্য্যনো  
মাতৃভিগ্ৱং জন্তুন্ অন্তরস্য উপস্থে পিন্ৱস্ব।”

(অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প—৭।২০২।৪৬)

ভাষ্যকার মহাশয় বলেছেন—

অপস্ৱ=জলেশ, সাধিঃ=স্থানং তে। স্তনয়িষ্ৱঃ অনুরূপসে স্তনঃ  
=সংহতো ইষ্ৱঃ। মেঘৈঃ তৈঃ মণ্ডলং=মেঘকালে ওষধীরূপেণ  
স্বীকরোসি জঠরাগ্নিনা তস্য ভূতস্য=প্রাণিজাতস্য গৰ্ভে স্বং ভদ্রং।

ভদি=রক্, মৃদুস্তকমিতি। মাতৃভিঃ=অশ্লিঃ সংসৃজ্য=একীভূয়  
জন্তুন=ক্রিমীন্ তান্ অন্তরস্য=অন্তঃ মধ্যে। উপস্থ=জনন-  
স্থানে পিল্বস্ব=গোপারসি!

এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—মেঘের উদয়ের সঙ্গে তোমার দেহ ঔষধিরূপে গঠিত হয়।  
তুমি স্তনয়িত্ব বা মেঘবারির সংহতিতে জন্মলাভ কর, তাই তুমি মৃদুস্তক। জলেই  
তোমার বাসস্থান। জঠরে প্রবেশ করে তুমি অগ্নিরূপ ধারণ কর; তাই তুমি ভদ্র বা  
মঙ্গল। জলের সঙ্গে তুমি একীভূত হও। তুমি জন্তুর জননস্থান ঢেকে রাখ।

বৈদিক কাঁপি থেকে প্রায় সবগুলিই পাওয়া গিয়েছে—(১) জন্মস্থান ও কাল,  
(২) স্বভাব-ক্রিয়া, (৩) প্রকৃতি ও (৪) তার বৈশিষ্ট্য। এখন প্রয়োজন, বিচার বিবচনা  
ক'রে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ।

চরক-সুশ্রুতাদি সম্প্রদায়ের মনীষিগণ প্রথমেই বিচার করেছেন তার পাণ্ডুভীতিক  
গঠন বৈচিত্র্য—এই মৃদুস্তক বর্ষাকালেই হৃষ্টপুষ্ট হয়, কিন্তু তার দেহগঠনের মূল  
উপাদানে নির্দিষ্ট দু'টির আধিক্য থাকতে, এমন-কি জলে বাস ক'রেও তার গর্ভে  
অগ্নি আছে। অর্থাৎ এটি জলে বাস ক'রেও অগ্নিগুণের অধিকারী, যেহেতু সে তিস্ত-  
কষায় রস-সমৃদ্ধ।

### কার্যকারণ সম্পর্কের অনুশীলন

বস্তুবাদের মধ্যে একটি নিমিত্ত কারণ তো থাকবেই। তাছাড়া যেকোন দ্রব্য-সৃষ্টিতে  
ক্ষিতি-অপ-তেজ প্রভৃতি মূল উপাদান তো আছেই। এই মূল উপাদানের স্বভাব  
পরিণতিতেই দ্রব্যেরও রস, গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তাদের স্বাদের পার্থক্য; তেমনি  
গুণেরও। স্বাদের স্বারাই সৃষ্ট দ্রব্যের মৌলিক উপাদানে কোন্‌টির হ্রাস কোন্‌টির বৃদ্ধি  
ঘটেছে, সেটার বিচার হ'য়েছে। আবার রোগের ক্ষেত্রেও যখন তারা দ্রব্য বিচার ক'রেছেন,  
তখনও সেই পণ্ড মহাভূতের গুণবিচার ক'রেই এবং রোগ নির্ণয়ও ক'রেছেন সেই একই  
চিন্তাধারায়। হয়তো আয়ুর্বেদের প্রতি তথাকথিত সেই বিদ্রূপাত্মক 'বায়ু, পিত্ত, কফ  
ছাড়া আর কিছুই নয় এই পরিহাস; কিন্তু পণ্ডমহাভূতের Concise form- এর মধ্যে  
যে ক্ষিতি ও অপ-রয়েছে—তা তো কফই, আর তেজ পিত্ত এবং মরুৎ ও ব্যোম  
যে বায়ু এটার রহস্য না বদলে আয়ুর্বেদের বিজ্ঞানই দ্দুর্বোধ্য। এদের স্বাভাবিক  
অবস্থা চলাকাল নীরোগ, আর অস্বাভাবিকতায় রোগ। অধিকাংশ রোগের ক্ষেত্রেই  
দ্রব্যের প্রয়োগ প্রধানতঃ হয় উল্টোপথে, অর্থাৎ রোগাক্রমণের হেতু কোন্‌টির আধিক্য  
বা হ্রাসে সৃষ্ট—আবার দ্রব্যের মধ্যে কোন্‌ দ্রব্যটি সে আধিক্যকে কমাবে বা ক্ষেত্রবিশেষে  
বাড়াবে, সেইটাই রোগ ও দ্রব্যের ভক্ষ্য-ভোজ্য সম্পর্ক।

এই আলোচ্য ভদ্র-মৃদুস্তকটি কষায় ও তিস্তরস। কষায়ের স্বভাব শোষণধর্মী, আর  
তিস্তের স্বভাবেও সেটি আপ্য হ'য়েও এই দু'টি গুণ-ধর্মের প্রাধান্য নিয়েই ভদ্র-মৃদুস্তকের  
উৎপত্তি।

### পরিচিতি

বৈদিক তথ্যে পাওয়া যাচ্ছে এক শ্রেণীর মৃদুস্তকের কথা; আর সপ্তদশ শতকে এসে  
সেটির চার প্রকারের উল্লেখ; অবশ্য তাদের প্রত্যেকের গুণ ও উপযোগিতাও পৃথক্  
পৃথক্ বলা হয়েছে। আলোচ্য বস্তু—ভদ্রমৃদুস্তক সম্পর্কে। এটি এক জাতীয় ঘাস,

ঔষধার্থে এর মূল ব্যবহার করা হয়, মূলটি গ্রন্থি আকারের (Tuberous root)। এটি জন্মে বালি-প্রধান স্যাঁতসেঁতে জমিতে, সাধারণে বলে মৃথো ঘাস, এর মূলগুলিই ভাদ্রা মৃথো। এই নামটি ভদ্রমুস্তকের বিবর্তিত চলাতি নাম। এই ঘাসটির বোটানিক্যাল নাম *Cyperus rotundus* Linn. ফ্যামিলি *Cyperaceae*। আর একই প্রজাতির আর একটি ঘাস জন্মে জলাস্র ভূমিতে। তার পাতা চওড়া, সে ঘাসগুলি এক/দেড় ফুট উঁচু হয়, তার বোটানিক্যাল নাম *Cyperus Scariosus cyperaceae*। এছাড়া কৈবর্ত মুস্তকের নামোদ্ভেদ আছে, সেটি আজও সিন্ধি ওষধি বলে চিহ্নিত। কিন্তু কৈবর্ত মুস্তক এই শব্দটি জলজ মুস্তকেরই ইংগিত বহন করে।

### রোগ প্রতিকারে

বৈদিক সূক্ত থেকে তাঁরা পেয়েছেন—এটি স্তনয়িহ্ন অর্থাৎ মেঘের জল-সিঞ্চনে তার গর্ভে অগ্নি সৃষ্টি হয়। এদিকে বর্ষাকালেই জলদোষে ও কালধর্মে মানুষের যখন অগ্নিমান্দ্য হয়, তখন সে বিষমতা দূর করতে পারবে এই মুস্তক। এইটাই তাঁদের অনুশীলন।

১। অঙ্গীর্ষে:— দমকা পাতলা দাস্ত হয়—সেক্ষেত্রে ৪।৫ গ্রাম কাঁচা মৃথো একটু খেঁতো করে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেকে ৪।৫ বারে একটু একটু করে খেতে হয়; এটাতে ২।১ দিনেই বিশেষ উপকার হয়।

২। আমাশয়:— এ রোগে অনেকের পেট কুন-কুন করে, ব্যথা করে, সেক্ষেত্রে এই মৃথোর কাথ খেলে আম ও ব্যথা দুই-ই কমে যায়।

৩। যাঁদের পাতলা দাস্ত হয় না, অথচ হজমও হয় না—এক্ষেত্রে কাঁচা মৃথো ৩।৪ গ্রাম, যোয়ান আধ চা-চামচ একসঙ্গে খেঁতো করে এক কাপ গরম জলে ভিজিয়ে সেটা ছেকে সকালে-বিকালে দুই বারে খাওয়া; এর দ্বারা অগ্নিবল ফিরে আসবে।

৪। জ্বরের পিপাসায়:— মৃথো-সিদ্ধ জল (উপরিউক্ত মাত্রায়) একটু একটু করে খেলে জ্বর ও পিপাসা দুই-ই যায়।

৫। জ্বালায়:— পিত্তবিকৃতি-জনিত গায়ে বা হাত-পায়ের জ্বালায় মৃথোর রস ক'রে লাগালে উপশম হবে।

৬। অপম্মারে (এপিলেপ্সিতে):— মৃথোর রস ১ চা-চামচ ৪।৫ চা-চামচ দুধে মিশিয়ে সেইসময় খাওয়াতে পারলে ওটার তীব্রতা কমে যায়। একটা কথা বলে রাখি— যাঁদের এ রোগ আছে, তাঁরা এটা নিয়মিত ব্যবহার করবেন।

৭। মাতাল হলে:— মদের নেশা বেশী হলে মৃথোসিদ্ধ জল খাওয়াতে ওটা কেটে যায়।

৮। ক্ষতে:— কোন কিছুর খোঁচা লেগে যা হলে মৃথোর রসে পাক-করা ঘি লাগালে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়।

৯। ঠুনকো হ'লে:— মায়ের স্তনে ঠুনকো হলে এই মৃথো বাটা লাগালে ২।১ দিনেই যন্ত্রণার উপশম হয়।

১০। পায়োরিয়ায়:— মৃথোর রস ক'রে অল্প জল মিশিয়ে খানিকক্ষণ ক'রে মৃথো রেখে দিলে ওটা সেরে যায়।

১১। বোলতার কামড়ে:— বোলতা কিংবা বিছে হুল বসালে মৃথো বেটে ওখানে লাগিয়ে দিয়ে থাকে গায়ের লোকেরা, ওটাতে যন্ত্রণার উপশম হয়।

গত প্রায়দশ শতক থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র বিপাকে পড়ে আছে। তার মধ্যে চিরঞ্জীব-১০

আবার সে বিশেষ ঘৃণিপাকে পড়েছে সপ্তদশ শতকের পর থেকে, এখন সে ছিন্নাঙ্গি; তাহলেও তার চিকিৎসার সুত্রগুলি এখনও মজ্জ্বল আছে কিন্তু এগুলিকে দিয়ে যুগোচিত রূপসৃষ্টির ভার নেয় কে?

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Unstable alkaloids. (b) Acids viz., linolenic, linotic, oleic, myristic & stearic acid. (c) Other compounds viz., pinene, cineole, sesquiterpenes iso-cyperol & glycerol. (d) Essential oil. (e) Fatty oil.



## উদ্ভানক

চিকিৎসক রোগীর রোগ নিরাময়ে অগ্রসর হয়ে সর্বাগ্রে খোঁজেন রোগের কার্যকারণ সম্পর্কটা কি, কিন্তু স্তম্ভ হ'য়ে যান যখন রোগের সাক্ষাৎ কারণগুলো কি তা খুঁজে পান না; কারণ রোগীর স্বকৃত দোষে রোগ হ'লে তার কারণ থাকে, কিন্তু এমন রোগও হয়, যেগুলি এসব থেকে পৃথক—এই সব রোগের ক্ষেত্রে পুরোহিতভন্দ্য তার ঐহিক দোষ নিরাময়ের জন্য জীবিতাবস্থায় চান্দ্রায়ণ বা মৃত্যুর পর প্রারম্ভিকের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, কারণ রোগীর রোগ উৎপত্তির কারণকে তাঁরা জন্মান্তরের রোগ ব'লে মনে করেন; অতএব প্রশ্ন থাকে—তা হ'লে কি রোগসৃষ্টির মূলে এই দেহ এই মন ছাড়াও অন্য কারণ থাকে?

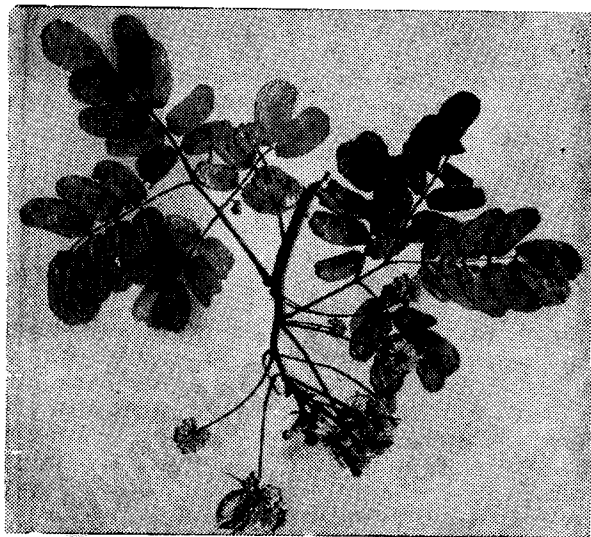
এ প্রশ্ন যাঁদের মনে আসে, আজকের ভারতে হয়তো তাঁরা সংখ্যায় লঘু; কিন্তু

পদুরোহিতভক্তের স্মৃতিশাস্ত্রের এ বিধানকে তো ভারতের বহু পুরাতন বিশেষ একটা সমাজ নিজেরাও মেনেছেন, অপরকেও মানিয়ে নিয়ে চলেছেন। সেখানে তাঁদের যুক্তি আছে—

যান্তি কৰ্ম্ম ক্ষয়াৎ ক্ষয়ম্’

অর্থাৎ যেসব রোগের ঐহিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না সেগুলি কর্ম্মজ, সেই কর্ম্ম-জন্য ব্যাধিগুলি পূর্বজ কর্ম্মক্ষয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বিশেষর অন্যান্য মানবসমাজে এ ধরনের সংস্কার না থাকলেও তাঁরা রোগের দৃষ্ট



কারণের মধ্যে অ-দৃষ্ট হেতুকেও বাদ দেন না, তাই তাঁরা বিশেষ কতকগুলি রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে তাদের মূলীভূত কারণ যে আছে তা অস্বীকার করেন না; তার প্রমাণ তাঁদের শোণিত বিজ্ঞানের অনুশীলন। সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র-বিজ্ঞানের মধ্যে তা আপাততঃ ধরা যায় না ঠিকই, কিন্তু তাঁরা সেখানে কিন্তু এসব রোগের অস্তিত্ব যে বহুদিন থেকে রয়েছে এটায় তাঁরা নিঃসন্দেহ; তাই বৈজ্ঞানিকগণ সেখানে এসে থমকে যান। তা হ'লে এটা অবশ্যই মনে করা যায় রোগের বর্তমান রূপই সবটা নয়। জন্মসূত্রেও তা বাহিত হ'য়ে আসে এবং সেই কারণগুলি শোণিতদ্বারা সৃষ্টিত অবস্থায় থাকে। সে পিতৃ বা মাতৃকুলের মধ্যে যে কুল থেকেই আসুক; যেমন হাঁপানি, এক্জিমা, অর্শ, কুষ্ঠ, হার্ণিয়া, যক্ষ্মা, এমন কি মধুমেহ পর্যন্ত। সুপ্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র প্রণেতৃপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—এ সব রোগ পাপজ; সেগুলি যোগ্য প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অপসৃত হয়। সেইজন্য এই চান্দ্রায়ণ বা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

বর্তমান বস্তুবিজ্ঞানের বিপ্লবের যুগে আমরা কি সে সম্পর্কে আর কোন তথ্যের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটা অনুসন্ধান করতে পারি না? নাকি সেইটাকেই অপ্রাপ্ত বলে মনে নিতে চিকিৎসাশাস্ত্রকে স্থাবির ক'রে রাখবো?

অথবা কোন পথে সেসব পাপজ রোগ (ভাঁদের মতে) থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাস্তবানুগ পথে অনুসন্ধান করতে পথ দেখাবো?

এই প্রশ্ন সামনে রেখে সেই বংশানুক্রমিক শোণিতবীজী রোগের সন্ধান ও বনৌষধি সম্পর্কে এই নিবন্ধে আলোচনা।

### ক্ষেত্র, কাল ও বীজ

অনেকেই দেখে থাকবেন মাটিতে বেতো বা গিমে (Chenopodium album or Mollugo spargula) শাকের বীজ চৈত্রমাসে ক্ষেতে পড়ে, তারপর হেমন্তের পরিবেশ পেলেই সে অঙ্কুরিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে; সুতরাং অঙ্কুর ও বৃক্ষলতাদির জন্ম-সূত্রটি কেবল ক্ষেত্র ও বীজ থেকেই আসে না; উপযোগী কালও তার প্রয়োজন। এসব রোগের ক্ষেত্রেও তেমনি যথাকালেরও উপযোগিতা আছে।

### টপকানো রোগ জীবাণু

বংশগত রোগের অস্তিত্ব যে একটি বিশিষ্ট রক্তবীজকোষে নিবন্ধ থাকে এবং ক্ষেত্র (system)ভেদে তার রূপও বদলায় এটা প্রত্যক্ষ।

যেমন দেখা যায়, একজনের চারিটি সন্তান; তার মধ্যে একজনের হাঁপানি, একজনের একুজিয়া, একজনের হাঁপানি ও একুজিয়া দুই-ই, আবার একজনের কিছুই নেই; এ থেকে আরও বিচিتر যে, এ আবার টপকায়—যেমন পিতামহের ছিল, পিতায় এলো না; কিন্তু পৌরতে এসে সেটা বর্তালো। এইভাবে মাতৃকুলের দিক থেকেও অমনি টপকে আসে। মোটকথা, রক্তবীজের ব্যাধি থেকে রেহাই পাওয়াই সম্ভব হয় না। যাকে বলে “বাধে ছুঁলে আঠারো ঘা”।

### উপেক্ষিত পাদপের আভিজাত্য

এমনি এক টপ্কাধর্মী রোগের বংশবিস্তারে

অপেতবীত বীচ সপতাতো যে অত্র বসুদনীথ উদ্দানকঃ। তৎসং  
বর্ধয়স্ব কামাঃ ঘৃতেন॥ (অথর্ববেদ ২২।১০।৮ সূক্ত)

মহাধর ভাষ্যঃ—

‘উদ্দানকঃ শিরীষঃ তস্য স্বক্ ক্ষীরং চ গৃহমানীয় সপদীন্য  
মূষিকাদীন্য চ বিষস্য অপনোদন্য স্তোতি=অপেতবীচঃ তব  
শিখরস্থ লোমশঃ কুসুমার্নি দক্ষিণাং দিশং নিরুপয়তি, ঘৃতেন  
কামান্ তৎসং=শালিতং চ বর্ধয়স্ব।’

এর ভাবার্থ—উদ্দানক-এর (শিরীষ) ছক্ (ছাল) ও ক্ষীর গৃহে এনে রাখ; সর্প ও মৃষিকের বিষকে দূর কর; তোমার শিখরের কুসুমগুলি দক্ষিণ দিককে নিরুপিত করে; তুমি ঘৃণের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাম এবং কান্তিকে বর্ধন কর। এইভাবে তাকে স্তব করা হয়েছে।

### নামকরণের তাৎপৰ্য

‘উদ্’ অর্থে উত্তমরূপে যে দানক, যার অর্থ সে বন্ধন কর’। ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন,

‘রক্ত স্রোতসাং গ্রন্থি বন্ধনং’

অর্থাৎ এই শিরীষের ব্যবহারে রক্তবহ স্রোতকে গাট বেঁধে দেয় বা সংহত করে। আর শিরীষ নামকরণের তাৎপৰ্য—শৃ+ঈষ্ বা ঈষণ্=শৃ শোণিতং ঈষতি, অর্থ, সর্পিত অর্থাৎ যার দ্বারা শোণিত-গতি পরিবর্তিত হয়। উপরিউক্ত ভাষ্যের উদ্দানক বা শিরীষ নামকরণের তথ্যই পরবর্তী গবেষণার উৎস।

### পরবর্তী সমীক্ষা

চরক সংহিতার কালে এটি ব্যবহৃত হ’য়েছে বিষনাশক দ্রব্য হিসেবে এবং কুষ্ঠে, সর্পবিষে, বিসর্পে ও শ্বাসরোগে। সুশ্রুতেও তাকে স্থান দেওয়া হ’য়েছে। সালসারাদিগণে এই গণের (গ্রুপের) ভেষজগুলির কাজ হ’লো কুষ্ঠ, মেহ ও পান্ডু (Anaemia) নাশ করা; এ ভিন্ন গাছটির ব্যবহার ক্ষেত্র বিসর্পেও দেখা যায়।

গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে মৌলিক ও অনুলিখিত আয়ুর্বেদিক গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে শিরীষের ব্যবহার নানান দিকে রেখে বিশেষ ক্ষেত্র তার রক্তজ রোগেই করা হ’য়েছে; সর্বশেষে ১৭ শতকের দু’টি বনৌষধির বিশিষ্ট গ্রন্থ ‘ধন্বন্তরি’ ও ‘রাজনিঘণ্ট’ে বলা হ’য়েছে—এই গাছটি বিকৃত রক্তবিকারজনিত রোগে, যেমন কুষ্ঠ, দদ্রু, গাঠচর্মের বিবর্ণতা, কন্ডু (চুলকণা) নাশ করে; অধিকন্তু শ্বাস-কাস হরণ করে। এই গাছের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে, যাকে আয়ুর্বেদের পরিভাষায় বলা হয় “ব্যবায়ী” (যে দ্রব্য পরিপাক হওয়ার পূর্বেই তার দোষগুণ শরীরে প্রকাশ করে), যেমন কাঁচা সুপারি, তামাক পাতা প্রভৃতি।

### পরিচিতি

এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম Albizzia lebbeck Benth. —ফ্যামিলি (Leguminosae.) একে মহীরুহ বলা চলে, রাস্তার ধারে সাধারণতঃ এ গাছকে লাগানো হয় ছায়াতরু হিসেবে; এই গণের (genus) আরও কয়েকটি প্রজাতি (species) এ দেশে আছে। আয়ুর্বেদে আরও দুই প্রকার শিরীষের নামোল্লেখ দেখা যায়—যেমন—কৃষ্ণশিরীষ, কাঁটা শিরীষ ইত্যাদি।

রোগের প্রতিকারে ব্যবহার করা হয় মূল বা গাছের ছাল (ছক), আর পাতা, ফল, বীজ ও কাণ্ডের সারাংশ।

## বংশানুক্রমিক কোন রোগ বিশেষে

একথা সবারই স্বীকার্য যে একজিমা ও হাঁপানির মৌলিক কারণটি দ্রুত অপসৃত তো হয়ই না—তাছাড়া এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি যে, এটাকে ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, এই দু'টি রোগের যেকোন একটির রূপ নিয়ে (যেকোন বয়সেই) আত্মপ্রকাশ প্রায়ই করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সদুদীর্ঘদিন অল্পমাত্রায় উদ্দানকের মূলত্বক ব্যবহার করলে আনুষ্ঠানিক (যাকে বলে নাছোড়বান্দা) রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাব্যতা থাকে; আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করার যে, এই গাছের ফুল হাঁপানিতেও ব্যবহার করার নির্দেশ আছে সপ্তদশ শতকে রচিত বঙ্গসেনের গ্রন্থে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারায় দেখা যায়—এই দু'টি রোগের উৎস একই।

(১) মূষিক বিষে:— ই'দু'রের কামড়ে প্রথমটা অনেক সময় আমরা তা উপেক্ষা করি, কিন্তু তার বিযুক্তিয়া যে নানাপ্রকার উপসর্গ সৃষ্টি করে—এটা কিন্তু প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকবৃন্দ জানতেন, তাই সে যুগের মনীষীবৃন্দের সমীক্ষা ছিল, তার প্রতিকারের ব্যবস্থায় সর্বাগ্রে শিরীষ ছাল বেটে দন্টস্থানের চারিদিকে প্রলেপ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তাছাড়া এর রসও পান করা উচিত বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

(২) বিষাক্ত পোকায় কামড়ালে বা আরশোলা উচ্চড়ে বা মাকড়সায় চাটলে শিরীষ গাছের মূলের ছাল বেটে লাগালে তাদের বিযুক্তিয়া আর হয় না। (এটা চরকীয় পন্থা)।

(৩) আধকপালিতে:— আধকপালে ব্যথায় মূলের ছাল চূর্ণ বা বীজ চূর্ণের নস্য নিলে উপশমিত হয়। প্রথমে খুব অল্প পরিমাণ নিতে হয়, তাও দিনে দু'বারের বেশী নয়।

(৪) চলিত দন্তে (দাঁত ন'ড়তে থাকলে):— এই গাছের মূলের ছাল চূর্ণ দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ও মাড়ি দুই-ই শক্ত হয়।

(৫) ঘাঁদের রক্ত দূষিত হ'য়ে গায়ে কালো দাগ হয়, সে ক্ষেত্রে গাছের ফল বেটে অল্প ঘি মিশিয়ে লাগালে স্বাভাবিক হয়।

## একটি মূল্যবান তথ্য

ঘাম— সংস্কৃত ভাষার শ্বেদ শব্দ ঘাম এবং সৌক দেওয়া, তাই পরিবেশভেদে এর দু'টি অর্থ—আমার বক্তব্য ঘামের ক্ষেত্রে। স্থূলকায় ব্যক্তির ঘাম হয়, অবশ্য আরুর্বেদমতে সেটা মেদেরই মলাংশ; শরীরের বারটি মূলের মধ্যে এটি একটি। শ্বেদ শব্দ বৈদিক। স্থূলকায় ব্যক্তির ঘাম হওয়ার না হয় একটা যুক্তি আছে; কিন্তু যেখানে স্থূলকায় নয় অথচ ঘাম হয়, বিশেষতঃ হাতে ও পায়ের তলায়—সে ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন সকলেরই মনে আসা স্বাভাবিক, কেন? তাহ'লে এটা কি? এক্ষেত্রে আমার অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুদ্ধি আছে যে, এ সব ব্যক্তির বংশে (জন্মস্থানে) হাঁপানি বা একজিমার সম্পর্ক অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে শিরীষের মূলের ছাল শ্বেদবাহী স্রোতের গতি পরিবর্তনে আশ্চর্যরকম প্রভাব বিস্তার করে; তবে রোগীর বলাবল, বয়স, আনুষ্ঠানিক লক্ষণ ও সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মাত্রার তারতম্য করতে হয়।

ক্ষয় রোগে— ঘাঁদের ঘামে ঘাম হয় (যাকে বলে নৈশ ঘর্ম), এক্ষেত্রেও এর মূলের ছালের চূর্ণ খাওয়ালে কয়েকদিনের মধ্যেই ঘাম কমিয়ে দেয়, অথচ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না; এই ক্ষয় বন্ধ হলে রোগীর দুর্বলতাও কমে যায়। এক্ষেত্রেও সেই মূল বক্তব্য—



স্নোত্ধারাটির গতির পরিবর্তনে সার্থকতা এই কারণেই—এটি তার গুণপ্রকাশক সংজ্ঞা নাম।

এছাড়া বিভিন্ন রোগ প্রতিকারে এই গাছের পাতা, বীজ, গাছের সারাংশ ব্যবহার করা হয়েছে; এসব তথ্য বিভিন্ন বনৌষধির গ্রন্থে পাওয়া যায়; যেমন—বলা হয়েছে, পাতার রস রাতকালীয় খাওয়ানো, চোখ উঠলে শিরীষের বীজ ঘষে চোখে কাজলের মত লাগানো, গলগন্ডেও বীজ বেটে গলায় প্রলেপ, শত্রু স্তম্ভনের জন্য শিরীষফুলের চূর্ণ খাওয়া ইত্যাদি—তবে ইউনানি সম্প্রদায় প্রধানভাবে ব্যবহার করেন কাঠের সারাংশ ও বীজ। তাঁরা রক্তবিকারে, চর্মরোগে ও রক্ত শোধনে দ্রব্যের সঙ্গে এই শিরীষ কাঠের সারাংশ চূর্ণ পান করার পদ্ধতিতে সিদ্ধ করে কাথ খেতে দিয়ে থাকেন। অবশ্য এই কাস্টসারের ব্যবহারের কথা সুদূরতেও উল্লেখ আছে। আর তার বীজচূর্ণ মিছারি। সঙ্গে মিশিয়ে গরম দুধ সহ খাওয়ার ব্যবস্থা করেন—যাঁদের শত্রুতারল্য ঘটেছে, বীজের চূর্ণের মাত্রা সাধারণতঃ ১।২ গ্রাম।

এই গাছটির ঔষধার্থে ব্যবহার কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নেই, বহু দেশেই এটি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটিকে নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলে এই অল্পসম্ভূত গাছটিতে যে একটি বিশেষ শক্তি নিহিত আছে, এবং আজও যা বহু উদ্ভূত বিজ্ঞানীবৃন্দের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে—জীন-জেনেটিক্সের (Gene-Genetics) মাধ্যমে জীবের বিচিত্র দেহবিকাশের সঙ্গে রোগেরও বীজ নিহিত রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ঋষিবৃন্দ কি বহুপূর্বেই সেটির সম্ভান পাননি? দেহ এবং ব্যাধির সবটাই যখন প্রজাপরাধিক্যত নয়। তবে প্রাচীন ও নবীনের এই ভাবধারা পৃথক হলেও অস্ত-নিহিত সত্য আজ অস্মান।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Aminoacids viz. cystine, aspartic acid, threonine, serine, glutamic acid, proline glycine, alanine, valine, methionine, isoleucine, leucine, tyrosine, phenylalanine, lysine, histidine, arginine, tryptophan. (b) Essential oil.



## বংশ

গোত্র-কুলের পুত্রপৌত্রাদির একই ধারায় অবস্থান থাকে অনন্তকাল, এ কামনা শুধু মানবেরই নয়, প্রাণীকুলেরও। সেই কুলই তো ভারতে স্বতন্ত্র নাম নিয়েছে বন্+শ অর্থাৎ অঙ্কুর প্রত্যঙ্কুর হ'য়ে যে সত্তা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে, এমনি নাম নিয়েই তো এই স্বনামখ্যাত তৃণরাজ বংশবৃক্ষটি বহুল উপমার বস্তু। তাই বাংলার লোকসাহিত্যেও স্থান নিয়ে আছে অনেক প্রবচন প্রখ্যাতি। যেমন—

- (১) 'বাঁশ পাকলে সরু, বাড়ির কত' পাকলে গরু'।
- (২) 'দাতার নারকেল, বাকিলের (কুপণ) বাঁশ'।
- (৩) 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাস্‌টাস'।
- (৪) 'বাঁশ বনে ডোম কানা'।
- (৫) 'বাঁশের চয়ে কণি দড়ো'।
- (৬) 'বাজালে বাঁশ ঘরু'লে কোঁৎকা'।
- (৭) 'ছেলেটি বংশের বাঁশ'।
- (৮) 'বাঁশ মরে ফুলে, আর মানু'ষ মরে ভুলে', প্রভৃতি।

এ ভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে উৎসন্নকারক বংশকেন্দ্রিক ভাষা নানা বিশেষণেও প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। এগুলি সবই কিন্তু কার্যকারণের অভিযান্ত্রিক। তাছাড়া পারিবারিক জীবনে ও শিল্পসম্পর্কিত তার উপযোগিতারও সীমা পরিসীমা নেই। পুরাতন সমাজে জন্মের পরক্ষণেই নাড়ীছেদের জন্য চ্যাচারির ব্যবহার ছিল; এখনো কোথাও কোথাও এ রীতি বর্তমান। তা ছাড়া মৃত্যুর পর শেষকৃত্যেও তার উপযোগিতা কতখানি তাও অজ্ঞাত নয়। এছাড়া গৃহস্থালীর কত জিনিষই তৈরী হয় ওর দেহ-তন্তুতে।

এবার বলি বাঁশ গৃহচিহ্নিকংসকও হয়। এই গাছটির প্রতিটি অংশ বিভিন্ন ব্যাধির

নিবারণক ও নিয়ামক। এ রকম নূতন নূতন বহু তথ্যের সম্বন্ধ মিলতে পারে বিভিন্ন বনৌষধির মধ্যেও, কিন্তু এগুনের গুণ-বিচারের ক্ষেত্র কোথায়? আমি কি আমার দেশের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এটা আশা ক'রতে পারি না যে তাঁরা এইসব দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ঘাটিত ক'রে আমাদের পূর্বপুরুষদের গভীর জ্ঞানগরিমার খ্যাতি বিশ্বে স্ফাবিত ক'রবেন।



**শব্দনাম—** সংস্কৃত ভাষায় বং অর্থ অঙ্কুর, এই শব্দের উপর শক্ প্রত্যয় ক'রে বংশ হ'য়েছে, এটি বৈদিক শব্দ, ঋকবেদে আছে। আপাতদৃষ্টিতে শব্দবিন্যাস হ'লেও পরিচয়ের বৈশিষ্ট্যে যেন অভাব থেকে যায়, এর আর একটি নাম 'তৃণধনুজ'। এটিও সার্থক নাম বলা যেতে পারে, আবার বেণু অর্থেও বাঁশ এও বৈদিক শব্দ। বেণু অর্থ শব্দ করা—এর সঙ্গে উফ্ প্রত্যয় ক'রে বেণু হ'য়েছে। ১২ শতকের লেখায় জয়দেব বেণু অর্থে বাঁশের বাঁশী লিখেছেন।

এই তৃণধনুজের বোটানিক্যাল নাম *Bambusa bambos* (Roxb.) Druce; ফ্যামিলি Gramineae.

**সর্বনাম—** কলকাতায় যেমন সর্বজাতের সমন্বয় দেখা যায়—তেমনি শিবপুত্র

বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেউর বাঁশ (B. spinosa Roxb.), তালদা বা তলুতা (B. tulda Roxb.), ভালকো (B. balcooa Roxb.), কারাইল (Dendrocalamus Strictus Nees), বাসনি বাঁশ (Bambusa vulgaris), বাওয়া বাঁশ প্রভৃতি নানা জাতের বাঁশের সহাবস্থান দেখা যায়; এ ভিন্ন ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম প্রভৃতি দেশের নানাজাতীয় বাঁশের সমাবেশও এখানে করা হ'য়েছে। এরা ফ্যামিলিতে Gramineae, এদের প্রজাতি (Species) ও গণ (Genus) ভেদে গঠন ও আকৃতি ভিন্ন। সব জাতের বাঁশে ফুল হওয়াটা স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু সেটা আমাদের নজরে আসার আশা কম, কারণ ২৫। ৩০ বৎসর বয়সের পর সাধারণতঃ বাঁশে ফুল হয়, তারপর যবের মত ফল হয়; তারপর পাতা আস্তে আস্তে পড়তে থাকে এবং দুই-এক বৎসরের মধ্যেই ম'রে যায়—এ কথাটা কিন্তু রামায়ণেও লেখা আছে; এ জন্য তার আর এক নাম 'ফলান্তক' ও 'স্বফল'। যা হোক, আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু দ্রব্যগুণগুলিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা।

প্রসঙ্গত বলি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক চেষ্টা রোগমুক্ত থাকা, তাই যুগে যুগে রোগ প্রতিকারের উৎসের সন্ধান চ'লেছে। ঋষি সংস্কৃতি চ'লে গেলেও মানুষের বা কোন জীবের অস্তিত্ব তো যেমন চলে যায় না, তাদের রোগ, শোক তো থেকেই যায়, তেমনি শতাব্দীর পর শতাব্দীতে যখন কোন নতুন গ্রন্থ প্রণীত হ'য়েছে, তখন কিছু কিছু নতুন তথ্যও তাতে সন্নিবেশিত হ'য়ে থাকে। এখনও তো তেমন বহু তথ্য অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে, হয়তো কিছু কিছু আছে লোকমুখে। যোগদলি হ'য়েছে বা হয়নি, তা থেকেও নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে; এইজন্য চাই যথাযথ অনুশীলন।

কোন বনৌষধির বা জাল্তবৌষধির আলোচনায় যুক্তি ও বাস্তব এ দুটির সমন্বয়-সাধনই আমার লক্ষ্য থাকে, এ ক্ষেত্রেও আমি তার ব্যতিক্রম করিনি।

### ব্যবহার

(১) আপনারা অনেকে দেখে থাকবেন—গরুর বাচ্চা হবার সময় তাড়াতাড়ি ফুল (অমরা- placenta) বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দুই-এক মৃত্যু বাঁশপাতা এনে খাওয়ানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ফলও পাওয়া যায়। এখনও গ্রামাঞ্চলে গরুর অল্পদিনের গর্ভস্রাবের জন্য বাঁশের শীষের রস ক'রে খাওয়ানো হয়ে থাকে, এ ভিন্ন প্রসবে দেবী হ'তে থাকলে বা প্রসবাস্তিক স্রাব ভাল না হলেও অনুরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা যে ঋতুস্রাবকারক, একথা পাশ্চাত্য উন্নিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ গ্রন্থেও উল্লেখ আছে। এ তো গেল একটা দিক, অন্যটি হচ্ছে—বেশী দুধ পাওয়ার জন্য আজও বহুলোক গরুকে একমৃত্যু বাঁশপাতা খাইয়ে থাকেন। এই তথ্যটির সমর্থন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন প্রামাণ্য দ্রব্যগুণ গ্রন্থের একটি শ্লোকে—

‘বংশপত্রিকা—মধুরা শীতলা পিত্তঘনী,  
রক্তদোষহরী রুচ্যা পশুদুগ্ধস্য বান্ধনী।’ (রাজনিঘণ্ট)

প্রথমোক্ত ও শোষোক্ত কার্য দু'টি পিটিউটারিয়ার ও পিটিউটারী গ্রন্থির প্রধান কাজ। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই পিটিউটারী গ্রন্থিকে ‘মাস্টার গ্ল্যান্ড’ বলে থাকেন, কারণ এটির বহুদুগ্ধী ক্রিয়া বহুগ্রন্থির উপরে।

গরুর পাতলা দান্ত হলে গো-বৈদ্যরা এর পাতা খেতে দেন, এটি ধারক।

(২) অশ্বের যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে গায়ে তেল মাখিয়ে বাঁশ পাতা-সিন্ধ জলে

অবগাহন করতে বলেছেন আগ্রয় ঋষি (চরকে)। এ ভিন্ন নানা প্রকার রোগে এই বাঁশ-পাতার লৌকিক ব্যবহার হয়ে আসছে, তার মধ্যে কতকগুলি বনোঁষধির গ্রন্থে উল্লেখ আছে। যেমন—গে'টেবাতে (Gout) কচি পাতা বেটে গরম করে প্রলেপ দিলে ব্যথা ও ফলা দুই-ই কম যায়। এইভাবে ফোড়া ফাটিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা ঘায়ে (ক্ষত) পোকা হলে বের করে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৩) ইউরানি গ্রন্থে লেখা আছে—পাতার রস মধু মিশিয়ে খেলে কাসি ভাল হয়।

(৪) বাঁশের শিকড় (মূল):— (ক) অন্যান্য বনোঁষধির সঙ্গে ব্যবহার হয় মূত্র-কৃচ্ছ্র (strangury) ও শোথ রোগে (oedema)। তামিল বৈদ্যরা বলেন—এটি ডাইলুয়েন্ট অর্থাৎ ঘন পদার্থকে তরল করে। (খ) কুকুর বিষে—এই শিকড় ও ধলা আঁকড়ার (Alangium salvifolium) শিকড় গোদুগ্ধে বেটে ব্যবহার করতে বলেছেন ভাবপ্রকাশকার (ষোড়শ শতকের গ্রন্থ)।

(৫) বাঁশের গোড়া (মূলের স্খলাংশ):— পুড়িয়ে ছাই করে চামেলী বা তিল তৈলের সঙ্গে মিশিয়ে টাকে ব্যবহার হয় এবং এই কয়লা দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ি ভাল থাকে ও দাঁত চকচকে হয়—এটা ইউরানি সম্প্রদায়ের গ্রন্থে লেখা দেখি।

(৬) বাঁশের ঝক্ (সবুজাংশ):— যাকে আমরা নীল বলি। এটায় পীড়কা আরোগ্য করে। (Watt.) বাঁশের নীলের ধোঁয়া খেলে হাঁপানির টান নষ্ট হয়।

(৭) বাঁশের কাঁটা— বেউড় বাঁশের (Bambusa spinosa) কাঁটা বেটে ফোড়ার চারধারে লাগালে ফোড়া পেকে যায়।

**বংশলোচন:**— কৃষ্ণবদন্তী শূর্নি—স্বাতী নক্ষত্রের জল বাঁশের মধ্যে পড়লে নাকি বংশলোচন জন্মে; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি—এ দেশের ২।১ শত পাকা বাঁশের মধ্যে মাত্র ২।৪টিতে পাওয়া যায়, তাও কালো কাদার মত। কিন্তু আমরা ব্যবহারের জন্য যেটি সর্বদা কিনে থাকি, সেগুলির জন্মস্থান জাভা-সুমাত্রা স্বীপ অঞ্চলে। এগুলি যখন আসে, তখন দেখতে অনেকটা ফ্যাকাশে রঙের ভাঙা ভাঙা ছোট কাঠকয়লার মত। এখানে সেটাকে পুড়িয়ে সাদা চকচকে করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষকের মতে—এটির মধ্যে আছে ৫০ ভাগ সিলিকা, বাকী ভাগ পটাশ, আয়রন, অ্যালুমিনিয়া ও জল। ঔষধার্থে আমরা চূর্ণ করে ব্যবহার করি—কফজনিত ক্ষয়রোগে ও কাসিতে। এটি চ্যবনপ্রাশেরও একটি অন্যতম উপাদান। আর ইউরানি সম্প্রদায় ব্যবহার করেন বৃষ্য (Aphrodisiac) ও বলকারক রসায়ণ হিসাবে। নামটি তাঁদের 'তাবাশির'। বৈদেশিক মদ্যের অভাবে আমদানী বন্ধ থাকতে এ দেশে নকল তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে আসলের দম ১০০ টাকা কিলো, আর নকলের দাম ৮।১০ টাকা মাত্র।

এ প্রশ্ন আপনাদের সকলেরই মনে আসা স্বাভাবিক যে, রোগ-প্রতিকারে এই বনোঁষধির যথাযথ নির্বাচন কি করে সম্ভব হয়েছিলো—তখন তো এরকম ল্যাবরেটরী ছিল না?

হ্যাঁ, ছিল না সত্যি, কিন্তু তাঁরা একটা জিনিষ অধিগত করেছিলেন, সেটা হচ্ছে দেহের অগ্নিতত্ত্ব (Metabolism) সম্বন্ধে।

বর্তমান ল্যাবরেটরিতে বৃদ্ধিমান মানবের মস্তিষ্ক-প্রসূত বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার কৌতূহল নিবারণের জন্য যেসব উপায় গৃহীত হয়, সেই সুপ্রাচীন ভারতের উন্নত চিন্তাশীল মানবগণ বস্তু-বিজ্ঞানের এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মৌলতত্ত্ব অধিগত করার জন্য ভূমি, অগ্নি, মেঘ, সূর্য, দেহ ও আকাশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বভাব বিশ্লেষণী শক্তির উপর প্রতিটি ক্ষেত্রে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতেন। বেদে তারই উল্লেখ ভূরি ভূরি।

কয়েকটি নমুনা দিই—(১) ঋক্ ৫ম/১১৭ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে আছে—

‘আপো বাক্ আপো ঋত্বিক্ তনুৱাতাতানো ঔষধীঃ মেঘঃ সংপ্লিয়াম ।’

সায়ণ ভাষ্যঃ—

ঔষধীঃ উশ্ণিভজঃ আপঃ বাক্চ ঋত্বিক্ তনুং আতনোতি মেঘ-  
সংপ্লিয়াম ।

অনুবাদঃ— ঔষধীসকল, জল এবং ঋত্বিকের বাক্য ও দেহ এবং ভূমির তনুকে  
মেঘ সংবহন করে, শক্তিবর্ধন করে। এই সূক্তটির অনুশীলন করে সংহিতায়ুগে প্রতিটি  
ভেষজকে নিজেদের দেহে প্রয়োগ করে এবং ভূমির গুণগত তারতম্যে তাদের গুণ-ক্লিয়া  
বীর্ষের যে তারতম্য হয় এবং মেঘের ও জনগণের দেহে যে তারতম্য, তার বল-বীর্ষেরও  
তারতম্য হয়—এই অনুশীলনই করেছেন।

(২) অর্ক ও বংশ (বাঁশ) তার একটি নমুনা—এই বাঁশটিকে ধরে ঋক্বেদ  
(১৭।২০।৫২ সূক্তে বলেছেন—

‘আতং ইন্দ্রায় পর্বন্তং সুপর্বঃ তৃণকেতুকঃ বলায় তিতৃৎসান্ ।  
শকৃৎসং সহস্রধারাং মহীং সহস্রধারাং অপাং পুরুপুত্রাং বৃহতীং  
দৃদৃক্ষু ॥’

ভাষ্যকার সায়ণ লিখেছেন—

‘হে ইন্দ্র তে আপনন্তঃ=সুপর্বঃ=তৃণ কেতুকং বংশঃ বলায় তিতৃৎ-  
সান্ । ধনু রুদ্রম্য দেহবলং বিদধ্যাৎ । স সহস্রধারাং মেঘৈঃ সহ  
সহস্রপর্বং অপাং পুরুপুত্রাং কুর্যাৎ । আপনন্তঃ সুপর্বঃ বংশঃ  
শ্লেষ্মাঘাতিনঃ দীপনাঃ ভবেয়ুঃ । শ্লেষ্মাদাহঃ ইতি তহ ঘৃণ্তি  
শ্লেষ্মনঃ ।’

অনুবাদঃ— হে ইন্দ্র, এই তৃণ কেতুবংশ ইনি। ইনি সুপর্ব। এ’র দ্বারা তোমার ধনু-  
বল বৃদ্ধি পাবে। মেঘের সহস্রধারায় এর সহস্রধারার পর্বগুলি গঠিত হয়। এর দ্বারা  
ধেনু-দোহন সুখদা হয়। পুত্রবতী হয়। ইনি সর্বদা দীপনশীল, শ্লেষ্মাঘাতী। শ্লেষ্মা  
=দাহঃ। দাহ দূর করে।

বৈদিক সূক্তটির দ্বারা বাঁশকে অবলম্বন করেই ভূমি ও মেঘাদির গতি-বিধিতে  
ভেষজের বলবীর্ষ ও কার্যকরী শক্তির অনুশীলন করে। সংহিতাকারগণ আরও এগিয়ে  
বলেছেন—সূত্রভূতের সূত্রস্থানের ৪৫ অধ্যায়ে। বাঁশের কন্দর, বাঁশের পাতার গুণ  
সম্বন্ধে নিরীক্ষণের ফল জানানো হয়েছে। বংশকবীর, বংশতণ্ডুল, বংশত্বক্, বংশ-  
দল, বংশধান্য বা বংশবীজ সম্বন্ধে আরও গবেষণার ফল ভাবপ্রকাশের সময়েই বেশী  
হয়েছে। এর পাতা দিয়ে পাখা তৈরী করে সেই পাখার হাওয়া শরীরে লাগলে শরীরের  
বায়ু-পিণ্ড বৃদ্ধি পায়—এটির মূল সূত্র পাওয়া গেছে বৈদিকসূক্ত অর্থাৎ সায়ণ ভাষ্যের  
‘আপনন্তঃ’ এই সূত্র থেকে।

সমস্ত রোগের প্যাথোলজি তারই মধ্যে নিহিত। আর দ্রব্যবিচারও হয়েছিল  
অগ্নিতত্ত্বের ভিত্তিতে।

দ্রব্যগুণ সম্পর্কে যে যাই অনুসন্ধান করুক না কেন, উৎস তাঁদেরই সেই উৎস-  
সম্ভাত জ্ঞান-বিচারের।

## CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Terpenoids viz. lupeol, betaamyirin, alphaamyirin, friedelin, taraxerol, alphaamyirin methyl ether, ferneol. (b) Polysaccharides. (c) Other constituents viz. 2-furaldehyde, lignins hemicellulose, holocellulose, miliacin, glutinone, glutinol, cylindrin, crusgallin, cholin, betain, cyanogenetic glycoside. (d) Sterols viz. betasitos-terol, stigmasterol. (e) Acids viz. oxalic acid, benzoic acid.



## কদম্ব

অশ্বথ, বট, পাকুড়, শাল্মলী, শমী, জয়ন্তী প্রভৃতি প্রখ্যাত বৃক্ষগুলির ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠালাভের মূলে আছে জানপদিক ভূমিরক্ষায় তাদের অসাধারণ দক্ষতা, তাই তারা কেউ গীতা, কেউ ভাগবত, কেউ বা মহাভারত, আবার কেউ বা রামায়ণের পৃষ্ঠায় পবিত্র ও স্মরণীয় বৃক্ষরূপে চিহ্নিত হ'য়ে আছে ঠিক এমনিভাবেই :—

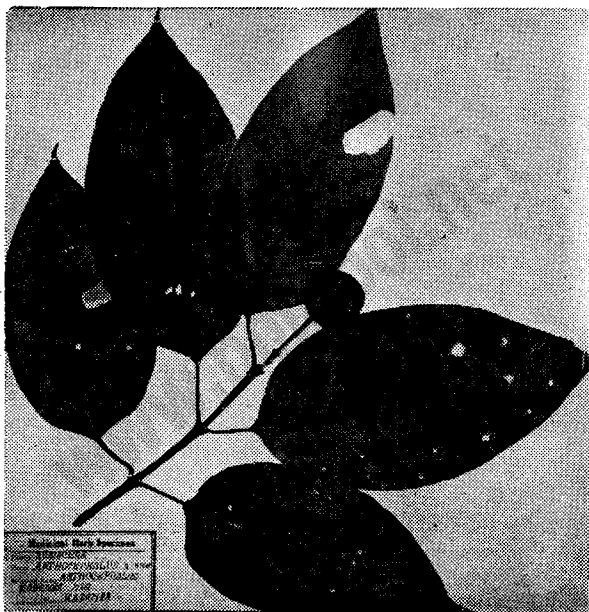
রাধাকৃষ্ণের লীলাবাদের উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে কদম্ব বৃক্ষও আমাদের কাছে পরিচিত। কদমতলায় ভক্তিরসের দৃষ্টি দিব্যমূর্তির সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুণি আমাদের মনের রসতন্ত্রীগুলিকে উন্মেষিত করে তোলে আজও।

কিন্তু এই গাছটি যে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেও জড়িত এবং তার আর একটা দিকও আছে—সমাজের কল্যাণসাধনে, সে দিকটা আমাদের মধ্যে অনেকের অজানা রয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এই বৃক্ষের নামকরণের মধ্যেও কি অপূর্ব বিচক্ষণতা, এ কথা বাস্তব ধর্মনিরাগিদেরও ভাবতে হয় যে, প্রাচীন যুগে দ্রব্যগুণের অনুভূতিলব্ধ

যোগজ্ঞ অথবা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানও তো আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে। বৃক্ষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবই বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতপ্রকার রোগ নিরাময় করে। নীরব এই কদম্ব বৃক্ষটি শীতাতপসহিষ্ণু হ'য়ে বর্তমানে শৃঙ্খল আমাদের কাছে কাঠের উপযোগিতাই জানিয়ে প্যাকিং-বাক্স ও ব'সবার পিঁণ্ড তৈরীর কাজে আত্মদান ক'রে আসছে।

কিন্তু প্রাচীনকালে সে অতিবৃদ্ধ প্রাপিতামহের স্বগোষ্ঠও ছিল, কারণ কদম্ব তো বৈদিক শব্দ।

‘বনেষু বান্‌তরিক্ষং এতান্ কদম্বং বাজমবৎসু পয় উৎপ্রিয়াসু  
অদধ্যাৎ সোমমদ্রৌ’। (শুক্ল যজুর্বেদ—৪।৩১)



মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ঋং কদম্বঃ কদি=অচ, অম্বং=বৈবশ্যকরং। বান্‌তরিক্ষং বাজং=বীৰ্য্যং ততান। তথা অরবৎসু বাজং=বীৰ্য্যং বলং ততান। পয়ঃ শীকরোৎক্ষিপ্তং বায়ুং রেণুং উৎপ্রিয়াসু পদমস্‌সু ততান। ঋং অদ্রৌ ভূসু সোমং অদধ্যাৎ। বৈবশ্যং করোঁসি। ভূসু=পৃথিবী, সোমং=রসং ধারয়সি।



উপরিউক্ত ভাষাটির অর্থ হ'লো—তুমি কদম্ব। তুমি বিবশতা আন পৃথিবীতে। অন্তরিক্ষে অর্থাৎ শূন্য স্থানে (ক্ষয় জন্য শূন্য স্থানেও) বর্ষ্য স্থাপন কর। বায়ুদ্র মধ্যে রেণু ছাড়িয়ে অপরের দেহ-মনে বলাধান কর। তুমি পর্বতে ভূমিতে জন্ম নাও।

### বৈদিক সূত্রে লক্ষ্যীয় কয়েকটি শব্দ

অর্থে পাই কদম্বরেণু শরীরে বলাধান করে, মত্ততা আনে, অদ্বি অর্থাৎ পর্বতে এবং মাটিতে ওর জন্ম প্রভৃতি।

অনুশীলন করে পাওয়া যায়—বর্ষা, শরৎ ঋতুতে যখন প্রাকৃতিক কারণেই আমাদের শরীরে বলহানি ঘটে, তখনই প্রাকৃতিক ভৈষজ্য কদম্বরেণু ও কদম্বকুসুমের ব্যবহার করা কর্তব্য। তা ছাড়া রাখাক্ষের উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও কদম্বের ফল সুগন্ধ এবং মধুর, তাও গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাব্যে ‘প্রোড়া কদম্বানিলাঃ’ (কাব্য প্রকাশ) ‘ছান্না-বন্ধ কদম্বকং মৃগকুলং’ (মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে ২।৬) রঘুবংশ কাব্যের ১৫।৯৯; মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘের ২৫ শ্লোক ‘প্রোড় পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ’, ঋতুসংহার ২।৪ ‘বিকচনবকদম্বম্’-এ। তাই বৃক্ষটি যে অনেকদিন থেকেই প্রখ্যাত হ’য়ে র’য়েছে এ তো স্পষ্ট।

প্রাচীনগণ দেখেছেন—এ বৃক্ষ গিরিকদম্ব ও ভূকদম্ব এই দুটি নামে প্রখ্যাত হওয়া ছাড়া তার আর একটি প্রজাতির (species) কদম্বকেও তাঁরা দেখেছেন। বৃক্ষটির প্রকারভেদে মতভেদ থাকলেও ধারাকদম্ব (*Anthocephauls indicus* A. Rich.) ও কেলিকদম্ব (*Adina cordifolia*) এই দুই প্রকারেই তাকে দেখা যায়; এরা একই (*Rubiaceae*) ফ্যামিলিভুক্ত।

কদম্বকে সাধারণ ভাবে নীপ বলা হয়ে থাকে, আবার নীপ অর্থে গিরির অধোভাগ, এসব অঞ্চলে বেশী জন্মাতো বলেই সম্ভবতঃ তার আর একটি নাম নীপ রাখা হয়েছে।

নাম-আহাঙ্গ্য:—‘যে কোন নামের শব্দ-নির্বাচন এবং সংগঠনের একটি তাৎপর্য ছিল, সেই হিসেবে এই কদম্ব হ’চ্ছে ‘কত্’ (বিবশতা) থেকে ‘কদি’ আর অম্বচ্ একটি প্রত্যয়, এই প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে এর নাম সৃষ্টি। এর সমষ্টিগত অর্থ হ’চ্ছে অসাড় (বিবশ) করা। এখানে প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি—এই কদমপাতা সম্পর্কে আমার অনু-সন্ধানের উৎস একদা এক বৃক্ষার মূখে আবেদন শুনে—“দুটো কদমপাতা পেড়ে দেবে বাবা, নাতিদের কিরমি (ক্রিমি) হ’য়েছে, খাওয়াবো।”

### সংহিতা রচনার যুগে

চরকের সময় (অর্থাৎ আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয়) বলা হয়েছে—হাত-পায়ের তলায় জ্বালা বোধ হলে এবং সেই জ্বালার পাতলা চামড়া উঠে গেলে ঐ পাতার রস মাখালে অবশ্য কমে যায়। চরকীয় চিকিৎসা পদ্ধতির যুগের গবেষণায় দেখা যায়—ব্রণ ঢেকে রাখার জন্য কদমপাতার ব্যবহার। বাখা নিরাময়ে বেসব বনৌষধির ব্যবহার হয়েছে, কদমপাতা তার মধ্যে একটি।

তা ছাড়া এটিতে যে আরও বহু রোগনাশক শক্তি আছে, সেটা বলা হ’য়েছে সুশ্রুত। সুশ্রুতের বক্তব্যকে অনুশীলন করে পাওয়া যায় যে, এর বাতনাশক শক্তি আছে; এই অংশটুকুকে গবেষণা করে পরবর্তী চিকিৎসকবৃন্দ বুঝেছেন—বাতনাশক অর্থ শ্লেষ্মা সম্ভবত এবং অমাবস্যা তিথিতে বর্ধিত একপ্রকার রসগত রোগ। তাকে উপশমিত

করে, কারণ গ্রন্থিস্ফীতির সঙ্গে ব্যথা বুঝলেই কদমপাতার সেক এবং কদমপাতা গরম করে ফুলো জায়গায় বেঁধে রাখলে ফুলো এবং ব্যথা কমে, এ ব্যবহারের আদি উৎস সন্দেহাত থাকেই। কিন্তু কৃমিনাশক ঔষধার্থে কোথাও এটির ব্যবহার হয়নি। বর্তমানে এই গাছটি চিকিৎসক বা জনসাধারণের কাছে যে খুব দরকারী—এমন প্রচার নেই।

**গ্রামীণ ব্যবহারঃ—** (১) কোষবৃদ্ধিতে (Hydrocele) অনেকে কদমপাতা বেঁধে থাকেন। এখান আমার বক্তব্য হচ্ছে—যদি গাছের ছালকে (স্কক) চন্দনের মত বেটে কোষে লাগিয়ে তারপর কদমপাতা দিয়ে বাঁধেন, তাহলে ব্যথা ও ফোলা দুই-ই কমে যাবে।

(২) শিশুদের কৃমিতে এই পাতার রস খাইয়ে থাকেন, কিন্তু বয়সানুপাতে মাত্রা বেশী হলে বমি হতে পারে, এ ক্ষেত্রে সব থেকে নিরাপদ—পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে খাওয়ানো। ৪।৫ বৎসরের শিশুদের ৩ গ্রেণ মাত্রায় সকালে একবার খাওয়ানো যায়; যদি না কমে তাহলে সকালে ও বিকালে ২ বার দিতে হবে। সপ্তাহ মধ্যে উপদ্রব কমে যাবে। এটায় প্রত্যহ মলের সংগে কিছু কিছু বোরিয়েও যাবে, এমন-কি কেঁচো ক্রিমি বা গোল ক্রিমি (Round worm) ও সূতা ক্রিমি (Thread worm)—বেরুতে দেখেছি।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি—পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্রিমিনাশক ঔষধের দু'টি ধারা আছে। একশ্রেণীর ঔষধ পোকাগুলির জীবনক্রিয়াকে স্তব্ধ করে (Metabolic poison) তাদের মৃত্যু ঘটায়; এদের বলা হয় ভারমিসাইডস্ (Vermicide)। এটির ব্যবহার কিন্তু সীমিত। আর এক শ্রেণীর ঔষধ—যেগুলি ক্রিমি কীটের মৃত্যু না ঘটিয়ে কীটগুলিকে অসাড় করে, ওদের ক্রিয়া অনেকটা নারকোটিক ধরণের; এগুলিকে বলা হয় ভারমিফিউজেন্স্ (Vermifuges)। আমাদের কদমপাতা এক্ষেত্রে শেষোক্ত ধরণের কাজ করে।

(৩) **অর্বুদে (Tumour):—** কচি ছাল চন্দনের মত বেটে সহায়ত গরম করে লাগালে কমে যেতে থাকে, ব্যথা থাকলে সেটাও সেরে যায়।

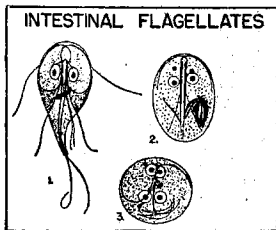
(৪) যদিও মূখে মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ হয়, তাঁরা কদম ফুল কয়েকটা নিয়ে কুচিয়ে কেটে জলে সিদ্ধ করে সেই জল দিয়ে দিন-রাত্রে কুঞ্জ করলে অবশ্যই তা দূর হয়।

(৫) ওয়াট সাহেবের বইতে লেখা—তদানীন্তন যুগের সার্জেন ডাঃ আনন্দমোহন মুখার্জি লিখছেন—শিশুদের মূত্থের ঘায়ে ও স্টোমাটাইটিসে (Stomatitis) কদমপাতা-সিদ্ধ জলের কবল ধারণ (মূত্থে রাখা) বা কুলকুচায় শীঘ্র সেরে যায়। এই গাছের ছাল জ্বরে ব্যবহার হয় এবং টানিকেরও কার্য করে, এ ভিন্ন বহু রোগের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার করা হয়েছে।

(৬) **নেশার আশায়ঃ—** আজকালকার কথা নয়, সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের যুগ থেকে চলে আসছে। গাছের ছালে গর্ত করে শুকনো ছোলা ও লবঙ্গ পুড়ে রাখা হতো, পরদিন ছোলাগুলি কদমের রস টেনে ফুলে গেলে সেগুলি খাওয়া হত। এটাতে অল্প নেশাও হয় এবং বৈবশ্য (বিবশতা) সৃষ্টি করে। এখনও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে গাঁজার কলিগুলিকে কদম গাছের গায়ে পুঁতে রেখে পরের দিন যথানিয়মে সেবিত হয়ে থাকে। তাই তাকে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে সেকালের কোকেন।

**নুতন তথ্যের সম্বন্ধেঃ—** কদমগাছের ছালে (স্ককে) সিনকোনার সহধর্মী দ্রব্য পাওয়া যায়, এটি পাশ্চাত্য ভেষজ-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষিত। এই সিনকোনা ও কদমগাছ এ দু'টির

ফ্যামিলী একই (Rubiaceae) এবং আলোচ্য বনৌষধিটি বিবশতাকারক, সেজন্য কোতুহলবশতঃ কদম্বছালের ট্যাবলেট জিয়ারডিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যে এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়েছিলাম, তিনি রিপোর্ট দিলেন যে, ১২ দিনের মধ্যে নেগেটিভ হয়ে গিয়েছে। তবে দেখা যায়—কচি ছালে উপকার বেশী হয়। আবার ঋতুভেদে দ্রব্যের গুণ কম-বেশী হয়।



চরকঃ— (১) ব্রণাচ্ছাদনার্থ কদম্ব পত্রঃ— কদম্বের পত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে।

(চ. চি.—১৩অঃ)

(২) মূত্রে বৈবর্ণ্য ও কৃচ্ছ্রতায় কদম্বঃ— কদম্বের ক্বাথ ও গব্যদুগ্ধ সহ যথাবিধি ঘৃত পান করিলে মূত্রে বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রতা নিবৃত্তি পায়।

(ঐ. চি.—২২ অঃ)

(৩) কদম্বের ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহার ছালের চূর্ণ, অহিফেন ও ফিটকারি সমপরিমাণে মিশাইয়া অক্ষিকোটরের চতুর্দিকে দিলে চক্ষুপ্রদাহ আরাম করে (Dymock)।

(৪) কদম্ব পত্রের ক্বাথ ক্ষতে ও মূত্রে ঘায়ে দিলে সেরে যায়।

(৫) কদম্ব ত্বকের রস জ্বরীচূর্ণ ও চিনির সহিত সেবনে শিশুর বমন নিবারিত হয়।

(৬) জ্বরের প্রবলবিপ্লবঃ— যখন অতিশয় পিপাসা হয়, তখন কদম্বফলের রস সেবন করলে পিপাসা নিবারিত হয় (R. N. Khory)।

(৭) কোন স্থানে বেদনা, শূক্ৰশোথ ও বমনের জন্য কদম্ব-নির্যাস হিতকর। (চরক)

(৮) কদম্ব পাতার কষকঃ— বালকদিগের মূত্রে ঘায়ে এবং যেকোন মূত্রে ঘায়ে 'কুল্লি' হিসাবে ব্যবহারে উপকার হয়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Acids viz., quinonic acid, cinchotannic acid. (b) Tannins.



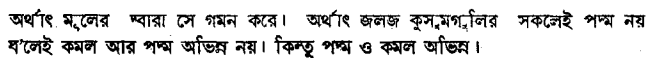
## পদ্ম

প্রকৃতির রূপ, কালের রূপ, দেহের রূপ, বয়সের রূপ, কোথায় না রূপের প্রশস্তি; কিন্তু ভূষণে ভূষিত না হ'লেও যে সবারই দৃষ্টি ও মনকে টানে সেও তো রূপ। হয়তো বা রূপের আসল ব্যাখ্যা তাই; এই যে কমল, তারও সমাদর ওই রূপের জন্য, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—পদ্মের কি শুধুই রূপ? নাকি ওকে রূপক করার জন্যই তার রূপের প্রশস্তি; কিন্তু এত কথাই মধ্যে ঘুরেফিরে আসে—ওসব রূপাভিলাষ তো কবিরই মানসক্ষেত্রে। হ্যাঁ, তা কেবল কবিই দেখেছেন, কিন্তু তার ঠৈষজ্যাগুণের বিচার ক'রেছেন বৈদ্যককুল। রূপের বন্দনা করার সময় কোথায় তার? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বাধা দূর ক'রতে একমাত্র বৈদ্যকেই অগ্রসর হ'তে হয় রোগ নিরাময়ের পথ বেছে নিতে। তিনি স্পষ্ট বলেন, পাথরের কালো নুড়ি হ'লেই যেমন শালগ্রাম শিলা হয় না, তার বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে চাই, সেইরকম তো কমলও; রূপময় কুসুমরাজির মধ্যে কমলও একটি, এর আরও নাম আছে এবং তার প্রকারভেদও আছে। এটির রং প্রধানতঃ সাদা, লাল ও নীল হয়, তবে নীল কমলের অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে; আবার মিশ্রবর্ণ ও আকৃতি ভেদে আরও পাঁচ প্রকার পদ্মের নামোল্লেখ দেখা যায়। যে সব জলজ ফুল সুবোধদয়-বিকাশী অর্থাৎ দিনের বেলায় ফোটে, তারাই প্রচলিত ভাষায় পরিচিত পদ্মের পর্যায়ভুক্ত; আবার অনেকটা এই ধরনের যে সব জলজ ফুল রাত্রিবেলায় ফোটে, তারা কুমুদের (শালুক বা সাঁপলা) গোষ্ঠীভুক্ত; এদেরও পৃথক নাম আছে এবং গুণেরও তারতম্য আছে। এক কথায় জলজ কুমুদের ঐক্যবন্ধ নাম কমল বলা যেতে পারে; কেন তা পরে বলছি, তবুও কমল আর পদ্ম নাম অভিন্ন।

নামের তাৎপৰ্য—

কং=জলং অলতি=ভূষয়তি=কমলং,

পদ=মূলং তেন মনতে=সপর্ণিত



আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন—পদ্মের কন্দ থেকে ফেঁকড়ি (একে মৃণাল

বলা হয়) বেরিয়ে আবার আর একটি গাছের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই তার নাম পদ্ম রাখা হয়েছে। এই অর্থেই কমল ও পদ্ম নাম অভিন্ন।

### বৈদিক সমীক্ষা:—

‘যদুস্তায় সবিতা দেবান্ সূর্যতো ধিয়াদিবং পদ্মং সবিতা  
প্রসূবাতি তান্’ (অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প ৩।৫।৭ সূক্ত)

### মহাধর ভাষা:—

সবিতা (সূর্যঃ) প্রেরয়িতা প্রজাপতি বা তান্ দেবান্ ধিয়া দিবং  
পদ্মং যথা প্রসূবাতি সর্বতঃ নিয়ম্য বৃদ্ধিধিয়া বৃদ্ধ্যা যথা প্রকাশয়তি  
তথা পদ্মং চ রসবদ্ অপি তন্নিরসা বিকাশয়তি।

এর অর্থ হ’ল—সূর্য বা প্রজাপতি যেমন দেবতাদিকে রস বিষয়ের মধ্যে থেকেও তাদিকে  
বৃদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত করেন, তেমনি সূর্য জলপদ্ম কমলকে জলের মধ্যে রেখেও  
নিজ তেজগুণের দ্বারা বিকশিত করেন।

**পরবর্তী সমীক্ষা:—** বৈদিক সূত্রের অন্তর্নিহিত তথ্যকে সূক্ষ্মরূপে রোগ-  
প্রতিকারের কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। ওখানে হ’ল পদ্ম প্রকৃতিগত জলজ কুসুম  
হ’য়েও সূর্যের তেজপ্রভাবেই সে বিকশিত হয়; আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ পিত্ত ও  
শ্লেষ্মা যখন বিকারগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ শ্লেষ্মাক্রান্ত পিত্ত তেজ বা অগ্নিবল হারিয়ে  
ফেলে, তখন পদ্মফুলের সেই তেজপ্রভাব তাকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর এক কথা জানিয়ে রাখি, যে কোন দ্রব্যের জন্মকাল ও জন্মস্থান  
ভেদে কালজ ও স্থানজ শক্তিটি তার অন্তর্নিহিত হ’য়েই স্বতন্ত্র দ্রব্যান্তির গুণগত  
পার্থক্য সৃষ্টি করে। এটা অনুদ্রুপভাবে প্রতিটি জীবদেহেও থেকে অনুকূল বা প্রতিকূল  
অবস্থার সৃষ্টি করে।

এই যেমন গম ও ধান—দুটি সর্বভারতীয় মানুষের খাদ্য, কিন্তু একটির জন্ম  
প্রধানভাবে বর্ষাকালে, অন্যটির হেমন্তকাল।

ডায়াবেটিস (Diabetes) হ’লে আমরা রুটি খেতে দিই, কিন্তু ভাত খেতে নিষেধ  
করি। আবার শর্করতা রোগে ভাত পথ্য দিই, কারণ ভারতীয় চিকিৎসার চিন্তাধারা  
হ’লো—যারা হিমবর্ষে সিন্ধু ও সূর্যের তেজে শর্করভূমিতে জন্মে (একে রবিশস্যও  
বলা হয়), তারা তেজগুণসমৃদ্ধ হয়; আর যারা বসন্তকালে (বর্ষাকালে) জন্মে, প্রায়  
ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে সৌম্যগুণের আধিক্য থাকে।

এই ডায়াবেটিস রোগটিতেও সৌম্যাতুর আধিক্য থাকায় এটার ব্যবহার সমীচীন  
নয়; ঠিক এমনিভাবে অপতর্পণজনিত রোগে উপবাসোখ রোগে শর্করতা এলে তাকে  
অন্ন বা ভাতই খাদ্য দিতে হয়। শর্কর খাদ্যেই নয়, রোগের ক্ষেত্রে এবং কোন ওষধির  
বিচারেরও এটি একটি দিক। ভিন্ন প্রদেশেও এইভাবে পথ্যের বিবর্তন ঘটাতে হয়।

**জাতি ও কুল:—** এই জলজ উদ্ভিদটির সাধারণ পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের  
কোন অবকাশ নেই। সমগ্র ভারত ও তৎসম্বন্ধিত অঞ্চলে সাধারণতঃ পুরাতন পাক-জমা  
পুকুরে, বিলে বা ঝিলে জন্মে।

কোন কোন অঞ্চলে এক এক রঙের পদ্মফুলের প্রাচুর্য দেখা যায়। এই ফুলের  
রঙের পার্থক্যের জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ নামও আছে, যেমন—শ্বেতপদ্মের নাম  
পদ্মবীক, রক্তপদ্মের কোকনদ, নীলপদ্মের ইন্দীবর ইত্যাদি; এর অঙ্গভেদে নামও

পৃথক—যেমন কচিপাতার নাম সংবর্তিকা, কেশরের নাম কিঞ্জলক, পদ্মপনিঃসৃত রসের নাম মকরন্দ ইত্যাদি; এদের প্রত্যেকেরই গুণগত পার্থক্যও আছে। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় হ'ল—শ্লশপদ্মের সঙ্গে কিন্তু জলপদ্মের কোন সম্পর্ক নেই। ওটির বোটানিক্যাল নাম—*Hibiscus mutabilis*, ফ্যামিলি *Malvaceae*। কিন্তু আলোচ্য এই পদ্মের বোটানিক্যাল নাম *Nelumbo nucifera Gaertn.*; ফ্যামিলি *Nymphaeaceae*। এই জলজ উদ্ভিদটির মূল থেকে ফুল পৰ্যন্ত প্রতিটি অংশই রোগ-প্রতিকারের কাজে লাগানো হয়েছে।

### গুণপদ্মা (গুণ এখানে ব্যবহারগত প্রশংসা)

(১) পদ্মের পাতা (সহজ প্রাপ্য হ'লে) গরীবের ভোজনপাত্র বা তীর্থস্থানের প্রসাদ বিতরণের পাত্র হিসাবেও এর ব্যবহার আজও চলে আসছে, কিন্তু রোগ-প্রতিকারে তার বিশেষ উপযোগিতাও আছে—এ তথ্য ঋষিকল্প কবিরাজ গঙ্গাধরের শিষ্যধারার জানা। তাঁরা শ্বেতী রোগীকে (শিব রোগে) কচি পদ্মপাতায় গরম ভাত ঢেলে খেতে বলেন। এ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহকালে এইটুকু জানতে পেরেছি যে, রাঢ় অঞ্চলে লৌকিক টোটকা ঔষধ হিসাবে এর ব্যবহার এখনও প্রচলিত। রোগের প্রারম্ভে একনাগাড়ে এই পাতায় গরম ভাত ঢেলে খেতে হয়; কিন্তু বর্তমানকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এ ব্যবস্থা হয়তো সকলের পক্ষে সম্ভব হবে না সত্যি, কিন্তু গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে, পদ্মপাতায় কোন মিষ্টদ্রব্য বেঁধে রাখলে পরদিন তার স্বাদ পরিবর্তিত হয়। এটা সংযোগ-বিকার। আমরা আয়ুর্বেদের সেই সূত্রগুলির পুনরুজ্জীবনে অসমর্থ হ'য়েছি, যে সূত্রগুলির ম্বারা জানতে পারি কেন এমন হয়, কি আছে এর মধ্যে।

(২) জন্মের দাছে— পদ্মপাতার উপর শুয়ে থাকলে গানের জ্বালা কমে যায়। এটা চরকের ব্যবস্থা।

(৩) হারিশে (এও এক ধরনের অশ্রোগ) (Rectal prolapse)—যেসব শিশুর পায়খানার সময় মলম্বারের উপর অংশ খানিকটা বেরিয়ে আসে (যাকে গ্রামাঞ্চলে হারিশ বা হালিশ বলে); সে ক্ষেত্রে কচি পদ্মের পাতা (যেগুলি তখনও প্রসারিত হয়নি) ৩—৮ গ্রাম মাত্রায় (বয়সানুসারে) অল্প চিনির সঙ্গে খেতে দিলে ওটি আর বাইরে আসে না। এ ব্যবস্থা কিন্তু আজকালের নয়, একাদশ খৃষ্টাব্দ থেকে ব্যবহার হতে আসছে। এভিন্ন অনেক বৃদ্ধ বৈদ্য এই রোগে পদ্মের কচিপাতা বেটে কিছু মাখন মিশিয়ে মলম্বারে কয়েকঘণ্টা করে কয়েকদিন বেঁধে রাখতে ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। (কোপীন এ'তে)

(৪) মায়ের রোগ— প্রসবের পর বা যেকোন কারণে নাড়ী সরে এলে (prolapse of uterus) পদ্মের কচিপাতা চিনি দিয়ে খেতে দেওয়াটা প্রাচীন ব্যবস্থা। এ রোগের চিকিৎসার সমাধা করার পূর্বে এটা খেয়ে দেখতে দোষ কি?

(৫) হৃৎ-শূল রোগে (Angina pectoris)—আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় বিকৃত কফ ও পিত্ত ওই ধাতু দুটি রক্তাশয় বা হৃদগত হলে বায়ুর সাবলীল সঞ্চারশীলতা স্বাভাবিক কারণেই বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শূলবৎ বেদনা সৃষ্টি করে; এ ক্ষেত্রে প্রাচীন বৈদ্যগণ পদ্মফুলের পাপড়ির রস খেতে দিতেন, এর ম্বারা হৃদগত সেই বিকৃত কফ ও পিত্ত সংশোধিত হয়—যার ফলে এই বাধা থেকে রোগী নিষ্কৃতি পায়।

(৬) রক্তপিত্ত—যাঁদের মাঝে মাঝে গলা স্ফুট স্ফুট করে, হঠাৎ মূখ দিয়ে রক্ত ওঠে বা দাঁতের সময় রক্ত পড়ে অথচ পেটে বা মলম্বারে কোন জ্বালা-বন্দনা থাকে

না, সেক্ষেত্রে পশ্ম-কেশর চূৰ্ণ ৩—৬ গ্রেণ মাত্রায় চিনি বা মধুর সঙ্গে খেলে রক্ত নিগমন বন্ধ হয়। অনেকে এর সঙ্গে একটু বাসক পাতার (*Adhatoda vasica*) রস মিশিয়ে খেতে দিলে থাকেন।

(৭) রক্তাশে— এই পশ্মকেশরই উপরিউক্ত মাত্রায় উপশমদায়ক।

(৮) চলিত গর্ভে— যাদের অকালে গর্ভপাত হয়ে যায়—সেক্ষেত্রে ৩।৪টি পশ্ম-বীজের শসি বেটে সরবৎ করে ২।১ দিন অন্তর খেলে এ দোষটি সেরে যায়।

(৯) পিত্তাতিসারে— যাদের পাতলা ও সবুজাভ দান্ত হতে থাকে—সেক্ষেত্রে পশ্মের ফেঁকাড়ি বা নাঁতর (যাকে মৃগাল বলা হয়) ২।৩ চা-চামচ রস চালধোয়া জলের সঙ্গে ১০।১২ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেতে দিলে ওটার নিবৃত্তি হয়।

(১০) প্রস্রাব রোধে— পশ্মের কন্দমূল তিল তৈলে ভেজে খেলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়; তবে এটি গোমূত্রে বেটে খেলেই আরও ভাল কাজ হয়। চরক সম্পদায় এক্ষেত্রে পশ্মফুলের কাথ খেতে উপদেশ দেন; পশ্মের অভাবে শাপলাফুল হলেও চলবে।

(১১) অনিয়মিত ক্ষতুদ্রাবে— মেয়েদের প্রতিমাসে ঋতুদ্রাবে যদি অনিয়ম ঘটে— পরে তা ক্ষতের আকার ধারণ করে, এক্ষেত্রে লাল পশ্ম বা লাল শূদ্দি (যার প্রচলিত নাম রক্তকম্বল, বোটানিক্যাল নাম—(*Nymphaea rubra*) মূলের কাথ চিনি মিশিয়ে দ্রাব চলাকালীন কয়েকদিন খেলে এ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তবে ৩।৪ মাসের মধ্যে মাত্র ঐ কটাদিনই খেতে হয়। এ সম্পর্কে অন্যান্য উপসর্গগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাহলে কখনো ব্যর্থ হয় না।

(১২) চোখের ছানিভে (*Cataract*)— প্রথমেই বলে রাখি, এমন কোন ফল নেই যার মধু নেই; কিন্তু এমন কোন একক ফুলের মধু নেই, যার রোগ-উপশমের শক্তি আছে; কিন্তু এই পশ্মফুলের মধু—যার বিশিষ্ট নাম অরবিন্দ; এই নামটিই কিন্তু তার চরিত্রগুণের দর্শন। চোখের মণির ‘অর’ (চক্ৰাকার যে বস্তু অর্থাৎ পথ) এর ককর্শ বন্ধুর অবরোধকে সে বিন্দিত—শময়িত। এখানে আর্যবেদের মূল বক্তব্য হল— তিমির রোগ, পিত্ত-শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধি—এই ফুলের মধু সেই পিত্ত-শ্লেষ্মাকে অপ-সারিত করে। ছানি পড়াও তিমির রোগের অন্তর্গত। এটাও কিন্তু সেই সূত্রভূতের সমীক্ষার আর একটি দিক। তবে রোগের সূত্রভূতে এ ব্যবস্থা না করতে পারলে ওটিকে সরানো দায়। এর সঙ্গে আর একটা কথাও ভাবতে হয় যে, দোষ সঞ্চার আর না হয়। এভিন্ন আরও কত ভৈষজ্যগুণের কথা এখনো হয়তো উদ্ঘাটিত হয়নি।

সেই বৈদিক যুগের একক ভৈষজ্য-বিধানের পরবর্তীকালে এলো বহু ভৈষজ্যের একত্র ব্যবহার—যাকে আমরা সংহিতার যুগ বলি, তারপর পরবর্তীকালে এসেছে পারদ গন্ধকাদি পার্থিবদ্রব্যের গুণগত ব্যবহার এবং মিশ্রণ করেও ব্যবহার; এর দ্বারা আর্যবেদের ভৈষজ্য চিন্তনের মৌলিক চিন্তাধারা পথপ্রস্তুত কিনা সেটা আজ চিন্তনীয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র পৃথিবীতে একক বনোৰ্ষধির সমীক্ষা আরম্ভ হয়েছে; তবে তাঁদের পরীক্ষাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের আর্যবেদীয় ভৈষজ্য নিরীক্ষাটির আজও জাগরণ হচ্ছে না।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Alkaloids viz., nelumbine, nupharine. (b) Volatile oil  
(c) Tannin.





## বুড়ি গুয়াপান

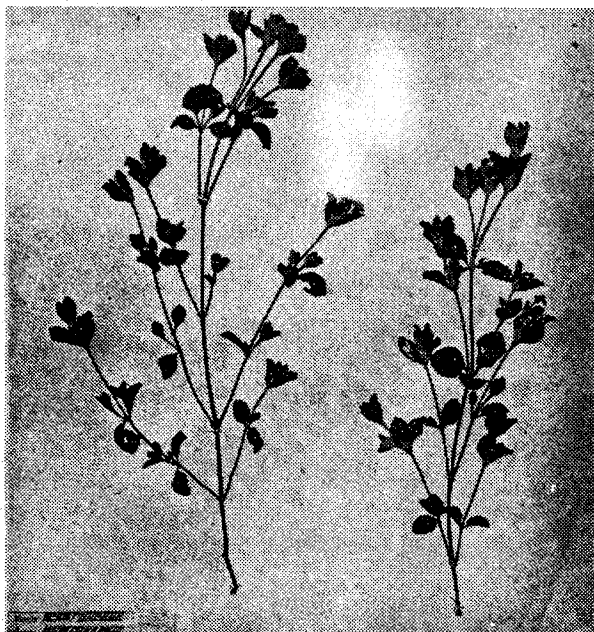
আগাছা কথাটা লৌকিক, অপরপক্ষে অ-গাছ অর্থাৎ যে যায় না; এরই পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যেটি খুবই প্রামাণ্য সূত্র থেকে সবাই নিয়ে থাকেন।

গৌতমবুদ্ধের অনুগত সম্প্রদায়ে চিকিৎসক ছিলেন জীবক; তিনি যখন তক্ষশিলায় অধ্যয়নাধী, তখন তাঁর আচার্যদেব তাঁকে বলেছিলেন যে, এমন দ্রব্যের সম্ভান করে নিয়ে এসো, যেটি ভেষজ নয়। তিনি বহুদিন ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন, 'না ভৈষজ্য-মস্তি', অর্থাৎ অনৌষধিভূত কোন দ্রব্য নেই (চরক সূত্রস্থান ২৬ অধ্যায়ে); এ কথাই উল্লেখ দেখতে পাই বৌদ্ধগ্রন্থের 'মিলিন্দপঞহ' এবং জীবক চরিত্রেও। আর্যবেরদের সংহিতা গ্রন্থ চরকে বোধ হয় এই কথারই সূত্রধারী রয়েছে। এর মারাই আমরা ধারণা করতে পারি যে, তখনকার আর্যবর্দিয়ার ভৈষজ্য শিক্ষার মান কি ছিল।

আর্যবেরদের সেই বৈদিক সংস্কৃতির যুগ থেকে আজও চলে আসছে আর একটি রীতি—মাদুলী পরা; তা হয়তো বা প্রাক-আর্যদের সংস্কার থেকে নেওয়া; তা থেকে উত্তরযুগে কত নতুন জিনিসের সম্ভান মিলেছে—আধিকপালে মাথাব্যথার জন্য মাথায় গাছের ফল বাঁধা, ন্যাবা (জন্ডিস্) হ'লে গলায় ওষধির মালা পরা, চোখে আজনি হ'লে (আঁচিল থেকে কথাটা এসেছে) সাতটি কুলপাতা চোখে ছোঁয়ানো; এ রকম অনেক টোটকার প্রভাবে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা। ও সব ছাড়াও ভৈষজ্যগ্রন্থে দেখতে পাই চেতকী জাতীয় হরীতকী হাতে রাখলে ভেদ হয়; এবং এমন বিবও আছে—যেটা গরুর শিং-এ বাঁধলে দুধ লাল হয়। এমন একটা কথার সূত্র ধরেই বুড়িগুয়াপানের যে রোগনাশক শক্তি আছে, তার সম্ভান মিলেছে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে এক চারণ বৈদ্য বললেন—এমন গাছও আছে, যার ২ ফোঁটা রস ২।৩ দিন কানে দিলে আমাশয় (Dysentery) সেরে যায়। তখন মনে হ'লো যে

বৈজ্ঞানিকযুগে এ কথা বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের আত্মপ্রত্যয় দেখে তাঁর এই সংবাদের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, তিনি এক বৃক্ষকে এই বড়িগুণ্যাপানের রসের ফোঁটা কানে দিতে দেখেছেন, এবং নিত্যই নতুন নতুন লোকও সেই বৃক্ষটির কাছে আসতো। তাঁর এ কথাটি আমার কাছে শব্দ সংবাদ হ'য়েই রইলো না, আমাকে অনুসন্ধানের প্রেরণাও জোগালো।



চিরঞ্চিত রীতি অনুযায়ী কোন উদ্ভিদ সম্পর্কে প্রাথমিক কত'ব্য হ'চ্ছে—নাম অনুযায়ী তার স্বরূপ নিশ্চয় (Identification); আবার তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গাছটি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে ও লোকপ্রমুখ্যে অনুসন্ধান করা; তাতেই জানতে পারি—একে মৃষাকর্ণী বলে। মৃষা অর্থে ইন্দুর, আর কর্ণী অর্থে কান, তাকে চলতি কথায় কোন কোন অঞ্চলে ইন্দুরকানী বা মৃষাকর্ণী বলা হ'য়ে থাকে। এ সম্বন্ধে বনৌষধির প্রাচীন গ্রন্থ রাজনিষট্টতে আথকর্ণী নামের উল্লেখ আছে, অবশ্য আথদ অর্থেও ইন্দুর, সূত্রার্থ শব্দার্থ দু'টি এক হ'লেও গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে উপরি উক্ত গাছটির কোন মিল না থাকতে, আসলে এটা মৃষাকর্ণী কিনা, সন্দেহের অবকাশ আছে। আবার কারও মতে এই মৃষাকর্ণী (ইন্দুরকানী) একজাতীয় পানা (শেওলা), মজা পুকুরে বা ঝিলে জন্মে; একে ইন্দুরকানী পানাও বলে, যেটির

বোটানিক্যাল্ নাম স্যাল্ভিনিয়া কুকুলেটা (Salvinia cucullata Roxb.)

নাগাজ্জনের যদুগে পারদ শোধনের জন্য আখরুণী'র ব্যবহার রয়েছে; এঁভিন্ন চরক সূত্রস্থান ২৭/৭৬ আখরুণী'র নামের উল্লেখ।

এই গাছটির সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অন্যান্য নামগুলির অর্থ অনুশীলন করলে উপরিউক্ত গাছ দুটিকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ তাকে বলা হয়েছে ভূমিচরী, বহুপাদিকা, প্রত্যাক্ষেণী, বহুকণী, ভূদরীভবা প্রভৃতি। আমি দেখেছি—ইভলভুলাস্ নাম্মুলেরিয়াস্ (Evolvulus nummularius Linn.) গাছটির সঙ্গে আয়ুর্বেদোক্ত আখরুণী'র সম্পর্ক সাদৃশ্য আছে, এটি Convolvulaceae ফ্যামিলী-ভুক্ত।

আলোচ্য বনৌষধিটি অ্যাকান্থেসিস (Acanthaceae) ফ্যামিলীভুক্ত, বোটানিক্যাল্ নাম হেমিগ্রাফিস্ হিরটা (Hemigraphis hirta T. And.) বাংলা দেশের যত্রতত্র এই গাছ অল্পে প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। এর বিশেষ কোন স্বাদ নেই। প্রামাণ্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ গ্রন্থে এই গাছটির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না; এমন কি 'ওয়েলথ্ অফ্ ইন্ডিয়া' (Wealth of India) বলে দিল্লী থেকে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যেও এই গাছটির কোন উল্লেখ নেই। এই গাছটি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে সংবাদ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, আমাশয় ও রক্তামাশয় (প্রবাহিকা) হ'লে এই গাছের রস বয়সানুপাতে এক বা দুই চা-চামচ করে খাওয়ানো হয়। এই গাছ সম্পর্কে 'বনৌষধি দর্পণ' (কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত) ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে এই গাছটির রস-গুণ সম্পর্কে কোন কথাই উল্লেখ নেই, তবে মূত্থর ও জিহবার ক্ষতে পানের সঙ্গে এই গাছের পাতা চর্বণ করলে উপকার হয় এবং পুরাতন কদর্য ক্ষতেও এই পাতা বেটে লাগালে ক্ষত শুষ্ক হয়, এই কথা বলা আছে।

**আমাতিসারে—** এই গাছটির পুষ্টিপতকালেই একে সংগ্রহ করে শুকিয়ে সমগ্র অংশ চূর্ণ করে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করলে সাদা ও রক্ত আমাশয় ভালই উপকার হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তেমন উপকার পাওয়া যায়নি, অবশ্য এসব ক্ষেত্রে অন্য কোন হেতুও থাকতে পারে। পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগে যে সব ক্ষেত্রে তেমন উপকার হয়নি, সে সব ক্ষেত্রে কারণগুলির অনুসন্ধান যেমন প্রয়োজন, তেমন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসূ তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন; তা না হ'লে রোগ-নিরাময়ের কোন পূর্ণাঙ্গ ঔষধরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; এবং বৈজ্ঞানিক জগতে এককোনদিনই স্থান হবে না।

অথচ বা মত্রে বর্ণিত এই সব বনৌষধির পরিচয়ের ব্যবস্থা ও তার ঔষধার্থে প্রয়োগের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করাও প্রয়োজন। এর দ্বারা সমগ্র দেশই উপকৃত হবে।



## অজুন

বৃক্ষ ও মানবের সহাবস্থান অনাদিকাল থেকে চলেছে বলেই না পশ্চিতি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,

‘ফলেন ফলকারণে অনুন্নয়িত’,

অর্থাৎ ফল দেখে ফলের কারণ জানতে হয়। অজুনের এই নামকরণটিও সেই রকম লাগসই; এই বৃক্ষটির বৈদিক নাম ‘ককুভ’; অথর্ববেদের ৫৬।৪।১১৮ সূক্তে এই গাছটির সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

ককুভঃ শৃঙ্গা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদি বেরতে।

ধনং সনিষ্যন্তী নাম্নাত্মানং তব পদ্রুষণং ॥

এই সূক্তটির মহাধর ভাষ্য হ’লো—

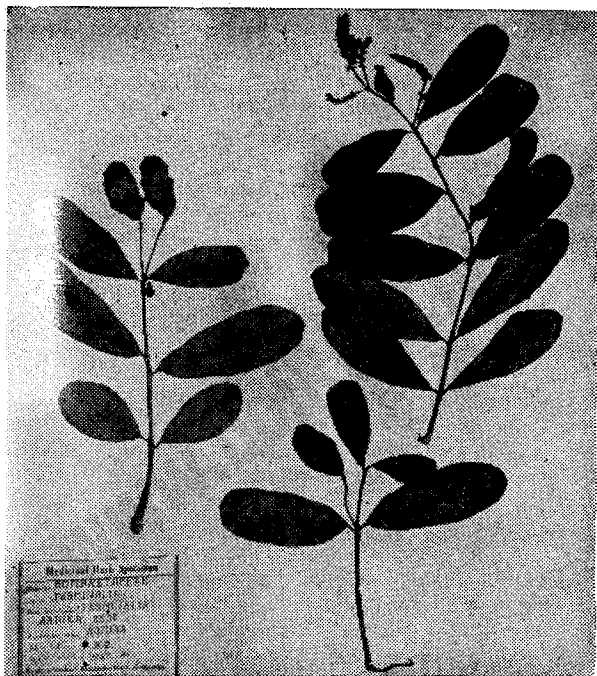
বৃক্ষরাট্ ককুভয়াসি, কস্য বাতস্য কুঃ ভূমিঃ ভাতি অস্মাৎ বাতভূমি-  
প্রকাশকঃ অজুনঃ তব শরীরং প্রতিধনং দাতুং ইচ্ছন্তীনাং ওষধীনাং  
শৃঙ্গা বলানি সামর্থ্যানি উদীরতে উদগচ্ছন্তি, যথা গাবো  
গোষ্ঠাদিব অরণ্যদেশং প্রতি উদগচ্ছন্তি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ’লো—হে বৃক্ষরাট্! ককুভ (অজুন), বিস্তীর্ণশাখ ভূমি; বায়ুর  
প্রকাশ তোমাতে সর্বদা হয়, তোমার শরীর সর্ব শরীরের শ্রেষ্ঠ ধন যে বল, তাকেই  
দান করে। যেমন গরু গোষ্ঠ থেকে বল সঞ্চয় করে আবার অরণ্যে ফিরে যেতে পারে।

## নামের তাৎপৰ্য—

ককো বাতঃ, তস্য ককস্য বাতস্য। কং ভূমিং ভাতি; অস্মাং বাতভূমি-  
প্রকাশকঃ অর্জুনঃ

এই নামটির দ্বারা সে যে বাতভূমিতে (হৃদযন্ত্রে) বলদান করে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে অর্জুন নামের তাৎপৰ্য হ'লো অর্জ+উনন্; এই অর্জ অর্থ বল; এই কথাটা বৈদিক শব্দাভিধানে আছে।



**ঔষজ্য সংহিতাকারের দৃষ্টিতে—** কান টানলে মাথা আসার মত এই অর্জুনের ঔষজ্যগুণকে চরকে ও স্দ্রশ্রুতে বিচার করা হ'য়েছে বলে মনে হয়। কারণ হৃদযন্ত্র-ঘটিত কোন রোগে প্রত্যক্ষতঃ এটা ব্যবহার করার ফল। সে চিন্তাধারা হ'লো বান্ধু আবরকধর্মী, অর্থাৎ সে যেকোন দ্রব্যকে আড়াল ক'রে রাখে অথচ আবৃতধর্মী তার নেই, অর্থাৎ নিজে আড়াল হয় না; যেহেতু সে সঙ্গরগণশীল।

বিস্তৃত চিন্তাধারা হ'লো আবৃত ধর্ম থেকে ধাতুর (পিত্ত-শ্লেষ্মার) অবস্থাকে অন্য ঔষজ্য ব্যবহারের দ্বারা স্বভাবে ফিরিয়ে আনা উচিত—এই ভেবেই অর্জুনের ক্রিয়া-

কারিষকে অন্যভাবে বিচার ক'রেছেন; কিন্তু আরও পরবর্তীকালে চক্রপাণি দত্ত (যাঁর পুস্তক চক্রদত্ত, (একাদশ খণ্ডাংশে) সোজাসুজি বন্ধের আবরক বায়ুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হৃদরোগে অর্জুনের ব্যবহার করেছেন। এটা কিন্তু সেই বেদোক্তিরই নির্দেশিত পথ।

### বৃক্ষ পরিচিতি

বৃহৎ গাছ, ৫০।৬০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, পাতাগুলির আকারটা একটু বড় হ'লেও মানুষের জিভের মত কিন্তু পাতার ধারগুলি খুব সরু দাঁত করাভের মত কিন্তু মাংসল নয়, শক্ত গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Terminalia arjuna*. ফ্যামিলি *Combretaceae*। সমগ্র ভারতেই এ গাছ দেখা যায়, তবে কম-বেশী।

ব্যবহার্য অংশ— গাছ বা মূলের (ত্বক) পাতা ও ফল।

প্রাচীন বৈদ্যের দৃষ্টিভঙ্গী—গুরু শিম্বাকে বলছেন, বাবা! অর্জুন গাছের পুর্বের দিকের ছালটা নিও; কারণ পুর্বের দিকের বায়ুর তরলত্ব বেশী, ওদিকের ছালটা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকারিণীও অনুকূল। তখন ভেবেছি এটা কি বৈদ্যের সংস্কার? আজ উত্তরবয়সে সেই কথাটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মন ভাবতে চায় যে, সকালের রৌদ্র ওদিককার ছালটার রঞ্জনরশ্মি বেশী সমৃদ্ধ হয়, তাই তাঁদের এই ব্যবস্থা। আজ হয়তো সিনোনিম বদলে গেল সত্যি; কিন্তু তাঁদের দ্রব্যগুণ সমীক্ষার স্তরটা কতটা উচ্চ ছিল!

### প্রয়োগ ক্ষেত্র

(১) যাঁদের বৃক্ষ ধড়ফড় করে অথচ হাই ব্লাডপ্রেসার নেই, তাঁদের পক্ষে অর্জুন ছাল কাঁচা হ'লে ১০।১২ গ্রাম অথবা শুষ্ক হ'লে ৫।৬ গ্রাম একটু খেঁতো ক'রে, আধ পোয়া দুধ আর আধ সের জল একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, আন্দাজ আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে, ছেকে বিকেলের দিকে খেতে হয়। তবে গরম অবস্থায় ঐ সিদ্ধ দুধটা ছেকে রাখা ভাল। এর দ্বারা বৃক্ষ ধড়ফড়ানি নিশ্চয়ই কমবে। তবে পেটে বায়ু না হয় সৈদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হয়।

(২) লো ব্লাডপ্রেসারে— উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তৈরী ক'রে খেলে নিশ্চয়ই প্রেসার উঠবে।

(৩) রক্তপিত্তে— মাঝে মাঝে কারণ বা অকারণে রক্ত ওঠে বা পড়ে; সে ক্ষেত্রে ৪।৫ গ্রাম ছাল রাগিতে জলে ভিজিয়ে রেখে ওটা সকালে ছেকে নিয়ে জলটা খাওয়ার প্রাচীন ব্যবস্থা।

(৪) শ্বেত বা রক্তপ্রদরে— উপরিউক্ত মাত্রা মত ছাল ভিজানো জল আধ চামচ আন্দাজ কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

(৫) ক্ষয়কালে— অর্জুন ছালের গুঁড়ো, বাসক পাতার রসে ভিজিয়ে, সেটা শুকিয়ে (অন্ততঃ সাত বার) নিয়ে রাখতেন প্রাচীন বৈদ্যেরা। দমকা কাসি হ'তে থাকলে একটু স্বত ও মধু বা মিছির গুঁড়ো মিশিয়ে চাটতে দিতেন।

(৬) শুক্রমেহে (Spermatorrhoea)— অর্জুন ছালের গুঁড়ো ৪।৫ গ্রাম ৪।৫ ঘণ্টা আধ পোয়া আন্দাজ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ছেকে ঐ জলে আন্দাজ ১ চামচ শ্বেতচন্দন ঘষা মিশিয়ে খেলে উপকার হয়, এটা সুদ্রুত সংহিতার কথা।

(৭) ষাঁদের প্রস্রাবের সঙ্গে Pussell বেশী যায়, তাঁরা ৩।৪ গ্রাম শুকনো অর্জুনছাল আধ পোয়া আন্দাজ গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে পরে ছেঁকে তার সঙ্গে একটু রান্না করা বালি মিশিয়ে খেলে ওটা চলে যাবে।

(৮) রক্ত আমাশয়ে— ৪।৫ গ্রাম অর্জুন ছালের কাথে ছাগল দুধ মিশিয়ে খেলে ওটা সেরে যায়।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, অর্জুন গাছের সব অংশই কষায় রস (Astringent); এর জন্যই ওর কাথে অনেকের কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। ওদিকটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। তবে এটা দেখা যায় দুধে সিম্ব অর্জুন ছালের ব্যবহারে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

### বাহ্য প্রয়োগ

(৯) মচুকে গেলে বা হাড়ে চিড় খেলে— অর্জুন ছাল ও রসদুন বেটে অল্প গরম করে ওখানে লাগিয়ে বেঁধে রাখলে ওটা সেরে যায়; এটা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। তবে সেই সঙ্গে অর্জুন ছালের চূর্ণ ২।৩ গ্রাম মাত্রায় আধ চামচ ঘি ও সিকি কাপ আন্দাজ দুধ মিশিয়ে অথবা শুধু দুধ মিশিয়ে খেলে আরও ভাল হয়।

(১০) মেচেডায়— অর্জুন ছালের মিহি গুঁড়ো মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে ও দাগগুলি চলে যায়।

(১১) পশ্মকটায়— অর্জুন ছাল টুক ঘোলে ঘষে লাগাতে, দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যরা।

(১২) পুঁজদ্রাবী ঐ (ক্ষত)— অর্জুন ছালের কাথে ধুয়ে, ঐ ছালেরই মিহি গুঁড়ো ঐ ঘায়ে ছড়িয়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

(১৩) ফোড়া— অর্জুনের পাতা দিয়ে ঢাকা দিলে ওটা ফেটে যায়, তারপর ঐ পাতার রস দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

(১৪) হৃৎপানীতে (Cardiac)— অর্জুনের ফলের শুষ্ক টুকরো ক'ল্কে করে তামাকের মত খোঁরা টানলে হৃৎপের টান কমে যায়; এটা বলেছেন আমার এক কবিবরাজ বন্দু।

(১৫) হৃৎপিণ্ড হ'লে— ঐ ফল গ্রামাণ্ডলে কোমরে বেঁধে রাখে। এই রকম আরও অনেক টোটকার ব্যবহার চলে আসছে।

অর্জুন গাছ নিয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ বহু গবেষণা করেছেন; কিন্তু আয়ুর্বেদ সংহিতার ফলশ্রুতিটি তাঁদের পদার্থ বিজ্ঞানে ও রসায়ন বিজ্ঞানে ধরা পড়েনি; কারণ দেহাভ্যন্তরে শারীর যন্ত্রের সক্রিয়তায় ভেজ প্রয়োগের দ্বারা মহুর্দুর্দেহ যে অবস্থান্তর ঘটতে পারে তেমন নিষ্ঠা নিয়ে বোধ হয় অগ্রসর হননি, তা ছাড়া দ্রব্যের মধ্যে প্রভাব নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে, আভ্যন্তরিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে তার সক্রিয়কারিত্ব; কিন্তু রোগোপশমেই প্রত্যক্ষ করা যায়, এটা পুনঃপুনঃ অভিনিবেশের সঙ্গে অভ্যাসের ফলে অভ্যন্তর প্রকট হয়, তাই এসব ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তে এটা দ্রব্যের প্রভাব বলেই স্বীকৃত।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Crystalline compounds viz., arjunine, arjunetin. (b) Lactonic constituents. (c) Essential oil. (d) Tannin. (e) Reducing sugar. (f) Colouring matter.



## রক্তচন্দন

যে সদন সেই ভবন আর যে নাশন সেই সাদন; এখানে শুধু একটি আকার (আ) জুড়ে দিলেই বিপত্তি ঘটে। কিন্তু অবসাদনের অর্থ হয় পরিষ্কার, এমনভাবে শব্দ-সংকোচন, শব্দ-প্রসারণ করার মধ্যে আছে বর্ণবিন্যাসে ভাবান্তর সৃষ্টি, তাই প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বস্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দ যোজনাই তার অপূর্ব রূপসৃষ্টি। এর দ্বারা বাস্তব জগতের উদ্ভূত অনদ্ভূত যে কোন মানসচিন্তার ও দ্রব্যের স্বরূপ প্রকাশ করার ধী-শক্তি এরই মধ্যে নিহিত করার রীতি। যেমন—আহার, প্রহার, বিহার, সংহার শব্দের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়—এক একটি উপসর্গের (প্র—পরা প্রভৃতি) মাধ্যমে, তেমনি শব্দ-যোজনায় আর একটি ভাষা ‘প্রসাদন’। প্রসিদ্ধ দ্রব্য রক্তচন্দন—এটি শৌণিতের প্রসাদন করে অর্থাৎ প্রসন্নতা আনে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে রক্তচন্দনের কার্যকারিতাই তার প্রসাদন, এখানে অবসাদন অর্থে প্রসার বা পরিষ্কার বা প্রসন্নতা আনা; রক্তচন্দনের ক্ষেত্রে এই বিশেষণটির প্রয়োগের গুঢ় তাৎপর্যই হ’লো—রক্তের দোষকে নিরসন করে প্রসারিত করে।

আর্থ-চিকিৎসাশাস্ত্রের চিন্তাধারা—

‘যদুন্নি প্রাণিনাং প্রাণঃ শৌণিতং হ্যনু বর্জতে’

(চরক—চিকিৎসাস্থান)

অর্থাৎ প্রাণ হ’লো রক্তের অনুগামী, সেই রক্ত বিশুদ্ধ থাকলেই দেহের বল, বর্ণ ও স্বচ্ছতা বজায় থাকে। একেই বলে শৌণিতের প্রসাদন। এই কার্যের সহায়কের অন্যতম বনৌষধি এই রক্তচন্দন। এটি বৈদিক ভেষজ হ’লেও তবে পাশ্চাত্য (পাশ্চাতে আগত,

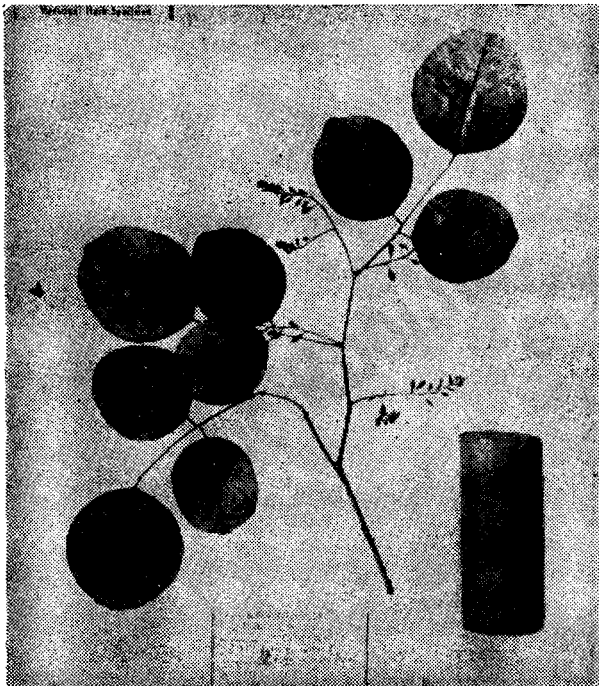


ডাই পাশ্চাত্য) বলা যায়—এটি ঝক, যজ্ঞ ও সাম্যে সম্মান পাওয়া যায়নি। বেদগ্রন্থের  
 টের পরে অথর্ববেদের বৈদ্যক কল্পে এবং অন্যান্য কল্পেও এটির সম্মান আছে, সেখানে  
 বলা হয়েছে—

‘কুসীদং যো নিষদনং পর্ণে বসতিস্কৃতা।

যোনিং ইং কিলাসং অথবন্ত—সনবথ জ্বলনম্ ॥

(বৈদ্যককল্প ১০।৩৯।১৩০ সূত্র)



মহীধর ভাষ্যে বলা হয়েছে—

‘কুসীদং=রক্তচন্দনং। যো যজ্ঞাকং নিষদনং=স্থানং, যোনিং, কিলাসং  
 =কুষ্ঠং, পর্ণে=পলাশে বসতিস্কৃতা সনবথ জ্বলনং চ ইং=দাহাহ্নিং  
 প্রশময়সি।’

এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—যোনির ক্ষত ও কুষ্ঠ, গাত্রকুষ্ঠ এবং দাহের বসতিস্থলে

(চর্ম) রক্তচন্দন বসতি করুক। তার পত্রেও সর্বদা অগ্নির বাস রয়েছে অর্থাৎ তার পাতাগুলিও এসব স্থানের দাহ প্রশমন করে।

অথর্ববেদের এই ইঙ্গিতটুকু সম্বল করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রোগ-প্রশমনে, অলঙ্কারে ও দেহরঞ্জে তাকে কাজে লাগিয়েছেন মনীষীগণ। চরক-সুশ্রুতাদিতে বৈদিক সূত্র থেকে তাঁরা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তার নামকরণের মধ্যেই। বলা হয়েছে—কুসীদং অর্থাৎ কুৎসিত স্থানে তার কর্মক্ষেত্র এবং সে রোগ ক্ষেত্রটি কোথায় তারও একটা ইঙ্গিত বৈদিক সূত্রে আছে। অবশ্য এ সম্পর্কে আরও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তাঁরা প্রয়োগ করেছেন—রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, কামজ উন্মাদ, কুষ্ঠ, বিসর্প ও বিভিন্ন রোগজ দাহের ক্ষেত্রে। এ ভিন্ন দেখা যায় যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ রক্তচন্দনের তিলকের দ্বারা বশীকরণের কাজ করতেন। আর সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ের চিহ্ন লেখার রীতি বর্ণনা করা আছে, সেটির অঙ্কর পদ্মফুলের পাপড়িতে রক্তচন্দনে লেখা হতো। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ আছে—“গ্রীষ্মকালে শ্রীরামচন্দ্রের দেহে রক্তচন্দন মাখানো হ’তো, দেহের দাহকে প্রশমন করার জন্যে”। এই দাহ প্রশমনের শীর্ষ দ্রব্য হিসাবেই কি সাধকগণ সূর্য্যাস্ত দেওয়ার সময় রক্তচন্দনকে আবশ্যিক উপচার রূপে নিধারণ করেছিলেন?

### কালে কালে

নানা মূর্নির নানা মত—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। অথর্ববেদে পাওয়া গেল রক্তচন্দন, আর প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অথবা দ্রাবিড় সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে শ্বেতচন্দন। কত শত বৎসর পার হ’য়ে আসার পর ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে কেমন এক জগা-খিচুড়ী পাকানোর কাল। ভাবপ্রকাশকার বললেন—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতচন্দন) এবং কুচন্দন (পত্তঙ্গ বা পত্রাঙ্গ); আর তার আগে পঞ্চদশ শতকের রাজনিঘণ্ট, নামীয় সংগ্রহ গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে ছয় প্রকার চন্দনের নাম; কিন্তু পরম্পরায় পরিচিতির অভাবে আজ সব কয়টির পরিচিতি সম্ভব নয়।

### কি পাওয়া যাচ্ছে—

১। রক্তচন্দন (*Pterocarpus santalinus* Linn.f.) ফ্যামিলি Leguminosae.

২। শ্বেতচন্দন (*Santalum album* Linn.) ফ্যামিলি Santalaceae.

৩। কুচন্দন—এদেশে একে রক্তকম্বল বলে, এর নাম *Adenanthera pavonina* Linn. ফ্যামিলি Leguminosae. আলোচ্য রক্তচন্দনের গাছ ২৫।৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। কাঠের সারাংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ সাধারণতঃ পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের অঞ্চল বিশেষে। এতদঞ্চলে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনেও একটি আছে।

আসল-নকল—বাজারে নকল রক্তচন্দনের কাঠ আমার নজরে পড়েছে, এটি অন্য গাছের সারাংশ, তবে সবই নকল একথা বলাই না। সম্ভব হলে সরকার পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কিনলে ও ভয়টা থাকে না। তা না হলে কোন বিশ্বস্ত দোকান থেকে সংগ্রহ করবেন।

### শোণিতের স্রুতি কোন পথে—

প্রথমেই বলি—শোণিতেই প্রাণ, যদিও সর্বশরীরব্যাপী এর অবস্থানক্ষেত্র, তাহলেও

এর বহির্গমন তখনই হয়, যখন শারীরক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই নিগর্মনের পথ প্রধানতঃ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মূত্র, লোমকূপ, মল ও মূত্রের ম্বার। যদিও পিত্ত-প্রাধান্যেই এই বিকৃতি ঘটে, তাহলেও ত্বক্ বিদীর্ণ হয়েই (চামড়া ফেটে) রক্ত আসতে পারে। এর মূল সূত্র হচ্ছে—ক্ষয়ধর্মী হলেই দাহ থাকে, এরই প্রতিষেধক এই রক্তচন্দন।

### সক্রিয় ভূমিকায়—

(১) প্রবল জ্বরের দায়েঃ— অকৃত্রিম রক্তচন্দনের গুড়ো বা চেলি ১০।১২ গ্রাম এক পোয়া আন্দাজ গরম জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে সেই জল অল্প মাত্রায় সমস্ত দিন খেলে দাহ ভাল হয়; গুড়োর অভাবে রক্তচন্দন ঘষে গরম জলে গুলে নিলেও চলে।

(২) রক্ত প্রস্রাবের জ্বালায়ঃ— উপরিউক্ত পদ্ধতিতে রক্তচন্দনের জল তৈরী করে ২।৩ বার খেলে জ্বালা কমে যায় ও রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

(৩) রক্তপিত্তঃ— যেখানে বলকে বলকে রক্ত উঠছে, তার সঙ্গে শরীরের জ্বালাও আছে—এ ক্ষেত্রেও ঐ পদ্ধতিতে জল তৈরী করে খাওয়ালে গায়ের জ্বালা ও রক্তবমন নিশ্চিত প্রশমিত হবে। বৃন্দ বৈদ্যেরা এরই সঙ্গে ৪।৫ গ্রাম পাতা সমেত শালপানি (*Desmodium gangeticum*) গাছ খেঁতো করে ভিজিয়ে খেতে বলেন।

(৪) অনিয়মিত রক্তপ্রস্রাবেঃ— যাঁদের ঋতুধর্ম অনিয়মিত হয়—সে ক্ষেত্রে এই রক্তচন্দন উপরিউক্ত মাত্রায় প্রস্তুত করে কিছুদিন খেলে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

(৫) নাক-কানের রক্তপ্রস্রাবেঃ— শরীরের এই দু'টি ম্বার দিয়ে রক্ত বরতে থাকলে রক্তচন্দন সিদ্ধ বা ভিজানো জল খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(৬) চর্ষিপোকা লাগায়ঃ— এটা সাধারণতঃ হাতের তালুতে হয়। এটাকে ক্ষুদ্র-কুষ্ঠের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে—এ ক্ষেত্রেও রক্তচন্দনের কাঠ সিদ্ধ করে সেই জল খেতে হয় এবং তার সঙ্গে রক্তচন্দন ঘষা হাতের তালুতে লাগাতে হয়।

(৭) কর্ণমূলের শোথে (Mumps)ঃ— এ রোগে আক্রান্ত হলে রক্তচন্দন ঘন করে ঘষে কর্ণমূলে লাগাতে হয়, এর ম্বারা ব্যথা, ফুলো ও জ্বালা তিনটিই কমে যায়।

(৮) ঘামাচি শূনিকরে চামড়া উঠে যাওয়ার মত সর্বাপেক্ষে এক প্রকার রোগ হয়। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে একে 'নুনছাল ওঠা' রোগ বলে। এ ক্ষেত্রে রক্তচন্দন ঘষে গায়ে লাগালে ওটা সেরে যায়।

(৯) দায়ে (Ringworm)ঃ— এ রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তচন্দন ঘষে লাগালে প্রায় ক্ষেত্রেই সেরে যায়।

(১০) বাতরক্তঃ— যেসব ক্ষেত্রে কোন আঘাত না লেগে গায়ে লাল দাগ হয়, অনেকের আবার এর সঙ্গে ওগুদীতে একটু ফুলো ও চুলকানি থাকে, সেখানে এই কাঠ ঘষে লাগালে এটা উপশম হয়।

(১১) দাঁতের মাড়ির রক্ত পড়ায়ঃ— এই কাঠসিদ্ধ জল দিয়ে কুলকুটো করলে বন্ধ হয়। এমন-কি ঘুমলে যাঁদের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, এর ম্বারা তাঁরাও নিষ্কৃতি পাবেন।

(১২) মাথার যন্ত্রণায়ঃ— এই যন্ত্রণা যদি কোন বিশিষ্ট কারণে না হয়, তাহলে এই কাঠ ঘষে কপালে লাগালে কমে যায়।

(১৩) স্তনের ফোড়ায় (একে আমরা ঠুনকোও বলি):— এ ক্ষেত্রে এই কাঠ ঘষা (ঘন করে) দিনে-রাতে ৩।৪ বার লাগাতে হয়।

(১৪) বিষ ফোড়ায়:— ঘষা রক্তচন্দন ও গোলমরিচ ঘষে ফোড়ায় লাগালে এক-দিনেই বিষদুনি কেটে যায়।

(১৫) দূষিত ঘায়ে (ক্ষতে):— রক্তচন্দনের কাথ দিয়ে ধুলে ক্ষতের দোষ কেটে যায়।

এ ভিন্ন কোন দোষের জন্য রক্ত সম্পর্কে কোন রোগের সৃষ্টি হয়েছে, বিচার করতে পারলে এর দ্বারা বহু রোগেরই উপশম হতে পারে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Glycosides. (b) Colouring matter. (c) marsupium.



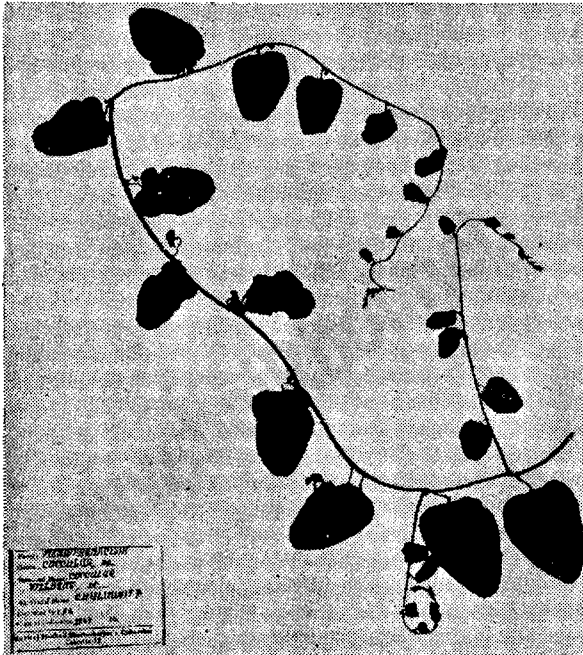
## জন-জম্বানী (ছিলা হি-ত)

গ্রামীণ জীবনের শৈশবে খেলাপাড়ির একটা স্বতন্ত্র ঘর-সংসার পাতা হ'তো। সে ঘরে বন-ভোজনের উৎসব পর্বও হ'তো; আবার পদুতুলের বিয়ের নিমন্ত্রণ এবং তার আয়োজনও হ'তো সেই ঘরে, সঙ্গে থাকতো ভূরিভোজন।

এই ভোজনের প্রধান উপাদান ও উপকরণ থাকতো খোলাম-কুচি ও চিতে পাতার লুচি, আর তরকারীর খোসার ব্যঞ্জন এবং দই; সেই দই বস্তুটি প্রস্তুত করা হ'তো দই-এ খই-এ' পাতার রসে অল্প জল মিশিয়ে; খাওয়ার সময় মূখে টক্ টক্ শব্দ করে দই আস্বাদনের তৃপ্তির ধ্বনিও তোলা হ'তো।

এ স্মৃতি অনেকেরই মন থেকে আজও হয়তো স'রে যায়নি; এখন দেখছি, নাঃ, সে দই-এ খই-এ পাতার প্রয়োজন সে বয়সেই ফুরিয়ে যায়নি; তবে তার ধারা ব'দলেছে; ঠিক যেমন বালোর কর, খল, ঘট-এর অভ্যাস, সেই অভ্যাস পরে হয় সেইসব শব্দের ব্যাকরণের পদচ্ছেদ চিন্তা, আর তার অর্থবোধের বিশেষ প্রয়াসে।

তাই ব'লছিলাম, বালোর সেই খেলাঘরের দই-পাতা এখন ভৈষজ্যবিজ্ঞানের রস-বিচারে দাঁড়িয়েছে। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু সেই দই-জমানো লতাটি।



বহু প্রাচীনকালেই ছিল এই ভারতে বনৌষধির সাধ'ক (অর্থযুক্ত) নামকরণ করার রীতি। ওতেই থাকতো দ্রব্য পরিচিতির অন্যতম দিগ্‌দর্শন; কিন্তু আলোচ্য বনৌষধি দ্রব্যটির সম্ভান যদিও তেমনভাবে বৈদিক সংস্কৃতিতে সাধ'কনামা ক'রে নমুনা পাওয়া যায়নি এবং সংহিতার যুগেও দেখছি সে অনুপস্থিত; তাই কতক অনুমানের ভরসায় বৈদিক ভৈষজ্যানামের মধ্যে সেটি হয়তো লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে, যা আজও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্ক ব'লেছেন—শব্দশক্তি ৩ প্রকার—(১) প্রত্যক্ষ, (২) পরোক্ষ, (৩) আজীবক, অর্থাৎ আজীবক হ'লে আমরা যেটাকে বলি প্রমুখাৎ (মুখে মুখে)। এই লতাটির নামই বা তেমনই সেই আজীবক

পর্যায়েরি থাকতে পারে তার শব্দনাম; যেহেতু এই লতাগাছটির বৈদিক সংহিতা রচনার সময় তার কোন মৌলিক শব্দ বা সমার্থক শব্দেরও সমাবেশ করা হইয়াছিলো কিনা দেখা যায় না।

**ঔষধি পঙ্ক্তি-ভুক্তি করণঃ**— ষোড়শ শতকের আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়, তৎকালের পরিচয়ে তার দেশীয় নাম 'ছিলিহিণ্ট'। এইটিই এখন সর্বভারতীয় বৈদ্যক সমাজের পরিচিত নাম। বাংলায় ছিলিহিণ্টের চলিত নাম দই-এ খই-এ বা হয়ের। কোন কোন অঞ্চলে দৈয়া পাতা (মোদিনীপত্র) বলে। এটি হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে 'বসন বেল', ছিরেটা, পাতালা গরুড়ী, ফরিদ বট, জল-জমানী ইত্যাদি নামে পরিচিত; এভিন্ন প্রদেশান্তরে তার আরও নাম আছে; তবে বোটানিক্যাল নাম *Cocculus hirsutus* (Linn.) Diels. এবং *Menispermaceae* ফ্যামিলীভুক্ত। সমগ্র ভারতবর্ষে এর ২০টি প্রজাতি আছে; এভিন্ন সিংহল, পেগু, দক্ষিণ চীন ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এই জংলা লতাগাছটির সম্মান মেলে। এগুলা প্রধানতঃ জন্মে উষ্ণপ্রধান অথবা নাতি-শীতাতাপ অঞ্চলে। ভারতের গ্রামে গেলে একে চিনতে কষ্ট হয় না, ঠাকুমা থেকে নাভনী পর্যন্ত সকলেই এর সংগে পরিচিত। আর আপনিও পরীক্ষা করে চিনতে পারবেন; এর ৩।৪টি পাতা অল্প জলে রগড়ালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলটি জমে দই-এর আকার নেয়।

### গ্রন্থোক্ত পরিচিতি ও প্রকৃতি পরিচয়

আয়ুর্বেদিক গ্রন্থের (ভাবপ্রকাশ) শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

ছিলিহিণ্টঃ মহামূলঃ পাতালগরুড়াহরয়ঃ।

ছিলিহিণ্টঃ পরং ব্যাঃ দাহঘঃ পবনাপহঃ॥

এই শ্লোকটির দুটি দিক আছে—একটি হচ্ছে তার নাম আর অন্যটি হচ্ছে তার ঔষজ্য শক্তি। নামগুণলিতে রয়েছে মহামূল ও পাতালগরুড় দুটি সংজ্ঞা। এটি প্রধানভাবে ব্যাঘ্র স্পন্দন (Rejuvenative) এবং সে কফ ও বায়ুকে প্রশমিত করে।

### রোগ প্রতিকারে

(১) এর প্রধান কাজ urinary system -এর উপর—প্রস্রাবের সময়, যেকোন কারণেই হোক, যদি জ্বালা ও জ্বালাবোধ হয়, সেক্ষেত্রে ৩।৪ গ্রাম কাঁচা পাতাকে খেঁতো করে আন্দাজ আধ পোয়া জলে সেটাকে চটকে ছেঁকে অল্প চিনি দিয়ে সকালে বা বিকালে খেলে জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না; এটা গনোরিয়াকেও উপশমিত করে। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে।

(২) প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে কিছু ক্ষুণ্ণ হতে থাকলে (লালামেহ বা শুক্রমেহ রোগে—spermatorrhoea) এর পাতা উপরিউক্ত নিয়মে সরবৎ করে ব্যবহার করলে অপূর্ণ কাজ পাওয়া যায়। তবে ব্যবহারবিধি সহজ করতে গেলে এটাকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে ৬ বা ৮ গ্রেণ (৩।৪ রতি) মাগায় সকালে বা বৈকালে সুবিধে মত সময়ে একবার দুধ বা জল দিয়ে খেতে হয়; এটাতে দাস্তও ভাল পরিষ্কার হয়।

(৩) স্ববন্দোষঃ— এই পাতার সরবৎ বা গুঁড়োর সংগে ৪।৫ গ্রেণ কাবাবচিনির

গুড়ো বা ২।১ দানা কপূর মিশিয়ে দুধের সঙ্গে খেলে এটার হাত থেকে একেবারে পরিণাম পাওয়া না গেলেও সীমিত থাকে। এটা বৃন্দ বৈদ্যের অভিজ্ঞতা।

(৪) শুল্ক তারল্যে এবং ক্ষীণতায়:— পূর্বোক্ত নিয়মে একটু বেশীদিন খেতে হয়।

(৫) রক্ত দৃষ্টিতে:— সালসার (Sarsaparilla) ন্যায় কাজ করে। এই গাছের মূল এবং অন্যান্য রক্ত-পরিষ্কারক ওষধির সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন অন্যান্য প্রদেশের চিকিৎসকগণ। এ-ভিন্ন পুরাতন বাত রোগের ক্ষেত্রেও এই মূলের উপযোগিতা আছে।

(৬) শুল্ক একজিমায় (Dry Eczema) বাহ্য প্রয়োগ (External uses):— যে একজিমায় রস গড়ায় না, অথচ চুলকায়, সেক্ষেত্রে এটাকে জলে রগড়ে ঘন দই-এর মত করে লাগিয়ে থাকেন কোন কোন প্রদেশের সাধারণ লোক।

(৭) চোখের পার্শ্ব ক্ষতে:— এই পাতার দই-এর ফোঁটা দিলে আরাম হয়।

(৮) চুলকণায়:— এটা শিশুদের হলে এই পাতার দই গায়ে লাগালে চুলকণা কমে যায়, তবে দুপূরের দিকে (স্নানের পূর্বে) লাগানো ভাল, নইলে দুর্বল শরীরে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

(৯) বিষ-ফোড়ায়:— জ্বালা বা প্রদাহে এই পাতা বেটে ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে জ্বালা ও প্রদাহ দুয়েরই উপশম হয়; আবার কোন কোন অঞ্চলে আগুন পোড়ায় এটার দই লাগিয়ে থাকেন সাময়িক জ্বালা নিবৃত্তির জন্য, কারণ ও ক্ষেত্রে শৈত্য প্রয়োগ যেমনি নিষিদ্ধ তেমনি উষ্ণবীর্য, শীতবিপাক স্নেহ ভিন্ন অন্য কিছু প্রয়োগও ঠিক নয়।

(১০) জিহ্বা ক্ষতে:— এই গাছের মূলটা ঘষে অথবা মূল বেটে ঘিয়ের সঙ্গে পাক করে জিহ্বে লাগালে ক্ষত সেরে যায়। এটা ব্যবহার করতেন কলিকাতার লম্বপ্রতিষ্ঠ বৃন্দ বৈদ্যগণ। অবশ্য এইসব লৌকিক ব্যবহারের কয়েকটির সংগ্রহকার ১৯ শতকে ভারতে আগত পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দ।

(১১) নব্য বৈজ্ঞানিকের সমীক্ষা:— বিংশ শতকে এই লতাগাছটির ভৈষজ্যাণু সম্পর্কে তাঁরা লিখলেন— Sedative, Hypotensive, Bradycardiac cardio-tonic and Spasmolytic. এই ভৈষজ্যটিতে হয়তো এরকম বহু উপযোগিতা এখনো আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে; কারণ কোন শব্দের অলক্ষ্য স্পর্শে বৃক্ষের পাতার নৃত্য এবং পাতার রস বিহবায়ুদ্র সংস্পর্শে এলে ঘন হয়ে যাওয়ার মৌলিক কারণ কি (যদিও প্রত্যক্ষ)—এসব তথ্যের পাঠ অদ্যাবধি আমরা আমাদের আয়ুর্বেদের সংগ্রহ গ্রন্থে এমন কি হাতের লেখা কোনও ঘরোয়া পুথিপত্রের আলোচনার সূত্রে পাই নাই। যা পাই শিশুদের খেলাঘরের একটি উপাদান নিয়েই। ভাবতেই পারি না প্রকৃতির খেলাঘরে এই রকম শত সহস্র উপাদান পড়ে রয়েছে—যা আজও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং অনাদৃত। তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েই তো একদিন এই ভারতের ঋষিগণ জনকল্যাণে তাদিকে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যবহার করার রীতিও জানিয়েছেন।

এ দেশের অধিকাংশ মানুষ অল্পবিস্তৃত সমাজের, তাঁরা অধিক ব্যস্ত চিকিৎসা করাতে অসমর্থ, কিন্তু ভারতের প্রতিটি বন সম্পদকে যদি চিকিৎসার উপযোগী করে নেওয়া যায়, তাতে সব লতাপাতার মধ্যেই যে বিশেষ ভৈষজ্যাণু নিহিত রয়েছে তেমন পরিচয়ের সঙ্গে আমাদের শরীর ও মনের অনেক ব্যাধিরই সুষ্ঠু চিকিৎসা করা যাবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্বীকৃতিটা পূর্বে না রেখে ওকে পরবর্তীকালের সমর্থক বলেই গণ্য করা হোক না—সেই রীতিই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন।

## CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., coclaurine, trilobine, isotrilocine, menisarine, tetraadrine. (b) Quaternary base viz. cocsarnine, 10-ethoxy-1, 2, 9-trimethoxyaporphine. (c) Alkaloid glycosides. (d) Sterols.



## মদয়ন্তিকা

প্রসাধন ও লাভণ্য এ দুটি শব্দ এক কথায় ব'লতে গেলে ঠিক যেন দেহ আর ক্ষুধা; একটি থাকলেই অপরটি থাকবে; তবুও প্রশ্ন ওঠে—মানুষের লাভণ্য তো ও ক্ষেত্রে সহজাত হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু তবুও যে দেহে সেটির আকর্ষক রূপ দেখা দেয় না, সে ক্ষেত্রে তাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন তো আছে; এ ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণকই বা কি, সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ এসেছে প্রসাধন।

সর্বকালে সবার আগে এ প্রয়োজন অনুভব করেন মায়েরা, তাই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও তার প্রকৃতিদত্ত লাভণ্যকে ধ'রে রাখতে কিংবা তাকে আরও নিখুঁত করে তুলতে হাত বাড়িয়েছেন প্রসাধনের দিকে; তবে যুগে যুগে তার রকমফের হ'য়েছে—এসেছে পরিবর্তিত রুচি ও বৈচিত্র্য; এখনও সেই সুপ্রাচীন যুগের বাস্তব সাক্ষী হ'য়ে রয়েছে আলোচ্য এই বনজ উদ্ভিদটি।

প্রমাণ কোথায়? শত্ৰু যজ্ঞবর্ষেদের ১২।৬৬ সূক্তের মহাধর যে ভাষ্য ক'রেছেন—তার অনুবাদ হ'লো—ওগো মেধে (মদয়ন্তিকা), তুমি আমার শরীরের দুটি বাহু, মণিবন্ধ ও অঙ্গদুলিকে সাজিয়ে দাও; আমার প্রিয়তম আলিঙ্গন করে সুখী হবে;



তোমার পাতাগুলির রস আমার গোপন অঙ্গকে ক্রেদমুক্ত ও দৃঢ় করবে।

মূল সূত্রটি হলো—

“মেন্ধে স্বা জ্যোতিষ্মতী মদয়ান্তিকা বাহুঃ শ্লেষোসি কল্যাভ্যাং  
ভগং অভিসংবিশতু ইন্দ্রইব অঙ্গযোনিং শারদাবৃত্তু ক্লিস্ত ভগা  
দৃষইব মেটম্ ॥



পরবর্তী অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩য় মণ্ডলের ২২ সূত্র ও ভিষককল্পের ৪র্থ মণ্ডলের ৩১৭ সূত্রে সেই একই কথার প্রতিধ্বনি।

## সংহিতার কালে

এই বৈদিক তথ্যকে উপজীব্য করে তার শব্দবিন্যাস ও ভেবজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানভান্ডারকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো হয়েছে।

**নামকরণের তাৎপর্য**— মদ্, ধাতুর অর্থ গর্ব ও হর্ব। এ দুটিকে দান করতে পারে বলেই এর রুঢ়ী নাম মদয়ন্তিকা। এর ফুলের মৃদু গন্ধও মত্ততা আনে।

**নামের হেরফের**— মেম্ব্ থেকে মেম্বিকা, মদয়ন্তিকা, মেহেদি, মেদি; এইভাবে উচ্চারণদোষে ভ্রষ্ট শব্দের জন্যই এটা এসেছে। এ ভিন্ন তার আর একটি নাম গিরি-মল্লিকা বা বনমল্লিকা। সুশ্রুত সংহিতায় তাকে বলা হয়েছে 'নখররঞ্জিকা'—তারপর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তার নামের পার্থক্য তো আছেই। এটির বোটানিক্যাল নাম *Lawsonia inermis* Linn. ফ্যামিলি *Lythraceae*. সর্বজন পরিচিত এই গাছটিকে সাধারণতঃ বেড়ার ধারে লাগানো হয়। ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয় তার ফল, ফুল, পাতা ও মূল।

## গুণগণনা

জন্ডিস্ বা কামলা রোগে—আঙ্গুলের মত মোটা মেদি গাছের মূল (কাঁচ হ'লে ভাল হয়) অর্ধকুটিত (আধকুটা) আতপচাল-ধোয়া জল দিয়ে ঘষে (চন্দন পাতায় ঘষলে ভাল হয়) ২ চামচ আন্দাজ নিয়ে ৮।১০ চামচ ওই চাল-ধোয়া জলে মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এইভাবে ৪।৫ দিন খেলে আরোগ্য হয়। এই টোটকা ঔষধটি খাওয়ার কালে ডাবের জল বা আখের রস (ইস্কুরস) খেলে ভাল কাজ হয়। এটি উড়িয়ায় একটি সিদ্ধফল টোটকা ঔষধ। এটি কিন্তু পূর্ণবয়স্কের মাথা দেওয়া হ'লো।

(১) **শুক্রেমেহ রোগে**— মেদি পাতার রস এক চামচ দিনে দুইবার জল বা দুধ এবং তার সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে খেলে ১ সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(২) **শ্বেতপ্রদরে**— উপরিউক্ত নিয়মে ব্যবহার করলেও উপশম হয়। এর দ্বারা যদি কোষ্ঠকাঠিন্য আসে তবে কোষ্ঠ পরিষ্কারক—যেমন ঈসবগুলের ভূষি খাওয়া ভাল।

(৩) **নখরঞ্জিকায়**— এই গাছের পাতার রস নখে লাগালে চোখ ও চুল ভাল থাকে। এ কথাটা আবহমান কাল প্রচলিত। দ্বিতীয় কথা—এটা তো সেই আমলের 'নেল পালিশ'।

(৪) **হিমোগ্লোবিন**— শরীরে রক্তকণিকা কমে গিয়েছে না ঠিকই আছে, এটা বিচার করেন মেদি পাতার রস হাতের তালুতে লাগিয়ে; হিমোগ্লোবিন যদি ভালই থাকে তা হ'লে রঙটা লালচে আভা দিতে থাকে; নইলে নয়। এটি এখনও রাজস্থানের প্রাচীনপন্থী বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

(৫) **কাঁথের ব্যাথা**— মেদি পাতার রস ও সরষের তেল মিশিয়ে ঘাড়ে মালিশ করলে ব্যথা কমে যায়। এমনকি গরুর ঘাড়ে ব্যথা হ'লে এই গাছের পাতা বেটে গরম করে লাগিয়ে থাকেন দেশগায়ের লোক। অনেকে এর সঙ্গে একটু গোবর মিশিয়ে দিয়ে থাকেন।

(৬) **নখকুশ ও হাত-পায়ের হাজায়**— এই পাতার কাথ একটু ঘন করে দিনে দু'বার লাগাতে হয়। অনেকে এর সঙ্গে একটু টাটকা গোবর মিশিয়ে ব্যবহার করেন।

(৭) চুল উঠে যাওয়া ও পাকায়— হরীতকী ১টি ও মেদিপাতা ১ তোলা মত একটু খেঁতো করে আধ পোয়া জলে সিদ্ধ ক'রে আধ ছটাক মত থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে ঠান্ডা হ'লে সপ্তাহে ২ দিন মাথায় লাগাতে দিয়ে থাকেন ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়। আমি মনে করি এর সঙ্গে কেশদূর্তের পাতা (যার চলতি নাম কেশদূত) (Eclipta alba) ২।১ তোলা কাথ করার সময় ওর সঙ্গে দিলে আরও ভাল হয়।

(৮) শ্বেতপ্রদরে (Leucorrhoea) দুই তোলার মত (২৫ গ্রাম) মেদিপাতা সিদ্ধ ক'রে সেই জলে উত্তরবস্তি দিলে (ডুস্ দেওয়া) সাদাস্রাব ও অভ্যন্তরের চুলকানি (Itching) প্রশমিত হয়। তার সঙ্গে অনেকে ঐ পাতার রস দিয়ে তৈরী তেলে গজ বা তুলো ভিজিয়ে পিচু ধারণ (Plugging procedure) ক'রতে দিয়ে থাকেন; এর দ্বারা (এই পদ্ধতিতে ব্যবহারে) স্রাব বন্ধ হয় এবং অভ্যন্তরভাগের রোগও আরোগ্য হয়; অধিকন্তু যোনির শিথিলতাও অপেক্ষাকৃত কমে যায়।

(৯) স্থানচ্যুত জরায়ু (Displacement of the uterus)—উপরিস্থ পদ্ধতিতে প্রয়োগ ক'রলে ওটির অসুবিধাও কমে যায়।

(১০) হাত-পায়ের জ্বালায়— টাটকা পাতার রস হাতে-পায়ে লাগালে জ্বালা কমে যায়; এর সঙ্গে পিত্তবিকৃতিও যাতে দূর হয় সেইমত ঔষধও ব্যবহার করা উচিত।

(১১) বসন্ত রোগে— পায়ের তলায় পাতা বাটার প্রলেপ দিলে চোখে গুটি বেরোয় না। দেশগাঁয়ের বসন্ত চিকিৎসকদের একটি প্রক্রিয়া।

(১২) মরামাস ও ঋষিক— সে যেখানেই হোক না কেন, এই পাতার কাথ লাগালে কমে যায়।

(১৩) পায়োরিয়ায়— পাতার কাথে অল্প খয়ের মিশিয়ে দাঁতের গোড়ায় লাগাতে দিতেন বৃন্দ বৈদ্যরা; তবে দাঁতে দাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। সেটা অবশ্য কিছুদিন বাদে উঠে যায়।

(১৪) মূখক্ষত ও গলক্ষত— পাতাসিদ্ধ জল মুখে খানিকক্ষণ রাখতে হয়, যাকে বলে কবল ধারণ করা; এর দ্বারা ওই দুটো সেরে যায়।

(১৫) গাত্রদৌর্গন্ধে— গ্রীষ্মকালে যাদের ঘাম বেশী হ'য়ে গায়ে দুর্গন্ধ হয়— তারা বেগামূল (Vetiveria zizanioides) ও মেদি পাতা সিদ্ধ জলে স্নান ক'রলে উপকার পাবেন।

(১৬) নাড়ীরশে (sinus)— মেদি পাতা ও নিসিন্দার (vitex nigundo) পাতা বেটে তিল তৈলের সঙ্গে পাক ক'রে ছেঁকে নিয়ে, সেই তেল লাগালে অনেক ক্ষেত্রে সেরেও যায়। এসব বদ্যাবাড়ীর হাঁড়ির খবর।

(১৭) কানের পুঁজ— পাতার রস গরম ক'রে ২ ফোঁটা ক'রে কানে দিলে ৪।৫ দিনে পুঁজ পড় বন্ধ হ'য়ে যায়; আবার অনেকে এই পাতার রস দিয়ে তৈরী তৈলও ব্যবহার ক'রতে দিয়ে থাকেন।

(১৮) চোখ ওঠায় (নেত্রাভিঘ্নে) অল্প কয়েকটা পাতা খেঁতো ক'রে, গরমজলে ফেলে রেখে সেটা ছেঁকে সেই জল চোখে ফোঁটা দিলে সেরে যায়। এমন কি যাদের চোখের কোণ থেকে পুঁজের মত পড়তে থাকে, এর দ্বারা সেটাও সেরে যাবে।

(১৯) লোলাচর্মে— যাদের গায়ের বা মূখের চামড়া কুঁচকে ঢিলে হ'য়ে বা ঝুলে গিয়েছে, তাঁরা এই পাতার রস দিয়ে তৈরী তৈল মাখলে (মূখের ক্ষেত্রে ঘৃতও মাখা যায়) অনেকটা স্বাভাবিক হবে।

(২০) অনিদ্রায়— মেদি ফুলের 'বালিশ' ক'রে নবাব বাদশাদের ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা ক'রতেন ইউনানি চিকিৎসকগণ। এর ফুলে আছে লাইলাকের (আধুনিক এক-

প্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধ) গন্ধ। এই মদর্যন্তকার সার্থক নামটি উপলব্ধি করে তাকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন।

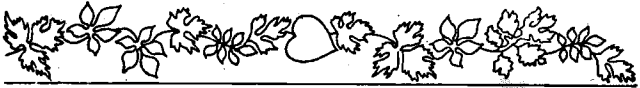
সর্বশেষে একটা কথা মনের কোণে ঊর্ণক দিচ্ছে—তাদের এই যে মদর্যন্তকা নামকরণ এবং তার ফুলের গন্ধে নিদ্রা আনয়ন, এই কার্যকারণের অন্তরালে অবসাদগ্রস্ত করানোর ইঙ্গিত বহন করে নাকি? তাই প্রাচীনদের সমীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ইঙ্গিতই এই নামকরণের পটভূমিকা।

চরকের বাস্তব সমীক্ষায় বলা যায়—গন্ধটি পাথিব সত্ত্বায় সমৃদ্ধ—বায়ুবার্হিত হয়ে গন্ধটি নাসারন্ধ্রের পথে মস্তিষ্কে উপস্থিত হয় এবং ইড়া পিণ্ডগলাকে একত্বীভূত করে সুবুদ্ধ্যায় পৌঁছে দেয়। তখনই হয় মন অন্তর্মুখী; সেটাই নিদ্রার পূর্বরূপ; আসে আস্তে আস্তে স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ, তারই বাস্তবরূপ তন্দ্রা।

আমাদের পূজার্নায় ধূপধুনো দেওয়ার রীতি; এই রীতিটির অন্তরালে সেই গন্ধ দ্বারা মনঃসম্মিবেশেরই আবেশসৃষ্টির উপকরণ দান।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Essential oil. (b) Glycoside. (c) Colouring matter viz. 2-hydroxyalphanaphthoquinone. (d) Other constituents viz. hennotannic acid and fatty alcohols.



## অসুস্থমূল

কোথায় মহারাষ্ট্র আর কোথায় উড়িষ্যা, কিন্তু হাঁপ, হাঁপা, হাঁপা, হাঁপা এই কথাগুলি একটু এদিক-ওদিক পালটে সেই হাঁপানিকেই বোঝাতে বাংলার সঙ্গে একই সূত্র যেন বয়ে চলেছে শব্দতরঙ্গে; অর্থাৎ হাঁপ কাস বোঝাতে একই ভাষায় সারা ভারতে ভাষান্তর করতে হয় না। হয়তো এই রোগের কষ্টকে লঘু করে দেখা যায় না। মানবদেহের ব্যাধির মধ্যে হাঁপানি এমন একটি রোগ, যেটা আকস্মিকভাবে প্রাণহারকও নয়, আবার হৃদরোগীর হাঁপ উঠলে প্রাণহারকও হয়, তবে এমনি সাধারণ অবস্থায় এটি বড়ই কষ্টদায়ক। একে দমন করতে এ পর্যন্ত যত ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে—সবগুলিই সাময়িক উপশমকারী ঔষধ বলা যেতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময়ের সামর্থ্য কোন ঔষধের নেই আছে, এ কথা কোন চিকিৎসকই স্বীকার করেন না।

ভারতেও স্মরণাতীত কাল থেকে বহু টোটকা ঔষধের প্রচলন এবং এখনও আছে। টোটকার ম্বারা সাময়িক রোগোপশম হয়ে বেশ কিছুদিন ভাল থাকতেও দেখা যায়। অবশ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ পুনঃ পুনঃ হতে থাকে; কারণ রক্ত সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম হয় সে বয়সে। অনেককে আবার উত্তরাধিকার সূত্রেও ঐ রোগে গ্রস্ত হতে দেখা যায়, তবে তার রূপ ও লক্ষণ বদলায়। যেমন দেখা যায়, কোন সন্তানের হাত ও পায়ের তলে অসম্ভব ঘাম হয়, সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে—এই লোকটির বংশে কারও হাঁপানি না হয় একজিমা আছে, কারণ মেদোবহ স্নোতের বাধাই রক্তদৃষ্টি সৃষ্টি করে একজিমা হয়—এটা বংশগত। [www.boiRboi.net](http://www.boiRboi.net)

আবার শ্বাস ও কুষ্ঠ রোগের পক্ষে যেটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে, সেটাও রক্তদৃষ্টি থেকে আগত। এটি যে নিয়তই থাকবে, এমন কারণ নাও হতে পারে, যেহেতু মাতা-পিতার মত তাঁদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গেও সন্তানের জন্মকারণগুলি একীভূত হয়ে

সর্বদা নাও হ'তে পারে। এ সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গিয়েছে—আলোচ্য বনৌষধিটির প্রয়োগের কোন উপযোগিতা নেই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি—আয়ুর্বেদে কুষ্ঠ শব্দটির এক ব্যাপক অর্থ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। দদু (দাদু) ও চুলকাণি এসব যেমন ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে, তেমনি একজিমাও সেই পর্যায়ে পড়ে, তাই রক্তদুষ্টি বাহ্যরূপই কুষ্ঠের অন্তর্গত।

আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে হিষ্কা ও শ্বাস (হাঁপানি) প্রভৃতি রোগগণ্ডুলির উৎপত্তির হেতুও একই। তবে এত বহুদুষ্খী কারণে এই রোগাক্রমণের সম্ভাব্যতা থাকে, যা সাধারণ মানুষকে কোন না কোন দোষে দুষ্ট হ'তেই হয়।

মোটের উপর বিকৃত বায়ু ও শ্লেষ্মার ক্ষেত্রটি থাকবেই। তাছাড়া বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে সাধারণ কারণেও—যেমন ঋতু বিপর্যয়, দুর্বলান্ন ব্যস্তির শীতল জলে স্নান, পান, ভোজন, অবস্থান, নাসিকাপথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, গুরুভার বহন, পথ পর্যটন প্রভৃতির দ্বারাও এ রোগ হ'তে পারে; কিন্তু এ ছাড়াও এই রোগ আর একটি কারণে আত্মপ্রকাশ করে; জন্মসূত্রে যাদের মধ্যে এই রক্তদুষ্টি বীজ শরীরে এসে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন রোগের রূপেও রূপান্তরিত হ'য়ে হাঁপানি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনরাক্রমণের হেতু কি, তা রোগী বুঝতে পারে না; সে ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে—

‘সর্বত্র হি ক্রিয়াযোগো নিদান-পরিবর্জনম্’।

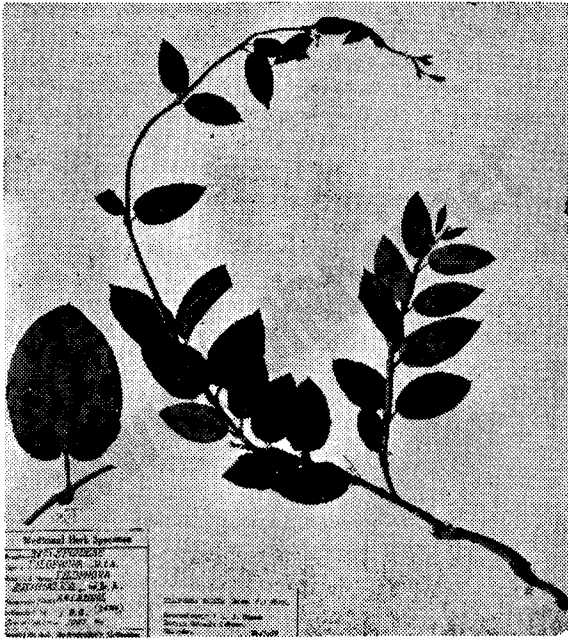
অর্থাৎ রোগের হেতু বর্জন করলে বোঝা যায় রোগাক্রমণের হেতু কি এবং তা রোধের পথই বা কি। এ ক্ষেত্রে তারও মৌলিক কারণও থাকে সেই রক্তদুষ্টিতে। আবার অনেক-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হেতু বর্জন করেও রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না; কিন্তু আক্রান্ত হ'য়ে প'ড়লে তখন উপশমের পথটাই অগ্রে বিবেচ্য হ'য়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য সেই নিয়ে। উপরিউক্ত বনৌষধিটি এমনি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলা যেতে পারে।

প্রথমেই ব'লে রাখি, বনৌষধিটি কিন্তু আমাদের বহু পরিচিত অনন্তমূল (Hemidesmus indicus) নয়। আয়ুর্বেদের যেসব প্রাচীন গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে ‘অন্তমূল’ নামীয় কোন ওষধির উল্লেখ দেখা যায় না; অবশ্য গ্রন্থোক্ত বহু উদ্ভিদের স্বরূপ-নির্ণয় (Identification) অদ্যাবধি করা এখনও সম্ভব হয়নি। আলোচ্য বনৌষধিটির বর্ণনা ও গুণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ গ্রন্থেই উল্লেখ দেখা যায়। এরকম বহু বনৌষধির লৌকিক ব্যবহার সংগ্রহ করেই তাঁদের পদ্ধতিতে নামকরণের পর সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের দেশে এ কার্যে প্রধান-ভাবে ডঃ রস্কবর্গ (Dr. Roxbrough), জে. ডি. হুকার (J. D. Hooker), প্রেন (Sir David Prain) প্রমুখ পাশ্চাত্য বহু মনীষীদের অবদান স্মরণীয়।

‘অন্তমূল’ নামটি কিভাবে হ'ল— এর উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, এটি অপভ্রংশ শব্দ। যেমন “দেশলাই” শব্দটি দীপ শলাকার দ্রুত লগ্নে জন্মেছে; হিন্দী ভাষায় ‘দীয়া-শলাই’, তারপর সেটা ‘দেশলাই’এ রূপান্তরিত হ'ল। সেইরকম মাদ্রাজের করমন্ডল উপকূল এলাকায় এই গাছ ‘অন্তমূল’ নামে পরিচিত; অর্থাৎ অন্তের (Intestine-এর) রোগ আশ্রয়ে এই গাছের মূল ব্যবহৃত হতো। সেই নামটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ-গ্রন্থে Unto mool নামে স্থান পেলে, তারপর হিন্দী ও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ‘অন্তমূল’ নামে পরিচিত হয়। হ'তে পারে এটি রোগমৌলিক ভাষা।

প্রাস্তম্মান ও পরিচিতি— এই লতাগাছটি অ্যাস্ক্রিপিয়াডেসিস (Asclepiadaceae) ফ্যামিলিভুক্ত। সমগ্র পৃথিবীতে এর ৫০টি প্রজাতি (species) আছে। তার

মধ্যে ভারতবর্ষ ও তৎপার্শ্ববর্তী দেশে ২৩টি পাওয়া যায় (হুকার সাহেবের মতে)। তবে তাদের মধ্যে তিনটি প্রজাতিই বহুস্থানে দেখা যায়, অন্তমূল তারই অন্যতম। এই গাছ ভারতের সর্বত্র অল্পবিস্তর আছে, বাংলায়ও অভাব নেই। এতদঞ্চলের গাছের পাতাগুলির আকৃতির বিভিন্নতা দেখা যায়, তবে আকারে অনেকটা মালতী ফুলের (*Aganosma dichotoma*) গাছের পাতার মত, আবার দেশ ভেদেও পাতাগুলির গঠনের তারতম্য হওয়াটা স্বাভাবিক। মাদ্রাজ অঞ্চলে যে গাছ জন্মে, তার পাতাগুলি পানের মত এবং বোঁটার দিক কাটা কাটা (Lobe) ৫ ছবিতে বড় পাতাটি লক্ষ্য করুন), আর নিচের পিঠ হয় রোমশ (tomentose)। যদিও উভয় প্রদেশের পাতার আকৃতি-প্রকৃতিতে অসমতা বর্তমান, তথাপি বিশেষজ্ঞদের মতে গাছটির প্রজাতি একই। এটির



বর্তমান নাম *Tylophora indica* (Burm.f.) Merr. এই গাছটির নাম ছিল যথাক্রমে *Tylophora asthmatica* W & A ও *Tylophora vomitoria*. এই ওষধিটির মূল, পত্র ও লতাকে (stem) ঔষধার্থে ব্যবহার করা যায়। উন্নিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ-গ্রন্থে এটাকে বলা হয়েছে—‘ইন্ডিয়ান ইপিকাকুহানা’। কারণ এমিটনের সম্বন্ধে বস্তুও এই গাছের মূলে পাওয়া যায়। অবশ্য এই রসায়ন বিজ্ঞানটি আয়ুর্বেদের রস বিচারে আবিস্কৃত নয়।

### হাঁপানির ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে

কাঁচাপাতা ছোট হলে একটা, আর বড় হলে আধ বা সিকি ভাগ নিয়ে প্রত্যহ সকালে খালিপেটে চিবিয়ে খেতে হয়; খাওয়ার আধ ঘণ্টার ভেতর অন্য কিছু খাওয়া উচিত নয়। এর ব্যবহারে ম্বিতীয় দিনেই উপকার বোঝা যায়, আর ৬।৭ দিনের মধ্যে বহুক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়। অন্য পদ্ধতিতেও নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে—পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে ২-৪ গ্রেণ মাত্রায় খেলেও একই ফল হয়। ক্ষেত্র-বিশেষে সকালে ও বিকালে ২ বার খেতে হয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, ব্রঙ্কিয়াল (Bronchial) হাঁপানিতেই এই পাতাটি বেশী উপকারী। তবে মাত্রা বেশী হলে বমনোদ্বেক বা বমন হতে পারে, অবশ্য সেজন্য শঙ্কার কোন কারণ নেই, এইজন্য যে, এর পাতার রস ২।৩ তোলা মাত্রায় নিম্নকোঙ্কনদেশে বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। আর লতার গুঁড়োও রক্ত আমাশয়ে ওদেশে ব্যবহৃত হয়, একথা বলেছেন ডিমক (Dymock)। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী কালে টাইলোফোরা অ্যাজমার্টিকা বা ভোমিটোরিয়া তার গুলের নির্দেশকরূপে গাছটির নামের সংগে যুক্ত করা হয়েছিল। আলোচ্য লতাগাছটির বিভিন্ন অংশ দ্বারা কয়েকটি রোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলের গো-চিকিৎসকগণ গরুর হাঁপানি হলে এ গাছের লতার মালা করে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে থাকেন, এটা ওদেশের টোটকা ঔষধ।

আগাছা বলে যেটিকে মনে করি, কালে দেখা যায় সেটি একটি মহৌষধি। এরকম ঔষধি সম্ভার সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। এই জাতীয় বনৌষধিগুলি আমাদের এই গরীব দেশের আর্থের সেবার নিয়োজিত হওয়া দরকার; তবে এ সম্পর্কে একটা মন্তব্য করা যায়—ভারতীয় বনৌষধির দ্রব্যগুণ বিচারের গ্রন্থমালায় এই অন্তমূলের রস, গুল-বীষ নিয়ে গবেষণা করে প্রাচ্য রীতিতেই এর পরীক্ষালব্ধ ফলটুকু যাতে লিপিবদ্ধ করা যায়, সে বিষয়ে ভারতীয় বৈদ্যগণ যত্ন নিলে একটি মূল্যবান তথ্যের নবযোজনা করা যায়। জানি না সোদিনের কত দেরী!

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Alkaloids viz., tylophorine, tylophorinine. (b) Essential oil.  
(c) Sterols. (d) Other basic constituents.





## যমদুতিকা

“তাল, তেঁতুল, কুল—তিন করে বংশ নিমূল” খনার বচনের ধরণে এই প্রবাদটি আজও আছে; এবং আরও আছে একটি বিশেষ বয়সে অভিভাবকদের সাবধান বাণী, লবণ দিয়ে কাঁচা তেঁতুল খেতে দেখলেই তাঁরা সাবধান করতেন, ‘খাসনে, হাড়ের জ্বর টেনে বার করবে’।

এরপর চিকিৎসকের জীবনে এসেছে দুবাটির ভৈষজ্যগুণ সম্পর্কে একটি তথ্যের সন্ধান বা সংকেত, “প্রাণদা যমদুতিকা” অর্থাৎ যে যমের দূতী, সেই প্রাণরক্ষণী; তাই কত প্রশ্ন জাগে—তেঁতুলকে ঘিরে কেন এত প্রবাদ?

এ ক্ষেত্রে বিচারে দেখা যায়, যদিও “বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা” সে ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ পৃথক; কিন্তু দুব্যের বিচারে যে দুব্যের উৎকর্ষই প্রত্যক্ষ হয় এটা তো ঠিক।

বর্তমান সে সব তথ্য নিয়েই নিবন্ধে আলোচনা।

দেখা যায়—তাল, তেঁতুল ও কুল গাছের তলায় সাধারণতঃ কোন গাছই হ’তে চায় না; স্বিতীয়তঃ, বৈদিক তথ্যের সমীক্ষায় বলা হ’য়েছে, তৃণবৃক্ষ তাল এবং তেঁতুল ও কুলবৃক্ষের পারিমাণ্ডলিক বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই অর্থেই সেই বংশ-নিমূলের প্রবাদ।

আর স্বিতীয়টি হচ্ছে—যে ঋতুতে এটি জন্মে সেটি শরৎ; এ সময় কর্ফপিত্তজ (পিত্ত-শ্লেষ্মা) জ্বরের জন্মই স্বাভাবিক হ’য়ে ওঠে। তার উপর কাঁচা তেঁতুল ঐ কালধর্মী রোগগুণী কারণটির সহায়ক হয়; এই উদ্দেশ্যেই এই কথাই প্রচলিত। আর তৃতীয়টি হ’লো একটি প্রাচীন তথ্যের ইঙ্গিত—

‘জীবনং জীবনং হন্তি প্রাণান্ হন্তি সমীরণঃ।

কিমাশচর্য্যং ক্ষারভূমৌ প্রাণদা যমদুতিকা’॥

এই ইঙ্গিতটির মধ্যে দুটি জীবন শব্দের উল্লেখ, তবে অর্থ দুটি শ্লেষ ক'রেই প্রয়োগ করা হ'য়েছে।

প্রথমোক্তটির অর্থ জল আর মৃত্যুটির অর্থ প্রাণ, এই ক্ষারভূমির জল ও লবণাক্ত বায়ু প্রাণবায়ুকে বিনষ্ট করে।



আর এখানে যম শব্দেরও দুটি অর্থ, (১) সংযমশক্তি (প্রাণবায়ুকে যে সংযত করে সেই সংযমশক্তি)। (২) অম্লরস। সংযমের ক্ষেত্রে তার শক্তিক্রিয়া এবং বিশিষ্ট অম্লত্বের বীৰ্যক্রিয়া (ক্রিয়াকারিত্ব) আর দুতিকা হ'লো শক্তিদারীণী বা বাহক, তাই তে'তুলের সার্থক নামকরণ “যমদুতিকা”।

এবার কেন সে প্রাণদা? এখানেও প্রাণ শব্দের দুটি অর্থ, (১) প্রাণবায়ু, (২) শারীর বল; তে'তুল এই শারীর বল প্রদান ক'রে ব'লেই সে প্রাণদা। সেখানেই বিশেষ ইঙ্গিত আবহমন্ডলের; কারণ দ্রব্যের ক্ষেত্র বিচারে আসতে গিয়েই আয়ুর্বেদ লবণ ও ক্ষারকে ভূমির একটি সমপর্যায়ের স্তরে ভুক্ত ক'রেছেন। লবণসমুদ্রবর্তী অঞ্চলকে ক্ষারভূমি বলা হয়; সেই ক্ষেত্রে লবণের বলহানিকর শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্যই অঞ্চল বিশেষে নিত্য তে'তুলের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই দক্ষিণীদের এটা নিত্য

আহাৰ্বেৰ অঙ্গ। ক্ষার এবং অম্লের যোগেই মধুর রস, আর মধুর রসই শারীর বল দেয়। খুবই বিস্ময়কর এ ধরণের রসায়নের আবিষ্কার; ক্ষারভূমিবাসীর পক্ষে যে জীবন-রক্ষণী, তাই প্রাকৃতিক কারণেই সে যমদাতিকা; অতএব সে জীবনহন্তা হ'য়েই প্রাণ-রক্ষক। তাছাড়া এখানের বায়ুও এমন যে, ক্ষারাক্ত বায়ু অন্যত্র জীৰ্ণহানিকর হ'য়েও এখানে সে জীবনরক্ষক।

### বৈদিক সমীক্ষা:—

নস্তোষসা সমনসা দ্যুতং বিরূপে চিণ্ডে।

ধাপয়েতে সমীচী রুক্মো অন্তৰ্বিভাতি দ্রবিণোদা॥

অথর্ববেদ—বৈদ্যককম্প ৩।৪৫

এই সূক্তের মহীধর ভাষ্য করেছেন—

‘চিণ্ডে হুং সমনসাং দ্যুতং নস্তোষসা, বিরূপে চ ধাপয়েতে, যথা দ্রবিণোদা দ্রবিণং ধনং দাতুমসি। অন্তঃ বিভাসি রুক্মো রোগদা যথা। সমীচী সম্যক অগ্ণে সমম্বিতা হুং চিণ্ডা তিন্তিড়ী।’

হে চিণ্ডে, তুমি মনস্বীদিকেও দ্যুতকীড়ায় প্ররোচিত কর। রাগি ও ঊষাকাল পর্যন্ত প্রমত্ত রেখে কখনও ধনদান কর। আবার অন্তরে তোমার পাপ রোগের মত বিরূপও কর। রোগ অগ্নি করারও সামর্থ্য তোমার আছে।

পরবর্তী সংহিতার যুগে তিন্তিড়ী সম্বন্ধে বেদের ঐ দুটি কথাকে উপকম্পনীয় অধ্যায়ে স্থান দিয়ে তার দোষগুণ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করা হয়েছে।

**বৈদিক সমীক্ষার অন্তরালে:—** ভারতে যে তিনটি প্রাচীন সংহিতা আছে, তাদের মধ্যে চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট্টই সর্বাপেক্ষে প্রামাণ্যের স্থান পায়—ঐ তিনটির মধ্যেই তেঁতুল তার বৈদিক আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখেছে। অথর্ববেদের বৈদ্যককম্পে তেঁতুলকে ‘চিণ্ডা’ বলা হয়েছে (বর্তমানেও তাই বলা হয়); এই নামকরণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই চিণ্ডা শব্দটির বিন্যাস করা হয়েছে—চিৎ অব্যক্ত শব্দ চিনোতি। ভোজনকালে চক্ চক্ টক্ টক্ শব্দ স্বভাবতঃই আসে বলেই কি এর নাম চিণ্ডা? বেদভাষ্যকার লিখলেন—

‘সম্যক্ অগ্ণে সমম্বিতা হুং চিণ্ডা’

এই অগ্নি শব্দের অর্থ হলো—খুব্লে খুব্লে এবং চেঁছে চেঁছে ময়লা নিষ্কাশন করা। পরবর্তী আয়ুর্বেদ সংহিতার যুগে এই বৈদিক তথ্যটির সূত্র ধরেই তার দোষ-গুণ সম্পর্কে গবেষণা করে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে; তাই ব'লে এটাকে নিয়ে আর গবেষণা করার কিছুই নেই, তা নয়। তার এই অগ্নি শক্তিক্রিয়াই নতুন তথ্যের সম্মানের সূত্র।

**পরিচিতি:—** ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই, বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে এবং বর্মায় এ গাছ জন্মে; তবে কম-বেশী। মহীরুহও বলা চলে। ভারতের পশ্চিমাংশে এর নাম ইম্লি; মনে হয় এটা সংস্কৃত অম্লিকা নামের অপভ্রংশ শব্দনাম।

সাধারণের চোখে তেঁতুল ৩ রকম—(১) টক বেশী শাঁস কম, (২) শাঁস বেশী টক কম, (৩) ক্রীড়ায় লাল—এর রসও গোলাপী রঙের—একে পশ্চিমাংশে বলে ‘লাল ইম্লি’; এদের বোটানিক্যাল নাম একই—*Tamarindus indica* Linn.

**ব্যবহার্য অংশঃ—** (১) পাতা, (২) গাছের ছাল (স্কর্ক), (৩) কাঁচা ও পাকা ফলের শাঁস, (৪) পাকা ফলের খোসা, (৫) বীজের শাঁস ও বীজের খোসা।

**পাতার কদর একালে ও সেকালেঃ—** এই তেঁতুল পাতাকেই উপমার ক্ষেত্রে অমর ক'রে রেখে গিয়েছেন—সরস্বতীর বরপুত্র নদীয়ার বুনো রামনাথ তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে। আজও ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে গরীব লোকেরা কচিপাতা বেটে লংকা ও লবণ মিশিয়ে বড়ার মত ভেজে পান্ডাভাত দিয়ে খেয়ে থাকে। এটা হয়তো বাহ্যতঃ চরম দারিদ্র্যের চিহ্ন মনে হতে পারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতে আজ সেটা নতুন তথ্যের সম্ভান দিচ্ছে। এ সম্পর্কেও গবেষণা হয়েছে, দেখা গিয়েছে—ছোট গাছের কাঁচ পাতায় যথেষ্ট পরিমাণ 'এমিনো এসিড' (Amino acid) আছে। এভিন্ন সমাজ-কল্যাণে এর ফলে প্রস্তুত জৈব অম্লের উপযোগিতা প্রভূত—সেটা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা সকলেই জানেন; অবশ্য এ সম্পর্কে এখনও বিশেষ সমীক্ষা চলছে।

### বিভিন্ন রোগ প্রতিকারে পাতার ব্যবহার

(১) **নব প্রতিশ্যয়েঃ—** (কাঁচা সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া) তেঁতুলের কাঁচা পাতাকে (৩।৪ গ্রাম) সিদ্ধ করে তার ঠাণ্ডা জল খেলে উপশম হয়।

(২) **রক্তপ্রাবী অশ্বরোগেঃ—** উপরিউক্ত মাঠায় পাতা-সিদ্ধ জলের সরবৎ ক'রে খেলে কমে যায়। এছাড়া পুরানো তেঁতুল ভিজানো জল সেবনেও কাজ হয়।

(৩) **প্রস্রাবের জ্বালায়** (পিণ্ডবিকার জনিত)ঃ— এক চা-চামচ আন্দাজ পাতার রসের সরবৎ খেলে উপশম হয়।

(৪) **বসন্তেঃ—** ৩ গ্রাম তেঁতুল পাতার সমান হলুদ পাতা, তার অভাবে কাঁচা হলুদ একত্রে বেটে ছেঁকে নিয়ে সরবৎ ক'রে খাওয়ালে ঐ গুটিগুটি শীঘ্র পেকে যায়।

(৫) **আমাশায় (পূরাতন)ঃ** ৪।৫ গ্রাম পাতা সিদ্ধ ক'রে, চটকে, ছেঁকে সেই জলটিকে জিরে ফোড়নে সাঁতলে নিয়ে খেলে ২।৩ দিনের মধ্যে বহুদিনের পুরানো এবং পেটে সঞ্চিত আম (Mucus) বেরিয়ে যায়; অবশ্য নতুন আমাশায় ক্ষেত্রেও টোটকা চিকিৎসায় এটার ব্যবহার হয়ে থাকে।

(৬) **মচকানো ব্যাধায়ঃ—** এই পাতা বেটে অল্প সোরা (ঘেটায় বাজি তৈরী হয়) মিশিয়ে সহ্যমত গরম ক'রে লাগালে ব্যথা ও ফুলা ১ দিনে দুইই কমে যায়।

(৭) **পূরাতন ক্ষতেঃ—** যে ক্ষত কিছুতেই ভাল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে পাতাসিদ্ধ জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিলে তাড়াতাড়ি আরোগ্য হয়।

(৮) **মুখের ক্ষতেঃ—** এর পাতা-সিদ্ধ জল মুখে খানিকক্ষণ রেখে ফেলে দিতে হয়। এইভাবে ৫।১০ মিনিট ক'রে ২।৩ দিন ব্যবহার করলে উপশম হয়; অনেক ক্ষেত্রে সেরেও যায়, তবে আভ্যন্তরিক কোন কারণে ক্ষত হলে সেখানে চিকিৎসার প্রয়োজন।

(৯) **বাতের ব্যাধায়ঃ—** পায়ে বা হাটুতে ফুলা ও ব্যাধার ক্ষেত্রে এই পাতা তালের তাজিতে সিদ্ধ ক'রে একসঙ্গে বেটে নিয়ে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়, অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে। এ-ভিন্ন রোগ-প্রতিকারে বহু গ্রামীণ ঔষধ আমাদের এখনো অজানা রয়ে গিয়েছে। অবশ্য এই গাছের প্রতিটি অংশই বহু রোগ নিরাময় করে। এখানে কেবলমাত্র শারীরিক্রিয়ার উপর তার বিশিষ্ট ক্রিয়াকারিত্ব শক্তি কি—সেইটা আমার বস্তুর বিষয়বস্তু।

বহু ভেষজের মধ্যে জৈব অম্ল কম-বেশী থাকলেও এই তেঁতুলের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে—বোটিকে অণ্ডন শক্তি ও লেখনধর্মী বলই আখ্যায়িত করা যায়

(এই হেতু শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয় না)। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, একটু বয়স হলেই অনেকেরই রক্তে 'কোলেস্টেরল' বাড়তে থাকে এবং ধমনীগুলোর স্থিতিস্থাপকতা কমে যেতে থাকে, যাকে বলা হয় Arteriosclerosis; যার জন্য হাই ব্লাড-প্রেসার ও তৎ-পরবর্তী অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যারা 'নিত্য তেঁতুল সেবনে অভ্যস্ত'—তাদের এটা হয় না কেন, আজ বৈজ্ঞানিকরাও সেটা চিন্তা করেছেন এবং ২।১ জন চিকিৎসকও একটু একটু পুরানো তেঁতুলের সরবৎ করে খাওয়ার ব্যবস্থাও দিচ্ছেন; অবশ্য সেটা কেবল বাস্তবকে লক্ষ্য করে। আয়ুর্বেদের এই বস্তু-বিজ্ঞানের সহজ ব্যবহার রীতিটি উপলব্ধি করার মন আজও যদি আমাদের না হয়ে থাকে, তবে সেটা হবে আমাদের অতীতের বস্তু-বিজ্ঞানের প্রতি অজ্ঞতা-প্রকাশ।

এখন প্রসঙ্গত বলা হচ্ছে—প্রধানভাবে এই গাছের পাতা ছাড়াও এর অন্যান্য অংশের প্রচলিত ব্যবহার ও তার বিশিষ্ট শক্তি সম্পর্কে। এই গাছটির অন্যান্য অংশ কিভাবে সমাজ-কল্যাণের কাজে লাগানো হয়েছে, সেটাও আলোচ্য।

এটা অনেকের অজ্ঞাত নয় যে, আজও গ্রামবাংলার কোন কোন অঞ্চলে শারদোৎসবের বিজয়া দশমীর দিন দেবী প্রতিমার সম্মুখে পালতা ভাত, কচু শাকের ঘণ্ট ও কাঁচা তেঁতুলের বা চালতার অম্বল রান্না করে নিবেদন করা হয়; মনে করা খুবই সঙ্গত যে, এর মূলেও আছে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থান ও জলবায়ুর গতি-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই এই প্রচলন। প্রাচীনগণ লক্ষ্য করেছেন মানুষের দেহস্থিত স্বাভাবিক বায়ু, পিত্ত ও কফের যদি বিষম অবস্থান্তর (শরৎ ঋতুতে) ঘটে, তবে তার প্রতিষেধক হিসেবে সহজপ্রাপ্য তেঁতুলের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি। মাতৃতান্ত্রিক বঙ্গভূমিতে তাই দেবীকে নিবেদন করে খাওয়ার বিধি অথবা নবান্ন গ্রহণের মত রীতি, হয়তো বা নিজে তৃপ্ত হই ব'লেই সর্বাগ্রে দেবতাকে নিবেদন করে আত্মতৃপ্ত। যাই হোক, এটা অবশ্য পরবর্তী-কালে সংস্কাররূপে পরিগণিত হয়েছে।

**শীতপিত্তে (প্রচলিত নাম আমবাত):**— শরীর চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে ও চুলকায়, সেক্ষেত্রে তেঁতুলের শাঁস (কাঁচা হলে সিদ্ধ করে) জল দিয়ে অল্প পাতলা করে কোন তামার পাত্রে ৫।১০ মিনিট ঘষে নিয়ে তা শরীরে লাগালে ফুলো ও চুলকানি দুই-ই কমে যায়। এটা ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে খুবই প্রচলিত; তবে এ রোগে দাস্ত-পরিষ্কার থাকা বিশেষ প্রয়োজন—তা না হলে রোগের মূলে আঘাত করা হয় না।

### ব্যাতিক্রমের ক্ষেত্র

প্রচলিত বহুলক্ষেত্রে নব্বইয়ের কদর বেশী, বৃদ্ধি মানে ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম কেবল পাঁচটিতে— ১। তেঁতুল, ২। কুল, ৩। ঘি (ঘাত), ৪। চাকর, ৫। চাল। এইসব তত্ত্বকথা পূর্বসূরীদের দৃষ্টফলেরই বিদগ্ধ জ্ঞান বলতে হয়। তাই রোগ-প্রতিকারে পুরাতন তেঁতুলেরই ব্যবহার সর্বদা করা সমীচীন।

(১) পেটের বায়ু (উর্ধ্ব বা অধঃ) স্তম্ভিত হয়ে যারা কষ্ট পান, তাঁরা অল্প (৩।৪ গ্রাম আন্দাজ) পুরানো তেঁতুল ১ কাপ জলে ভিজিয়ে রেখে চটকে নিয়ে, ছেকে একটু চিনি বা লবণ মিশিয়ে অথবা শুধু ঐ জলটি রাতে শয়নের পূর্বে খেলে ঐ অসুবিধে অনেকেরই থাকে না।

(২) হাত-পা জ্বালায় কষ্টে (শরৎ ও গ্রীষ্মকালে) তেঁতুল ভিজানো জল খেলে অনেকের কমে যায়। অবশ্য হাঁদের অঙ্গরোগ থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার সমীচীন নয়।

(৩) কিড্‌নির দোষে হাত-পা বা মূখে একটু ফুলো ফুলো দেখায়, সেক্ষেত্রে একটু পুরানো তেঁতুল ভিজানো জল খেলে উপশম হয়।

(৪) বৃকে সর্দি বসে খুব কষ্ট হচ্ছে, এক্ষেত্রেও খেলে সর্দি উঠে যায়। তবে এর সঙ্গে মাষকলাই ও পান সরিষার তৈলে ভেজে ঐ তৈল বৃকে মালিশ করলে আরও সুবিধে হয়।

(৫) সিন্ধির নেশা কাটাতে তেঁতুলের সরবতের জুড়ি নেই। আমাশা হলে পুরানো তেঁতুলের সরবৎ খাওয়া এটা সুপ্রাচীন টোটকা হিসাবে চলে আসছে। তবে যাঁরা অম্লপিণ্ড রোগগ্রস্ত, তাঁরা এটাকে সহ্যমত ব্যবহার করবেন।

(৬) লু লাগলে— কাঁচা তেঁতুল আগুনে ঝলসে তার মজ্জা (মাড়ি) দিয়ে সরবৎ ক'রে খেলে এটাকে সামলে দেয়। যে সর্দিগর্মিতে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে মনে হয়, সেক্ষেত্রে কাঁচা (পোড়া) তেঁতুলের বা পুরানো তেঁতুলের সরবৎ ব্যবহারে ঐ অসুবিধেটা চলে যায়। এতে লবণ দেওয়ার দরকার নেই।

**বীজ-মহাশক্তিঃ**— বৈদিকযুগেও যে সেটা জানা ছিল না, তা নয়—তবে সেটা সেক্ষেত্রে বলা আছে যে, এই বীজ 'রাত্রি থেকে উষাকাল পর্যন্ত প্রমোদিত করে রাখে।'

পরবর্তী সংহিতার কালে সেই সূক্তের অনুশীলনে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন তেঁতুল বীজের অন্তর্নিহিত শক্তির বল। এর আর একটি আশ্চর্য প্রাণধর্মিতা প্রত্যক্ষ— সেটি হ'ল যৌনশক্তিকে প্রাণবন্ত করা। প্রাক্-আর্যবংশীয়গণ আজও তেঁতুলের বীজ বালিতে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে মহারার সঙ্গে হালুয়া প্রস্তুত ক'রে খেয়ে থাকেন। টোটকা বিধানে সিন্ধুহস্ত বৈদ্যরা বলেন—'এই কাঁচা বিচি হ'ল যৌবনের মূল্যমান'; অবশ্য এই রেওয়াজটা কলকাতার লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ বৈদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

**শোনা কথাঃ**— তেঁতুল বীজকে বালি'র মত রান্না ক'রে খাওয়াতে নাকি ডায়াবেটিস রোগ কমে গিয়েছে। এটা বৈজ্ঞানিকগণকে দেখতে অনুরোধ করি। তবে বীজের অঙ্কুর খাওয়ালে বহুদ্রবের উপশম হয়।

**দুপরাগেঃ**— মাটির প্রতিমা রং করার জন্যে এই বীজ-সিন্ধ ঘন জল বিশেষ উপযোগী। এ ভিন্ন দেশ-গায়ে চপ, কাটলেট তৈরীতেও ডিম বা এরারুটের পরিবর্তে ব্যবহার হয়।

**বীজের খোসাঃ**— অশের যন্ত্রণায় বীজের খোসা পুটলি ক'রে সেক দিলে উপশম হয়।

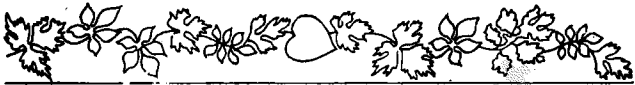
**ফলের খোসাঃ**— তেঁতুল ফলের শুকনো খোসা পুড়িয়ে তার ছাই (১-২ গ্রাম আন্দাজ) অম্লশূল ব্যথায় জলসহ অনেকে খেয়ে থাকেন, উপকারও হয়। টোটকা বিধান এটা।

**তেঁতুল চটা (গাছের স্বভাব-মত ছাল)ঃ**— এর পোড়া ছাই ৩ গ্রাম আন্দাজ জল-সহ খেলে বমন নিবারণ হয়।

তেঁতুল এমনই একটি ভেষজ গাছ, যার সব অংশই কোন না কোন কাজে লাগে; এর কাঠ কাঁচা থাকলেও জ্বলে, শুধু তাই নয়—তৈল পেঁষাইয়ের ঘানি-গাছটি এই কাঠ ভিন্ন প্রস্তুত হয় না। কথায় বলে—'এই গাছটির সবই খায়, ছাইও না তার ফেলা যায়।'

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tartaric acid. (b) Malic acid. (c) Polysaccharide. (d) Oxalic acid.



## তাম্বুল

তাম্বুলবিলাস তখনই—যখন মদন্তোর চুণ আর কস্তুরী চুয়ার মশলা দিয়ে পান খেয়ে থাকেন নবাব বাদশারা এবং পান বিলাসিরা; আবার সমস্তদিন ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে ২০।৩০টা পান খাদ্যের খেতেই হয়—তাদের হয় সেটা নেশা, কিন্তু দু'বেলা খাওয়ার পর দু'টো পান খাওয়ার অভ্যাস—সেটা হলো স্বাস্থ্যসম্মত বিধি; তবে অসুস্থের জন্য নয়।

এই পানকে নিয়ে উপমাবহুল লোককথা পঞ্জাবাংলায় মুখে মুখে আজও ফেরে; যেমন—(১) ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমনি চুণ; বেশী হ'লে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল। (২) ছাগলের মুখে প'ড়লো পান, পান বলে মোর গেল জান্! (৩) পান থেকে চুণ খসলেই বিপদ। (৪) পানের পিকে রেঙেছে নয়ান, বানরমুখে কি শোভে পান? (৫) পানের সজ্জা পানের ডাবর পান মশলার বাটি, কন্যার পাঠালেম আমি করি পরিপাটি। অতএব এই পান তো আজকের নয়, সামাজিক মান্যতায় পানের সমাদর সবার আগে; কিন্তু এর আদিমান্যতা সেই বৈদিকযুগ থেকে চলে আসছে। এমনি সম্বন্ধান নিতে গিয়ে দেখছি—ঋক্, যজু, সামবেদে এই লতাগাছটির নাম খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে খৃষ্টপূর্ব অন্ততঃ আড়াই/তিন হাজার বৎসরের অথর্ববেদেই এর সম্বন্ধান পাওয়া যায়; সেখানে দেখা যায়, এটির বিভিন্নাংশ বিভিন্ন-গুণের আধার। এর বৈদিক নাম “সন্তশিরা” (সব পানেই এটি প্রধান শিরা আছে), এই নামটির উল্লেখ আছে ৬৭ মণ্ডল ৫৩ সূক্তে।

“সন্তশিরে পর্ণং প্রপত চোষণে কিকিদীবিণা।

যক্ষ্মং বিবোধধব বাতস্য ধ্রাজ্য নশ্য নিহাকরা॥”

## মহীধর ডায়া—

ঝং সপ্তশিরা, তব পৰ্ণং কিকিদীবিনা=চোষণে প্রপত। সপ্তশিরা  
নাগবল্লীতি। তব পৰ্ণং কিকিদীবিনা কফাবরুদ্ধ—কণ্ঠোথরুনেরন  
—করণেন কিকিনা=কিকিদীবিনা=শ্লেষ্মারোগঃ তেন=চোষণে  
ব্যাকুলং কৃষ্ণা পিত্তরোগঃ বাতস্য প্লব্জিঃ=বাতরোগঃ। তস্যাপি রুজঃ  
যক্ষ্মাণঃ নিহাকা বেদনং। ঝং নস্য সপ্তরোগান্ পৰ্ণতি ইতি পৰ্ণং  
বৰ্দ্ধয়তি চ।



অনুবাদ— তুমি সপ্তশিরা। তুমি নাগবল্লী। কফরোগ জন্য কণ্ঠরোধ ও তজ্জন্য  
স্বরাবরোধ, জ্বর ও বাতরোগ দূর কর। তখন অতি কষ্টে কষ্টে ধরনি ওঠে। তাতে  
ব্যাকুল কণ্ঠে নিঃশব্দের মত শোষ হয়, জ্বর ও বাতরোগ। তোমার পত্র সেইসব রোগ



দূর করে। তুমি যক্ষ্ম (জ্বর রোগেরও নাম যক্ষ্ম) দূর কর। তোমার এটি শিরা, সারাটি রোগকে হ্রাস-বৃদ্ধি করে। (একটি কথা এখানে ব'লে রাখি—এই কণ্টরোগ সম্পর্কে ভাষ্যকারের বর্ণনার সঙ্গে বর্তমান ডিপথিরিয়া রোগের লক্ষণের হুবহু মিল আছে।)

নাগবল্লীর বৈদিক সমীক্ষায় তার যতটুকু গুণপনা জানতে পারা যায়, তার পরবর্তী-কালে অনুশীলিত বনৌষধি-সমৃদ্ধ সংহিতাগুলিতে রোগ-প্রতিকারার্থে তার বিশেষ কোন ব্যবহার দেখা যায় না; তবে চরকে কেবলমাত্র মাত্রাশিতায় অধ্যায়ে এবং সূত্রদ্বয়ে আহারের পরবর্তী কৃত্যে পানের ব্যবহারের কথা বলা থাকলেও, মনে হয়, পরবর্তী চিকিৎসাজগতে সে যেন হারিয়ে গেছে, আর পানের আসর জমিয়েছে চেতনাহীন দ্রব্যের (নিরিন্দ্রিয়ম্ অচেতনম্) সাধক-সম্প্রদায়ের সাধিত রসগ্রন্থসমূহে; তাঁরা দেখেছেন—পারদ, গন্ধক প্রভৃতি প্রাণহীন দ্রব্যের ঔষধীর প্রাণ-সঞ্চার পান একটি অপরিহার্য ঔষধী। এই পানের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তাঁরা বহুরূপে দেখেছেন—সেটাও আজকের কথা নয়, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতকের আরও আগের শতাব্দীরও পূর্বেকার কথা। এই সব সূত্রে অবলম্বন করে রসসাধক পূর্বাচার্যগণ যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, আমার বর্তমান আলোচ্য এই বল্লীটির উপর নিবন্ধ তার পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে।

**জাতি ও গোষ্ঠী**— সমগ্র ভারতে ও তৎসম্বাহিত অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাদের ও গন্ধের বিভিন্ন প্রকার পান পাওয়া গেলেও, পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানীদের মতে তারা সকলেই Piperaceae ফ্যামিলীভুক্ত, এর বোটানিক্যাল নাম Piper betle Linn.; কিন্তু আয়ুর্বেদ অনুবর্তীদের মতে বিভিন্ন প্রকার পানের গুণগত পার্থক্য অনেকদিন থেকেই রয়েছে।

**এক নজরে পানের রসের দোষ-গুণ**— (১) এটি বলকারকও যেমনি, বলহানিকরও তেমনি; অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে। (২) নবপত্র (নূতন পাতা) শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, পুরাতন পান শ্লেষ্মা দূর করে। (৩) পরিপাক শক্তি যেমন বৃদ্ধি করে, অপব্যবহারে তেমনি আবার অজীর্ণও সৃষ্টি করে। (৪) পাতার রস বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে বলাধানও করে, আবার শিরা (বোটা সমেত প্রধান শিরা) খেলে ইন্দ্রিয়ের বলহানিও করে। (৫) শরীরের চামড়ায় এর রস দাহ সৃষ্টি করে, আবার দংশ চামড়ায় এর রস স্নিগ্ধতাও নিয়ে আসে। (৬) এর পাতার রস মূত্রে জড়তা ও অবরুচি দূর করে, আবার এই পানের রস বাসি হলে ঠিক এইগুলিই বাড়িয়ে দেয়।

**কোথায় কিভাবে কাজে লাগে**— খাওয়ার পর একটি করে পান খেলে মূত্রে যে লাল-নিঃসরণ হয়—তাই হয় হজমের সহায়ক, এই পর্যন্তই অনেকের জানা; কিন্তু আর একটি অন্তর্নিহিত শক্তি এর আছে—যেটি গ্রহণীনাড়ীর আকৃশন-প্রসারণ শক্তি (peristaltic movement) বাড়িয়ে দেয়, আবার বেশী খেলেও এ কাজটি খুবই মন্দীভূত হয়। এটি নব্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

### রোগ-প্রতিকারে

(১) পানের রোগ-নাশিনী শক্তি সম্পর্কে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে—যেখানে শ্লেষ্মাপ্রধান রোগ, সেখানেই তার প্রভাব বেশী; তাই রসতাত্ত্বিক আয়ুর্বেদজ্ঞগণ ঔষধের সহপানে পানের রস বেশী ব্যবহার করেন।

(২) দাঁতের মাড়ির দূষিত ক্ষতে পুঁজ জমতে থাকলে পানের রসের সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে কলকুচি করলে ওখানে আর পুঁজ জমে না; ক্রমশঃ ক্ষত শুকিয়ে যায়।

(৩) পুরাতন দাদ বা চাপড়া-চুলকানিতে পানের রস ঘষে দিলে কয়েক দিনেই ও অবস্থাটার অবসান হয়।

(৪) কানের পুঁজে এর রস গরম করে ২।১ ফোঁটা কানে দেওয়ার বিধি গ্রামাঞ্চলে তো আছেই।

(৫) হাতে-পায়ে হাজায়— পানের রস অল্প গরম করে রাতে লাগিয়ে রাখুন; উপশম হবে—তবে এটাও ঠিক যে, হেতুটা বজ্র না করলে সে তো আবার হবেই।

(৬) নখকুনির কণ্টে— পানের রস গরম করে দিনে ৩।৪ বার নখের কোণে দিলে ব্যথা থেকে রেহাই হয়, তবে নখের ঐ বৃন্দিটুকু কাটতেই হয়।

(৭) ফোড়ায়— পানের পাতার সোজা পিঠে ঘি (পুরাতন হলে ভাল হয়) মাখিয়ে ফোড়ার উপর বসিয়ে দিলে ফোড়া পাকে ও ফাটে; আবার এইভাবে পানের উল্টোপিঠ ফোড়ায় বসালে ওটা পুঁজ টেনে বার করে শুকিয়ে দেয়; (অবশ্য একটু গরম করে নিতে হয়)। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি—পানের পাতায় পচন-নিবারক উদ্ভাবী তৈল আছে, যার জন্য ঐ ফোড়া বিসর্পিত হতে পারে না।

(৮) মাথায় উকুন হলে পানের পাতার রস মাথায় লাগিয়ে দেখুন—ওরা সবংশে চলে যাবে। (তবে ঝাল পান হলে ভাল হয়। এ পানের গঠন একটু মোটা হয়।)

(৯) গভর্নিরোধ— পানের শিকড় বেটে খাওয়ালে ছেলেপুলে হয় না—একথা গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কানায়দুধো শুনতাম, এখন দেখি বর্তমানের প্রামাণ্য গ্রন্থ Glossary of Indian Medicinal Plants-এ এ কথা লেখা আছে। রোগ-প্রতিকারে এই পানের ব্যবহার আরও হয়তো অনেকের জানা আছে।

পান খাওয়া উচিত নয়— (১) রুদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তির, (২) মূর্ছা রোগীর ও যার চোখ উঠেছে, (৩) রক্তপিণ্ডে, ক্ষয় ও যক্ষ্মা রোগীর, (৪) অতিরিক্ত নেশার পর।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি নৈস্কর্মান্বিতক আত্মশ্লাঘার পরিচয় দেখা যায় যে, আমাদের আয়ুর্বেদে সব আছে, অতএব নতুন কিছু জানারও নেই, করারও নেই; হ্যাঁ, আছে সত্যি, কিন্তু আজ যে সেটা বাস্তবে হাতে-কলমে প্রমাণ করার সময় এসেছে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Phenolic compounds viz. chavicol, hydroxychavicol. (b) Vitamin viz. ascorbic acid. (c) Enzymes. (d) Essential oil.



## অগ্নিমন্থ

দাবান্নের বাস্তব অভিজ্ঞতা সকলের নেই, সেটা অনেকের কাছে অভিধানের শব্দও বলা যায়, কিন্তু পার্থিব বা ভেষজদ্রব্যকে মন্থন ক'রে যে আগুন জ্বালানো যায়, তার বাস্তবরূপ এখনও দেখা যায়। কারণ অদ্যাবধি মাদ্রাজের প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্ রাম্মণরা মন্থন প্রণালীতে কাষ্ঠ ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নিসৃষ্টি ক'রতে পারেন। মন্থন প্রণালীটি তাঁদের বনৌষধির দুটি কাষ্ঠ দ্বারা; সূতরাং বিশেষ ধরনের একটি ভেষজের নাম যে অগ্নিমন্থ এটি অপ্রাপ্ত, অথবা অগ্নিমন্থ নামকরণের উৎসও এইখানেই। এ নাম কিন্তু ইদানীন্তন যুগের দেওয়া নয়, সেই বৈদিক যুগ থেকে এই নামেই এটির ব্যবহার চ'লে আসছে, সেখানে তার নাম দেওয়া হয়েছে “হবির্মন্থ”; এর আর একটি নাম ‘অরুণি’। এইজন্য বেদে অগ্নিমন্থ শব্দের বক্তব্যে হবির্মন্থ প্রয়োগ অর্থাৎ অগ্নিমন্থ কাঠটি আধার, আর তার আধেয় কাঠটি হয় শমী? তা ছাড়া এতে অরুণি শব্দটিও যুক্ত করা যায়, সেটি তখন মাতৃসাদৃশ্যবাচক। আধার কাঠটির নাম অগ্নিমন্থ বা হবির্মন্থ। ওটিই অগ্নির যোনি, কিন্তু জনক নয়। অরুণি শব্দটি সেখানে মন্থনক্রিয়া বাচক। মন্থনকালে দণ্ডটির নাম অরুণি হয় না। আধার কাঠটির নামই তখন অরুণি (যাঙ্ক ১১।১৯।৩৪) সূক্ত ভাষ্য দ্রষ্টব্য—অথর্ববেদ’। আর্যবৈদিক সংহিতাগ্রন্থে এর আর একটি নাম গণিকারিকা, যাকে আমরা বাংলাদেশে চলতি কথায় গণিয়ারী বলে থাকি।

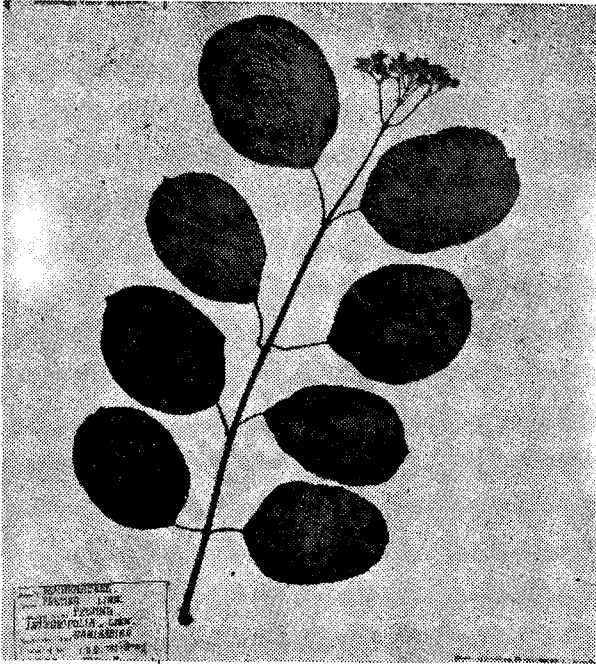
‘হবির্মন্থ ওষধীষু সোমস্য শ্ৰুত্ব সূরয়া সূতস্য রসস্তে জিহ্ব  
যজমানং মদেন অশ্বিনৌ ইন্দ্রং অগ্নীয় জিহ্ব।’

সূক্তটির মহাধর ভাষ্যে বলা হয়েছে—

হবির্মন্থ্যাসি, হবিষে মনতে অসৌ হবির্মন্থ হবিরিতি স্নেহরসঃ  
মজ্জাস। পাবকারণিগাসি অরুণিকা পাবক এব ব্যতরাং পাবকারণিঃ।

ঋৎ ওষধেষু সোমস্য শৃঙ্গম্ যৎ বলং, যেন মদয়তি সুরয়া সহ সূতস্য  
সোমস্য মদেন যজমানং অশ্বিনৌ ইন্দ্রং=অগ্নিং জিহ্বা।

ভাষ্যটির অনুবাদ হ'ল—'তুমি হবির্মন্থ অর্থাৎ হবির জন্যই মন্থন। তুমি পাবকারিণি, তুমি ওষধিদের মধ্যে সোমের বল বাড়িয়ে দাও। সেই বলের দ্বারা সুরা ও সোমের মদে গজমানের অগ্নিকে জয় করে। অশ্বিনীকুমারও তোমাকে প্রীত করেন।'



প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু ইঙ্গিতই পাওয়া যায় বৈদিক তথ্যে। প্রথমতঃ হবির্মন্থ একটি নাম, কারণ হবি শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করে—(১) ঘৃত (স্নেহ), (২) আমাদের শরীরের রস থেকে সৃষ্ট স্নেহ (মেদ ও মজ্জা দাতু)। দ্বিতীয় হলো পাবকারিণি—এই পাবক শব্দটি অগ্নির দ্যোতক আর অরুণি শব্দটির বিন্যাসে দেখা যায়—~~অ~~গ্নৌ অনিচ্—ক। উনাদি প্রত্যয়ে সৃষ্ট। বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্ক লিখেছেন, অরুণি দু'টি—একটি উত্তরারুণি আর একটি অধরারুণি। মন্থনে দু'টি কাঠ লাগবেই, যে কাঠটি আধার হবে অর্থাৎ যার উপর ঘর্ষণ করা হবে তার নাম অধরারুণি, সেটাই কিন্তু অগ্নিযোনি, আর মন্থন কাজটির দন্ডটি হবে অন্য কাঠ—সেখানে শমী কাঠের উল্লেখ। এই হবির্মন্থনের

আধার কাঠটিই যে অগ্নিগর্ভ—এইটাই ইঙ্গিত করা হলো।

**সংহিতাকালের অনুশীলন—** প্রকৃতির পার্থিব তেজ (অগ্নিক্রিয়া) সর্বত্রই বিদ্যমান, তবে কম-বেশী, এমন-কি জলের মধ্যেও; তা না থাকলে স্রোতের জল গরম হয় কি করে। সেই রকম আমাদের শরীরে সূচ্য রস, রক্ত, মাংস ইত্যাদি সর্বপ্রকার ধাতুতেও অগ্নির ক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। বর্তমান বিজ্ঞানে বলা হয় ‘মেটাবলিজম্’ এই অগ্নিবল কমে গেলেই আমাদের শরীর পোষণের মূল উপাদান যে রসাদি ধাতু সে হয় আমদোষে দুষ্ট অর্থাৎ অপক্ক দোষে দুষ্ট হলো, আবার বেড়ে গেলে অত্যগ্নিজনিত রোগ সূচ্য হয়, যাকে বলা যায় ‘গোড়ায় গলদ হলো’। এর থেকে না আসে, এমন রোগ প্রায় নেই বললেই হয়।

**পাশ্চাত্য মতে পরিচিতি—** এটি Verbenaceae ফ্যামিলী ও Premna গণভুক্ত। ভারত ও তৎসম্বন্ধিত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই গণের ৪০টি প্রজাতি (species) আছে। বৈদ্যক গ্রন্থে বহু ও ক্ষুদ্র ভেদে দুইটি প্রজাতির ব্যবহার করেছেন। বহুটির নাম Premna latifolia Roxb. ও ক্ষুদ্র প্রজাতিটির নাম Premna integrifolia Linn. বৃক্ষের আকারে স্থূলতা ও কৃশতা বর্তমান থাকতে তাকে বহু ও ক্ষুদ্র বলা হয়েছে। এই বৃক্ষটির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সম্প্রদায়েরই স্বরূপ নির্ণয়ের ধারা একই বলা যেতে পারে, কারণ এই ক্ষুদ্রাগ্নিমন্ত্ৰের পাশ্চাত্য নাম পূর্বে ছিল Premna serratifolia, যেহেতু শৈশবাবস্থায় গাছের পাতাগুলির ধার করাতের মতো কাটা হয়; তারপর তার নামকরণ করা হলো Premna spinosa; এইহেতু গাছগুলি বড় হলে কাণ্ডের সরু ডালগুলি কাটায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এই গাছটির নাম Premna integrifolia, এই অর্থে গাছ যখন পূর্ণিপক্ব হয়, তখন পাতাগুলির উপরের অংশ কাঠাল পাতার মত অখণ্ড হয়। আর প্রাচ্য মতে এই ক্ষুদ্রাগ্নিমন্ত্ৰের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা বলা আছে—(১) ‘তনুষ্ণতা’—তনু অর্থে কৃশ, ষ্ণ (ষ্ণা?) অর্থে ছাল। এই গাছের ছাল খুবই পাতলা হয়। (২) ‘গন্ধপত্রা’—পাতায় এক বিশেষ ধরণের গন্ধ থাকে, যার জন্য, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ডাল রান্নার সঙ্গে ঐ পাতা ব্যবহার করা হয়। (৩) গন্ধমূলা—এই গাছটির মূলের ছালে বেশ মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু স্বাদে তিক্ত। বহু ও ক্ষুদ্র এই দুইটি প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য—পত্র, ষ্ণকে, গন্ধে এবং আকারে।

**প্রাস্তিষ্ঠান—** সর্বত্র অল্প-বিস্তার পাওয়া গেলেও সাধারণতঃ নদীমাতৃক অঞ্চলে ও সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশে বেশী পাওয়া যায়।

**উপযোগিতা—** আর্যবর্ষে এই বৃক্ষটির বিভিন্ন অংশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে সেগুলিকে ব্যবহার করা হ’য়ে থাকে। রোগগুলির মধ্যে যেমন—অলসতা, শ্রম-বিমুখতা, দিবানিদ্রাপ্রিয়তা, ভোজন-বিলাসিতা ইত্যাদি। এগুলি রসধাতুর বিকারজাত। তাছাড়া শারীরিক অস্বাভাবিকতাও কারণ হতে পারে। এই রোগের হেতু সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য না থাকলেও শারীর-ক্রিয়ার ক্রম-বিবর্তনের পরিণতিগত (physiological outlook) মতভেদ থাকবেই। তবে এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হ’লো দ্রব্যগুণের প্রসঙ্গ নিয়ে।

বেদের সূক্তটির মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করার মত তিনটি বস্তু—(১) হবি শব্দটি স্নেহ এবং রস ধাতুর মজ্জাকে বোঝায়। (২) শরীরে ব্যতন হয়ে অর্থাৎ বিপরীত হয়ে দেহকে অরুণি করে যে জন্মগ্রহণ করে। (৩) ওষধির বা ভেষজের মস্তানে অগ্নির জন্ম হয়। বলা হয়েছে—তুমি বলের দ্বারা সূরা ও সোমের মদে যজ্ঞমানের অগ্নিকে জয় কর। অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রকে প্রীণিত করে অর্থাৎ রসধাতুতেও অগ্নির অবস্থান হয়। কথাটা এই যে, রসে মস্তানক্রিয়ার বল কম থাকলে অগ্নির উদয় হয় না। তার

সরলার্থ হলো, প্রকৃতি এবং রোগ এক নয়। প্রকৃতির অন্যতম উপাদান রসধাতু। আর সেই রসধাতুতে অগ্নি অবস্থান করে। উভয়েই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জল বা রসকে মগ্নন করলে অগ্নির উদয় হয়, আবার সেক্ষেত্রে অগ্নির উদ্গম প্রচণ্ড হ'লে রসধাতু শুকিয়ে যায়, যেমন বড়বাগ্নি। স্বভাব স্নেহ বা রস ধাতুকে মগ্নন করলেই অগ্নির উদয় হয় দেহে। আবার অগ্নির মাল্য হলে বা মালিন্য এলে রসধাতুটি প্রবল হয়, তাতে শরীরে শোথ রোগের আবির্ভাব হয়। সে শোথ প্রায়শঃ রস-প্রধান। রস-প্রধান ধাতুর দেহে আরও রস-প্রধান দ্রব্যের সমাগম ঘটলে আরও অগ্নিমাল্য হয়।

এইজন্যই বেদের দ্বিতীয় সূত্র হলো—শরীরের রসধাতু মগ্নন করে বলেই এটির নাম হবির্মগ্ন, অর্থাৎ শরীরে দোষ থাকলেই রোগ হয় না। তাহলে সর্বদাই রোগ হতো। রস ধাতুটিও দোষ, যেহেতু সে নিজেও দূষিত হয়। দোষ শব্দের ব্যাখ্যা দু'বার দু'রকমে হয়—

‘দূষয়তি ইতি দোষঃ, দূষ্যতে ইতি দোষঃ’,

অর্থাৎ যে দূষিত করে সেও দোষ এবং যে দূষিত হয় সেও দোষ। কিন্তু তার মগ্নন বা বিকার হয় না সর্বদা। ব্যত্যয় হ'লেই হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি এবং রোগের মধ্যে এই হলো ভেদ। অপথ্য সেবনে প্রকৃতি কুপিত হয় না, কিন্তু দোষ কুপিত হয়। (পিত্ত-প্রকৃতির লোক কটু রস খেলে বেশ সহ্য করে যায় কিন্তু পিত্তজন্য ব্যাধি হলে আর কটু খাওয়া চলে না। লেপ্ত-প্রধান ধাতুতে দূষ বা আতা খেলে কিছু হয় না, কিন্তু লেপ্তাবিকার হলে দূষ বা আতা খাওয়া চলে না।) এমনি ব্যদ্-প্রধান ধাতুতে শূদ্রক হরীতকী খেলে তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ব্যদ্‌বিকারে তা খেলে বহু রোগ হবেই। বৈদিক সূত্রের দ্বিতীয় ভাগের এই মন্তব্য। তৃতীয় ভাগ হলো ওষধির মগ্ননে তোমার জন্ম।

ওষধি মগ্ননে জন্ম এই অর্থ গ্রহণ করে চরক-সংহিতায় ঐ অধ্যায়ে (সূত্র) বলা হয়েছে—এটি ‘শোধোপগ’ অর্থাৎ অগ্নিবলের হ্রাস মানেই শোথ রোগ। শোথ শব্দটি সাধারণ পরিভাষা। এর মৌলিক অর্থ রস মগ্ননের অভাবে যখন অগ্নিবল কমে যায়, তখনই শোথের আবির্ভাব। এইজন্যই শোথের সব প্রথম চিকিৎসা অগ্নিবলবিধান। জ্বর রোগেও অগ্নিবল কমে যায়, সেখানেও দোষের বিকারে শোথের উদয় হয়। যেমন স্নেহধাতুর বিকারে তালুদূলে শোথ হয়, সেখানেও অগ্নিমগ্ননের দ্বারা সেই শোথকে উপশমিত করা হয়। আবার রক্তে শোথ হলে বিসর্প হয়, সেখানেও অগ্নিমগ্ননের দ্বারা চিকিৎসা করতে হয়। কাস, তৃক্ষা প্রভৃতিতেও শোথের উদয় হয়, সেখানেও অগ্নিমগ্ননের দ্বারা চিকিৎসাবিধি। স্বকের শোথেও অগ্নিমগ্ননের প্রয়োজন হয়; যেহেতু ব্যদ্‌র স্বভাবই শৌষিক সৃষ্টি করা। আবার ব্যদ্‌র কোপেও শোথের আবির্ভাব হয়, সেখানেও অগ্নিমগ্ননের প্রয়োজন অর্থাৎ অগ্নিবল বাড়ানই হলো শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। অগ্নিবলের বৃদ্ধি মানেই অগ্নিমগ্ননের ব্যবহার। হবির্মগ্ন অর্থাৎ রসসৃষ্ট মেদ ধাতুকে মগ্নন করে বলেই এর অপরা নাম হবির্মগ্ন। এমনি কাস, শোক, ভয়ের দ্বারা শোথের জন্ম হয়, সেখানেও অগ্নিবল কমে বলেই অগ্নিমগ্ননের সমধিক প্রয়োগ অর্থাৎ যেখানে ‘অত্যব্দুপানাদ্ বিষমাশনাদ্’ ইত্যাদির অগ্নিমগ্ননের সমধিক প্রয়োগ অর্থাৎ সেখানে ‘অত্যব্দুপানাদ্ বিষমাশনাদ্’ ইত্যাদির ক্ষেত্র, সেইখানেই অগ্নিমগ্ননের ষোগ্য প্রয়োগের স্থান। তাছাড়া যেখানে রসশেষে অম-বিস্বেষ এবং হ্রদের অশুদ্ধি বোধ, শরীরে গুরুতা বোধ, সেইখানেই অগ্নিমগ্ননের প্রয়োগ। সর্বাধিক লক্ষণীয় সেখানে অগ্নির সমতা স্থাপন করতে হয়। যেখানে বিষমাগ্নির উপশম করতে হয়, সেইখানেই অগ্নিমগ্ন ভেষজের প্রয়োগস্থল।

এইজনাই পরবর্তীকালের সংহিতার মধ্যে চরক সংহিতার সূত্রস্থানে এবং সূত্রদূতের সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ে রস সম্পর্কিত শোথে অগ্নিমন্ত্ৰের বিশেষ প্রয়োগ নিবন্ধ করা আছে।

বাগ্‌ভটের উত্তর তন্ত্ৰের ২০ অধ্যায়েও ওরই অনুসরণ। এই অগ্নিমন্ত্ৰের লোক-ব্যবহারঃ— এর মূলের ছালই ভৈষজ্য শক্তি দেয় বেশী, তবে শুষ্ক পাতার চূর্ণেরও ব্যবহার আছে। এই ভৈষজ্যটিকে প্রখ্যাত ঋষিভুল্য বৈদ্য গঙ্গাধর রায় মহাশয় তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে ব্যবহার পন্থাতি জানিয়ে গিয়েছেন।

### ব্যবহার

১। অমিদোষে দমকা দান্তে— মাঝে মাঝে হতে থাকলে অগ্নিমন্ত্ৰছাল চূর্ণ ২।৩ গ্রাম মাত্রায় জলসহ দু'বেলা ব্যবহার করলে, তাছাড়া মাঝে মাঝে দান্তও হতে থাকলে দোষটি সেরে যায়।

২। আঘাতজনিত ফুলোর— কোমলস্থানে আঘাত লেগে ফুলে গেলে এই গাছের পাতা বেটে লাগালে ফুলা সেরে যায়।

৩। কিডনির লোবে—প্রস্রাবের অল্পতা, তন্জন্য হাতে-পায়ে ফুলোর— এর পাতার রস ৩।৪ চা-চামচ অল্প গরম করে খেলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কিডনির শোথ নষ্ট হয়ে প্রস্রাব স্বাভাবিক হবে এবং হাত-পায়ের ফুলাও কমে যাবে।

৪। জন্ডিসে ও পান্ডু রোগে— এর ছাল ও পাতার পান ব্যবহার করলে পান্ডু ও কামলা (ন্যাবা) সারে। এই গাছের পাতা ও ডাঁটা মিলিয়ে ১২—১৬ গ্রাম পর্বস্ত মাত্রায় ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেকে প্রত্যহ ২ বারে খেতে হবে।

৫। ঋতুদোষে— মেয়েদের ঋতুদোষে ক্রমে শরীরটা মোটা হয়ে গেলে এবং মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে উপরিউক্ত নিয়মে পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ করে খেলে শরীরে সে তম্বী হয় এবং তার ঋতুদোষও নষ্ট হয়।

৬। হৃৎরোগে— অস্বাভাবিক মেদজন্য বুক খড়খড় করে, সেক্ষেত্রে এই গাছের ছাল চূর্ণ ২।৩ গ্রাম মাত্রায় জলসহ খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ মেদের জীর্ণতা এনে শরীরের বলাধান করে, তবে এই ঔষধটি খাওয়ার পর ঘরে পাতা দই একটু ঘোল করে খেতে বলা হয়।

৭। শূলভ্রম বোঝে মলরোধ ও আমদোষ হ'লে— এক্ষেত্রে জানতে হয় এটি রস-দৃষ্টি আমরোগ জনিত হয়েছে কিনা এবং তাতে বিষমান্নির জনাই যে প্রচুর আহার করতে চায় এটা জেনে নিতে হবে, যে রোগীর বিশেষ লক্ষণ মাঝে মাঝে কটুরসের (খাল) আহারে প্রবৃত্তি বেশী আসে; সেক্ষেত্রে অগ্নিমন্ত্ৰের চূর্ণ গরম জলসহ দু'পূরে ও রাত্রের আহারের পর ৩ গ্রাম মাত্রায় খেতে হয়।

৮। দৃষ্টিভ্রম জনিত ফুলোর বা ফোঁড়ার ফুলোর— দেহের যেকোন জায়গা যেকোন দৃষ্টিভ্রমের ফুলে গেলে এর ছাল বেটে প্রলেপ দিলে কমে যায়।

৯। অগ্নিমন্দ্য রোগে— প্রায়ই বীরা অগ্নিমন্দ্যে ভোগেন, তাঁরা নিত্য অগ্নি-মন্ত্ৰের ছালের গুড়ো খাবেন ঠান্ডা জলসহ।

১০। মলবেগ না আসার— পায়খানা করতে বীদের বেগ আসে না, তাঁরা এর পাতার চূর্ণ ১।২ গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ খেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য বেগ পাবেন। তাদের ও দোষ নষ্ট হয়।

চক্রদন্ত (১১শ শতাব্দীর একটি আয়ুর্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থ) লিখেছেন গণিয়ারী মূলের স্বকের কাথে শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি স্থূল ব্যক্তিও কৃশ হয়। কথাটি যে অদ্রান্ত, তা আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেই আপনাদের নিকট নিবেদন করছি। এমন-কি শৃঙ্গ গণিয়ারী ছাল চূর্ণ প্রয়োগেও উপকার হয়। তবে এই দু'টি দ্রব্যের সংযোগে ব্যবহারের ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কোলেস্টেরল (Cholesterol) বেড়ে গেলে এই গাছের ছাল চূর্ণ ১৫ গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ খেলে ব্লাড কোলেস্টেরল কমে যায়।

**সত্যকতা—** বর্তমানে গণিয়ারী গাছের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। আর চক্রদন্তের বিধানে যে শিলাজতুর ব্যবহার বিধি, সে ক্ষেত্রেও এটি বর্তমানে দুর্লভ হয়ে উঠেছে বলা যায়, কারণ বাজারে যেগুলি বিক্রি হয়, তার মধ্যে অধিকাংশই চিনি পুড়িয়ে তার সঙ্গে গোমূত্র মিশিয়ে তৈরী করা হচ্ছে; যেহেতু আসল শিলাজতু গোমূত্র গম্ভীর হয়, সেই কথাটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এটা মিশানো হয়; অথচ এই কৃত্রিমতা রোধের কোন ব্যবস্থাও করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান যুগে বহিরাগত সভ্যতার জন্যই কিনা জানি না, কারণ রুচিকর হ'লেই সেটা খাদ্য, এ ধারণাটার সঙ্গে বহিরাগত সভ্যতার একটা যোগ আছে। এমনি অবিচারে খাদ্য গ্রহণের ফলেই যে রোগগুলির বিপুল প্রসার, তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ইন্সুলিন ও বসা মেহ প্রভৃতি রোগ।

**Urinary disease—** এ রোগে এই গাছের বা মূলের ছালের কাথ পান করার উপদেশ দিয়েছেন সূত্রুত ও চক্রদন্ত।

সূত্র পেলই অনুসন্ধানের প্রেরণা আসে, তাই রক্ত-সম্পৃক্ত শর্করা বৃদ্ধি রোগে (Blood Sugar) এই গাছের পাতা (যেটি সহজ প্রাপ্য) চূর্ণ দিনে ২ বার ১ গ্রাম মাত্রায় ব্যবহারে দেখা গেছে যে, এক মাসের মধ্যে রক্তে শর্করার ভাগ স্বাভাবিক হয়। অবশ্য এই রোগের বিধিনিষেধগুলিও এই সঙ্গে মেনে চলতে হয়। যদিও আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্র সীমিত, তথাপি এটির মধ্যে বিশেষ ভেষজগুণ বর্তমান আছে মনে করি। এখন এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচারের প্রয়োজন এসেছে—এটি পেশীসমূহের metabolism বৃদ্ধি করে অথবা Liver এবং Pancreas-এর বিশেষ কোন ক্রিয়াকে সক্রিয় করে এই কার্যের সহায়ক হয়।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন প্রদেশে *Clerodendrum phlomidis* Linn. f. নামীয় গাছটি অরণি নামে চিহ্নিত করেছেন; এটিও *Verbenaceae* ফ্যামিলিভুক্ত, সেখানেও সমীকার প্রয়োজন।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz. premnine, ganiarine. (b) Antibiotics viz. staphylococcus aureus, bacillus subtilis, streptococcus pyogenes (these substances are only active against grain positive organisms).





## লবলী

যুধিষ্ঠির কখনো বলতেন না “দুঃখোদন”, তিনি তাঁকে “সুখোদন” সম্বোধন করতেন; অর্থাৎ কর্কশ অপ্রিয় ভাষায় শত্রুকেও আহ্বান করতে নেই। তাই সারা ভারতে আজও একটি রোগকে বলা হয় “শীতলা”। এটির উদয়েও জ্বালা, অন্তেও ষন্ত্রণা, তাছাড়া চিরদিনের জন্য দাগও রেখে যায়। তনুশ্রীকে বিস্ত্রী করে নিজে স’রে পড়ে। আবার সুযোগ বুঝে আসে। তবে রসগত হ’য়ে যখন আসে তখনকার শীতলা বা বসন্ত নাম নেয় পানিবসন্ত বা জলবসন্ত। তারপর রক্তমাংসাদি অন্যান্য ধাতুগত হ’লে সে বসন্তকে Small pox বা আসল বসন্ত বলা হয়; উত্তরোত্তর পরিণাম-প্রাপ্ত রসরক্তাদি ধাতুকে দূষিত করে যে বসন্তরোগটি উদ্ভূত হয়, সেইটিই মারাত্মক।

আজকের যুগোত্তরকালে এই রোগের জন্য উপযুক্ত সময়ে টীকা নিলে আর রসগত বা মাংসগত বসন্ত (Small pox) হয় না, এটা একরকম স্থিরীকৃত হ’য়েছে বলা যেতে পারে; তবে পানি বা জল বসন্তের হাত থেকে রেহাই যে হবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই তখন দেখতে হবে—অতীতে আয়ুর্বেদে এর কোন ভেষজ ছিল কিনা, অথবা আছে কিনা; এক্ষেত্রে ব্যবহারগত প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, আমাদের দেশে একটি অল্পসম্ভূত বনৌষধি কণ্টকারীর নাম খুব উল্লেখযোগ্য (Solanum Xanthocarpum)। সেটি এই অবাধ্য রোগকে সংযত করে রাখতে পারে। সাদা ও বেগুনে দু’রকম ফুলের গাছ দেখা গেলেও জাতিতে দু’টি একই। এদেশে বেগুনে ফুলের গাছই বেশী দেখা যায় ও ব্যবহারও করা হয়। অনেকের ধারণা আছে যে, এই গাছের মূল না হ’লে কাজ হয় না; কিন্তু তা ঠিক নয়; সমগ্র গাছেরই উপকারিতা আছে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে ব’লে রাখি, আমাদের দেশে বহুপ্রচলিত এই হাম রোগ; এটি একজাতীয় বসন্ত। এই হাম শব্দটি এসেছে ঘাম বা ঘর্ম থেকে, অর্থাৎ দেহে পিত্ত-

শ্লেষ্মার তাপজনিত স্বেদক্ষরণ বা ঘাম হয়, তা থেকেই হাম হয়। এটা আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকৃত যে, ঘাম থেকেই ছাড়িয়ে পড়ে; এই ঘাম খুব বিষাক্ত ও পাতলা, এটা হাওয়াতে ব'য়ে চলে তাই সে অন্যে সংক্রমিত হয়।

তা ছাড়া এই হাম সম্পর্কে আর একটি বিশেষ গাছের ব্যবহারও আমাদের দেশের পল্লীঅঞ্চলে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) ও উত্তর-



বঙ্গে যারা চিকিৎসা করতেন, তাঁরা হাম হ'লে এই লবণী অর্থাৎ নোয়াড় গাছের (Phyllanthus distichus Muell-Arg. ফ্যামিলি Euphorbiaceae) পাতার রস খেতে দিতেন এবং ঐ গাছের পাতা সমেত একটি ডাল (শাখা) গায়ে বুলিয়ে আরোগ্য করিয়ে দিতেন। এই গাছটির সংস্কৃত নাম “লবণী”।

লবণী? না লবণী। লবণী নামটি যে অর্থ বহন করে, লবণী কিন্তু তা করে না; চরকে আছে লবণী (সদুপস্থান ২৭ অঃ, ১১৭ শ্লোকে)।

ওর ফলটি টক এবং তা দিয়ে চাট'নী হয় এবং গুণে সে রুদ্ধ, বায়ুকারক।

“অবদংশক্ষমং রুদ্ধম্ বাতলং লবণী ফলম্”

আর সুশ্রুতে আছে লবণী (সুশ্রুতস্থান ৪৬ অধ্যায়)

কষায়ং কফপিত্তঘ্নাং কণিষ্ঠং তিষ্ঠং রুদ্ধচিপ্রদম্।

হৃদ্যং সুদৃগন্ধি বিষদং লবণী ফল মূচ্যতে॥

শব্দবিন্যাসে—

লবং ছেদনং ক্রিয়তে অস্মিন্, লবণী বৃক্ষে ফলে চ।

আর লবণী লবং লেশং লাতি লবণী (নোয়াড়)। শীতলা বা বসন্ত রোগটির সম্পর্কে প্রাসংগিক বস্তুবা এই যে—চরকে বসন্ত শব্দ দিয়ে কোন রোগের নাম নেই, তবে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অন্যান্য গ্রন্থে এর উৎপত্তি বা কারণ দেখে বলা যায় যে, এটি চরকোক্ত বিসর্প রোগেরই অন্তর্গত এবং তার জন্য পাচন, প্রলেপ হিসেবে বহু যোগের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আর সুশ্রুতে এর মসূরিকা নাম (সুশ্রুত চিকিৎসাস্থান ২০। ১৯ শ্লোক)। ওখানে বলা হয়েছে—এই রোগটি পিত্তশ্লেষ্মা জন্য বিসর্প রোগ। এর চিকিৎসা কুষ্ঠ চিকিৎসার মত (কুষ্ঠ শব্দটি কুৎসিত অর্থে)।

মসূরিকায়্যং কুষ্ঠঘ্না—লেপনাদি ক্রিয়া হিতা,

পিত্ত শ্লেষ্মা বিসর্পোক্তা ক্রিয়া বা সংপ্রকাশ্যত।

এটি সুশ্রুতের মতে ক্ষুদ্র রোগেরই অন্তর্গত, অর্থাৎ জটিল রোগ নয়।

বাগ্ভটের উত্তরতন্ত্রের ৩১ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে এটি ক্ষুদ্র রোগের অন্তর্গত এবং পিত্ত, কফ এবং কফ-বায়ুপ্রধান রোগ বলা হয়েছে। তবে নামটি—

মসূর মাত্রা স্তম্বর্ণাস্তৎ সংজ্ঞা পিটিকা ঘনাঃ।

ততঃ কণ্টতরা স্ফোটা বিস্ফোটাখ্যা মহারুজঃ॥

এর চিকিৎসার ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলা হয়নি।

পরবর্তীকালের রচিত গ্রন্থ “মাধব নিদান” নামক গ্রন্থের ৫৪ অধ্যায়ে মসূরিকা নিদানে বলা হয়েছে এবং বিস্তৃত করেই তার রূপও দেখানো হয়েছে।

কিন্তু এইসব লক্ষণ তিনি যে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা বলেন নি, অর্থাৎ মাধব নিদানের স্থিতীয় টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্ত; তিনি মাধবের প্রত্যেকটি শ্লোকের আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মসূরিকার বেলায় তা করেন নাই। অতএব চরক, সুশ্রুত ও বাগ্ভটের তুলনায় তা নবীন।

আবার ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশকার এই মাধবের সংগৃহীত শ্লোকগুলিই অবিকল উদ্ধৃত করেছেন। তাদের মধ্যে ৩টি স্থানে নতুন যোজনাও করেছেন। প্রথমে বলেছেন—মাধবের আনুগত্যে অর্থাৎ অসাধ্য মসূরিকায়—

‘নদেয়ং তস্য ভেষজং’

অর্থাৎ অসাধ্য মসূরিকায় কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নয়।

স্থিতীয় যোজনা সম্পূর্ণ নতুন—

‘বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি।

কৌচিং প্রযোজয়ন্ত্যেক মতং তেষাং অথ রুবে॥’

অর্থাৎ অনেক চিকিৎসক এ ক্ষেত্রে কোন ঔষুধই দেন না, আর ষাঁরা দেন, তাঁদের মত ব'লিছ।

তারা বলেন—শীতল জলে নিমের বীজ এবং কাঁচা হলুদ বেটে খাওয়ালে, আর শীতলা বিকারই হবে না, তবে ঐ রোগটির চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় শীতল চিকিৎসাই ক'রতে হয় বলেই এর নাম শীতলা। এর সব অবস্থাতেই শীতল কষায় পান, শীতল প্রলেপের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ আয়ুর্বেদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে এবং রোগ উপশমনের ক্ষেত্রে এমনভাবে লক্ষ্যে লক্ষণসংগতি রেখে বর্ণনা ক'রেছেন যা চিরন্তন রূপেই পরিগণিত হয়। অর্থাৎ রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে বায়ু, পিত্ত, কফের পরস্পরের একক প্রাধান্য বলে লক্ষিত হ'লেও অন্য দুটি দোষ সেখানে অলক্ষ্যে অনুগমন করে; যেহেতু পাণ্ডুভৌতিক সৃষ্টিটি পৃথকীকরণ হয়েছে অন্য প্রবিষ্ট; অতএব বায়ু, পিত্ত, কফের মৌলিকভিত্তি আপ্য, পার্শ্ব ও আগ্নেয়, আর তার বিকার বা রোগের উৎপত্তিটিও সেই ত্রিবিধ ভূতের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সে ক্ষেত্রে যেখানেই আপ্য বা পার্শ্ব অথবা আগ্নেয় বিকার, নিশ্চয় সেখানে তার সমধর্মী ভেষজ বা ক্রিয়া কখনও তাকে উপশমিত করে না। সেইজন্য এই পিত্তপ্রধান শ্লেষ্মানুগত বিকার মসুরিকা বা বশন্ত রোগটি তার বিপরীতধর্মী আপ্য ধাতু স্বারাই উপশমিত হয়। অতএব মসুরিকা বা বশন্তরোগে উষ্ণবীৰ্য এবং শৈত্য গুণপ্রধান ভেষজই তাকে শমিত করে।

এই বিচারে পরিষ্কার ধরা যায়—এই শীতলা বিদ্যাটির প্রচার হতে দীর্ঘদিন লেগেছে, কারণ ১১শ শতকের চক্রদত্ত গ্রন্থে শীতলার নাম নেই, তবে মসুরিকার চিকিৎসা-বিধান আছে। সে চিকিৎসা বিসর্প-বিস্ফোট চিকিৎসার অন্তর্গত। এ ক্ষেত্রে চক্রদত্ত অমৃতাদি পাচনও খেতে বলেছেন; আর প্রতিষেধক ঔষধ হিসাবে একটা পূর্ণ-বয়স্ক লোকের পক্ষে ৩ গ্রাম (সিকি তোলা) কণ্টকারী ৯/১০টি গোলমরিচ একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ আধ ছটাক থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সকাল বেলা খেতে হয়, ছোটদের বয়সানুপাতে মাত্রা ঠিক করতে হয়; তবে বাড়িতে কেহ আক্রান্ত হলে প্রথম ৩ দিন প্রত্যহ খেতে হয়, তারপর ২।১ দিন অন্তর খেলেই চলে। হামের ক্ষেত্রে এই একই ব্যবস্থা। পল্লীতে হতে থাকলে প্রতিষেধক হিসাবে ২।৩ দিন অন্তর খেলে এ রোগের আর সংক্রমণ নাও হতে পারে। এ সম্পর্কে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমিত ক্ষেত্রেই করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের সুপ্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে এ রোগের নিদান এবং চিকিৎসা কার্যে তার সহায়ক ভেষজ নিয়ে গবেষণা নিশ্চয়ই হয়েছিল। তাই অন্যান্য ভেষজের স্বারা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্মল আবহাওয়া স্থাপন করার মাধ্যমে একে তাঁরা চিকিৎসা করতেন। এর সঙ্গে অনেকে বিশেষভাবে ঘরোয়ানা ঔষধ হিসাবে আর একটি ঔষধের ব্যবহার করে থাকেন, যে ভেষজটির গুণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লবণী বা লবলীকে উপস্থাপিত করাটা এখানের মূখ্য। এ ভেষজটির আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন মনে করি। তারপর সাধারণের সহজে ব্যবহারোপযোগী ক'রে একে এ রোগের প্রতিষেধক ঔষধ হিসেবে প্রস্তুত করলে স্বল্প মূল্যেই একে জনকল্যাণে ব্যবহার করা চলে।

‘অপনয়তি মসুরীং শীতপিত্তং জ্বরং’

তা ছাড়া আছে দশাঙ্গ প্রলেপ আর চতুঃসম প্রলেপেরও ব্যবস্থা সেখানে।

তারপর চক্রদত্ত মসুরিকা চিকিৎসা নামে একটি অধ্যায় রচনা ক'রেছেন। তাতে দেখা যায়—চরক, সুশ্রুত ও বাগভটের বিসর্প যোগদুলিই উদ্ভূত করেছেন। অতিরিক্ত ২টি প্রক্রিয়া যুক্ত করেছেন, একটি হোলো কজ্জলির ব্যবহার।

এই রোগের টোটকা (তান্ত্রিকদের তন্ত্র, যন্ত্র ও মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম ট্রোটক। ট্রোটক পদ্ধতিতে বনোঁষধির ব্যবহারই টোটকা) ঔষধ সম্পর্কে পল্লীমঞ্জল চিকিৎসায় দেখা যায়—গোয়ার ভূতপূর্ব হেলথ অফিসার Antonio Toagum লিখেছেন—সাধারণ বনকলার (যাকে রামকলা বলে) বীজ ৮।৯টি গুঁড়ো করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়ার প্রথা প্রাচীন বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে গোয়ার প্রচলিত। আমাদের দেশে সেটি 'দয়াকলা' বলেই পরিচিত।

আর একটি টোটকাও দেশ অঞ্চলে ব্যবহৃত হ'তো, অবশ্য সেটি মানুষের ক্ষেত্রে নয়। কোন গরুর বসন্ত হলে শিমূল তুলোর টাটকা বীজ ৫।৬টি গুঁড়ো করে আধ তোলা কাশীর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে গোয়ালের অন্য গরুগুলোকে খাওয়ানো, যাতে অন্য আর কোন গরু আক্রান্ত না হয়।

এখানে বস্তু, এইসব সাধারণ জিনিষগুলি পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? প্রসঙ্গত আর একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করে রাখি—বসন্তকালে আহাৰ এবং ঔষধ হিসাবে কয়েকটি জিনিস ব্যবহার করা ভাল—যেমন সজিনার ডাঁটা, উচ্ছে, নিমপাতা, পলতা, হিণ্ডে, এঁচাড়া প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য প্রথার পুনরুল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, সেটা হ'ল—বসন্ত রোগে গর্দভের সম্পর্ক ধ'রে। এত জীব থাকতে গাখাটিকে শীতলা মায়ের বাহন বলে কেন চিহ্নিত করা হ'ল? এ জীবটির অঙ্গে কি কোন বসন্ত প্রতিষেধক বস্তু নিহিত আছে? উত্তরে শীতলার পুরোহিতরা বললেন—এ সম্পর্কে একটি উৎস আমরা দেখতে পাই—বাড়িতে কারও বসন্ত হ'লে বাড়ির অন্যান্য সকলকে ১ চা-চামচ করে গাখার দুধ খাওয়ানো হ'ত এবং ঐ দুধে চাল ভিজিয়ে শুকিয়ে রাখা হ'ত; কোন সময়ে দুধ পাওয়া না গেলে, ঐ চাল খেতে দেওয়া হ'ত। তাছাড়া কোন চিকিৎসক গাখার দুধ দিয়ে বসন্তের ক্ষত মূছে দেওয়ারও ব্যবস্থা দিতেন, আবার এও প্রবাদ আছে যে, গাখার নাকি বসন্ত হয় না। এটাও তো অনুধাবনযোগ্য।

কিন্তু গর্দভীর দুধ কি বসন্ত রোগে চলে? চরকের মতে এক খুর বিশিষ্ট প্রাণীর দুধ—ঘোড়া, গাখা প্রভৃতির দুধ উষ্ণ, অম্লরস, ঈষৎ লবণাক্ত, রক্ষ এবং শাখাগত বায়ুনাশক, তবে বলকর এবং স্বেদকর। (চরক—সূত্রস্থান ২৭।১৮৩ শ্লোক।)

শেষের দু'টি গুণ হয়তো সূত্রে পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু বসন্ত রোগটাই যখন পিস্ত-শ্লেষ্মা সমুদ্ভূত, তখন অম্ল, লবণ রস এবং রক্ষগুণ দ্রব্যের ব্যবহার সেক্ষেত্রে চলে না। তাছাড়া গর্দভী পাঁচ প্রকার। প্রত্যেকের দুধের গুণও পৃথক এবং প্রত্যেকের মধ্যেই ঈষৎ অম্লতা ও লবণভাব আছে।

(গ্রন্থ সংহিতা—৮ম অধ্যায়।)

আমি বিভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকদের কাছে অনুরোধ করি—ঐহিকল গাছের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখুন যে, এ সকল ভেষজের এ রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে কিনা। আমাদের দেশে এখনও বহু উদ্ভিদ, পাখি ও জন্তব পদার্থ আছে, সেগুলির উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা হলে বহু নতুন তথ্যের সম্ভাবনা মিলবে। এসবের উৎস এখনও বহু লোকের কাছে আছে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tannin. (b) Saporin. (c) Gallic acid, oxalic acid, malic acid and other acids. (d) Unidentified substances. (e) Different amino acids.



## দারুহরিদ্রা

(জিন্ডিসের চাৰি)

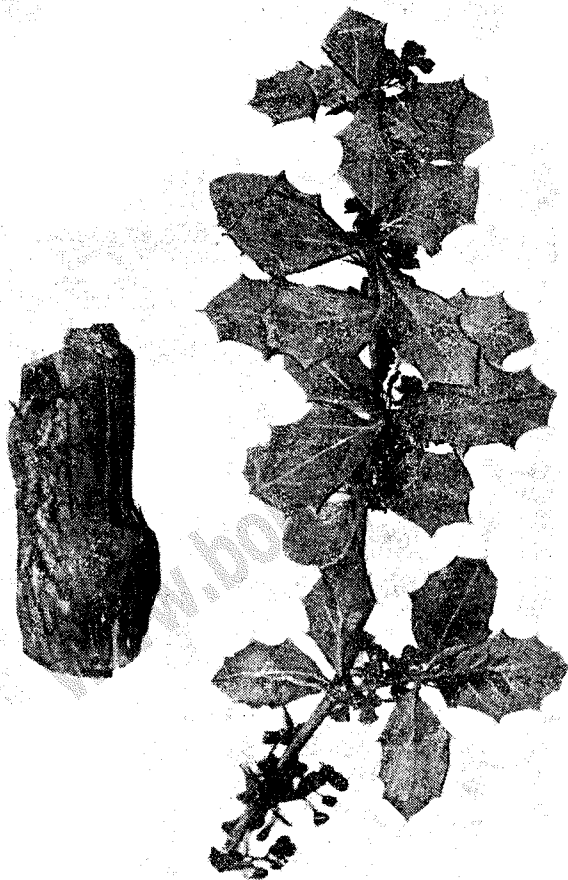
আয়না, আরসি, আফ্‌শোষ, আফিম্, আবগারি, আড়াল, আব্রু, আওয়াজ, আম্-মোস্তার এবং আমলার মত বহু বৈদেশিক শব্দই কালপ্রভাবে আমাদের কথ্য ভাষায় এসে গিয়েছে, যেগুলি বাদ দিলে অনেক মনোভাবই অপ্রকাশ্য থেকে যায়। ওগুলি আজকাল আমাদের শ্রুতিকটু হয় না। কেদারা আনতে ব'ললে অভিধান খুঁজতে হয়; কিন্তু চেয়ার ব'ললে তা হয় না, দর্পণ ও আয়না এবং জলপাত্র ও গ্লাসের ক্ষেত্রেও তাই। বর্তমান যুগে সহজবোধ্য ব'লেই রোগের পশ্চিমী পারিভাষিক নামটাই শিরোনামায় প্রয়োগ ক'রলাম। এই রোগের অবস্থা বিশেষকে আয়ুর্বেদে বলা হয় পাণ্ডুরোগ, আর জিন্ডিসের আয়ুর্বেদিক নাম কামলা রোগ, যার প্রচলিত নাম “ন্যাবা”; এটি বিশিষ্ট লক্ষণাবিত হ'লে তাকে বলা হয় ‘হলীমক’। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রোগের নামও কম নেই, তার মধ্যে জিন্ডিস্, হেপাটিক্ জিন্ডিস্ প্রধান। বর্তমানে একপ্রকার জিন্ডিস্ দেখা যাচ্ছে, সেগুলি নাকি ভাইরাস্ থেকে হ'চ্ছে। আমরা ভাবি ভাইরাস্ হ'লো একপ্রকার জড়াজড় বস্তু, বিশ্বজুড়েই তার অবস্থান, বহু ব্যাধিরই উদ্ভব হয় এ থেকে। বৈদিক পরিভাষায় এ হ'লো “যাতুধানম্”।

**নামভাষ্যঃ—** দারু সংস্কৃত শব্দ, এর অর্থ কাষ্ঠ বা কাঠ, যার জন্য আমরা জগন্নাথদেবকে বলি ‘দারুৱক্ষা’, আর এখানে হরিদ্রা শব্দের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি রংয়ের ও গুণের সাদৃশ্যের জন্য, তাই তার নাম দেওয়া হ'য়েছে দারুহরিদ্রা; অর্থাৎ হরিদ্রা, তবে দারুৱয়। আর একটি কথা—প্রকৃতপক্ষে আমাদের ব্যবহারগত হলুদ রঙটির মৌলিক শব্দ যে হরিৎ এটাও নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না, কারণ হরিৎ শব্দটি কচি কলাপাতার রঙ এবং পান্নারও রং, কিন্তু স্মরণাতীতকাল থেকে হরিৎ মানেই হলুদ।

তা যাক্, এটি কিন্তু বৈদিক বনৌষধি, শুল্ক যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে এর নাম

‘দবী’হর’, তার আর একটি নাম ‘পজ’ন্যহরী’, একথা বলেছেন বেদ ভাষ্যকার মহীধর।

কুলজীনাশাঃ— এই বিটপ্শ্রেণীর গাছগুলি ৩—৭/৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ’লেও শাখাগুলি নিম্নাভিমুখী, পাতাগুলির কিনারা (ধার) দাঁতযুক্ত, শাখাগ্রে সরু সরু কাঁটা



থাকে, কিন্তু সমতলে হয় না, এগুলি নীলগিরি ও হিমালয়ের বিভিন্নপ্রান্তে সাধারণতঃ ৩—১১ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে জন্মে। ফুল হয় বসন্তকালে আর ফল হয় গ্রীষ্মকালে। এই গাছের ছোট কিসমিসের মত শুষ্ক ও টক ফলগুলি ইউনানি চিকিৎসক

সম্প্রদায় ঔষধে ব্যবহার করেন, তাঁরা নাম দিয়েছেন 'জেরিস্ক'; আর গাছটিকে বলেন— দারহিল্‌দ, হিন্দীভাষী অঞ্চলে একে বলা হয় 'পীলী লকাড়ি'। নব্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের বিচারে ৮।১টি প্রজাতি (species) এদেশে পাওয়া গেলেও *Berberis asiatica* Roxb. Ex. Dc. এবং *Berberis aristata* Dc.— এই দু'টি প্রজাতির গাছই এখন পাওয়া যায়। এরা *Berberidaceae* ফ্যামিলীভুক্ত। ভেষজগুণে সবগুলি প্রায় একই, তবে কিছু ইतर-বিশেষ তো থাকবেই।

**বর্তমান সংগ্রহ ব্যবস্থাঃ**— সব প্রজাতির গাছের কাঠ হৃদে থাকতে সংগ্রহে বাদ-বিচার করা হয় না, গাছের মূল পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়, কারণ তার মূলের ভেষজগুণ বেশী। এই গাছের ছাল বা ছক্ ও মূলাংশ কুচি করে কেটে ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করে ছেকে তাকে ঘনসার (solid extract) তৈরী করা হয়, তার প্রাচীন নাম 'দারীরসাজন' আর চলিত নাম রসোত্। বর্তমানে প্রাপ্ত রসোত্ ভেজাল। আর দারু-হরিদ্রা বলে যেগুলি পাই, সে কাঠগুলির ছাল চেঁছে নেওয়া।

**বৈদিক যুগের গবেষণাঃ**— শত্ৰু যজুর্বেদের বর্ণনায় বলা হয়েছে এটি বিদারণ ও লেখন গুণসম্পন্ন। লেখন অর্থে সম্মার্জন করা, যাকে বলা হয় আঁচড়ে বের করে দেওয়া, এই হেতু পিত্তগ্রন্থিকে সে সম্মার্জিত করে, পিত্তবিকারের যে কোন ব্যাধিকে দূর করে ও বিষদোষ নষ্ট করে।

শত্ৰু যজুঃ—১৯।১০ এবং অথর্বের—৭।১১।২২'

(১) য়পমাজন্ধঃ দবী'হরঃ শ্বেতছাগলঃ।

(২) পর্জন্যহরী পীতকঃ আরণ্যদর্ষদি ক্ষপঃ।

মহীধর ভাষা—

শত্ৰুর=দবী'হরঃ;=দ. উন+দবী' স চ পীতকাস্তঃ, তেন য়পেন জন্ধঃ শ্বেতছাগলঃ বিষমাপ্যেত।

অথর্বের=সেই পর্জন্যহরী পীতকাস্ত অরণ্যের অভ্যন্তরে পর্বতের বক্ষে থাকে, রাত্রির তপস্যা করে।

প্রথম ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়—তৎকালে হরিদ্রাবর্ণের শক্ত কাস্ত দারুহরিদ্রার য়পকাস্তে শ্বেতবর্ণের ছাগলকে হত্যা করলে মাংসের বিষদোষ দূর হয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় জানা যায়—এই বৃক্ষটি অরণ্যের মধ্যে থেকে মেঘকে আহবান করে। সেইটাই তার রাত্রির তপস্যা।

বেদের সূক্ত ধরেই সংহিতার যুগে এর ভৈষজ্য শক্তির অনুশীলন। চরক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভট—সকলেই বিদগ্ধ পিত্তের প্রভাবে পিত্তজ গ্রন্থিগত রোগে এই দারুহরিদ্রাকে ব্যবহার করেছেন। সুশ্রুতে অপচরী রোগে অর্থাৎ গন্ডমালা রোগে এর ব্যবহারের উপদেশ।

এই রোগ দীর্ঘদিনস্থায়ী, অল্প চুলকানি হয়; পাকে, ফাটে, রস গড়ায়; চোয়াল, বাহু, মূলে ও গলায় ছোট ফুস্‌কুড়ি হয়ে সেও পাকে, ফাটে ও রস গড়ায়। এটি পিত্ত-শ্লেষ্মাপ্রধান রোগ এবং মেদ থেকে জন্ম নেয়। এক্ষেত্রে দারুহরিদ্রা-ঘষা কিংবা ক্লেপ ব্যবহার করলে ওগুলি তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

**সংহিতা যুগের গবেষণাঃ**— চরকে বলা হয়েছে এটি অশোষা, কণ্ডুঘা (পিত্ত-বিকৃতিজনিত চুলকণা) ও লেখনীয়; এই 'ঘা' অর্থে নাশ করা। সুশ্রুতে সর্পবিষের



ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপদেশ; এভিন্ন মেহরোগেও যেখানে খড়্গগালা জলের মত প্রস্রাব হ'চ্ছে, সেখানে এই কার্ঠাসিন্ধু ক্রাথ খেতে বলা হ'য়েছে। চক্ষুরোগেও ব্যবহারের উপদেশ। এক্ষেত্রে বাগ্‌ভটের (প্রাচীন আয়ুর্বেদিক সংগ্রহ গ্রন্থ) ইণ্ডিগো আরও সুস্পষ্ট। বেশীদিনের কথা নয়, গত ৩০ বৎসর পূর্বেও পারদর্শী পাশ্চাত্য চিকিৎসককে এই দারুহরিদ্রার কাঠ খেঁতো করে জলে ফুটিয়ে ছেঁকে নিয়ে সাধারণ চক্ষুরোগে সর্বদা ব্যবহার করতে দেখেছি। এই কার্ঠাসিন্ধু জল দিয়ে তৈল পাক করে কানের পুঞ্জি এবং যেকোন ক্ষত পুরণের জন্য ব্যবহারের উপদেশ আছে চরকে।

**রণ বা মেচেতায়ঃ—** এই কাঠ ঘষে চন্দনের মত করে লাগালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

**মখের ক্ষতেঃ—** এই কাঠ ঘষা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে উপশম হয়।

**রক্তপ্রদরেঃ—** (মেনোরিজিয়া, Menorrhagia) এই গাছের ছালের ক্রাথ ব্যবহার করতে হয়।

**শ্বেতপ্রদরেঃ—** (লিউকোরিয়া, Leucorrhoea) এর ক্রাথ ব্যবহার, এমনকি কাঠ ঘষে চন্দনের মত করে (১ চামচ) দুধ সহ খেলে উপকার হয়।

**রক্তার্শঃ—** (Bleeding piles):— এই বনৌষধিটি ব্যবহারের কথা চরকে কয়েক বার বলা হয়েছে, তাছাড়া ওয়াট সাহেবের গ্রন্থেও দেখা যায় যে, ডাক্তার পানি (Dr. Panny) ও—১০ গ্রেণ মাত্রায়, ঐ কাঠ থেকে তৈরী রসোত্ মাখনের সঙ্গে ব্যবহার করতে (খাওয়ার জন্য) দিতেন এবং ঐ রসোতের জল তৈরী করে অর্শের বলি ধুতে বলতেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য—বর্তমান সময়ে ভাল রসোত্ যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ঐ কাঠ যথানিয়মে সিদ্ধ করে সেই জল ব্যবহারে ক্ষতি কি?

**রণ রোগেঃ** (যা পুরাবার জন্য) দারুহরিদ্রার সিদ্ধ ক্রাথ তৈলের সঙ্গে পাক করে সেই তৈল ক্ষতে ব্যবহার করলে ক্ষতটি তাড়াতাড়ি পুরে যাবে। এক্ষেত্রে যতখানি তৈল (তিলের) নিতে হবে, তার ষ্টিগুণ দারুহরিদ্রা নিয়ে ক্রাথ করতে হবে। এ পদ্ধতি আয়ুর্বেদীয় তৈল পাকের।

**পিষ্টক মেহেঃ—** যাদের প্রস্রাব চটচটে রকমের হয়, তাঁরা এই দারুহরিদ্রা আর হরিদ্রা সমপরিমাণ নিয়ে (৬ গ্রাম পরিমাণে) ক্রাথ করে প্রত্যহ সকালে কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাবেন। (এটা সুশ্রুতের যোগ।)

**কোষবৃদ্ধিতে (Hydrocele)—** মেদম্বী দেহ, শরীরে কফের প্রাধান্য যেখানে, সেক্ষেত্রে দারুহরিদ্রার কার্ঠ ১২ গ্রাম নিয়ে খেঁতো করে গোমূত্র দিয়ে বেটে সেটা ছেঁকে খেতে হবে। অথবা জল ও গোমূত্র সহ সিদ্ধ করে ছেঁকে খেতে হবে। গোমূত্র ২।৩ চামচ—জল ১ পোয়া। (এটা বাগ্‌ভটের।)

**নেত্ররোগেঃ—** গরম জলে দারুহরিদ্রা (৩ গ্রাম) খেঁতো করে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর খেতে দিলে চোখ লাল, বাথা, ফুলা, জলঝরা, পিঁচুটি পড়া ইত্যাদি নিবৃত্তি পায়। (এটাও বাগ্‌ভটের।)

এবার শিরোনামার বক্তব্যটি আপনাদের জানাই—ন্যায্য হলে এদেশে অনেক টোটকাও ব্যবহার হয়, যেমন—কোন জিনিষ হাতের তালুতে ঘষা, কোন ওষধির মালা পরা ইত্যাদি—এর উপকারিতাও অনেকে নাকি প্রত্যক্ষও করে থাকেন; কিন্তু পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ পদ্ধতির গুরুত্ব নেই। এখানে বিশেষ বক্তব্য প্রত্যক্ষ দ্রব্য-গুণের। উল্লিখিত দারুহরিদ্রার গাছে বার্বেরিন (Berberine) এবং অক্সিক্যান্থিন

(Oxyacanthine) ব'লে দুটি দ্রব্য আছে, এ দুটি কিন্তু মূলেই বেশী পাওয়া যায়। এর মূল চন্দনের মত ঘষে ১—২ চামচ মাত্রায় একটু মধু মিশিয়ে ৬।৭ দিন খাওয়ালে জাঁডুসে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়, এটি পরীক্ষিত। এ ভিন্ন আরও বহুপ্রকার রোগে এটির উপযোগিতা বর্তমান; কিন্তু দুঃখ হয় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবর্তে পড়ে সেটা কাগজেই রয়ে গেল, বাস্তবে রূপায়িত আর হ'ল না।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই গাছটির একটি বৈদিক নাম 'পর্জন্যহরী', পর্জন্য অর্থে মেঘ অর্থাৎ মেঘকে সে হরণ করে; এ নিয়ে আরও গবেষণা করা যায়, কারণ মেঘের আকর্ষক বায়ু না হ'য়ে বৃক্ষ? এই গাছটির জন্মস্থান ৩—১১ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়িয়া অঞ্চলে, বিশেষতঃ হিমালয়ে। এই গাছের সে শক্তির বিশেষত্বের বিচার বিজ্ঞানীদের পক্ষে কি অবাস্তব? হিমালয়ের দারুহরিদ্রা বৃক্ষবহুল অঞ্চলে কুয়াশার (Fog) অপ্রভুলতা আমি দিনের পর দিন ধরে লক্ষ্য করে এসেছি, কিন্তু এটা স্বীকার করছি যে, তখন এই কারণটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারিনি—আলোচনা প্রসঙ্গে একথা জানানেন আমার অগ্রজ \*কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয়। জানি না সে সমীক্ষা কোনোদিন হয়েছে বা হবে কিনা—তথাপি উষাকীর্তনের মতই মাংগলাকীর্তন গেয়ে যাই—যদি কারও মনে কৌতুহল জাগে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., berberine, oxyacanthine. (b) Sterols viz., betasitosterol, gamasitosterol. (c) Unidentified gummy containing nitrogen.



## সহদেবী

আজ হয়তো এ কথাটা বিতর্কিত হতে পারে, তবে সোমরস যে নেশার জিনিস এবং সে যুগের মদের নাম, সে কথা এখন প্রায় স্বীকৃতিই পেয়েছে। শিরোনামের উৎস এবং কার্যকারণের সম্পর্কটা নিতান্তই আকস্মিক পাওয়া—আজ থেকে ২৫ বৎসর পূর্বে আমার বৈদ্যক জীবনে একবার ঔষদ্যুজ্জ্বল জেগেছিলো, আদিবাসীরা যে হাঁড়িয়া প্রস্তুত করে তার বীজাধার কি? সেই সময়ে উপরিউক্ত গাছটি যে ঐ বীজের অন্যতম উপকরণ সেটা আমার নজরে এসেছিলো; এবং এটা যে বাস্তবে সত্যি সেটাও আমার পরীক্ষা করা। এ ভিন্ন নেপালের পাহাড়িয়াদের মধ্যে এটিও ঐ কাজে ব্যবহার করা হয়; তাই বলে এটা নয় যে, তার এই গুণ ভিন্ন আর কোন উপকারিতা নেই ও আর্ষদের গোচরীভূত হয়নি। তার প্রমাণ অথর্ববেদ ২১।৩৭।৭৪ সূক্ত। সেখানে বলা হয়েছে—

যা অগ্নিং বিদধাসি কামান্ লোকায য়ুগ্ম সহদেবা।  
সংগ্ধবন্বতি ধিক্ষ্যা রোচনে উচিষে, অপ্স্বা যজস্বা॥

মহীধর ভাষ্য করলেন—

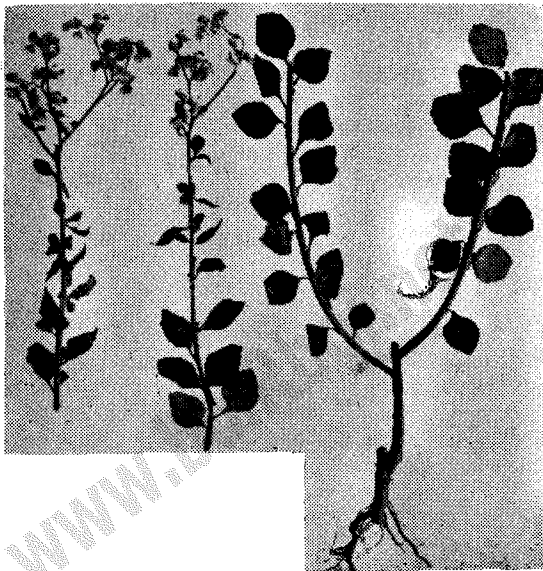
সহদেবা=দেহেন যুক্তা দিব্যতি=ইতি সা, সৈব মৃগাদনী যা বর্ষ-  
পুষ্পা ‘দন্ডোৎপলা’ ইতি লোকে। তাং যমজাং আবেষ্ট্য ঙ্ময়  
অগ্নিং রাজতে অতঃ কামান্ লোকায য়ুগ্ম। ধিক্ষ্যা চ রোচনে  
উচিষে, অপ্স্বা=মধুর রসান্ অনুযোজ। সংগ্ধবন্ অপি ভূরি  
রোগনাশিনী।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—তুমি তো সহদেবা (দেহে যুক্ত হ'য়েই যে তার ক্রিয়া

প্রকাশ করে) তুমি মৃগাদনীর অর্থাৎ ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে ভক্ষণ করেই আনন্দ লাভ করে তুমিও তৎসম। বর্ষাপ্ৰদীপই এর জীবন অর্থাৎ সমগ্র জীবনকাল ধরেই যে প্ৰদীপধারণ করে। দণ্ডোৎপল বলে তোমার লোকখ্যাতি। এটি যমজ স্বরূপ, এর দেহে অগ্নি বিধৃত হয়। মানবের সুখও এতে বিধৃত থাকে। রসে মধুর হয় এবং বহু রোগ দূর করে।

এ ভিন্ন ঐ কল্পের ১৫।৫।৩৯ সূক্তে উল্লেখ রয়েছে—

সহদেবী বিশ্বং সারিবাসু সোমং রাজানং অস্মভ্যং মধুমতী ভবন্তু।



উপরি উক্ত সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—

সহদেব্যতি দিব্ অচ্, পীত দণ্ডোৎপলা সারিবাসু=বিষবায়ুদ্রু  
সারিবা বিষভেদে, তজ্জ বায়ুদ্রু মধুমতী ভব, অস্মভ্যং রাজানং  
সোমং বিশ্বমিতি।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—যে লতা পীতদণ্ডোৎপলা হ'য়ে প্রকাশ পায়, সেই বিষ-  
বায়ুকে দূর করে মধুমতী ও আয়ুর্বর্ধক হয়। তাই সোমের এবং আমাদের জন্য  
আয়ুর্দ্রু কর।

এই সব, ওষধির গুণের বিচার উপমাপ্রধান হ'লেও তার শক্তির পরিচয়ের ব্যাপকতা  
অতি বিস্ময়কর। বলেছেন এগুনি ঘৃত ও পরমাণ্বের তুল্য আয়ুর্দ্রুকের ভেষজ প্রতিনিধি।

পরিচিতির ক্ষেত্রে সাধারণ ভাষ্য করলেন—

সহদেবী দণ্ডোৎপলা পীতপদ্মশাশ।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখি—নিম্নোক্ত সূক্তে বলা হ'য়েছে এটি আয়ুষ্কর। আমরা সাধারণে আয়ু ব'লতে বুঝি এটা জীবনীয়, প্রাণবায়ুকেন্দ্রিক, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আয়ু শব্দার্থের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক; সেটা হ'চ্ছে শরীরের যে কোন অঙ্গের অসুস্থতাই সেই অঙ্গের আয়ুহানি করে, একেই চরক সংহিতায় বলা হয়েছে খণ্ডায়ু বা অহিতায়ু; অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না হয়েও যে অকর্মণ্য, অনেক ক্ষেত্রে সেই অকর্মণ্য অঙ্গটি আরও অঙ্গের অহিত ক'রতে পারে; অতএব তার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক শক্তিই হ'চ্ছে আয়ুষ্কর। এই উক্তিটি তারই প্রতিধ্বনি; এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই শাস্ত্রটির নামকরণ করা হ'য়েছে আয়ুর্বেদ।

আমি আমার মূল বক্তব্যে ফিরে যাই।

প্রথমোক্ত সূক্ত থেকে আমরা কি পেলাম—

- ১। সহদেবা নামের দ্বারা দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস;
- ২। পদ্ম্পিতকালের দ্বারা তার বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি;
- ৩। তার অন্তর্নিহিত দ্রব্যশক্তি;
- ৪। যমজ শব্দের দ্বারা কি ইংগিত বহন করে?

### উত্তর পর্বে

চরক সংহিতার বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে, সুশ্রুতের সুত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে এবং চক্রদন্তের শূল চিকিৎসায় এর ব্যবহারগত ফলের কথা বলা হয়েছে।

### গাছে মানুষ্যে বয়োধর্মের অভিন্নতা

আমাদের যেমন তিন কাল (বাল্য, যৌবন ও বাধ'ক্য) গাছেরও তেমনি; তবে যে গাছগুলি এক বছরে ফুল, ফল হ'য়ে সাধারণতঃ ম'রে যায় (বর্ষজীবী) তাদের ক্ষেত্রেই এই মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে, বাল্যকালে থাকে শ্লেষ্মার (যেহেতু দেহের সর্বধাতুই অপুষ্ট), যৌবনে পিত্তের ও বৃন্দ্রব্যসে বায়ুর স্বভাবপ্রবণতা। যে বয়সের যা, সেটার ব্যতিক্রম যেখানে এসেছে সেইটাই তার রোগসৃষ্টির হেতু। বয়সের স্বভাবধর্মিতায় যখন একটি ধাতুপ্রকৃতিতে ঠেলে দিয়ে আর একটি প্রকৃতি অধিকার করে, তখন প্ৰব'র্টির অসম বণ্টন চলতে থাকে; যাকে বলা যেতে পারে যথাক্রমে বয়ঃস্বভাবজাত প্ৰব'র্ ক্রিয়াটির বিকৃতি। এটাও অনেক ক্ষেত্রে রোগের কারণ হয়; তারই জন্যে আহাৰ-বিহারের বিধিনিষেধ ও ভেষজ প্রয়োগ। এই বর্ষজীবী গাছের বেলান্নও তেমনি—প্ৰস্পিত হওয়ার প্ৰব'র্ গাছের অন্তর্নিহিত শক্তিতে থাকে কফপ্রবণতা, যখন সে প্ৰস্পিত হয়, তখন সে হয় অগ্নিগুণের অধিকারী আর গাছটা বড়ো হ'লে আসে বায়ুর স্বভাবধর্মিতা। এখানে একটা কথা বলে রাখি—এই গাছটিকে সুপ্রাচীনগণ দেহের ও বয়সের তারতম্যের মত গাছটির মূল, মধ্যভাগ ও অগ্রভাগেরও রস বিচার করেছেন। অর্থাৎ মূলে শ্লেষ্মাস্বভাব, মধ্যভাগে পিত্তের গুণ এবং অগ্রভাগে বায়ুর গুণ বিদ্যমান। তবে রোগের ক্ষেত্রে এই গাছ তার গুণ প্রকাশ করে (রোগপ্রকৃতি হিসেবে) হেতুবিপরীতভাবে অথবা ব্যাধিবিপরীতভাবে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বা সমতারক্ষার

পরিপূরক হিসেবে। সে বিচারটা আরও গোলমেলে। যা হোক, এই তিন কালের বিচার সেই চরক যুগেই হয়েছিল। আজ পাশ্চাত্য ভেষজ-বিজ্ঞানীদের সমীক্ষায় সেটা ধরা পড়েছে। তাঁরা এই তিন কাল বা বয়সের গাছকে নিয়েই অনুশীলন করে তবে তাঁদের বক্তব্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে তুলে ধরেন।

**পরিচিতি—** গুল্মজাতীয় অতি সাধারণ গাছ। বাংলা ভিন্ন সমগ্র ভারতের অয়ুর্বেদ-সেবিগণ এই ওষধিটি প্রামাণ্য সূত্রভূত ভাষ্যকার ডব্বনাচার্যের মতবাদের সমর্থক, তাই তাঁরা ব্যবহার করেন এই গাছটিকে। এটি দেখতে অনেকটা বেড়োলা (*sida cordifolia*) গাছের মত, তবে কান্ড নরম ও সরলই বলা যেতে পারে, শাখাপ্রশাখা অল্পই হয়, পাতার দুর্গন্ধিত অল্প রৌমশ ও বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। এর ধারগুলি অধিকাংশেরই সমান, গাছের নিচের পাতা থেকে উপরের পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। ফুলগুলি কুর্কশিমা (*Blumia lacera*), যার চলতি নাম “বনমূলা” গাছের ফুলের মত গুল্মাকারে হয় এবং রং হালকা বেগুনে রং-এর। এই সহবেদী গাছে ফুল প্রায় সারা বৎসরই দেখা যায়; এমনকি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একই ধরণের উচ্চতার মধ্যে জন্মে।

বীজ থেকে নতুন গাছ হয়, তবে পুরাতন গাছ কিছু কিছু থেকেও যায়। এ গাছ চিনে নিতে ভুল হয় না, কারণ এই গাছের মূলে একটি চমৎকার গোলাপ ও চন্দনের মিশ্র গন্ধের রেশ পাওয়া যায়। মূলটি শুকিয়ে গেলে গন্ধটি আরও সুমধুর হয়। গাছটি ২।৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু দেখা যায়, সারা ভারতেই (তবে মরুজ নয়) এই গাছ ছড়িয়ে আছে। হিমালয়ের ৬।৭ হাজার ফুট উঁচুতেও এ গাছ দেখা যায়। আর দুই বাংলার পতিত জমিতেও এর অভাব নেই। একে চলতি নামে ছোট কুর্কশিমে বলে। হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে একে বলে “সাদেয়ী”; এই নামটি সহবেদীর অপভ্রংশ শব্দনাম। এই গাছটি উত্তর বঙ্গে পরিচিত ডানকুনী নামে, তাঁদের মতে এটা শংখপুষ্পী, এর বোটানিক্যাল নাম *Vernonia cinerea* Less. ফ্যামিলি Compositae. সাধারণতঃ এই ফ্যামিলির বীজের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বীজের পিছনের দিকে ১ গুচ্ছ তুলোর আঁসের মত লোম থাকে। বীজ পাকলে বাতাসে ঐ বীজগুলিকে অন্য উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এইভাবে বংশবিস্তার করে।

### বেদোক্তর যুগে দ্রব্যগুণানুসন্ধানে

চরক সাহিত্যের প্রতিবেদন—এটি বল ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকর ওষধি। সূত্রভূতে বলা হয়েছে এটা বায়ু ও পিত্তজনিত ব্যাধি দূর করে; চক্ৰদত্ত মন্তব্য করলেন—এটা শূল চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে দ্রব্যান্তরের সহিত; এ ভিন্ন জরুরে এর মূল মাথায় বাঁধার কথা; তারপর দ্রব্যগুণের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ রাজনিঘণ্টে লেখা আছে—এটি হৃদরোগ, বাত, অর্শ, শোথ ও বিষমজরের নাশ করে আর বৃদ্ধি করে শূল ও বল। এর ঘর্মকারক শক্তিও আছে, মূত্রকৃচ্ছরোগে (*Stangury*) এবং মূত্রকোষের আক্ষেপেও ব্যবহার করা হয়, একথা লিখেছেন পাশ্চাত্য মনীষী ক্যাম্পবেল মহোদয়।

### লোকায়তিক ব্যবহার

বিশেষ সমীক্ষা—এই বনৌষধিটি দুটি খল রোগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরোগ্য করে। একটি অর্শ (*Piles*) আর একটি ফাইলোরিয়া (শলীপদ), তবে এটা যে অর্শরোগের

ক্ষেত্রেও মহোপকারী সে কথা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কিন্তু তার ব্যবহার-বিধি আমাদের অনেকেরই অজানা।

**ব্যবহার-বিধি—** মূল সমেত কাঁচা গাছ ১৭।১৮ গ্রাম নিয়ে ৩।৪টি গোল মরিচের সঙ্গে জল দিয়ে বেটে এক পোয়া (সিকি লিটার) আন্দাজ কাঁচা দুধে গুলে, কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে, সকালে খালি পেটে ২১ দিন খেতে হবে।

**আহারে বাছ-বিচার—** এই ২১ দিন মাছ, মাংস, ডিম, মৃগের ডাল, তেঁতুল, লঙ্কা ও তেল খাওয়া নিষেধ।

খাওয়া চ'লেবে—দই, দুধ, অল্প ঘিয়ে রান্না সব রকম তরকারী, টোমাটো, ঝাল হিসেবে গোল মরিচ, তবে সেটা নামমাত্র।

**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদে অর্শ-রোগ—** এই রোগনির্ণয়ের সূত্রে মত-পার্থক্য বর্তমান। পাশ্চাত্য মতে এ রোগ Systemic vein এবং Portal vein- এর রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহের বাধাই (obstruction) এই রোগের কারণ হয়; অবশ্য এই বাধা সৃষ্টি বহুবিধ কারণে হ'তে পারে, তবে প্রধানভাবে যকৃৎ (লিভার) দোষই মূখ্য কারণ বলে তাঁরা মনে করেন। প্রাচ্য চিন্তাধারা হ'চ্ছে—এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফের একক বা সংযোজক বিকৃতিতে রস, রক্ত, মাংস ও মেদকে দূষিত ক'রে আয়ুপ্রকাশ করে। তবে শারীরিক্রিয়ার বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, দুই মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু একই। আর উত্তরাধিকারী সূত্রেও যে অর্শ-রোগ হয় সেটা নব্য ও প্রাচীনে একমত।

### সাবধানতা

(১) অর্শজনিত অধিক রক্তস্রাব হ'তে থাকলে সেটা হঠাৎ বন্ধ করা অসমীচীন। তন্দ্বারা আসতে পারে অন্য নানা প্রকার উপসর্গ। তাই আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতি একটু পৃথক।

তন্মিহ্ন এই রোগের আনুষঙ্গিক উপসর্গও অনেক সময় থাকে; সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে এগুলিকে নিরসনের প্রয়োজন হয়।

(২) আর একটি বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র ফাইলোরিয়া বা শলীপদ রোগে— কেবল এই রোগ কেন, বহুরোগ সম্পর্কেই দুটি চিকিৎসাশাস্ত্রের রোগ-বিজ্ঞানের চিন্তাধারা বিপরীতমুখী। এক সম্প্রদায় ক্ষেত্রভেদের প্রাধান্যে বিশ্বাসী, আর এক সম্প্রদায় জীবাণু-তত্ত্বে বিশ্বাসী; সে ক্ষেত্রে চিকিৎসার ধারা পৃথক হওয়া খুব স্বাভাবিক। একজন বলছেন ক্ষেত্রটিকে এমনভাবে অনুপযোগী করে, যেখানে জীবাণুর সৃষ্টিই না হয়। আর একজনের মতে, যেখানে জীবাণুর প্রাধান্য স্বীকৃত সেখানে তারই বিনাশ করা মূখ্য চিকিৎসা; সূত্রাং নীতিগত পার্থক্য থাকবেই। আমার বক্তব্য হ'লো লেজের আগুনে নিভানো দরকার: এই ওষধিটি সেই কাজের উপযোগী কিনা সেটাই বিচার্য।

**কি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে—** সমগ্র গাছ (মূল সমেত) ১২।১৩ গ্রাম, ৫টি গোল মরিচ ও ৫টি বড় এলাচ একসঙ্গে জল দিয়ে শিলে পিষে নিয়ে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে ঐ জলীয়াংশ ঈষদৃষ্ণ ক'রে সকালে একবার খেতে হবে। এইভাবে ২১ দিন খেলে রোগের উপশম হয়। এই সময়টায় ক্ষীর ও দই খাওয়া নিষেধ। এটি ভাগলপুত্র অণ্ডলের বৈদ্যসম্প্রদায় ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

(৩) ক্রমশ শরীর শুনিকরে যাচ্ছে (বৃন্দ বয়সে) সে ক্ষেত্রে ১০।১২ গ্রাম (শুষ্ক

হ'লে ৫ গ্রাম) গাছে-মূলে নিয়ে জল আধ সের ও দুধ আধপোয়া একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে দুগ্ধাবশেষ অর্থাৎ আন্দাজ আধপোয়া থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ঐ দুধটি খেতে হবে। এটি ব্যবহারকালে অন্ততঃ আধ সের আন্দাজ দুধ প্রত্যহ খেতে পারলে ভাল হয়।

(৪) বয়সের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতিজনিত দুর্বলতায়, অল্প পরিশ্রমে কাতর, সে ক্ষেত্রে এই গাছের পঞ্চাঙ্গ (মূল সমেত সমগ্র গাছ) কাঁচা ১০ গ্রাম আর শুষ্ক হ'লে ৫ গ্রাম নিয়ে একপোয়া জলে সিদ্ধ ক'রে অবশিষ্ট এক ছটাক আন্দাজ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে একটু ঘিয়ে সাতলে প্রত্যহ খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চলে যায়।

(৫) সহদেবীর সমগ্র গাছ ছেঁচে রস ক'রে ৪ চামচ আন্দাজ একটু গরম ক'রে অথবা আন্দাজ আধ পোয়া (১০০ মিলি লিটার) গরম দুধে মিশিয়ে, তার সঙ্গে একটু চিনি বা মিছরি দিয়ে খেলে, মাথাঘোরা ও ভুল হ'য়ে যাওয়া অবশ্যই কমে যায়; তবে প্রথম দুই দিন অধিক মাত্রায় আরম্ভ করাই ভাল।

(৬) যাদের কোষ্ঠে সর্বদা ক্রিমি জন্মে, যার জন্যে বমি বমি ভাব, খুঁধু ওঠা, চোখে কালি পড়া—এসব পুরানো আমাশয়ের লক্ষণ, এসব ক্ষেত্রে সহদেবীর রস সকালে ১।২ চামচ একটু গরম ক'রে খেতে হয়, অবশ্য পাটনা অঞ্চলে ক্রিমির উপদ্রব কমানোর জন্যে এই গাছের বীজ ব্যবহার ক'রে থাকেন। এক্ষেত্রে এই গাছটির বীজ ব্যবহারের একটা যুক্তি আছে—এইহেতু যে এটি *vernonia* গণের গাছ। আমাদের সোমরাজীও সেই *vernonia* গণের।

(৭) অনিয়মিত মাসিকে— ৩।৪ মাস অন্তর হ'চ্ছে, তলপেট ও নিতম্ব ভেরে যাচ্ছে, তাঁরা এই গাছের রস ২ চামচ একটু গরম ক'রে প্রত্যহ কিছুদিন একবার ক'রে খেলে ঐ দোষটা চলে যাবে।

(৮) বিষমার্নিত— যখন-তখন ক্ষিধে লাগে আবার না খেলেও অস্বস্তি, আর খেয়েও কোন লাভ হ'চ্ছে না, অর্থাৎ বায়ুপ্রধান অগ্নিমান্দ্য—এই রকম ক্ষেত্রে এই গাছের রস ২ চামচ একটু গরম ক'রে খেতে হয়।

(৯) পেট ব্যাথা— (বায়ুর জন্য) আমাশার জন্য নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ২ চামচ রস গরম জলে মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

(১০) ঝিল ধরায়— শুধু হাটু, দুটোতেই ধরে, ব্যাথাও হয়; সেক্ষেত্রে এই সহদেবীর পাতার রস ২ চামচ জল মিশিয়ে খেতে হয়। আর বেটে অল্প গরম ক'রে ওখানে লাগাতে হয়।

(১১) আধি রোগে (মেলান্‌কোলিয়ায়)— যে উন্মাদ বিদ্রোহ করে না, বসে মনে মনে বকে, এসব ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বৈদ্যগণ সর্পগন্ধার মূলের (*Rauwolfia Serpentina*) চূর্ণ খেতে দিতেন, কারণ তাঁদের মতে এটি নাকি শঙ্খপুত্‌পী; ও অঞ্চলে এই গাছ ডানকুনী নামে পরিচিত; কিন্তু এ সব অঞ্চলে *Canscora decussata* গাছকেই ডানকুনী বলা হয়।

এই সব লৌকিক ব্যবহারকে কেন্দ্র ক'রে বনৌষধির গবেষণা ক'রলে দ্রব্যের অন্ত-নিহিত বস্তুসত্ত্বের সন্ধান পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

পারিশেষে আমার বক্তব্য হ'চ্ছে, গত ১২শ খৃষ্টাব্দ থেকে আমাদের সম্প্রদায় যাবাবর হ'য়ে গিয়েছে, আজ তার বাহ্য জৌলুস না থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু সেই পূর্বপুরুষের জীর্ণ উই-এ খাওয়া কোষ্টটা এখনও কিন্তু বগলে আছে। আজ আমাদের এসেছে inferiority complex । সেটুকু এ সম্প্রদায় কি আর কাটিয়ে উঠতে পারবে না?



## CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Acid viz. threo 12, 13-dihydroxyoleic acid. (b) Terpenoids viz. betaamyrin, betaamyrin acetate, lupeol, lupeol acetate, betaamyrin benzoate. (c) Sterols viz. alpha sitosterol, beta sitosterol, stigmasterol. (d) Carbohydrates.



## বর্ষার

শুধে নিয়ে নিজেই ভোগ করবো—এ প্রকৃতির মানুষও যেমন আছে, আবার শোষণ করলেও অপরের কল্যাণও কিছু করে এরও অভাব নেই; বৃক্ষজগতের মধ্যেও এই প্রকৃতির বৈচিত্র্যও বর্তমান। আলোচ্য বর্ষার বৃক্ষটি কিন্তু এই শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে।

তাছাড়া সুপ্রাচীন যুগে সোমরস পান করারও রেওয়াজ ছিল, হয়তো বা সেই সোমরসের স্বভাবধর্ম মদকারী (মত্ততাকারী), তবে সে দ্রব্যটি যে জীবনীয় সেটার সম্পর্কে সন্দেহ নেই। বর্তমানের মদ নাম শব্দটির উৎপত্তি সেই থেকেই নয় তো?

যে রসিকজন সোমরসে মত্ততা সৃষ্টি করে এই অর্থমাত্র গ্রহণ করেন, তাঁরা ভিন্ন সাধারণের প্রশ্ন নিশ্চয়ই থাকবে যে—তা হ'লে কি মদ ভাল? তার উত্তরে বলা যায়—ক্ষেত্র, কাল ও প্রকৃতি বিচার করে মাত্রামত সাপের বিষও তো জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে, সেই রকম এটিও শরীরের স্রোতপ্রবাহকে সিঞ্জন করে জীবনকে সঞ্জীবিত করে, এটাও অন্যতম সত্য; যাকে বলা যায়—

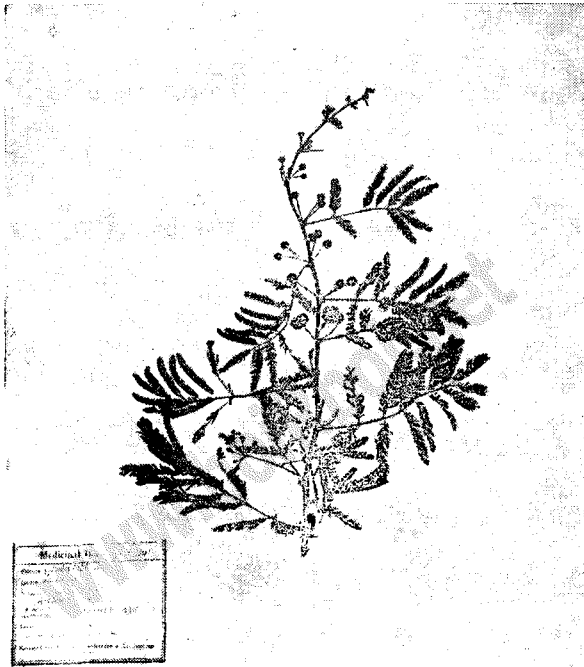
প্রকৃতির ভূতরে উন্মিষদগুণের বেঁচে থাকার মধ্যেও তাদের দেহকোষ সেইভাবে

নিশ্চয়ই গঠিত হয়। কারণ রসায়নটাই যখন দীর্ঘ জীবনের মৌল উপাদান।

এ সব তথ্যের উৎস কোথায়?

পৃথিব্যাঃ সৃজাম্যান্ডিঃ ওষধীভিঃ পয়সা প্রসবে যন্তুর্যন্ত্রেনাগ্নেঃ  
ঋতুভিঃ কল্পয়তি।

অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প ২২।৫।৭০ সূক্ত



এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—

পৃথিব্যাঃ অন্দিঃ সৃজামি প্রসবে যন্তুঃ যন্ত্রণ অগ্নেঃ=জাঠরান্নেঃ  
ঋতুভিঃ ওষধীভিঃ বর্বদ্রপয়সা সৃজামি। বর্বদ্র ইতি বর্ব+উরচ্  
বর্বচ্ স্তম্ভতায়াং বৃদ্ধ ভেদে ইতি যাস্কঃ। তস্য পয়সা পৃথিব্যাঃ  
রসমিব অগ্নেঃ রসং শোষণয়তি ইতি সৃজামি।

উপরিউক্ত ভাষ্যটির অর্থ হচ্ছে—এই বর্বদ্র পৃথিবীর রস শোষণ করেই জন্মগ্রহণ করিতেছে। অর্থাৎ বর্বদ্রস্থলেও সে জন্মগ্রহণ করে। একে জলসেচন করিতে হয় না।

এর রস পৃথিবীর মত জঠরাগ্নিকেও শোষণ করে। অর্থাৎ তাপ ও বহুঋতুর আবির্ভাবেও স্তম্ভতা প্রাপ্ত হয়ে রস দান করে, তাই স্বজন কর্তেছি।

আমাদের সর্বজন পরিচিত বাবলা গাছেরই সুপ্রাচীন নাম 'বর্ষদূর', অর্থাৎ সর্বত্র সে যেন স্তম্ভ বা অজ্ঞের মত থাকে; বৈদিক সূক্ত ভাষ্যে বর্ষদূর শব্দের অর্থ তাই করা হয়েছে; সপ্তে সপ্তে এও বলা হয়েছে—যদিও এটি বর্ষদূর, কিন্তু বিনা সেচনেই এই বৃক্ষটি জীবনায়ু লাভ করে। বহু ঋতুর আসা-যাওয়ার মধ্যেও সে আশ্চর্যকর করে, এমনকি মরুভূমিতেও সে সেচনের জন্য অপেক্ষা না রেখে জীবিত থাকে। এর নিজ দৃষ্টই তার জীবনকে সিংহিত করে; কারণ, এর শরীরস্থ রসই তো ঘনীভূত হয়ে নিগত হয়, যেটা আমরা গদের আকারে দেখতে পাই। এর এই অন্তর্নিহিত সঞ্জীবন রসই বিভিন্ন ঋতুকালজ (শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি) বিপর্যয়ের মধ্যেও জীবনকে রক্ষা করে, এমনকি মরুপ্রান্তরেও।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'বর্ষাণাং ধনক্ষয়ঃ' অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির ধন কেবল ক্ষয় করার জন্য। মধ্যযুগীয় সামাজিকগণ অজ্ঞব্যক্তি বলেই তাঁদিকে নির্বাচন করেছেন, কিন্তু ষাঁরা কৃপণ তাঁরা না খেয়ে না দেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ধনই সঞ্চয় করে যান, আর বৃদ্ধিমান তস্কর সেটাকে কাজে লাগিয়ে থাকে। এই বাবলা গাছের জীবনীশক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও হয়তো বা উপমাটা সেই ধরনের বৈদিক ইঙ্গিত।

### সংহিতা যুগের অনুশীলন

বৈদিক সূক্তটির অন্তর্নিহিত শক্তির তাৎপর্য অনুশীলন করে আয়ুর্বেদের সুপ্রাচীন সংহিতাগুলিতে সন্নিবেশিত হয়েছে; সেখানে শরীর পোষণের প্রাথমিক উপাদান যে রস ধাতু, সেটার ক্ষয়, এমন কি জীবনীয় যে শুক্রধাতু তার যেখানে ক্ষয় হয় সেখানে এবং অতিসারে (Diarrhoea), মূত্রাতিসারে (Diabetes insipidus) এবং রক্তের প্রবল রসক্ষয় এবং পুঞ্জের উৎপত্তিস্বারা দেহের ক্ষতপথে ক্ষয় প্রভৃতি—সেইসব ক্ষেত্রে এই বাবলার ঘনীভূত রস (গদ), পাতার ও ছালের (বৃক্ষ বৃকের) কাথ বাহ্য ও আন্তর ব্যাধিতে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ভেষজটি তিস্ত কষায় রসে পূর্ণ, যেহেতু এটি বায়বীয় শক্তিতে সমৃদ্ধ তাই সে গুণে লঘু, সূক্ষ্ম স্রোতোগামী। তাই এটি উপসর্পিত বা আগন্তুক ব্যাধিতেও ব্যবহার্য।

সংস্কারের দাঁড়ির গুচ্ছ স্বরূপ এই পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি, সেখানে ধর্মীয় আরব্য উপন্যাস বলা চলে, তবে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষায়, কি স্বস্থবৃ্ত্তের নীতি নির্ধারণের সরণী হিসেবেই তাকে সাজানো হয়েছে। এখানে সেইরকমই একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা করছি এই বাবলাকে কেন্দ্র করে।

কোন এক সময়ে ছিল যজ্ঞে পশুবলির বিধি। সেই বলির মধ্যে গো-বলি, ছাগ-বলি সমপর্যায়েরই ধরা হ'তো, তবে গো পশু পাওয়া গেলে সেই হ'তো সর্বোৎকৃষ্ট, তাই প্রায়ই ধনীর বাড়িতে যে সব যজ্ঞ হ'তো, তাতে ব্রাহ্মণগণ পরমানন্দে গোমাংস ভক্ষণ করতেন; কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই তাদের অগ্নিমান্দ্য হ'তে লাগলো, এমন যজ্ঞের মধ্যে 'পৃষধ' রাজার যজ্ঞটিই বেদে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হ'য়ে আছে।

সেখানে বলা হয়েছে—

‘গবাং সংধ্রাণাং পৃক্ষং মাংসং যবাপহম্’

চিরজীব-১৫

অর্থাৎ গোমাংসগুলি তাঁদের যব ভক্ষণেরও সামর্থ্য নষ্ট করে দেয়; সুতরাং অতিসার পীড়া। (এই উপাখ্যানের সারাংশটি চরকের চিকিৎসাস্থানের দশম অধ্যায়ের প্রথমেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। তারপর ঋষিগণ যখন অতিসার পীড়ায় আক্রান্ত হ'য়েছিলেন, তাতেই তারা উপলব্ধি করলেন, অগ্নি উপহত হ'য়ে বায়ু, মূত্র স্বেদকে পুরীষাশয়ে দ্রবীকৃত করে অতিসার উৎপাদন করেছে; অর্থাৎ বাতাতিসারের জন্ম হয়। পুরীষ (মল) জলের মত হয়, এবং শরীরও অবসন্ন হয়, মূত্র বৃদ্ধি হয়ে যায়, এবং বায়ু কোষ্ঠে আবদ্ধ হ'য়ে শব্দ হয়, তারপর পেটে শূলের মত অসম্ভব যন্ত্রণা হ'তে থাকে; বায়ু তখন তির্যকভাবে উদরে পরিভ্রমণ করে। (এই লক্ষণযুক্ত রোগটি কিন্তু বর্তমানের কলেরা রোগের লক্ষণের সঙ্গে হুবহু মিল আছে)। সুতরাং এইভাবে বর্ণনা করা আছে।

এমনিভাবে অতিসার কখনও পিত্তাবিকারের, কখনও বা শ্লেষ্মাবিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগটি দ্রুত প্রাণনাশকও হয়; আবার কালে তা অসাধ্য গ্রহণী রোগেও পরিণত হয়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে আহাৰ্য ও ঔষধের ব্যবহারের দুটি পথ ধরতে বলা হ'য়েছে; একদিকে তাকে যে সব ভেষজের মধ্যে দীপনশক্তি আছে, তাদের সাহায্যে তার অগ্নিবল উদ্দীপ্ত করা, আর সংগ্রাহী ভেষজের সাহায্যে শরীরের জলীয়াংশ বা মলাংশকে ধরে রাখা। এক্ষেত্রে ব্যবলাকে ব্যবহার করা হয় সংগ্রাহী ভেষজ হিসেবে, অগ্নির উদ্দীপ্তকারক হিসেবে নয়; তাই যেখানে সামান্য সংগ্রাহী ভেষজের প্রয়োজন, সেখানেই এই ব্যবলার ব্যবহার। এ সম্বন্ধে চরক ও সুশ্রুত একমত। অতএব কিবা আন্তর কিবা বাহ্য, যে ক্ষেত্রেই অতিসারণ ঘটে সেইখানেই ব্যবলার প্রয়োজন। এমনি কতকগুলি যোগের ম্বারা ব্যবলাকে সংগ্রহভেষজের আদর্শ ভেষজ হিসেবেই পেয়ে আসছি।

### পরিচিতি

যদিও তার পিতৃভূমি খন্দনদেশ (মরুদেশ) তবুও ভারতের মরুভূমি অঞ্চলে এর বাড়-বৃদ্ধি খুব; তবে বঙ্গটি আন্দ্রদেশ (জলাসন্ন দেশ) অথবা জাঙ্গল দেশ, প্রায় সব দেশের জলবায়ুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে; সে শক্তি ও স্বভাবধর্ম সে পেয়েছে আপন প্রকৃতির কাছ থেকে।

মাকারি গাছ ২৫।৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচুও দেখা যায়, তবে সাধারণতঃ ১৫।২০ ফুটই সর্বদা নজরে আসে। পাতা আকারে তেঁতুল পাতার মত বটে, তবে সাইজে সর্বদিকেই তার অধিক। গাছে সোজা লম্বা লম্বা কাঁটা; গত যুদ্ধের সময় এই কাঁটা আলপিনের পরিবর্তে ব্যবহার হ'য়েছে; সুতরাং কাঁটার আকৃতিটি পরিষ্কৃট। চালাগাছেই বেশী কাঁটা, পাছে গরু, ছাগল বা উঠে তাকে মর্দিয়ে খেয়ে ফেলে, তাই এটা তার বেঁচে থাকার প্রকৃতিদত্ত হাতিয়ার। তবে এটা যে মরুদেশজ গাছ সেটা তার কাঁটার গঠন দেখেই বোঝা যায়। একটা সরু শিরে সমান্তরালভাবে ১০-১২ জোড়া সূক্ষ্ম লোমাবৃত পাতা থাকে, ফুল দেখতে গোল, আকারে মটর সদৃশ হ'লেও মনে হয় যেন রোম দিয়ে তৈরী। ফল ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, আধ-ইঞ্চি চওড়া, চপ্টা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাদা রোমাবৃত, তাই দেখতে সাদাটে (শ্বেতাভ), ফলে ৮।১০টি বীজ থাকে, গাছের গুঁড়ি দীর্ঘদিনে মোটা হয়, এর কাঠ খুবই শক্ত, বাংলাদেশে লাঙ্গল ও গরুর গাড়ীর চাকা এই কাঠে তৈরী হয়।

পাশ্চাত্য ভেষজবিজ্ঞানীদের মতে এটির বোটানিক্যাল নাম *Acacia arabica* willd. ফ্যামিলি Leguminosae.

এই বাবলা নামের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আর একটি গাছ এদেশে হয়; তার প্রচলিত গ্রাম্য নাম 'গুয়ে বাবলা'। গুয়ে এই বিশেষণ দেওয়াটার কারণ হ'লো এই গাছের স্বকে (ছালে) পাওয়া যায় যেন বিস্তার গন্ধ, কিন্তু ফুলে পাওয়া যায় বর্তমানের প্রসিদ্ধ Scent 'মাইমোসা'র (Mimosa) গন্ধ। এই গাছগুলি আকারে ছোট হয় এবং এর বাড়-বৃদ্ধিও কম; এটির বোটানিক্যাল নাম *Acacia farnesiana willd.* এটি Leguminosae ফ্যামিলিভুক্ত। প্রাচীন বনৌষধি গ্রন্থকারের মতে, এটি বিট খদির নামীয় গাছ। এই *Acacia* গণের আরও বহু প্রজাতি আছে, তার মধ্যে আলোচ্য বব্বর বা বাবলা গাছের বোটানিক্যাল নাম *Acacia arabica willd.* আমাদের খদির বা খয়ের গাছ, শমী বা শাই গাছ এই *Acacia* গণভুক্ত। এই বাবলা গাছের হিন্দি নাম বব্বর, ববুল ও কীর।

### রোগ প্রতিকারে পত্রের ব্যবহার

(১) **পাতলা দাঁতে**— তার সঙ্গে আম সংযুক্ত আছে, সেক্ষেত্রে কচিপাতা ৩/৪ গ্রাম আধ পোয়া জল সিদ্ধ করে এক ছটাক থাকতে নামিয়ে ছেঁকে, অল্প চিনি মিশিয়ে সেটা একবার বা দুইবারে খেতে হয়। এর দ্বারা ওটা সেরে যায়; তবে ঐ পাতা সিদ্ধ করার সময় কুড়াচির ছাল ৩/৪ গ্রাম দিয়ে থাকেন অনেক বৈদ্য, অবশ্য এটা চন্দ্রদেবের ব্যবস্থা।

(২) ৫/৭ গ্রাম পাতা ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জলে ক্ষত ধুলে ওটা সেরে যায়, এমনকি ক্ষতে পচনক্রিয়া আসতে দেয় না; এ ভিন্ন পাতার মিহি গুড়ো ক্ষতের উপর ছড়িয়ে দিলে ওটা সেরে যায়।

হাজা হ'লে এই পাতার মিহি গুড়ো হাজার উপর ছড়িয়ে দিতে হয়।

(৩) **কর্শমল হ'লে**— ডাক্তারি মতে এটির নাম মাম্‌স্ (Mumps). সাধারণতঃ কানের গোড়া ফোলা, তার সঙ্গে জ্বর (অবশ্য এ জ্বর হয় দুই-একদিন বাদে) সেক্ষেত্রে পাতা ১০/১২ গ্রাম, ভাজা বালি ২০।২৫ গ্রাম, খয়ের (খদির) ২।৩ গ্রাম একসঙ্গে বেটে গরম করে ২/৩ বার প্রলেপ দিতে হবে। দুই-একদিনের মধ্যে ফুলো ও ব্যথা দুইই কমে যাবে। তবে জ্বর হ'লে আভ্যন্তরিক ঔষধের প্রয়োজন থাকবেই। তাছাড়া মাম্‌স্ ভিন্ন সম্বিপাতজনিত গাল, গলা ফোলায় ২।৩ দিনেই আরোগ্য হয়।

### প্রাচীন পদ্ধতিতে ঘনসার (Solid Extract) প্রস্তুত বিধি

বাবলা গাছের পাতা (মূলের ছাল, গাছের ছাল, পাতা, ফুল ও ফল)—গাছের এই পাঁচটি অংশ একসঙ্গে যতটা নেওয়া হবে তার ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করে চতুর্থাংশ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, তাকে মৃদু আঁচে (অগ্নিতে) পাক করতে হবে। ঘন হ'য়ে গলিত পিচের মত হ'লে, যাকে বলা যায় Semi solid, গরম অবস্থায় তার সঙ্গে প্রাতি কেজি গাছের ঘনসারের জন্য ৮ থেকে ১০ গ্রাম মত সোহাগার থৈ মিশিয়ে দিতে হবে। এটি দেওয়ার কারণ তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা। এটি প্রস্তুত করে রাখলে বহুক্ষেত্রেই একে সহজে প্রয়োগ করা যাবে।

(৪) **দাঁতের মাড়ী ফুলোয়**— উপরিউক্ত ঘনসারে একটু জল মিশিয়ে তুলি করে মাড়িতে লাগাতে হয়।

(৫) **ম'চু'কে গেলে**— ফুলো বাথা দুইই আছে অথবা ফ'লো আছে বাথা নেই, সেক্ষেত্রেও একটু জল মিশিয়ে পাতলা ক'রে লাগালে ওটা সেরে যাবে।

(৬) **গল ক'তে**— ২/৩ গ্রাম ঘনসার নিয়ে আধ কাপ অল্প গরম জলে মিশিয়ে, সেই জলে কুন্নি (Gargle) ক'রলে ওটা সেরে যায়; আর যদি মুখে বা গলার ক্ষত থাকে সেটাও সেরে যায়। অথবা ১০।১২ গ্রাম বাবলা গাছের ছাল আধ সের জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেই জলে কুন্নি (Gargle) ক'রলে যে গলার যা কিছুতেই সারছে না সেটা সেরে যাবে।

(৭) **প্রদর রোগে**— এটা স্ত্রীরোগ, ঋতুমতী হওয়ার পর সব বয়সেই হ'তে পারে, এক্ষেত্রে ২ গ্রাম আন্দাজ ঘনসার এক পোয়া আন্দাজ জলে গুলে উত্তরবিন্ধিত দিতে হয়— যাকে বলা যায় ডুসু দেওয়া; এর ম্বারা সাদা প্রাবটা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

(৮) **শতনের ক'তে**— শিশুদের মুখের টানে অনেক সময় এটা হয়, সেক্ষেত্রে বাবলা গাছের শুধু ছাল আন্দাজ ৮।১০ গ্রাম একটু খেঁতো ক'রে নিয়ে সেটা সিদ্ধ ক'রে সেই জলে ধুয়ে ফেললে ওটা সেরে যায়।

(৯) **প্রবল কাসি**— তার সঙ্গে কফের যোগ, সেক্ষেত্রে বাবলার ফল চু'র্গ ২ রতি (৪ গ্রেণ) মাত্রায় অল্প চিনি বা মিছরির গুড়ো মিশিয়ে দিনে রাতে মোট ৩ বার খেতে হয়, এর ম্বারা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, কাসিও কমে।

(১০) **শিতের দাছে**— ২/৩ গ্রাম গদ (বাবলার আঠা) আধ পোয়া জলে রাতে ভিজিয়ে রাখতে হবে, সকালে একটু চিনি মিশিয়ে সরবৎ ক'রে খেতে হবে।

(১১) **রক্তপ্রাবে**— সে উখ'র্ বা অথো যে মার্গ থেকেই হোক না কেন, ৩/৪ গ্রাম গ'দের সরবৎ ক'রে খেতে হয়, এর ম্বারা দুই-একদিনেই তার উপশম হয়।

(১২) **মুত্র-কুঙ্কুতায়**— যৌবনের গণোরিয়া রোগের পরিণতিতে প্রৌঢ়কালে প্রস্রাবের সময় মাঝে মাঝে কট হ'চ্ছে, সেক্ষেত্রে ২ গ্রাম আন্দাজ গ'দের গুড়োর সরবৎ ক'রে, তার সঙ্গে আমরুল শাকের (Oxalis Corniculata) রস ২ চামচ অথবা ৩ গ্রাম আন্দাজ শু'ক্ষ শাক ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে সেই জলের সঙ্গে গ'দের গুড়ো মিশিয়ে সরবৎ ক'রে খেলে এই অসুবিধেটা চলে যায়। এটা প্রাচীন বৈদ্যগণের একটি মৃদুশিষ্যোগ। মেহ রোগে শু'ধু গ'দের গুড়ো ২/৩ গ্রাম সরবৎ ক'রে খেলেও উপকার হয়।

(১৩) **শু'ক্র পুষ্টিতে**— ছোট ছোট টুকরো গ'দকে ঘিয়ে ভেজে, গুড়ো করে, তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে লাভু তৈরী হয়; এটার ওজন আন্দাজ ১০।১২ গ্রাম হবে। এই লাভু একটি বা দুটি খেয়ে এক কাপ দু'ধ খেয়ে থাকেন রাজস্বানারী। তাঁরা উপকার নিশ্চয়ই পেয়ে থাকেন।

(১৪) **বস্তি**— এই বরিশ (৩২) সংখ্যাটির উচ্চারণের অপভ্রংশ হ'য়ে বস্তিগা হ'য়েছে; আসলে পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, বংশ লোচন, আখরোট প্রভৃতি ৩১টি দ্রব্যের সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা গ'দকে গুড়ো ক'রে সব জিনিস চিনির সঙ্গে পাক ক'রে লাভু বানানো হয়। হরিয়ানা, পাজাব এইসব অঞ্চলে প্রসূতা নারীর ড'ন-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ও সুস্থ রাখার জন্য এইটি খাওয়ানোর রীতি আবহমান কাল থেকে চলে আসছে।

## CHEMICAL COMPOSITION

(a) Sucrose. (b) Tannin. (c) Enzyme. (d) Auxins.



## প্রসারনী

গ্রামাণ্ডলে কিশোর বয়সে কোতুকের একটি প্রধান উপাদান ছিল এই গাঁদাল পাতা, এটা আরও বাস্তব রূপ নিভে, যদি এর পাতার রস সরবের খোলে (খইল) মিশিয়ে নিয়ে সেটাকে কাপড়ে লাগানো হ'তো; কারণ একেই তো তার লতাপাতার বিস্তার গন্ধ, তার ওপর খেলের সংযোগ; হয়তো বা এই বিস্তাগন্ধের জন্য সমাজে সে অভদ্রা, কিন্তু বৈদিক সমীক্ষায় সে ভদ্রা।

কেন তা বলছি—

“যা ভদ্রাণি সরণী প্রতিমদুগ্ধতে প্রাসাবীদ ভদ্রং শ্বিপদে চতুঃপদে  
নাকমখ্যং বরেণ্যা প্রমাণে মৃষসো বিরাজতে।

অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ১১।১৪৮।৫৭

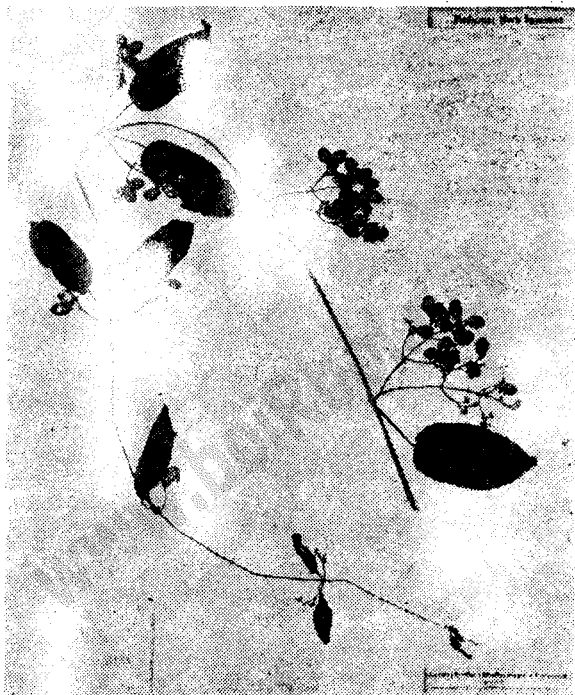
ভাষ্যকার মহাশয় লিখেছেন—

অস্যা ভদ্রায়া=লতায়ঃ। প্রতি মদুগ্ধতে ভদ্রং প্রাসাবীদ। ইয়ং  
বরেণ্যা=শ্রেষ্ঠা। শ্বিপদে চতুঃপদে=মনুষ্যপশুবাদভ্যো ভদ্রং=কল্যাণং  
প্রাসাবীদ=প্রেরয়তি। উষসো সবিভূঃ পুরোগামিনী ইয়ং সরণী  
সতী যা নাকং=স্বর্গং সুখং বাখ্যং প্রকাশয়তি। ভাদি মঙ্গলং রক্  
সা ভদ্রা। স্+অনি=পাথি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'চ্ছে—এইটি ভদ্রা লতা। এটি সরণী। এটি বরেণ্যা। মনুষ্য ও  
পশুদির জন্য কল্যাণ প্রেরণা করে। সূর্য যেমন সর্বাগ্রগণ্য হ'য়ে সকলের মঙ্গল বিধান  
করেন, এই সরণীও গতিশালিনী হ'য়ে স্বর্গসুখ প্রকাশকর।

## ষবনিকার জন্তরালে

এই সরণী বা গাঁদাল যে মনুষ্যের এমনকি গবাদি পশুরও কল্যাণকারী, তারই প্রতীক বৈদিক নাম 'ভদ্রা', এটি কল্যাণবাচী শব্দ। আর সরণী শব্দ সূ+অনি=সরণী। এই নামটি তার গুণের পরিচায়ক। পরবর্তী সংহিতার যুগে চরক সূত্রভূতে এই ভেষজটির ঔষজ্যশক্তির বিচার প্রচুর। এটি যে কিসের এবং কোথায় তার গতিশালিতা



তা নির্ণয় করা হয়েছে। শব্দার্থের পরিণত অর্থে বোঝা যায়—এটি সংস্কৃতিত পথকে প্রসারিত ও তার অবরোধ নিবারণ করে। যার ফলে বায়ুর স্বচ্ছন্দচারী স্বভাবে বাধা এলে তাকে সরল করে।

তাই সংহিতার যুগে সেই সরণী ভেষজটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রসারণী। এ শব্দ প্রসারিতই করে না স্থিতিস্থাপকতাও বজায় রাখে; যেহেতু এটি ভৌম ও বায়বীয় গুণসম্পন্ন ভেষজ।



## পরিচিতি

এই প্রসারণী, যার প্রচলিত নাম গাঁদাল বা গম্ব ভাদুলে, এটি ভারতের সর্বত্র (অবশ্য কম-বেশী) পাওয়া যায়; লতানে গাছ, সচরাচর অপর গাছ অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়, তবে জনপদে যত তত যে হ'য়ে আছে এটাও নয়; তবে সাধারণভাবে এটি লাগানো হ'য়ে থাকে। এ ভিন্ন মধ্য ও পূর্ব হিমালয়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যেও দেখা যায়, এর লতাপাতায় উৎকট বিস্তার গম্ব; সেইজন্য এর একটি নাম 'পুন্ডিগম্বা'। বর্ষাকালেই তার বাড়-বাড়ন্ত। শরতে ফল এবং শেষে ফল হয়। এইজন্যই আয়ুর্বেদের ভৈষজ্য সংগ্রহের নির্দেশে এই শরতেই তার সংগ্রহ কাল। এটির বোটানিক্যাল নাম *Paederia foetida* Linn. ফ্যামিলি *Rubiaceae*.

এদেশে এর আর একটি প্রজাতি পাওয়া যায়; তার প্রচলিত নাম ছুই গাঁদাল বা ছোট গাঁদাল, এর পাতাগুলি আকারে একটু ছোট ও অল্প রোমশ এবং তার লতাটাও একটু শীর্ণ, তার লতায় পাতায় দু'গম্ব একটু কম, তার বোটানিক্যাল নাম *Paederia tomentosa* Blume. এভিন্ন কেরলে *Mezemia tridentata*, Hallier. ফ্যামিলি *Convolvulaceae*. রাজস্থানে *Leptadania sparitum* এবং কোথাও কোথাও *Convolvulus arvensis* Linn. ফ্যামিলি *Convolvulaceae*. এই সব গাছ প্রসারণী বলে ব্যবহার হ'য়ে থাকে; কিন্তু অথর্ববেদেও সরণীই হ'ল মূলতঃ প্রসারণী।

## পূর্বাভাস

আকাশে কালো মেঘ যেমন বৃষ্টির পূর্বরূপ, রোগাক্রমণের তেমনি একটা পূর্বরূপ আছে। সেখানেও তার মূলীভূত কারণ থাকবে। এই যেমন আহার্যের স্বাভাবিক পরিণতিতে শরীর পোষণকারী রস সৃষ্টি হওয়াটাই দৈহিক ক্রিয়ার স্বভাবধর্ম। ভাল পরিপাক না হ'লে তার সৃষ্টি রসটা হয় দুঃশীল। তা সে ভাল-মন্দ যাই হোক, এই রসই শরীরের শিরা, উপশিরা, স্নায়ু প্রভৃতি স্রোতের মাধ্যমে প্রবাহিত হ'চ্ছে; সেই রসে যদি গলদ থাকে তার দ্বারা রোগ সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া যে রসের পরিণতি আমাদের দেহ-স্রোতের মাধ্যমে শরীরকে পোষণ করে, সেই সব স্রোতে যদি আমদোষ অর্থাৎ অপক্ক রস বহমান থাকে, তা হ'লে আসে আমবাত, রসবাত, অশ্র, অতিসার, গ্রহণী, এমন কি পক্ষাঘাত পর্যন্ত; একে বাতব্যাধির অন্তর্গত বলা হয়। এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের প্রাচীন মনীষীদের পরামর্শ হ'লো—আমদোষ কতৃক অবরুদ্ধ বায়ুকে মূত্র অর্থাৎ আমদোষের পরিপাক ও শিরা-উপশিরা প্রসারিত করার জন্য বৈদিক সরণী বা সংহিতার প্রসারণীর আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ এবং প্রয়োজনবোধে বাহ্য প্রয়োগও ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে চরকে একটি বিশেষ কথা বলা হ'য়েছে যে, দুঃশ্রু বিনা কোন ক্ষেত্রেই গাঁদালের প্রয়োগ করা উচিত নয়।

## রোগ প্রতিকারে

এই ভৈষজ্যটির উপকারিতা সাধারণের মনে গেঁথে রাখার জন্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য করে কয়েকটি বিশিষ্ট মৃষ্টিযোগ বলা হ'য়েছে ছড়ার মাধ্যমে।

“ভ্যাদাল মনে দাঁড়িয়ে বসে, হেঁকে বলে খাওয়া কসে”।

ভাই-বোনেতে বেড়া দেবো

অতিসারের ঘর।

মোদের সপ্পে বেলকে নেবো

আম-অতিসার কেঁটিয়ে দেবো

কিসের তোমার ডর?"

এই ভ্যাডাল হ'চ্ছে ভদ্রমুস্তক (cyperus rotundus). এর চলতি নাম মূখো। উপরিউক্ত দুটি মূখিটোয়োগে পেটের দোষ সারে; এবং এর সপ্পে শেখোক্ত বেল (বিস্ব) যোগ করলে আমাশা ভাল হয়, এমনকি ছোট ক্রিমিও ক'মে যায়।

২। পক্ষাঘাতে— পক্ষা, কিন্তু সেই অগ্নের স্পর্শশক্তি চ'লে যায়নি, এক্ষেত্রে এই প্রসারণী তাকে সজীবিত করতে পারে; তবে যুগপৎ আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রয়োগ ক'রে যেতে হয়।

৩। হাতে বা পায়ের শিরার সংকোচন আরম্ভ হ'য়েছে, সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতা বেটে, তিল তেলের সপ্পে মিশিয়ে গায়ে মাখার উপদেশ দেওয়া আছে। এটা চরক আমলের ব্যবস্থা।

৪। মূত্র-কৃচ্ছ্রভায়— গ্রন্থিস্ফীতি নেই অথচ প্রস্রাব আটকায়, সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতার রসে (৩।৪ চা-চামচ) আধ পোয়া আন্দাজ কাঁচা দুধ মিশিয়ে কয়েকদিন খেলে এ দোষটা সারে।

৫। হর-গৌরী মিলনের মত গাঁদাল ও এরন্ডতেল (Castor oil)। এই গাঁদালের রসে এরন্ডতেল মিশিয়ে অতি প্রত্যবে খেলে, আর তার সপ্পে পথ্যাসী হলে বাতরোগ পালাবেই।

৬। আম্রাঘাতে (Rheumatic affections)—গাঁদালের রসের সপ্পে এক কোয়া রসুন খেলে (এটা চিবিয়ে খেতে হবে) ২।৪ দিনের মধ্যেই আম্রাঘাতের যন্ত্রণার লাঘব হবে।

৭। আমাশায়— গাঁদাল পাতার রস ২-৪ চামচ একটু গরম ক'রে ৯।১০ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেলে থোকো থোকো আম পড়াটা কমে।

৮। আমাজীর্ণে— গাঁদাল পাতার ঝোল দুই-এক টুকরো কাঁচা কলা দিয়ে রাখা ক'রে খেলে ও দোষটা চলে যায়।

চোর ভাড়িয়ে ডাকাত পোষার মত এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি—অনেকক্ষেত্রে দেখেছি গাঁদাল পাতা বাটা দিয়ে ঝোল খেলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য এসে যায়, সেখানে থানকুনী বা থলকুড়ির (Centella asiatica) পাতার সপ্পে ২।৩টি গাঁদাল পাতা মিশিয়ে ঝোল ক'রে খেলে ও অসুবিধেটা আর হয় না; অবশ্য সব ক্ষেত্রে এটা হয় না।

৯। অর্শে— যে অর্শে রক্ত পড়ে অথবা শুষ্ক ফোলে, রক্ত পড়ে না, সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতার রস ২ চামচ ৩ গ্রাম আন্দাজ কাঁচা হলুদ বাটার সপ্পে মিশিয়ে খেলে ২/১ দিনের মধ্যেই যন্ত্রণাটা ক'মে যায় এবং নিরমিত অভ্যাস ক'রলে কয়েক মাসের মধ্যেই অর্শের বলি মিলিয়ে যায়। তবে প্রয়োজন হ'লে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য পাকা পেয়ারা সিদ্ধ বা আপেল সিদ্ধের সপ্পে ১ চামচ ঈসবগুলের ভূষি মিশিয়ে খাওয়া ভাল। অবশ্য সেটা সম্ভব হলে; নইলে রাতে শয়নকালে শুষ্ক ঐ ভূষি জল দিয়ে খেলেও চলে।

১০। বাদির মল প্রায় শুকনো হ'য়ে থাকে এবং পেটটা কাঁপে, তাঁরা যদি গাঁদাল পাতার রস সকালে সামান্য লবণের সপ্পে মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করেন তবে অচিরেই ঐ দুটো দোষই কমে যাবে।

১১। শুক্লদোষে— তারল্য এসেছে এবং পরিমাণেও কম ক্ষরণ হয়; পরিণতিতে এলো ‘অসমাপিক ক্রিয়া’, সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতার রস ২ চামচ একটু ঘন গরম দুধের সঙ্গে খাওয়ার অভ্যাস করতে উপদেশ দিতেন প্রাচীন বৈদ্যগোষ্ঠী, তবে প্রথমেই ২ চামচ না খেয়ে ১ চামচ থেকে আরম্ভ করাই ভাল।

### CHEMICAL COMPOSITION

- (a) Essential oil (b) Alkaloids. (c) Straight chain fatty alcohol.  
(d) Sterols.



### চণক

কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের বৈদিক আভিজাত্য যতই থাক, সে যদি একখানা জীর্ণবাস পরে পৃথ সম্বল করে থাকে, তাতে বিত্তবান সমাজে তার যতটুকু সমাদর, বর্তমান আভিজাত্য সমাজে ঠিক ততটুকু সমাদর এই চণকের। কারণ তার গুণ যতই থাক, সে তো বড়লোকের ধারেকাছে আসতে পারবে না, আর তার হাতের স্পর্শও পাবে না; তাকে হয় অশ্বশালায়, না হয় বড়জোর খুব সাধারণ মানুষের কাছে আসতে হবে, নিজেদের বাঁচার জন্য তারাই তাকে আদর করবে। তবে তার আভিজাত্য যে ছিল এবং এখনও আছে, তার নজর তো আছে—

সাঁ তুট্‌ যা হৃদয়ং যমায়তি ধেনুরিব।

অবন্তঃ সৃজাতসঃ সুরয় শ্চণকং নিত্যাসৌ বাজিন ইষং আভর।

অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ৮২১/৩।২২

মহাধর—

চণকং উদ্দেশ্যঃ=ত্বং ত্বাং অপহরসি, ধেনুদরিব, হৃদয়ং যথা ধেনুঃ  
হৃদয়স্য ত্বাং অবন্ত=বাজিনঃ নিত্যঃ=শাস্বতাঃ=সর্বকালভাবিনঃ  
অশ্বাঃ, তথা সুরয়ঃ=সুজাতসঃ=শোভনং জাতং জন্ম যেষাং তে  
ইষং অন্নং চ আভর। চণঃ দানে কুন্ ইতি যাক্, শমী ধান্যঃ  
ঋষিগোত্রশ্চ।



এ সম্বন্ধে মহাধরের উক্তি, চণককে উদ্দেশ্য করে—তুমি ত্বা অপহরণ কর, ধেনু যেমন  
হৃদয়ের ত্বা নিবারণ করে, তুমি অশ্বগণের এবং যাদের শোভন জন্ম তাদের অন্নরূপেই  
পোষণ কর। তুমি চণক।

নামকরণের উৎস— চণ ধাতু কুন্ প্রত্যয়ের যোগে চণক, এটি শমীধান্যের একটি।  
যে নিজেকে দান করে সেই চণক। এটি প্রতীকধর্মী নাম করা হ'লো, অর্থাৎ এই ধরনের  
আত্মদানকারী ঋষির নাম যেমন চণক করা হ'লো এবং গোত্রও করা হ'লো এই নামে।

মহাজিয়া লোকব্যাकरणে আর্দ্রক যেমন আদা হ'য়ে গেল, সেই রকম চণকও ঢানা

হ'লো। এই বাংলাদেশে তার নামের ওপর পালিভাষার প্রভাব পড়লো। ছিল তক্ষ (তক্ষ+ষ) এই তক্ষের অর্থ ছাড়িয়ে দেওয়া; সেটি প্রাদেশিক পালি ভাষায় হ'লো ছোল্ল; সেইটাই আবার অপভ্রংশ হয়ে হ'লো ছাল। তাই সেই তক্ষ বা ছাড়ানো শব্দটি ছোল্ল বা ছাল, তা থেকে নামের জন্ম হ'লো ছোলা।

এই চণকই প্রাচীন-প্রধান বলে তাই হ'য়েছে ছোল্ল বা ছোলা, এটি শমীধান্য; যদিও সব শমীধান্যকেই ছোল্ল বলা অসঙ্গত নয়, তবুও সূত্রপ্রাচীনকালে গুরুগোৎকর্ষের জন্য এই চণকই ছোল্ল ওরফে ছোলা হয়ে আছে।

### স্বিতীয় পর্ব (সংহিতার যুগ)

বেদোক্ত শমী নামকরণের গূঢ়ার্থ নিয়ে পূর্বোক্ত আঢ়কী (অড়হরের) নিবন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে, তবুও এখানে বলে রাখি, শমীধান্য বিশেষণের ইঙ্গিতই হ'লো, 'যে তাপজনক এবং পৃষ্টিকর খাদ্য'।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে এই চণকের দোষগুণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে, সেখানে বলা আছে এটি লঘু ও শীতলগুণে বিশিষ্ট, রসে অল্প কষায়, সে তেজ ও বায়ুগুণে সমৃদ্ধ, কারণ তার জন্মলগ্ন হেমন্তকাল, আর তার জন্মের মৌল উপাদানে বায়ুর প্রাধান্য থাকায় তার স্বভাবটা একটু রুদ্ধ। এটি সামগ্রিকভাবে পিত্তবিকার ও শ্লেষ্মাবিকারজনিত যে সব রোগ সৃষ্টি হয়, সেসকলে এই চণকের কি ঔষধ হিসেবে আর কি পথ্য হিসেবে এর উপযোগিতা আছে।

স্বিতীয় প্রশ্ন—চণকের সম্পর্কে বৈদিক-স্মৃতির অন্তর রহস্য চরক সংহিতায় কোথায় কি ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে? এর উত্তরে দেখা যায়, বৈদিক স্মৃতিতে আছে—'তুমি তৃক্ষা দ্রু কর।'।

সা তৃট্ যা হৃদয়ং যম্মরতি,

অতএব এই তৃট্ বা তৃক্ষাটি সাধারণ তৃক্ষা নয়, নিশ্চয়ই কোন ব্যাধি। তাই চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ২৪ অধ্যায়টিতে তৃক্ষা রোগ সম্পর্কে এবং ওই স্থানেই চণকের যুগের ব্যবহার।

তৃক্ষা রোগের প্রাধান্য যে স্বতন্ত্র ধরনের, সেটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেই চণকের ব্যবহার।

এই তৃক্ষা রোগের বিজ্ঞানটি হ'লো ওটি রসবহ স্রোতকে বিকৃত করে ব'লে।

সে সময় এমন অন্নপানীয় দরকার, যার দ্বারা অগ্নি অন্তর্মুখী হ'য়ে আমাশয়স্থ অগ্নিকে যেন দীপ্ত ক'রে; যার দ্বারা এই দোষটা ও তার উপসর্গ দূরীভূত হয়।

### পরিচিতি

বয়র্জীবী গাছ, ছোট ক্ষুদ্র জাতীয় ওষধি। বহু ক্ষুদ্র অখচ নরম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, পত্র পক্ষাকার ও সোজা ১/১ ই ইঞ্চি লম্বা দাঁতযুক্ত, পদ্পদন্ত ই—৪ ইঞ্চি, শব্দটি ছোট ও বেঁটে, লম্বা ৪—১ ইঞ্চি, প্রত্যেক শব্দটিতে সাধারণতঃ একটি বীজ থাকে। কখনও কখনও দুটিও দেখা যায়, মার্চ মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

এটির বোটানিক্যাল নাম *Cicer arietinum* Linn. ফ্যামিলি Leguminosae.

## রোগ প্রতিকারে

(১) রত্নপিণ্ডে— এর ভয়ঙ্কর রূপ দেখা দিলেও শুধু ছোলার (খোসা সহ সিম্ধ) যুষ বার বার প্রয়োগ করলে সেটা উপশমিত হয়। পরিমাণ হ'লো ছোলা ২৫ গ্রাম পূর্বদিন রাতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন তাকে অন্তত ৩/৪ কাপ জলে সিম্ধ করতে হবে; ওগুলাি বেশ সিম্ধ হয়ে ফেটে গেলে সেটা ছেঁকে, সেই জলটা সমস্তদিনে ৩/৪ বারে খেতে হবে।

(২) দাহ রোগে— ছোলা ভিজানো জল খাওয়া অভ্যাস করলে সেটা সেরে যাবে।

(৩) মেহ রোগে— প্রস্রাব করার সময় জ্বালা করে; অথবা পু'জের মত প্রাব হয়, এবং তার সঙ্গে জ্বালাও থাকে, তাঁরা নিত্য ছোলা ভিজানো জল খাবেন, অথবা ছোলা সিম্ধ করে তার যুষও খেতে পারেন। এর দ্বারা উপশম হবে, (অবশ্য শ্লেষ্মার বিকার থাকলে নয়)।

(৪) গায়ের রং— পেটের দোষে যাদের গায়ের রং নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ছোলা ভিজানো জল অথবা ছোলা সিম্ধ যুষ খেয়ে দেখুন।

(৫) জ্বর হ'লে— সিম্ধ ছোলার ডালের উপরকার পাতলা জল বিশেষ উপকারী। যদি অগ্নিমাল্দের জন্য অতিসার (পেটের দোষ) না থাকে।

(৬) কৃশতায়— যাদের শরীর শিশুকাল থেকেই কৃশ, তাঁরা রোজ বাসি জলে ১০-১২ গ্রাম ছোলা ভিজিয়ে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা রেখে, ওটা ছেঁকে সেই জলটা সকালের দিকে খাবেন, এর দ্বারা কৃশতা কমে যাবে।

(৭) বলহানি হ'তে থাকলে— যাদের শরীরের বল আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, তাঁরা ছোলার ছাড়ু অল্প অল্প করে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

(৮) মাড়ী ফুলোয়— যাদের দাঁতের গোড়া মাঝে মাঝে ফুলে যায়, তাঁরা ছোলা সিম্ধ যুষ দিয়ে কুলকুচি করে দেখবেন, ওটা কমে যাবে, তবে কারণটা যদি উর্ধ্ব শ্লেষ্মাজনিত হয় তা হ'লে তাঁর উচিত বাসক পাতার রস ৪।৫ চামচ একটু গরম করে প্রত্যহ সকালে খাওয়া।

(৯) শ্বাসে— রোগের প্রথমাবস্থায় সকাল বা সম্ম্যার দিকে একটু বদকে চাপ বোধ হ'তে থাকে, সেক্ষেত্রে খোসা সমেত ছোলা অন্ততঃ ১০ গ্রাম সিম্ধ করে সেই জল অন্ততঃ এক কাপ করে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

(১০) রূপ ও মেচেতায়— ছোলা ভিজিয়ে তাকে বেটে সেটা মুখে মেখে দেখুন, ওটা কমে যাবে।

(১১) অজীর্ণ রোগে— প্রায়ই চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, দাস্ত ভাল পরিষ্কার হয় না, মাঝে মাঝে বদকও জ্বালা করে, তাঁরা ৪।৫ গ্রাম ছোলা শাক ভাল করে বেটে, আধ গ্রাম আম্লাদ্রু বিট বলণ মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন বিহার অঞ্চলের গ্রাম্য বৈদ্যরা।

(১২) শূল ব্যাধায়— অজীর্ণ রোগের সঙ্গে যদি শূল ব্যাধাও থাকে, তা হ'লেও শাক বাটা ও বিট লবণ মিশিয়ে খেলেও কাজ হবে।

(১৩) চণকাম্বে— প্রাচীন বৈদ্যরা অতি প্রত্যাষে (ভোর বেলায়) ছোলা ক্ষেতে গিয়ে একখানা পাতলা কাপড়কে গাছের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতেন, শিশিরে ভিজে যাওয়া কাপড়খানা নিংড়ে তার জলটা সংগ্রহ করতেন, তারপর তাকে জ্বাল দিয়ে একটি দ্রব্য তৈরী করতেন, এটি খেতে অম্লাস্বাদ হয়—একেই বলা হয় 'চণকাম্ব'। অজীর্ণরোগে পাতলা দাস্ত হ'তে থাকলে দ্রব্যান্তরের সহিত মিশিয়ে ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল।

**ভিটামিন সাবান—** ছোলা বা মটর ডালের বেসন জলে গুলে সাবানের মত গায়ে মাখার রেওয়াজ ছিল; এর দ্বারা ত্বক-লাবণ্য রক্ষা হয়, আর গায়ের ময়লাও কাটে; এখনও বহু প্রদেশে কোন কোন প্রাচীন বাসিন্দা যারা, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত।

**সস্তায় কিস্তি—** বয়স হয়েছে, সকালে দাস্ত অপরিষ্কারে অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, রাতে ঘেটাই খাওয়া থাক না কেন, কোনটাতেই এসব অসুবিধে যায় না, সেক্ষেত্রে ছোলার বেসন গুলে ওম্‌লেটের মত তৈরী করে রাগির ভোজন সমাপন করুন, তবে মুখরোচক ও গুণোৎকর্ষ করার জন্য দুটো ঘোয়ান ও পরিমাণ মত একটু বিট লবণ মিশিয়ে ওট তৈরী করবেন; কিন্তু তরকারী বেশী খাবেন না।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Acids viz., oxalic acid, malic acid, acetic acid and other acids.
- (b) Amino acids viz., arginine, tyrosine, lycine, cystine, tryptophane.
- (c) Carotenoids. (d) Oil soluble vitamin viz., vitamins A, D and E.
- (e) Other constituents viz., lecithin, phytin, saponin, biochanin A, biochanin B and biochanin C.



## আড়কী

বাংলায় একটা কথা মূখে মূখে ফেরে 'ভুড়ু ও টামাক' (দুধ ও তামাক), যদিও কথাটা একটা নাটকের উদ্ভৃতি, সে পরিবেশটার মর্মকথা দুটো পৃথক বয়সের পানীয় দ্রব্যের সুবিধে ভোগ করার তুলনামূলক ডায়ালগ্। আলোচ্য আড়কী বা অড়হর—আহাৰ্হ

হিসেবে তার যেমন উপযোগিতা, তেমনি ভেষজগুণও তার কম নয়। সেইটাই প্রতিপন্ন ক'রতে সংহিতাকারগণ উল্টোপথে বিচার ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন; তা হ'লেও প্রারম্ভিক সূত্রটা প্রথমে বলি—

অভ্যাবন্তন আঢ়কী স্বা প্রজয়া ধনেন

সন্যা মেধয়া রথ্যা পোষণে বচসা হৃদয়ং রেরিহং হীমিম্ধো।

অথর্ববেদ ৫৩২।২।৩৯



মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

আঢ়কীমৃদুপক্ৰম্য, আঢ়কী ইতি আঢ়কী ধান্যশমী, স্বং প্রজয়া ধনেন  
 আয়ুর্ধা=জীবনেন সন্যা=ইষ্টলাভেন, মেধয়া=ধারণবত্যা পোষণে  
 =পুষ্টিয়া হৃদয়ং অপি রেরিহং=আক্রামসি, হি যস্মাৎ ইম্ধাঃ=দীপ্তশচ  
 অগ্নিঃ বচসা=পুষ্টিাদিকয়া অপি।

এই সূত্রটির অর্থ হ'লো—ভূমি ধন, আয়ু বা জীবন এবং ইষ্টলাভের ম্যারা এবং পুষ্টির



স্বারা আমাদের কাছে এসো, তুমি হৃদয়কে আক্রমণ কর, অগ্নিকে দীপ্ত কর, এবং পুত্রাদির স্বারা দীপ্ত কর।

### সংহিতার যুগে—

এই আদি সূক্তগুলির ইঙ্গিতকে উপজীব্য করেই তো দ্রব্যটির আহাৰ্য বা ভেষজগুণ কার কতটা তারই অনুশীলন। সেটা তো অনুশীলিত হ'য়েছে দ্রব্যের মৌল পদার্থকে সামনে রেখে। তাঁরাই ব'লেছেন—এই আড়কী একসঙ্গে আহাৰ্য, পথ্য ও ভেষজ; এটা চরক সংহিতায় সমিবেশিত। সেটা চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে অড়হর বা আড়কীকে আহাৰ্যের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করা হ'য়েছে।

সেখানে বলা হ'য়েছে—

‘আড়কী কফপিত্তঘনী বাতলা কফবাতনদুঃ’,

অর্থাৎ অড়হর কফপিত্ত নষ্ট করে এবং বায়ুকারক।

অথর্ববেদের বৈদ্যকল্পে একে ‘শমীধান্য’ ব'লেই চিহ্নিত করা হ'য়েছে; বৈদিক অভিধানে ধান্য শব্দের অর্থ—‘যে পোষণ করে’, আর শমী শব্দের অর্থ যার মধ্যে অগ্নির ক্রিয়াকারিত্ব শক্তি বর্তমান। এই যেমন গরম জল, তার মধ্যে আগুন না থাকলেও আগুনের ক্রিয়াকারিত্ব বর্তমান; সেই রকমই।

### মতবাদে মিশ্র

সংহিতার মতে এটি পিত্তঘ্নী অর্থাৎ পিত্তনাশক, আবার বৈদিক সমীক্ষায় অড়হর যখন শমীধান্য বলে আখ্যায়িত ও বিশেষিত হ'লো, বৈদিক থেকে তার প্রকৃতি অগ্নি-ধর্মী (বৈদিক অভিধানের মতে), দৈহিক অগ্নির বাহ্যরূপই তো দৈহিক পিত্ত, অথচ এই অড়হর পিত্তকারক না হ'য়ে পিত্তনাশক; তা হ'লে এই দ্রব্যটি কি আমাদের খাতুগত অগ্নিকে বাড়িয়ে দেয়? যাকে বলা যায় মেটাবলিজম্ (Metabolism) বৃদ্ধি করা? সেইটাই কি এখানকার বস্তুবিষয়?

অপরপক্ষে বৈদিকসূক্তেও অড়হরকে পোষক, অগ্নিদীপ্তকর, মেধাকর ব'লে উল্লেখ দেখা যায়। রোগ প্রতিকারে চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ১৫ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে অপস্মার রোগে ব্যবহার এবং বোনি রোগের চিকিৎসায় (৩০ অধ্যায় ১৫ শ্লোক) তার ব্যবহার; এ ভিন্ন পরবর্তী গ্রন্থে আরও বহুক্ষেত্রে তার যে উপযোগিতা আছে সেটি সমীক্ষিত হ'য়েছে।

### পরিচিতি

গড়মজাতীয় শাখাপ্রশাখায়ুক্ত উদ্ভিদ, ৪ থেকে ৮।১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়। গাছগুলিতে কান্ডগর্ভ হলেও ডালগুলি নরম, সাধারণতঃ একটি বৃন্তের তিনটি শাখাবৃন্তে এক একটি ক'রে পাতা, লম্বা ২-৩ ইঞ্চি, চওড়া আধ ইঞ্চিরও বেশী, সবুজ পাতার উল্টোপাঠ অপেক্ষাকৃত সাদা, ফল হলদে, ফল আকারে ছোট কড়াইশৃঙ্গটির মত, কিন্তু একটু চ্যাপ্টা হয়, প্রত্যেক শৃঙ্গটিতে ৩-৫টি বীজ থাকে।

এই অড়হর গাছ ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে জন্মে; কিন্তু উত্তর প্রদেশে ও বিহারে ব্যাপক চাষ হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে ফল ও শীতকালে অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয়। হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে একে বলে অড়হর; আহাৰ্য হিসেবে ডাল ব্যবহার হয়। অপেক্ষাকৃত লাল রংয়ের একটা ডাল (ডাইল) পাওয়া যায়, কোন কোন গ্রন্থে বলা হ'য়েছে, সেইটাই একটু বেশী পুষ্টিকারক এবং বাতকারক দোষও নেই। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Cajanus indicus spreng.* ফ্যামিলি Leguminosae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—পাতা, মূল ও বীজ।

### লোকায়ত্তিক ব্যবহার

১। কাসিতে (পিত্তশ্লেষ্মাজনিত) অড়হর পাতার রস ৭/৮ চামচ একটু গরম ক'রে ১ চামচের মত মধু মিশিয়ে খেলে কাসিটা ক'মে যায়।

২। কামলা রোগে (জন্ডিসে) এই রোগের প্রথমাবস্থায় পাতার রস ৮/৪ চামচ, একটু গরম ক'রে খেতে হবে।

৩। অশ্মরোগে পাতার রস ২ চামচ একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দুই-বার খেতে হবে, এর দ্বারা অশ্মের যন্ত্রণা ক'মে যায়। তবে এর সঙ্গে অড়হর ডালের যুগ্ম একটু ঘি-এ সাঁতলে খাওয়া খুব ভাল, এটাতে দান্ত পরিষ্কারও থাকবে।

৪। দাছে যাঁদের হাত-পায়ে জ্বালা বোধ হয়, তাঁরা এই পাতার রস হাতে মাখবেন, তার ঘণ্টাখানেক বাদে ধুয়ে ফেলবেন, তবে এর সঙ্গে পিত্তনাশক কিছু খাওয়া উচিত।

৫। মধুমেহ রোগে (ডায়াবেটিসে) এই পাতার রস একটু গরম ক'রে খাবেন, তবে এর মূলের ছালের রস (একটু জল দিয়ে করতে হয়) অথবা মূল ৮/১০ গ্রাম ঝেঁতো ক'রে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে খেলে বেশী উপকার হয়, খাঁটি মধু হলে এক/আধ চামচ দেওয়াও চলে। এটি ব্যবহারের কালে আহাৰ্যের সঙ্গে ডালের যুগ্ম খাওয়া উচিত।

৬। রক্তপিত্তে পাতার রস ২/৩ চামচ একটু গরম ক'রে ১৫।২০ ফোঁটা মধু মিশিয়ে অথবা শুদ্ধ রস গরম ক'রে দু'বেলা খেতে হবে। এর সঙ্গে অড়হর ডালের যুগ্ম (সারাংশ বাদ) খেলে ভাল হয়। যদি পেটের অবস্থা ভাল না থাকে ডাল খাওয়া চলবে না।

৭। অরুচিতে অরুচি যতই পুরানো হোক না কেন, এই ডালের যুগ্ম অল্প আদা মরিচ বাটা দিয়ে সাঁতলে তার সঙ্গে পরিমাণ মত লবণ মিশিয়ে বারে বারে একটু একটু ক'রে খেতে হবে। যুগ্ম এক/দেড় কাপ সমস্ত দিনে খেলেই চলবে। ৫০ গ্রাম আন্দাজ ডালের যুগ্ম করতে হবে।

৮। জিহ্বার ক্ষতে কয়েকটি কচিপাতা (সম্ভব হ'লে) ডাল ক'রে ধুয়ে অল্প ঝেঁতো ক'রে নিয়ে, সেটা আস্তে আস্তে চিবোতে হবে। এই সময় একটু জালা করে; তবে ২।৩ দিন এইভাবে করলে পারলে ওটা সেয়ে যায়। আর একটা কথা, চিবিয়ে পাতার ছিবড়ে ফেলে দেওয়ার পর আর মুখ ধুতে নেই।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Two globulins viz., cajanin and concajanin. (b) Sterols viz., gamasitosterol, betasitosterol.



## তর্বাদক

এমন তথ্য অনেক আছে যেগুলিকে আমরা নতুন তথ্য উদ্ভাবন ক'রেছি ব'লে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি; অননুসন্ধান ক'রলে দেখা যাবে সেই সব উদ্ভাবনের অন্তর্নিহিত সমীক্ষাই সেই বৈদিক যুগে সমীক্ষিত হ'য়েছে। সেই রকম একটা নিজের সৃষ্টির উদাহরণ এই উল্লেখিত বস্তুটিকে কেন্দ্র ক'রে।

আর একটা কথা, সব যুগেই রাজতন্ত্রের ছাপ পাওয়া যায়, তবে তার রকমফের আছে। প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে শত্রুকে জব্দ করার জন্য একটা দ্রব্য ব্যবহার করা হ'তো, তার প্রমাণ আছে শত্ৰুনাতিসারে—

“গর্ভাশ্র পত্নং ত্রিপদুটেভ্যো নীত্বা  
আমিষ্ক গর্ভে গুড়-সারষণ।  
অমিষ্টভোজ্যে বিনিষোজয়েৎ চেৎ  
মিথেন গদুপ্তং চ পদাদ-কৃত্যে॥”

এই শ্লোকটির অর্থ হ'চ্ছে—যদি রাজা মনে করেন অম্লক ব্যক্তি আমার শত্রু, তা হ'লে সেই শত্রুর বন্ধুকে হাত ক'রে, তার হাত দিয়ে শত্রুর খাদ্যে ছানার সঙ্গে গুড় বা মধু দিয়ে তার সঙ্গে ত্রিপদুট কলাই-এর গর্ভপত্র কিছুদিন খাওয়ালে নিশ্চয়ই সে পণ্ড হ'য়ে যাবে। এই ত্রিপদুট কলাই-এর প্রচলিত নাম তেউড়ি বা থেসারি। দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনবোধে সে যুগেও Slow poison করার রীতি ও পদ্ধতি তাঁরা অধিগত ক'রেছিলেন। এই গদুপ্তের উৎস কিন্তু অথর্ববেদ ২৯।৫।৪ সূক্তে পাওয়া যায়।

“অগ্ন্যান্যাত্না ভিষজা তদাশ্বিনাত্নান মণৈঃ সমধাত্ তব্বাদ'গৰ্ভম্ ।  
ইন্দ্রস্য রূপং শতমানমায়ুর্বলায় কণাভ্যাং শ্রোত্রং গ্রহাভ্যাম্ ॥”



এই সূক্তটির মহাধর ভাষ্য করেছেন—

যজ্ঞপ্রস্তোতৃগাং; ভিষজা অশ্বিন ইতি=অশ্বিনৌ যদ্বাং পশ্যাত  
আত্নান্ আত্নানি অগ্নানি অবয়বান্ সমধাত্ তব্বাদ'গৰ্ভম্=তব্বাদ'স্য  
গৰ্ভপত্ৰং তব্বেতি তব্বঃ=গতিঃ, অদঃ=পীড়নং গৰ্ভে=গৰ্ভপত্রে  
যস্য তৎ ত্রিপটী বা কলায়ঃ, তৈ মং ভক্তানাং স্তত্বীকৃতানাম্  
অগ্নানাং। যদ্বাং অস্মাকং অবয়বানাং তানি সমধাত্ সমধাতাং  
সমযোজয়তাং। যথা ইন্দ্রস্য শতনাম্না প্রাণিনাং আয়ুর্বলায় গ্রহাভ্যাং  
কণাভ্যাং শ্রোত্রমিতি লভেমঃ পদ্যাং লভেমঃ সন্নিধিং গচ্ছামঃ।

এটি যজ্ঞপ্রস্তোতাদের প্রার্থনা সূক্তি—তাঁরা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগলের নিকট  
প্রার্থনা করেছেন—ওহে অশ্বিনীকুমার যুগল! আমরা যজ্ঞকার্যে গমন করতে পারছি

না; “তর্বাদগর্ভ” ভক্ষণ করোঁছ; (তর্ব=গতি তাকে যে পীড়িত করে, তার অপর নাম তুবরী বা ত্রিপদট কলায়) আমাদের পাদ সমূহের গতিতে পীড়া সৃষ্টি করেছে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ু, দেহের বল, রূপ ও কর্ণের বল যোজনা করে দাও, যেমন করে শতনামা ইন্দ্রের করেছে, আর সমস্ত প্রাণীর কাছে আমরা যাতে যেতে পারি ও তাদের পূজা লাভ করতে পারি।

উপরিউক্ত অথর্ববেদিক সূত্র ও তার ভাষ্যের দ্বারা বাস্তব সত্যকে রূপ দেওয়া হয়েছে কোন না কোন ঘটনার মাধ্যমে।

### ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টি

প্রতিটি প্রাণীর দেহের মধ্যে আত্মা ও মনের (ত্রিদণ্ডধারী জীবিতং, ১ অধ্যায়, চরক) যেটি যোজক তাই আয়ু; এটিকে আবার হিতায়ু ও অহিতায়ু আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেখানে কোন বিচ্ছেদক দ্রব্য আত্মা, মন ও দেহকে পীড়িত করে সেইটাই অহিতায়ু, আর যখন সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে সেইটাই হিতায়ু।

আলোচ্য দ্রব্যটির সবটাই যে অহিতকর সেটা বক্তব্য নয়; তার গর্ভপত্রটিই কোন না কোন অঙ্গের ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিচ্ছেদক।

এখানে সমষ্টিগত ভাবে দেহের আয়ুকে হ্রাস করা হ'লো না বটে, কিন্তু তার অঙ্গের বা প্রত্যঙ্গের পঞ্জায় ঘটলো; একেই আয়ুর্বেদের ভাষায় খণ্ডায়ু বলা চলে। এই সব ক্ষেত্রে রসপ্রধান আহাৰ্য এবং বীৰ্যপ্রধান ভৈষজ্য শক্তিই স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে পারে। অথর্ববেদের সেই হৃদমহা বলিষ্ঠ ইগিগতিটি বর্তমানের বৈজ্ঞানিকগণকে নিশ্চয়ই আশ্চর্য করবে।

আর একটা কথা—এক্ষেত্রে চরকের সমীক্ষাটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সেখানে এই কলায়ের একটি নামকরণ করা হয়েছে ‘খণ্ডীক’; সেটা চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে লেখা হয়েছে।

এই নামকরণের তাৎপর্য হ'লো—যেহেতু সে আয়ুকে খণ্ডিত করে। এই নামটির সমর্থন একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘খণ্ডকঃ ত্রিপদট কলায়ঃ’, যার প্রচলিত লৌকিক নাম খেসারি।

এটি বিকৃত পিত্ত-শ্লেষ্মাকে স্বাভাবিক করে সতি, কিন্তু বায়ুবর্ধক হ'য়ে তারই পরিণতিতে ঘটায় দশটি ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির পঞ্জাদ্রব্যতা, কার্যতঃ দেখা যায় নিম্নাঙ্গের উপরেই এর প্রভাব সর্বাধিক।

এই দ্রব্যটির দোষগুণ বিচার হারীত সংহিতায় ও ভাবপ্রকাশে করা হয়েছে; তাঁদের বক্তব্যের সূত্র একই। তবে গর্ভপত্রের গরই (বিষ) যে নিম্নাঙ্গের স্নায়ুগুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করায় এ তথ্য কেবল অথর্ববেদেই বলা হয়েছে।

এই গর শব্দের অর্থ ‘যা কিছু বিচ্ছেদ ঘটায়’, এখন দেখা যাচ্ছে যতগুলি অহিত আহাৰ্য আছে তাদের মধ্যে ত্রিপদটি কলায় একটি।

এখন প্রশ্ন হ'লো—এই ত্রিপদটি কলাই—এর গুণগত বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে তা হ'লে ‘তংসামো সাম্য মায়াতি’, অর্থাৎ সমান দোষ, সমান গুণই সমানের হ্রাসবৃদ্ধি করে। খেসারির ডালের নিশ্চয় ভৈষজ্যগুণও আছে, না থাকলে সে বায়ুরই বর্ধক হয় আর পিত্ত-শ্লেষ্মার উপকারক হয় কি করে? তাই বৈদ্যগণের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশেষ জ্ঞানগুলি এখানে লেখা হ'লো।

## লৌকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই ব'লে রাখি এর গর্ভপত্রটিই খঞ্জতাকারক, এইটি থেকে সর্বদা সাবধান হওয়া দরকার; বাংলা, বিহার বিশেষতঃ উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে খেঁসারির বহু চাষ হয় এবং আহার্য ডাল হিসেবে বৎসরের পর বৎসর তাঁরা ব্যবহার করে আসছেন কিন্তু তাঁরা এর দ্বারা কোন কুফল পাননি—সেটা কেন? তার কারণ হচ্ছে, তাঁরা এই ডালটিকে প্রথমে বালির সঙ্গে ভেজে নিয়ে যাঁতায় ভেঙ্গে খোসাটা ঝেড়ে বের করে দিয়ে থাকেন; এর দ্বারা ঐ গর্ভপত্রের দোষ অংশটা বালির উত্তাপে নষ্ট হ'য়ে যায়। তারপর ব্যবহার করা হয় ব'লেই ঐ দোষমুক্ত হয়। আর বাজারে যেগুনি বিক্রি হয় সেগুনি ভাজা নয়, সুতরাং ঔষধার্থে ব্যবহার করতে গেলে তাকে ভাল করে ঝেড়ে, বেছে, ফুটন্ত গরমজলে ধুয়ে নিয়ে, শুকিয়ে রাখতে হবে। খেঁসারির ব্যবহার যেখানে বলা হ'চ্ছে সর্বক্ষেত্রেই এইভাবে সংস্কৃত ডালকে ব্যবহার করতে হবে।

## রোগ প্রতিকারে

১। কাশ্যরোগে (রিংকেট)— আধ তোলা বা এক তোলা শোধিত খেঁসারির ডাল আধ সের জলে সিদ্ধ করে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে, থিতিয়ে গেলে উপরকার জলীয়াংশ খেতে দিতে হবে; একদিন অন্তর কিছুদিন খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভাল হবে।

২। হাড়ের ও গাঁটের ব্যাথা— ফুলো নেই অথচ গাঁটে ব্যাথা, সেক্ষেত্রে ঐ শোধিত ডাল অল্প কুটে নিয়ে (অর্ধ কুট্রিত করে) ডালের মাত্রার আট গুণ উৎকৃষ্ট মদে ভিজিয়ে রাখতে হবে, এক সপ্তাহ বাদে ছেকে নিয়ে, ঐ মদ ২ চামচ করে আধ কাপ দুধের সঙ্গে কিছুদিন খেলে ঐ ব্যাথা চ'লে যায়।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য— যাঁদের এ অসুবিধেটা আছে তাঁরা খেঁসারির ডালের জলে অল্প লবণ দিয়ে কয়েক দিন রাতে খাওয়ার অভ্যাস করুন, পরের দিন দান্ত পরিষ্কার হবে। এইজন্য দেশগায়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত—“স্বর্গে ছিল খেঁসারি, তোকে মর্তে আনলে কে। তোর পায়ে পড়ি খেঁসারি, তুই কাছা খুলতে দে॥”

৪। জানায় ভুলে— যাঁরা মাঝে মাঝে ভুল হওয়ার জন্য অসুবিধেয় পড়ে যাচ্ছেন তাঁরা ১ কাপ গরম জলে ৩/৪ গ্রাম খেঁসারির ডাল ভিজিয়ে ঐ জলটা খাবেন। কিছুদিন খেলে এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৫। বমনোচ্ছাস— বিশেষভাবে শরৎ কাল আর বসন্ত কালে যাঁরা সর্বদা বমি বমি ভাব ভোগ করেন, অথবা বমিও করেন, তারা খেঁসারির ডাল ৩/৪ গ্রাম মাত্রায় গরমজলে ভিজিয়ে রেখে পরে ঠান্ডা হ'লে সেই জল সকালে অথবা বৈকালের দিকে খাবেন। এর দ্বারা ঐ বমনভাবটা চ'লে যাবে।

৬। অরুচিতে— অনেক কারণেই অরুচি হয়, এটা যদি পিত্তশূলোন্মার প্রাবল্যে হ'য়ে থাকে তা হ'লে ঐ ৩/৪ গ্রাম খেঁসারি গরমজলে ভিজিয়ে খেলে ঐ অরুচিটা সেরে যাবে, অনেক সময় এর সঙ্গে ত্রিমির উপদ্রবও দেখা যায়, এটাতে সেটাও চ'লে যায়।

৭। মাচী হাজায়— বর্ষাকালে অনেকের দাঁতের মাচী হেজে যায় বা হাজা ভাব হয়, এমন কি কিছুদিন বাদে তা থেকে রক্তও পড়ে; এক্ষেত্রে ৭/৮ গ্রাম খেঁসারির ডাল গরমজলে ভিজিয়ে রেখে, কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ জলে কুলকুচি করলে অথবা মৃৎ পট্রে খানিকক্ষণ রেখে (যাকে বলে কবল ধারণ করা) ফেলে দিলে ওটার উপশম হয়।

৮। হাজার— যাঁরা জল বেশী ঘাঁটেন তাঁদেরই বেশী হ'তে দেখা যায়, আর বর্ষাকালে দেশগায়েও হয়; সেক্ষেত্রে খেঁসারির ডাল বেটে গরম ক'রে লাগালে ক'মে যাবে এবং সেয়েও যায়; তবে রোগের কারণটা যদি বন্ধ করা না যায় তা হ'লে আবার হবে।

৯। গেঁটে বাতে— খেঁসারির পাতা, যাকে খেঁসারি বা তেউড়ি শাক বলে, বেটে গরম ক'রে গেঁটে বাতে প্রলেপ দিলে বাতের ব্যথা কমে যায়।

১০। নখকুর্নিতে— খেঁসারির কচি দানা বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ওর যন্ত্রণা কমে যাবে। আরও ভাল কাজ হয় যদি ওর সঙ্গে একটু জনকপদুরী খয়ের মিশিয়ে দেওয়া যায়।

### ঢোল সহরণ

গত ১৮২৯।৩০ খৃষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে বরা, খরা ও ঝড়ে ৩ বৎসর যাবৎ প্রধান খাদ্য যব, গম ও ধানের চাষ নষ্ট হ'য়ে যায়, আসে দুর্ভিক্ষ, সেখানকার সাধারণ মানুষকে ডাল কলাই সিদ্ধ ক'রে খেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকতে হ'য়েছিলো, কিছুদিন বাদে দেখা গেল ঐ অঞ্চলের বহু লোকের নিম্নাঙ্গ বিকল হ'য়ে যাচ্ছে, চলতে পারছে না, ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়লো; অনুসন্ধানও চললো, শোনা গেল অধিকাংশ দিনই ঐ অঞ্চলের এই সব লোককে খেঁসারির ডাল খেয়ে জীবন ধারণ ক'রতে হ'য়েছে; পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্থিরীকৃত হ'লো, খেঁসারির ডালই এই বিকলাঙ্গ রোগের উৎস, যত লোক এ রোগে আক্রান্ত হ'য়েছিলো তার মধ্যে আবার বেশীর ভাগই পুরুষ। এই অশ্রুত বাস্তব ঘটনাটি স্বল্পসংখ্যক মনীষীদের গ্রন্থে খেঁসারির পুষ্টিগুণ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে— এই নিশ্চয়্যাক ইঙ্গিত থাকলেও স্মরণাতীত কাল থেকে জনসাধারণের স্মৃতিতে তা অবলুপ্ত ছিল, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকজনিত দুর্ভিক্ষের তাড়নায় খেঁসারি ভোজনের কুফলটিকে ইংরাজ জাতি তাঁদের investigation -এর ফল বলে অস্ত্র ভারতবাসীকে চর্মকিত করলেন।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Starchy materials. (b) Salt of phytic acid. (c) Betaoxalylamino alanine. (d) Beta-N-oxalylalphanbetadiaminopropionic acid. (e) Glucose.



## দাড়িম্ব

ভারতে আৰ্য সমাগমের সময় বিভিন্ন শাখায় কারা কোন্ পথে এসেছিলেন, এবং কোন্ দিক থেকে নেমেছিলেন এ সবার নিদর্শন বেদের বহু সূক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে, আবার কোন্ ধাতু, কোন্ ফল এবং কোন্ ধরণের পোষাক-আষাক তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং পরে ইন্দ্রাদি দেবতার কাছে আবার চেয়েছেন, সেগুলির ইঙ্গিতও বেদের সূক্তির মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। এই দাড়িম্ব ফলের উল্লেখ দেখে মনে করা হয়, এ সব সূক্তি তুরস্ক, ইরাক, ইরান, মিশর ও আফগানিস্থানের পথে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন একে তাঁরা করক বলতেন। এ সম্পর্কে অথর্ববেদের বৈদ্যককণ্ঠে ৭৭২।১১।৯৭ সূক্তে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—

ইচ্ছন্তি স্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ সন্বলন্তি সোমং দধতি পয়াংসি।  
তিতিক্ষন্তে অভিশন্তি জনানাং করকন্তদা কশচন হি প্রকতেঃ ॥

এই সূক্তটির মহাধর ভাষ্য করেছেন—

করকং স্তোতি, করকোহি দাড়িম্বঃ। করঃ=উপলঃ তম্বং, কৃ+বৃন্।  
দাড়িম্বোতি দাড়ঃ=বিদীর্ণে, দড়্+ঘঙ্। স্বংতঃ সকাশাং প্রকতেঃ,  
প্রকৃষ্টেঃ কেতঃ মেধা যত্র পয়াংসি রসাঃ সোমং দধতি রস-  
ধাতুং স্নিহ্যতি। সন্বলন্তি সখায়ঃ মনুষ্যানাং সখিভ্বং কিম্ভূতাস্তে  
সোম্যাসঃ=সোম সম্পাদিনঃ তিতিক্ষন্তে, জনানাং অভিশন্তিঃ  
বাক্ রোহন্তি চ সহন্তে চ ॥



উপরিউক্ত এই ভাষ্যটির অনুবাদে উপলব্ধি হয় করকের স্তূতি সত্ত্বি এটি; করক অর্থাৎ দাড়িম্ব। কর শব্দের অর্থ উপল অর্থাৎ পাথরের টুকরো। আর দাড়িম্ব শব্দের অর্থ যা বিদীর্ণ হ'লে আত্মপ্রকাশ করে। তার নিকট থেকে মেধা সঞ্চিত করা যায়।



তার রস সোমধাতুকে স্নিগ্ধ করে। মনুষ্যাগণের সখা হয়, কারণ মনুষ্যাগণের বাক্ রোহণ করে, অর্থাৎ বাক্শক্তির বর্ধন করে, দেহের তিতিক্ষা বর্ধন করে। অর্থাৎ সহন

শক্তিকে বর্ধন করে।

এই বৈদিক সূক্তটির মহীধর ভাষ্যে পাওয়া গেল, এটি মেধাকারক এবং সোমধাতুকে স্নিগ্ধ করে; এবং বাক্ স্ফূরণের সহায়ক হয়। সহন শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এ ভিন্ন অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৬৬৯।১১।২৯ সূক্তের এই দালিমকে পাওয়া যাচ্ছে; এখনও সেটা দালিম নামেই পরিচিত। এগুনি টক্টকে লাল, রসে ভরা দানা, বীজও বেশ দাঁতে লাগে। আর একটা নাম দেখি তার বেদানা, এর দানা থাকলেও নাম মাত্র, তাই কি এদের নাম বে-দানা অর্থাৎ দানাহীন? না কি বহুদানা কথাটা থেকে বিবর্তন হয়েছে বেদানা হলো। যাক্, এই বেদানা শব্দটাই যখন ভারতীয় নয়, ফারসি; তখন ও নিয়ে আর আলোচনা নিঃপ্রয়োজন। এখন আমি বৈদিক দালিম নিয়েই আলোচনা করি।

### বৈদিক সমীক্ষার তুলিতে

অভ্যাবর্ত্তস্ব দালিমঃ যজ্ঞেন পয়সা সহ।

যন্তে শব্ধং যৎপূতং বিশদ্বা হৃদয়ং ভরামসি॥

(অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প—৬৬৯।১১।২৯)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—

দালিমঃ ইতি দল্ ভেদেন যন্ত্, তেন নিবৃত্তোঃ রসঃ ই—মপ্। যন্ত্ দালিমোহসি, ভেদনাং রস নিবৃত্তোহসি। এব পয়সা সহ অভ্যাবর্ত্তস্ব। যন্তে রসং শব্ধং=শব্দং—দীপ্তমং পূতং হৃদয়ং বিশদ্বা শ্লাঘ্যরূপং ভরামসি ভরামঃ সম্পাদয়ামঃ।

এর অনুবাদ হচ্ছে—দালিম বা দাড়িমকে নিয়ে এই বৈদিক সূক্ত। এর ভাষ্যে মহীধর বলেছেন—একে ভেদন করেই এর রস নিবর্তন করা হয়; তাই এর নাম দালিম। ড-ল অভেদে দাড়িম ও দল্ থেকে ই মপ্ প্রত্যয়ের যোগে দালিম। দল শব্দের অর্থ ভেদ করা। সূক্তে ও ভাষ্যে বলা হয়েছে—তোমার রসকে আমরা অভ্যর্থনা করি, তোমার পবিত্র দীপ্তমান রস শুবই শ্লাঘ্যকর, তাকে হৃদয়ে প্রবেশ করার কাজই আমরা সম্পাদন করবো।

### পরবর্তীকালে ঘোষণা

ভারতের একটি সুখ্যাত আহাৰ্য ও ভেষজ এই দালিম। চরকের বহুস্থানেই এর উল্লেখ। সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে মধুর রসযুক্ত ও অম্ল রসযুক্ত দাড়িমের গুণের বিবরণ; কোথাও এটি শ্রমহর, কোথাও হৃদ্য। আবার বিমানস্থানের ৮ম অধ্যায়ে অম্ল-স্কন্ধে ও মধুর স্কন্ধেও পঠিত হয়েছে। অর্শ, অতিসারে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি হৃদ্রোগেও; এক কথায় বলা যায়—উদর, হৃদয়, অর্শরোগ, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছতা প্রভৃতি মমস্থানগত রোগগুলিতেই দাড়িমের ব্যবহার। কারণ বেদ বলেছেন—এই দাড়িমটি হৃদয়ের জন্য অভ্যর্থনা করছি। প্রকৃতপক্ষে হৃদয় শব্দটি আয়ুর্বেদের একটি সংজ্ঞাবাচক শব্দ, কারণ চরকের অভিমত (সিদ্ধিস্থান ৯৮ অধ্যায়) হোলো—আমাদের শরীরের স্কন্ধ ও শাখায় মোট ১০৭টি মমস্থান আছে। এসব মর্মের কোন একটির পীড়া হলেই

শরীরের সর্বত্র পীড়া উপস্থিত হয়, কারণ মর্মস্থান মাত্রই সুখ-দুঃখ অনুভব করার শক্তি নিহিত আছে। স্কন্ধের অর্থ মস্তক, গ্রীবা ও মধ্য শরীর এবং শাখার অর্থ হাত-পা। স্কন্ধাশ্রিত মর্মগুলির মধ্যে হৃদয়, বস্তি ও মস্তকই সর্বাপেক্ষা গুরুতর মর্মস্থান। অতএব হৃদয় আহত হলেই কাস, শ্বাস, বলক্ষয়, কণ্ঠশোষ, ক্রোমশোষ, মূত্রশোষ, অপস্মার, উন্মাদ, প্রলাপ, দৃষ্টি বিভ্রম, মোহ প্রভৃতি সব রোগই উপনীত হয়। ঠিক এমনি ভাবেই মস্তক ও বস্তি প্রধানতম মর্মস্থান। হৃদয়ই সর্বাপেক্ষা গুরু। তাই বৈদিক সূক্তে যে ডালিমকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য অভ্যর্থনা বা প্রশস্তি, সেটি যথার্থ এবং যথার্থ বলেই চরক থেকে আরম্ভ করে সূত্রাচীন সমস্ত আয়ুর্বেদীয় সংহিতায় এবং রসতান্ত্রিক সংহিতাগুলিতে আহাৰ্য ও ভৈষজ্যের জন্য দাড়িমের প্রচুর যোগ, প্রচুর মৃদুষ্টিযোগ এবং ভাবনা বিধায়ক ঔষধের আবিষ্কার হয়েছিল।

দাড়িমই একমাত্র ফল—যেটির রস মধুরপ্রধান এবং গৌণ অম্ল অথচ হৃদয়ের বা প্রধানতম মর্মের শ্রেষ্ঠতম হিতকর ফল। বস্তিগত রোগেও এর অমোঘ প্রভাব, তাই মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাতিসার, মূত্রাস্মরীতে এর দ্বারা প্রচুর ঔষধের প্রচলন। আর একটি প্রধান মর্মস্থান মস্তক। সেখানেও এই দাড়িমের রসের ও দাড়িমের পত্রের ব্যবহার। সর্বপ্রকার রোগের অন্যতম স্বরোগেও এর ভৈষজ্য এবং আহাৰ্য সম্পর্কে এতটুকু শক্তি হ্রাস পায়নি।

### পরিচিতি

ভারতের সর্বত্রই ডালিমের গাছ সুপরিচিত। গাছগুলি ১০—১৫ ফিট উঁচু হয়। গাছের ছাল ধূসর বর্ণের ও কাণ্ডসার পীতবর্ণের হয়। পুষ্পভেদে একে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—একপ্রকার গাছে কেবলই পুং পুষ্প আর একপ্রকার গাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্প হয়। চরক সংহিতায় দাড়িমকে ৩ ভাগে ভাগ করা আছে সুগ্রন্থান ২৭ অধ্যায়ে—কষায়-মধুর দাড়িম, অম্ল দাড়িম ও মধুর দাড়িম। এই তিন প্রকারের মধ্যে মধুর রসের দাড়িমই শ্রেষ্ঠ। সুশ্রুতে অবশ্য চরকেরই দৃষ্টি। অন্যান্য নিষণ্টকর একে মধুর, মধুরাম্ল ও অম্ল ভেদে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। দেশভেদে এর আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বাদের পরিবর্তন দেখা যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এটি আফ্রিকার গাছ। সেইটাই যদি প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হ'লে অথর্ববেদে তার উল্লেখ থাকবে কেন? যদিও আফ্রিকা, কাবুল ও ইরানে বিশেষভাবে জন্মে। ভারতের সর্বত্রই কম-বেশী দেখা যায়। কাবুলের একপ্রকার দাড়িমই বাজারে বেদানা নামে বিখ্যাত। হিন্দীতে একে আনার বা আনারা মস্কট এবং ইংরাজীতে Pomgranate বলে। এটির বোটানিক্যাল নাম Punica Granatum Linn., এটি Punicaceae ফ্যামিলীভুক্ত।

### নব্যদের দৃষ্টিতে

ডালিমের গাছের কাণ্ড ত্বক ও ফলের খোসায় 22-25% Tannin Acid, মূলের ত্বকে 20-25% Punico-Tannic Acid পাওয়া যায়। মূলে একপ্রকার ক্ষার (Pelletierine) পাওয়া যায়। এতে ২ প্রকার ক্ষারতত্ত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া ফলে শর্করা ১৫ ভাগ, পেকটিন, মনাইড ইত্যাদি পাওয়া যায়।

## গুণপনা

এই তিন প্রকার দাড়িমই সমগুণসম্পন্ন। তবে চরকের বিশ্লেষণে প্রথম ২ প্রকার বায়ুনাশক, একটু গ্রাহী, তবে দীপন, হৃদ্য, কফ-পিত্তের অবিরোধী, এমন-কি মধুরাট পিত্তনাশক তো বটেই। চরকীয় বিশ্লেষণের অনুশীলনে পরবর্তীকালে বাগ্‌ডট, চক্রদত্তাদি ও লোকায়তিক সিদ্ধযোগ ভারতে প্রচলিত হয়েছে।

**মধুর দাড়িম—** হ্রদ্যে বিকারের উপশামক, শক্তিবর্ধক, হৃদ্য, কণ্ঠ্য, মূখ ও বস্তুগত রোগ-নাশক, দাহ-জ্বর-পিপাসানাশক, তৃপ্তিকারক, অরুচিনাশক, মেধা ও বলকারক, ধারক, স্নিগ্ধ ও লঘু গুণান্বিত।

**অম্লমধুর দাড়িম—** রুচিকর, অম্লপিত্তবর্ধক, লঘু ও দীপন।

**অম্ল দাড়িম—** কফ ও বায়ুনাশক, পিত্তবর্ধক।

১। পাতা ও গাছের ছাল— সঙ্কোচক, অতিসার ও ক্রিমিনাশক।

২। ফলের রস— স্নিগ্ধ গুণ, জ্বর-অতিসার-অজীর্ণ-অরুচি নাশক, বলকারক ও যকৃতের ক্রিয়া শোধক। এতে Vitamin B ও C পাওয়া যায়।

৩। ফলের ছাল— আম ও রক্তাতিসার, অজীর্ণ নাশক।

৪। ডালিমের ফুল— রক্তপ্রাবনাশক ও কফঘ্ন।

**ব্যবহার্য অংশ—** ফল, ফলের খোসা, মূলের ছাল, ফুল ও পাতা।

## প্রয়োগ কৌশল

১। অতিসারে— (ক) নতুন বা পুরাতন অতিসারে ডালিমের খোসা চূর্ণ ১-৩ গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবন। (খ) ডালিমের খোসা ২০।২৫ গ্রাম আধ সের জলে সিদ্ধ করে ১ কাপের মত থাকতে নামিয়ে ছেঁকে খেলে অতিসার সেরে যায়। (গ) ডালিমের খোসা ও বেলশুঠের চূর্ণ সমভাগে মিশিয়ে ২।৩ গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবনে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

২। অতিসার-রক্তাতিসার ও অজীর্ণে— এ তিনটিতে যারা প্রায়ই ভোগেন, তাঁরা ডালিমের খোসা চূর্ণ ১-৩ গ্রাম মাত্রায় বালি'র সঙ্গে বা ছাগলের দুধের সঙ্গে খাবেন, কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে যাবেন।

৩। রক্তাতিসারে— (ক) ডালিমের খোসা চূর্ণ ও কুড়িচির ছাল চূর্ণ সমভাগে মিশিয়ে ২।৩ গ্রাম মাত্রায় খেলে ভাল কাজ হয়। (চক্রদত্তের অভিমত।) (খ) ডালিমের কাঁচিপাতা ছাগদুগ্ধের সঙ্গে ফুটিয়ে ছেঁকে সেই দুধ পান করলে দুরারোগ্য রক্তাতিসার সারে। (গ) পাতার রস ১/২ চা-চামচ মাত্রায় মধুর সঙ্গে খেলেও কাজ হয়।

৪। আমাশয়ে— (ক) গাছের ছাল সিদ্ধ করে খেলে আমাশয় সারে, এটি রক্তমাশয়েও কাজ দেয়। (খ) বালি'র সঙ্গে ডালিমের খোসা সিদ্ধ করে খেলে বেলশুঠের মত কাজ দেয় আমাশয় রোগে। কাঁচা ছাল হলে ৫।৬ গ্রাম, শুষ্ক ছাল ৩।৪ গ্রাম হলেই চলবে।

৫। আমাজীর্ণে— ডালিমের রস (ফলের) ও পুরাতন আখের গুড় একসঙ্গে খেলে কাজ হয়। অথবা এই রসে একটু বিট লবণ মিশিয়ে খেলেও হবে।

৬। রক্তপ্রদরে— ডালিমের ফুল বেটে মধুসহ খেলে ওটার বেগ কয়েকদিনে কমে যায়। আরও কিছুদিন খেলে সেরে যায়।

৭। চলিত গর্ভে— যে মেয়েদের প্রায়ই গর্ভপ্রাব হয়ে যায়, তাঁরা ডালিমের

পাতা বাটা, সাদা চন্দনঘষা ও মধু একত্র মিশিয়ে দাঁধির সঙ্গে আলোড়নপূর্বক খেলে ও শত্কা করতেই হবে না। এটা বাগ্‌ভটের দৃঢ় অভিমত—হারীত সংহিতাতেও এই কথা বলা হয়েছে, তবে হারীত পঞ্চম মাসে খেতে বলেছেন।

৮। **কফ-পিত্তাধিকো**— বিশেষতঃ শিশুদের এটি হলে ডালিমের ফুল ছাগলের দুধে মেড়ে লেহবৎ করে খেতে দিলে দোষটা দূর হয়।

৯। **রক্তপিত্তে**— ডালিমের ফুলের রস ১ চা-চামচ মাত্রায় কয়েকদিন খেলে রক্ত ওঠা বা পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

১০। **নাসা থেকে রক্তস্রাবে**— ডালিমের ফুলের রস নাক দিয়ে টানলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

১১। **অরুচিতে**— অল্প ডালিমের ফুলের রস, বিট লবণ ও মধু একত্রে মিশিয়ে কুলকুচা করে ফেলে দিলে অরুচি কমে যায়। এটি চন্দ্রসত্ত্বের অভিমত।

১২। **পুত্রাতন অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে**— এতে যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা প্রত্যহ ঘোলের সঙ্গে খানিকটা টক বা মিষ্টি ডালিমের রস ও একটু বিট লবণ মিশিয়ে খেয়ে দেখুন, ম্যাজিকের মত উপকার পাবেন।

১৩। **উপদংশের ক্ষতে**— ডালিম গাছের ছাল চূর্ণ ছড়িয়ে দিলে ঘা শুদ্বিকিয়ে যায়।

১৪। **ক্রিমিতে**— ডালিম মূলের ছালের চূর্ণ ১-৩ গ্রাম মাত্রায় (বয়সানুপাতে) চূর্ণের জলসহ খেলে ক্রিমি দূর হবেই। ফিতা ক্রিমিতে (Tape worm) ভাল কাজ হয়।

১৫। **হৃদরোগে**— ডালিমের রস ২-৪ চা-চামচের সঙ্গে অল্প একটু ঘৃত-কুমারীর শাঁস মিশিয়ে খেলে বায়ুজন্য হৃদরোগের উপশম হয়।

১৬। **মূত্রকৃচ্ছ্রতায়**— ডালিমের রসের সঙ্গে গোন্ধুর চূর্ণ ২।১ গ্রাম মাত্রায় খেলে ২।৩ দিনেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

১৭। **অনিদ্রায়**— যাঁরা অনিদ্রা বা অল্প নিদ্রায় ভোগেন, তাঁরা ডালিমের রসের সঙ্গে ঘৃতকুমারীর শাঁস মিশিয়ে খেয়ে দেখুন—২।৪ দিনে ও কষ্টটা দূর হয়ে যাবে।

১৮। **শ্বেতপ্রদরে**— যে সব মা-বোনের সাদা প্রাব হয়, তাঁরা ডালিমের ফুল ২।৩টি বেটে একটু সাদা চন্দন ঘষা মিশিয়ে সম্ভব হলে অল্প দুধ মিশিয়ে অথবা জল দিয়ে খেয়ে দেখুন, ৩।৪ দিন খেলে উপকার পাবেন।

১৯। **মোখা হ্রাসে**— অনেক সময় দেখা যায় শরীরও ভেরে যাচ্ছে, এদিকে বৃদ্ধিটাও মোটা হচ্ছে—সেক্ষেত্রে ডালিমের রসের সঙ্গে এক বা দুই চামচ মধু মিশিয়ে প্রত্যহ একবার করে খেয়ে দেখুন, শরীরটাও ঝরে যাবে, মোখাও বাড়বে।

২০। **যকৃৎ বৃদ্ধিতে**— শিশুদের লিভার বেড়ে গেলে ডালিম গাছের মূলের ছাল চূর্ণ করে ২ বা ৪ গ্রেণ অথবা আধ গ্রাম মাত্রায় ২/১ চামচ দুধ মিশিয়ে সকালের দিকে খেতে দিতে হয়, তার সঙ্গে ২/৫ ফোঁটা মধু হলে ভাল হয়। পথ্যের দিকে কড়াকড়ি না করলে কোন কিছুতেই উপকার হবে না।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) alkaloids viz., pseudo-pelletierine, pelletierine, isopelletierine, methylpelletierine. (b) Vitamin P activity. (c) Mannitol and sorbitol.



## শারিবা

রূপ, গুণ, নাম বস্তু-পরিচয়ের এক-একটি অবলম্বন, তা সে কল্পিত নামের দ্বারাই হোক আর শব্দার্থের দ্বারাই হোক। শব্দ সংকেতই যে দ্রব্য নির্ণয় করে তা সত্যই, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিচয় যদি বোধগম্য না হয়, সেটা প্রাক্-আবিশ্বেগের আওতার পড়ে যায়। এই অনন্তমূল নামটার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে তার শারিবা নামের যে আভিজাত্য আছে, সেটা নিঃসন্দেহ। এখন প্রশ্ন হলো—এই গাছটির নামের আদি অক্ষর কি হবে বা হওয়া উচিত।

কে'চো খুঁড়তে সাপ বেরুলো ব'লে একটা কথা আছে। সে কথাটার প্রসঙ্গ এলো—যখন দেখাছি বৌদিকযুগে বস্তুবিচার করে তার নামকরণের টেকনিক্। আরো বৈচিত্র্য হ'লো নামের প্রথমাক্ষর কি হবে সে বিচারটাও শব্দবিজ্ঞানভিত্তিক। এই যেমন শারিবা—এই ভেবজটির আদি অক্ষর তালব্য 'শ' না হয়ে দন্ত্য 'স' তো হতে পারতো, তা না হয়ে তালব্য রাখার যুক্তি কি? তাঁদের বিচার হ'লো—তালব্য 'শ' ও দন্ত্য 'স' দুই উষ্ম বর্ণ হলেও প্রথমোক্তটির উচ্চারণ করতে হয় তাল্, থেকে, এই তাল্, হ'লো বাক্-প্রকাশের উৎসের স্থান—এটি বায়ুর আধার। আর দন্ত্য 'স' উচ্চারণ হয় দন্ত-মূলকে আশ্রয় করে; এই দন্তমূল পিত্ত-শ্লেষ্মার আধার। এই শারিবার অন্ত-নিহিত শক্তি হলো বায়ুকেন্দ্রিক, এই তালব্য 'শ'-কে সামনে রেখে তার নামকরণ করা হয়েছে। এইটাই এই নামকরণের পদ্ধতি। এই নামকরণের পদ্ধতিটি আর্য-সংস্কৃতির জ্ঞানগর্ভের আর একটি সরণী। আর শিরোনামে সালসা কথাটি পতৃ'গীজ শব্দ, এরই ইংরেজী হলো 'Sarsa', এটি দ্রব্যবাচক। এই সালসা বললেই আমরা বৃক্ষি এটি রক্ত পরিষ্কারক বনৌষধি।

## প্রারম্ভ সূত্র

অবিৎসি সোমাবতী মর্জয়ন্তীম্  
 উদোজসাম অসন্ধ্যাম শা শারিবাম্ ।  
 মজবন্দো অযবোভিঃ সজ্জরুযো  
 অরুণীভিঃ উর্জস্বতাম্ পিবমানম্ ॥

(অথর্ববেদ—১৬৫।৭১।৭৬)



উপরিউক্ত সূত্রটির মহীধর ভাষ্য হলো—

অবিৎসি=সমন্তাৎ বেষ্টি। সোমাবতীং সোমবাগ যোগ্যাং, উর্জয়ন্তী  
 =বল প্রণায়। উর্জয়ন্তী উদজোসাং=উদগতং ওজো যস্যঃ সা।  
 উদোজাঃ তং তেজঃ সম্পাদনীং। অসন্ধ্যাং=অশেষেণ সন্ধান দক্ষাং।  
 শারিবাম্ শারি=পাশঃ তং ব্যনাক্তি ইতি=উন্মার্গগামিবৈশ্বানর শক্তিং  
 তাং পাশয়তি শারিবা, তাং বেষ্টি অপিচ অহঃ=সূরঃ=বৈশ্বানরঃ  
 অ-যবোভিঃ সজ্জঃ যবাস্চ অযবাস্চ জোষণং জড়ট=প্রীতিঃ সহজয়া  
 বর্ততে। অরুণীভিঃ অরুণরসরশ্মিভিঃ চিত্রিতশ্চ প্রীতিযুক্তাং  
 পিবমানাং উর্জস্বতীং বলস্য দধানাং অবিৎসি।

মহীধর ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তোমাকে সর্বতোভাবে জানি। তুমি সোম যাগযোগ্য। বল, তেজ ও ওজোদায়িনী। তুমি অশেষ প্রকারে সন্ধানদায়িনী। তুমি শারিবা অর্থাৎ উন্মার্গগামী অগ্নিকে রুদ্ধ কর (শারি অর্থে পাশ বা বন্ধন, তাকে যে প্রকাশ করে, সেই শারিবা)। তুমি যব ও অযবকে বৈশ্বানরের প্রীতিগামী কর। অর্থাৎ জঠরের বিষমাত্রিক সমাশ্রিত কর। তোমার চিহ্নিত পত্রের অরুণবর্ণের রসরশ্মির দ্বারা শরীরের বল বিধান কর।

### পরবর্তীকালে

শারিবার প্রচলিত নাম অনন্তমূল। এই গুল্ম লতাটির মূল সরু হয়ে বহুদূরে যায়, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে শিকড়ের শেষ অংশটুকুর শেষ কোথায়—তার হৃদিস পাওয়া শক্ত হয়, হয়তো বা তারই জন্যে এই নামকরণ।

সংহিতাকারগণ এই শারিবাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন; তাঁরা জীবনীশক্তি রক্ষার মূল উপাদান যে রক্ত—সেটি শূন্য না থাকলে বল-বীৰ্য-তেজ এগুলি রক্ষা হয় না, সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে যে বিচার করেননি তা নয়, তবে সেটা গৌণপথে। কারণ সেটা হেতু-বিপরীত চিকিৎসার অন্তর্গত, ব্যাধি-বিপরীত চিকিৎসার ক্ষেত্রে নয়। এক্ষেত্রে ব্যাধিকে রুদ্ধ দিয়ে তারপর যে দোষে রোগোৎপত্তি হয়েছে, সেই দোষের কারণকে সে সরিয়ে দেয়, এইটাই অনন্তমূলের বৈশিষ্ট্য।

বৈদিক তথ্যে দেখা যায়—‘তুমি যব ও অযবকে বৈশ্বানরের প্রীতিগামী কর’—এর দ্বারা সে দেহের মন্ডাশ্রিত ও বিষমাত্রিকের মধ্যে একটির বৃদ্ধি ও অন্যটির সমতা করে, এইটাই প্রতীয়মান হয়। শেষে আর একটি কথার ইঙ্গিত আছে যে, ‘তোমার চিহ্নিত পত্রের অরুণবর্ণ রসরশ্মির দ্বারা শরীরের বলবিধান কর।’ এই সমগ্র লতাগাছটিতে যে ‘মিল্কি জুস’ (সাদা আঠা বা ক্ষীর) আছে, সেটা নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা চালালে, আর একটা নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এই অনন্তমূল বা শারিবা ভেষজটি রক্ত পরিস্কারক—এ ধরনের সংস্কার কে সৃষ্টি করলে?

এটা কিন্তু পরম্পরায় এসে গিয়েছে এই হিসেবে যে, বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত পিত্তের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রক্তবহু শিরামার্গে বন্ধ হয়ে গমন করে—যার ফলে আসে বাতব্যাধি (বিশেষতঃ পক্ষাঘাত) বা হাতে-পায়ে অসাড়তা। সুতরাং এর শূন্যতেই অনন্তমূলের ব্যবহার করলে ওটি আর সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হতে পারে না, ওখানেই সে রুদ্ধ হয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে সংশোধিত হয়। এই রোগের যে এই-ই কারণ, সে কথা চরকের চিকিৎসাস্থানের ৯২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, চরকে একে ব্যবহার করা হয়েছে রক্তপিত্তে। এখানে দূষিত পিত্তই রক্তের রূপধারণ করেছে; সুতরাং এখানে শারিবা ব্যবহার করাটাই প্রেয় বলে মনে করেছেন।

সুশ্রুতে একে শ্বাসরোগে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জানা উচিত যে, হাঁপালেই যে শ্বাসরোগ হয়েছে, এটাও যেমন ধরা উচিত নয়, সেইরকম সব বিকৃত পিত্তজনিত রোগে যে অনন্তমূল ব্যবহার করা যাবে তাও ঠিক নয়; সুশ্রুতে যে শ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রটি কিন্তু চরকের রক্তপিত্ত সম্পর্কের বিহীন নয়, অর্থাৎ এই শ্বাসরোগে পিত্তবিকৃতির সম্পর্ক থাকবেই।



### পরিচিতি

এই গুল্ম লতাটি ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই অস্পৃশ্যবস্তুর পাওয়া যায়; তবে প্রদেশ ভেদে পাতার আকারের ইতরবিশেষ হলেও তার মাঝখানের শিরা বরাবর যে সাদা দাগ আছে, সেটা সব ক্ষেত্রে থাকবেই। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় গাছের মূল; তবে মূল সরু কি মোটা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর। এই গাছের মূলে একটা বিশিষ্ট গন্ধ আছে। এটির বোটানিক্যাল নাম *Hemidesmus Indicus* R. Br., এটি *Asclepiadaceae* ফ্যামিলীভুক্ত। আর অপেক্ষাকৃত নবীন বনৌষধির গ্রন্থে শারিবা-দ্বয়ের উল্লেখ। তার জন্য এ দেশের বৃন্দ বৈদ্যগণ ব্যবহার করেন শ্যামলতা নামে একটি বৃহৎ লতজাতীয় সমগ্র গাছ। তার বোটানিক্যাল নাম *Ichnocarpus frutescens* R. Br., এটি *Apocynaceae* ফ্যামিলীভুক্ত। তবে এইটিই যে নিষ্পট্ট মিতীয় শারিবা কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

### লৌকিক ব্যবহার

১। যৌবন থাকতেও যেন নেই, লাভণ্য কমে গিয়েছে, ভাল ক্ষুধা হয় না, এক্ষেত্রে অনন্তমূল চূর্ণ ১-২ গ্রাম মাত্রায় সিকি কাপ গরম দুধ ও একটু মিছরির গুড়ো মিশিয়ে খেতে হয়। এর দ্বারা ওসব অসুবিধেগুলি চলে যায়।

২। অশ্রুগে— ৩ গ্রাম আন্দাজ অনন্তমূল জলে বেটে দুধের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে সেই দুধ দুই পেতে পরের দিন সকালে খেতে হবে। এর দ্বারা আহারের রুচি হবে ও ক্ষুধা বাড়বে, তার সঙ্গে অশ্রুও উপশম হবে।

৩। হাড-পায়ের জ্বালায়— শরৎকালে পিত্তবিকারে যাদের দেহ জ্বালা করে, তাঁরা ৩ গ্রাম আন্দাজ অনন্তমূল জলে বেটে চিনি দিয়ে সরবৎ করে খাবেন, এ জ্বালা থাকবে না।

৪। অরুচিতে— যাদের বিকৃত পিত্ত শ্লেষ্মা চাপা আছে, এরই জন্যে হয় অরুচি ও অগ্নিমন্দা, গা বমি বমি ভাব—এক্ষেত্রে অনন্তমূল খেঁতো করে গরম জলে ভিজিয়ে সকালে ছেকে নিয়ে জলটা খাওয়া। এর দ্বারা ও দোষগুলি চলে যাবে।

৫। একজ্জিমা ও হাঁপানীতে— দুটোই আছে, এক্ষেত্রে অনন্তমূল ৩ গ্রাম আন্দাজ জলে বেটে অল্প সৈন্দ্ব লবণ মিশিয়ে সরবতের মত দু'বেলা খেতে হয়; অবশ্য বয়সানুপাতে অনন্তমূল কমাতে হয়। তবে সৈন্দ্ব লবণটা যেন আসল হয়।

৬। শ্বশ্বসে কাসিতে— অনন্তমূল চূর্ণ ১ই গ্রাম মাত্রায় সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বার খেতে হয়। এটাতে উপশম হয়।

৭। অনিয়মিত ঋতুপ্রাবে— এ ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ বলেন—রক্তপ্রদর। এ রক্তে অনেক সময় দুর্গন্ধও থাকে। এক্ষেত্রে ৩ গ্রাম আন্দাজ অনন্তমূল বেটে সকালে ও বিকালে দুধ বা জল সহ খেতে হয়। এসব প্রাচীন বৈদ্যগণের অভিজ্ঞতার ফসল।

৮। গাত্রদৌর্গন্ধে— গায়ের যেখানে সেখানে ঘামে দুর্গন্ধ হয়। এই অনন্তমূল বেটে অল্প ঘি মিশিয়ে গায়ে মাখতে হয়। তার খানিকক্ষণ পরে স্নান করতে হয়। এটাতে ঐ দোষটি চলে যায়।

৯। বাতরক্তে— গায়ে যেন কি চরে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে থাকে যে কোন অগের মাঝে মাঝে সংকোচন; এক্ষেত্রে শ্বশ্ব ঐ মূলের ক্রাথ বেশ কিছুদিন খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ দোষটি চলে যায়।

১০। আমাশয়ে— অনন্তমূলের চূর্ণ মধু সহ খেলে প্রশমিত হয়।

১১। স্তন্যস্থাসে— অনন্তমূলের কাথ সেবনে স্তনে দৃশ্য বাড়়ে।

১২। উপদংশের ক্ষতে— অনন্তমূলের কাথ দিয়ে ঘা ধুলে ঘা শুকিয়ে পুড়ে ওঠে।

১৩। খোস পাচড়ায়— অনন্তমূলের চূর্ণ ১-২ গ্রাম মাত্রায় অথবা তার কাথ সেবনে স্ফুল পাওয়া যায়। ঐ স্ফে অনন্তমূলের কাথ দিয়ে ধুলে স্ফুর ফল পাওয়া যায়।

১৪। জিহবার ক্ষতে— ভেড়ার দুধে অনন্তমূল ঘষে লাগালে ওটা উপশমিত হয়। বিশেষতঃ শিশুদের জিহবার ক্ষতে বিশেষ উপকার হয়।

১৫। পাথুরী রোগে— গো দুগ্ধে অনন্তমূল বেটে খাওয়ালে এই রোগটির যন্ত্রণা অচিরেই লাঘব হয়।

এ ভিন্ন আরও কত লৌকিক ব্যবহার আমাদের অজানা থেকে গেল, তার ইয়ত্তা নেই।

অনন্তমূল যে রক্ত পরিস্কারক, এ কথা পরম্পরায় চলে আসছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-গণের মনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, সে কিভাবে রক্ত পরিস্কার করছে? এ সম্পর্কে নব্বীর মতবাদের সঙ্গে প্রাচীনদের মতবাদের পার্থক্য থাকবেই, কারণ দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, তবে এটা দেখেছি যে, প্রাচীনরা ব্রাডপ্রেসার রোগে এই অনন্তমূল ব্যবহার করতেন, তাঁদের ধারণা এর দ্বারা রক্তের মলাংশকে দূরীভূত করে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Essential oil. (b) 2-hydroxy-4-methoxy benzaldehyde. (c) Sterols. (d) Glycosides. (e) Other constituents viz., saponin, resin acid and tannins.



## এরও

অনেক কথাই আমরা বলে থাকি, কিন্তু বলতে হয় তাই বলি; সেই রকমই একটি কথা বরেন্দ্র ভূমি; আসলে বরেন্দ্র শব্দটি আরবী, এর অর্থ উচ্চ ভূমি; বরেন্দ্র থেকে বরেন্দ্র। আমাদের উত্তরবঙ্গ উচ্চভূমি বলে তাকে বলা হ'তো বরেন্দ্র ভূমি। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় বরেন্দ্র, এই রকম রাঢ়ের ভূমিতে যারা বাস করতেন, তাঁদের সংজ্ঞা হ'লো 'রাঢ়ী'। গাছপালার মধ্যেও দেখা যায় এরন্ডের প্রধান কলোনী হ'য়েছিলো রাঢ়ে (রাঢ় দেশে) তাই তার লোকায়তিক নাম হ'য়ে গেল 'রেড়ি'।

আবার গোদা বাংলায় আমরা যেমন বলি 'তেলাপোকা আবার পাখি'? সেই রকম পণ্ডিত সমাজের শ্লেষাত্মক উপমার বস্তু এই রেড়ি বা এরন্ড। এ-সব কিন্তু হাফ-আখড়াইয়ের পণ্ডিতি বুলেটিন্! একজন বললেন—রাখ তো, 'স্নহী বৃক্ষো মহাতরুঃ'। অর্থাৎ মনসা গাছও (Euphorbia nerifolia) আবার মহীরুহ? তারই উপমার রূপান্তর করে যাকে বলা যায় রং-এর উপর রসান চড়িয়ে আর একজন আসর জমালেন—

যস্মিন্ দেশে দ্রুমো নাস্তি এরন্ডাহপি দ্রুমায়তে।

অর্থাৎ যে দেশে গাছ নেই, সেখানে এরন্ড গাছই বৃক্ষ।

এ তো গেল স্থূল দৃষ্টিতে বিচারের রায়, কিন্তু বৈদিক যুগে এই ক্ষুদ্র জাতীয় গাছটির বস্তুসত্তার দিকেই দৃষ্টি দি়োছিলেন সেই যুগের মনীষীগণ তাঁদের সমীক্ষায়—

মাতেব পদ্বং পৃথিবী পদুরীষাং অগ্নিং স্বে যোনৌ অভৈরন্ডঃ।  
বিশ্বেঃ দেবৈঃ ঋতুভিঃ সংবিদানঃ অন্যাম্ অস্মদিচ্ছ

প্রজাপতির্বিমম্বতু॥

অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১২।১২৭।২৯



এই সূক্তটির মহর্ষির ভাষ্য করেছেন—

এরন্ড স্তব্ধ, মাতেব পদ্বং নিধায় দ্বংধং সিঞ্চেৎ, পৃথিবী ভূরূপা  
ইব পদুরীষাং অগ্নিং স্বে যোনৌ অভা ধৃতবান্ এরন্ডঃ ইরয়তি  
বায়ুং মলং চ ইঃ প্রেরণে অন্ডচ্। সর্বঋতুভিঃ সংবিদানাঃ একীকৃত্য  
পদুরীষাং এরন্ডকৃত্য জানন্তঃ অন্যং অগ্নিং অস্মৎ প্রজাপতিঃ  
স্বং বিমম্বতু।

অর্থাৎ তুমি এরন্ড (বায়ু ও মলকে প্রেরণ করে যে তারই নাম এরন্ড), মাতা যেমন  
পদ্বকে, পৃথিবী যেমন পদুরীষাকে অর্থাৎ তার মলরূপ খাদ্যকে দান করে, তুমিও সর্ব-

ঋতুতেই আমাদেরকে খাদ্যমল পরিভাগ্য করিয়ে নতুন খাদ্যগ্রাহক অগ্নিকে দান কর, তাই প্রজ্ঞাপতি তোমাকে এরুড অর্থাৎ বায়ুপ্রেরক ও মল পরিভাগ্যক করে আমাদেরকে দান করুন।

বেদের এই সৃষ্টিটি আয়ুর্বেদের দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) সিদ্ধান্তের অন্যতম মৌলভিত্তিক বায়ু। তার প্রাকৃত রূপ ও শারীর রূপের আকৃতি-প্রকৃতির চিহ্নিত ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টির রহস্য জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যার ক্রিয়া আছে অথচ রূপ নেই সেই-ই তো বায়ু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও অতীন্দ্রিয়; এর প্রকৃতিটি যেমন শীতল তেমনি রুদ্ধ, যেমন লঘু আর তেমনি গুরু, নেই তাতে পিচ্ছিলতা ও স্নেহ। আমরা দুটি রূপে তার ক্রিয়া-কলাপ উপলব্ধি করি। প্রথমটি হলো প্রাকৃত বায়ু, এটি স্বভাবে না থাকলে, কি জীব-জগৎ কি প্রাণীজগৎ, কেহই রক্ষে পেতো না; আবার তার বিকৃত রূপ যখন প্রকাশ করে, তখন হয় ঝড়-ঝঞ্ঝা; সেখানে তাপের আধিক্য বর্তমান থাকবেই; কিন্তু তখন বৃষ্টি হ'লে ওটি থেমে যায়। সেই রকম আমাদের দেহ-জগতের মধ্যে যেটি আছে, সেটি স্বাভাবিক থাকলে আমরা সুস্থ থাকি, আবার এটা বিকৃত হ'লেই শরীরের মধ্যেও ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয়; সেখানেও তাপের আধিক্য থাকে; তার ওপর তার স্বভাব প্রকৃতি রুদ্ধ ও খর, তখন তাকে স্নেহ সিগুন করলেই ও শান্ত হয়। আমাদের যখন বায়ু-বিকার হয়, তখন আমাদের অভ্যন্তরস্থ ধাতুগত অগ্নি বিকারগ্রস্ত হবেই।

এক কথায় বলতে গেলে, যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ও শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া নির্বাহিত হয় সেই শক্তির নামই বায়ু; এটি ভারতীয় সিদ্ধান্ত। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত হলো—স্নায়ু, শিরা ও ধমনীর দ্বারা (যাকে বলা হয় Nervous System) আমাদের ইন্দ্রিয়ের ও শারীর ক্রিয়া নির্বাহ হ'য়ে থাকে; কিন্তু এ প্রশ্নও মনে আসতে পারে যে, এই সব ধমনী বা শিরার ক্রিয়াকারিত্ব কার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে?

সুতরাং বৈদ্যক-ঋষির সিদ্ধান্ত যে আরও গভীর ও সুক্ষ্মতর চিন্তাধারা—এইটাই ভাবার জন্যে মন এগিয়ে আসে, তাই তাঁরা ভেবেছিলেন শারীর বায়ুই একমাত্র কারণ রোগ ও নীরোগের।

তা হ'লে এখানে আর একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, বায়ু ভিন্ন দ্বিদোষের আর বাকী যে দুটি দোষ পিত্ত ও কফ, তাদের কি কোন কাজ নেই?

এখানে হেতু সিদ্ধান্ত হ'লো—

পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গুবো মলধাতবঃ।

বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ॥

অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ রসরক্তাদি সকলেই তো অচল (চলৎশক্তি হীন), তাকে সচল করে রাখে বায়ু, যেমন মেঘকে টেনে নিয়ে যায়। তবে এটাও ঠিক যে বিকারগ্রস্ত পিত্ত বা কফ যদি তাকে ঢেকে ফেলতে পারে, অর্থাৎ আবৃতধর্মী হ'য়ে যায়, তবে তখনই হয় সান্নিপাতিক ক্ষেত্র অর্থাৎ সব দোষেরই প্রাধান্য। এ ক্ষেত্রে বায়ুর স্বভাবধর্মিতার বিকাশের জন্যই ওখানকার মলকে নিষ্কাশন করানোর প্রকৃষ্ট ভেষজ এই এরুড, বিশেষভাবে তার বীজের স্নেহ। এই স্নেহ আবার ৪ প্রকার: ১। মূলজ ২। স্বকজ ৩। জৈবজ ও ৪। বীজজ। তাদের মধ্যে জৈবজ ও ফলবীজ জাত স্নেহ বিকৃত বায়ুর পক্ষে বেশী হিতকর, এ সিদ্ধান্ত চরক সংহিতার এবং প্রধানতঃ সুদ্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ের। অতএব বিকৃত বায়ুর দ্বারা সৃষ্ট রোগের ক্ষেত্রে এই স্নেহ দ্রব্যটির ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ হয়; কারণ দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু যখন রুদ্ধ ও খর হয়, তখন তাকে স্নেহ

সিগুন করলে ওটি শান্ত হয়, সেক্ষেত্রে যারা উপশামিত করে তাদেরই বলা হয় স্নিগ্ধ বা শীতবীৰ্য দ্রব্য। বৈদিক সূক্তে পাওয়া যাচ্ছে এরূপ স্নিগ্ধবীৰ্য ভেষজ, অবশ্য এ স্নেহটা বীজেই থাকে।

এ তো গেল দ্রব্যের দোষনাশক শক্তি বিচার। এইবার দোষের ক্ষেত্র বিচার —

১৩টি স্রোতপথের সাহায্যে আমাদের দেহ ও জীবনকে ধারণ করে রেখেছে, এটা চরকীয় চিন্তাধারা; এই সব স্রোতের কোনটায় বা চলে অন্ন, কোনটায় রক্ত, এমনকি প্রাণেরও স্রোতপথ পৃথক। কোন দৃষ্ট কারণে যদি এই বায়ু, ভাঙ্গাঙ্কান্ত হ'য়ে পড়ে তার গতির সাবলীলতা বাধাপ্রাপ্ত বা রুদ্ধ হয়, তখনই সেখানে রোগ বাসা বাঁধে, বিশেষভাবে আমাশয়, পকাশয়, হৃদয়াশয়, রক্তাশয় ও সন্ধিস্থান প্রভৃতিতে; যে মলীভূত কারণে সেখানকার বায়ু অবরুদ্ধ হ'য়ে রোগাঙ্কান্ত করে দেহকে পীড়িত করছে এই এরূপ বীজ স্নেহ (যেটি আমাদের কাছে Castor oil বলে পরিচিত) আশয়গত দোষকে সরিয়ে দিয়ে বায়ুর সাবলীল গতিক্রিয়া পুনরায় স্বাভাবিক করে। ঠিক এমনিভাবে শিরাগত, স্নায়ুগত, রক্তগত, বস্তুগত বায়ুর ক্রিয়াকে সে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে দেয়; তাই এই এরূপবীজ স্নেহকে তুলনা করা হয়েছে মায়ের স্নেহের সঙ্গে; মা যেমন সন্তানের ভালোর জন্য তার প্রতি ক্রুদ্ধা হ'য়ে তাকে শাসন করেন, সেই রকমই।

### পরিচিতি

ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, সাধারণতঃ ১০।১২ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, শাখাপ্রশাখা খুবই অল্প; কান্ড ও পত্রদণ্ড নরম ও ফাঁপা, পাতাগুলি আকারে প্রায় গোল হ'লেও অঙ্গুল সমেত হাতের তালুর মত; ব্যাস প্রায় এক ফুট, পাতার কর্ণিত অংশগুলির অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। এই কর্ণিত অংশটি প্রায় ৫/৬ ইঞ্চি লম্বা। আবর্জনাপূর্ণ জায়গায় এর বাড়-বৃদ্ধি বেশী হয়। এক বৎসরেই গাছে ফুল ও ফল হয়; সাধারণতঃ কান্ডের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে গোল হ'য়ে ছোট ছোট হলুদে ফুল হয়, পরে ত্রিকোষ-যুক্ত এবং আকারে দেশী কুলের মত ফল হ'লেও গায়ে কাঁকরোলের (Momardica cochinchinensis) মত নরম কাঁটা থাকে। এই ফল পাকার পর ফেটে বীজ পড়ে যায়, বীজের খোলায় (শক্ত বহিরাবরণে) থাকে সাদা সাদা ডোরা দাগ।

চরক সূত্রদ্বয়ের পরবর্তীকালের বনৌষধির গ্রন্থে আর একপ্রকার এরূপের উল্লেখ দেখা যায়, তার কান্ড ও পাতার ডাঁটাগুলি একটু বেগুনে রং-এর; একে বলা হয় রক্ত এরূপ, দুটি গাছের আকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই, তবে বৈদ্যকগ্রন্থের মতে শরীরের দোষ নিরসনের জন্য রক্ত এরূপ অপেক্ষা শেবত এরূপ বৃক্ষের উপযোগিতার কথাই উল্লেখিত হ'য়েছে। পাশ্চাত্য ভেষজ বিজ্ঞানীদের মতে এই রক্ত এরূপ পৃথক কোন প্রজাতি (Species) নয়; এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম Ricinus communis Linn. ফ্যামিলি Euphorbiaceae.

### রোগ প্রতিকারে (পত্রের ব্যবহার)

১। নেগ্রাভিস্যন্দে (চোখ ওঠায়)— পাতার রস একটু গরম করে, ছেঁকে নিয়ে ঐ রস চোখে এক একবার ফেঁটা দিতে হয়।

২। ঠনুকোষ— যতদূর সম্ভব স্তনের দুধ গেলে ফেলে (অবশ্য সম্ভব হ'লে) এর পাতা আগুনে একটু সেকেনে নরম করে ঐ পাতা চাপা দিয়ে বেঁধে রাখলে ফুলোও

ব্যথা দুইই ক'মে যাবে। আর ৭/৮ গ্রাম পাতা এক পোয়া আন্দাজ জলে সিদ্ধ করে তিন ছটাক থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ঐ জলটা খেতে হবে।

৩। স্তন্যের স্বল্পতায়— মায়ের পুষ্টির যে অভাব তা নয় অথচ বৃদ্ধের দুধ কম, সেক্ষেত্রে কচিপাতা আন্দাজ ৫ গ্রাম, দুধ আধ পোয়া আর জল আধ সের একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, এক পোয়া থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সেই দুধ খেলে স্তন্য বৃদ্ধি হবে। এমন কি একটি ক'রে রেড়ির পাতা গরুকে খাওয়ালে গরুরও দুধ বাড়ে। গরুর পালানে বাঁধলেও দুধ বাড়ে।

৪। অম্লশূলে— কচিপাতা ৪।৫ গ্রাম সিদ্ধ ক'রে ছেঁকে সেই জল খেলে ব্যথা ক'মে যায়।

৫। মাথা ভার ও যন্ত্রণায়— ৫/৬ গ্রাম কচিপাতা সিদ্ধ জল ছেঁকে খেলে ওটা ক'মে যায়।

৬। রাতকানায়— সন্ধ্যার পর চোখে দেখতে পান না, সেক্ষেত্রে ১০।১২ গ্রাম পাতা ঘিয়ে ভেজে মধ্যাহ্নে আহ্বারের সময় শাক ভাজার সময় কয়েকদিন খেতে হয়।

৭। জন্মের দায়ে— গায়ের জ্বালা কিছুতেই ক'মেছে না, সেক্ষেত্রে এর পাতা খুয়ে, মূছে তার ওপর শুইয়ে দিতে হয়। এর দ্বারা গায়ের জ্বালা কিছু উপশম হবে।

৮। কশ'শূলে— উর্ধ্বজন্মগত দোষে কানে যন্ত্রণা, সাধারণতঃ রাত্রের দিকে বেশী হয় অথচ প'জও পড়ে না; সেক্ষেত্রে এরন্ডপত্র ও এক টুকরো আদা খেঁতো ক'রে সরষের তেলে ভেজে, ছেঁকে নিয়ে ঐ তেল কানে ফোঁটা দিতে হয়, এর দ্বারা ঐ যন্ত্রণার উপশম হবে।

৯। স্বল্প রঞ্জে— রজরক্ত স্রাব ভাল না হওয়ায় তলপেটে যন্ত্রণা, এক্ষেত্রে রেড়ির পাতা অল্প গরম করে তলপেটে (নাভির নিচে) বসিয়ে রাখতে হয়; পাতা শুকিয়ে গেলে ফেলে দিতে হয়। এইভাবে আরও দুই/একদিন পাতা বসাতে হয়। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। বাঁদের শ্বেতপ্রদর তাঁদেরও এটাতে কিছু সুবিধে হবে।

### মূল বা মূলক (মূলের ছাল)

১০। প্রবাহিকায় (আমাশায়)— পেটে গুট্টলে মল আছে, বেরুচ্ছে না, কিন্তু মাঝে মাঝে আম ও রক্ত দুইই প'ড়ছে, তার সঙ্গে মলদ্বারে শূলুনি ব্যথা, এ ক্ষেত্রে কাঁচা এরন্ড মূল ২৫ গ্রাম আন্দাজ, দুধ আধ পোয়া, জল আধ সের একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সেই দুধটা খেলে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। এ ব্যক্ত্যটা চরক সম্প্রদায়ের।

১১। প্রস্রাবের স্বল্পতায়— কাঁচা মূল ১৫/২০ গ্রাম মাত্রায় ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সকালে অথবা বৈকালে একবার খেলে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এবং বারে বারে যেতে হয় না।

১২। উদরের মেদে— নাদাপেটা ভুঁড়ি, যত বাড়-বৃদ্ধি যেন ওখানেই, এ ক্ষেত্রে কাঁচ এরন্ড মূলের রস ৩/৪ চামচ এক গ্লাস ঠান্ডা জলে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেতে হয়, এটা কিছুদিন খেলে মেদটা ক'মে যাবে। তবে আরও উপকার পাওয়া যায় যদি ওর সঙ্গে ১ চামচ মধু (খাঁটি) মিশিয়ে খাওয়া যায়।

১৩। রসগতবাত— এই রোগটিকেই আয়ুর্বেদে আমবাত বলা হ'য়েছে। এর লক্ষণ ফুলো আর সঙ্গে যন্ত্রণা; এ ক্ষেত্রে এর মূলের পাচনে উপশম হয়, তবে মূলের কাঁচ শক্ত হ'য়ে গেলে মূলের ছাল অন্ততঃ ১০/১২ গ্রাম নিতে হয়।

১৪। নিউরাল্জিয়ায় (Neuralgia)— অনেক বৃন্দ বৈদ্য এটাকে নাড়ীশূল বলে থাকেন। এ ক্ষেত্রে এর মূলের কাথ কিছুদিন ধরে খাওয়ালে ভাল কাজ হয়।

১৫। খোসা চুলকণায়— মূলের ছাল বাটার হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে গায়ে মাখতে বা লাগাতে হয়। এর দ্বারা ওটার উপশম হবে।

### বীজের ব্যবহার

১৬। সায়েরটিকায় (গুপ্তসী বাতে) ও কটি শূলে— কোমর থেকে আরম্ভ করে পায়ের শিরা বেয়ে যে যন্ত্রণা নামে, মনে হয় যেন কাঁটা বিধছে, সেক্ষেত্রে ৬।৭টি বীজের শাঁস বেটে দুধের সঙ্গে পায়ের কাছে খেতে হয়। কয়েকদিন ব্যবহারে কিছুটা উপশম হবে।

১৭। কোষ্ঠবন্দিতায়— নানান কারণে যাঁদের কোষ্ঠকাঠিন্যের দাত, মল গঠলে হয়ে ২/১ দিন অন্তর হয়, তাঁরা নিত্য আহার্য ব্যঞ্জনের সহিত ৪/৫টি এরুণ্ডবীজের শাঁস বেটে ঐ ব্যঞ্জন রান্নার সময় ওটা দিয়ে নিত্য ব্যবহার করবেন, তবে কিছুদিন ধরে এটা করতে হয়। এ সম্বন্ধে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি—উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে বহু গরীব গৃহস্থবাড়ীতে গাছ করা আছে; তাঁরা প্রায় নিত্যই ডাঁসা ফলের বীজের শাঁস মশলার সঙ্গে বেটে দিয়ে থাকেন ভরকারিতে। এটার উদ্দেশ্য রান্নার তেলের সাশ্রয় হয়, অধিকন্তু দ্রব্যগুণ তো আছেই। আর এই বীজ বাটা ব্যঞ্জন খেতেও নাকি খারাপ হয় না, কারণ তখন রৌড়ির তেলের যে একটা গন্ধ আছে, সেটাও হয় না।

১৮। ফোড়া পাকাতো— রৌড়ির বীজের শাঁস বেটে অল্প গরম করে ফোড়ার ওপর বসিয়ে দিলে ওটা পেকে ফেটে যায়।

### রৌড়ির তৈল প্রস্তুতের প্রাচীন পদ্ধতি

রৌড়ির বীজ মাটিতে ২ দিন রেখে (খড় চাপা দিয়ে, গোবর জল ছিটিয়ে) সেইগুলিকে রোদ্রে সামান্য শুকিয়ে নিলেই অল্প আঘাতে খোসা ছাড়ান যায়। বেশ করে বেড়ে নিয়ে খোলায় ভেজে, ঢেঁকিতে বা হামানদিস্তেয় কুটে জল দিয়ে ফটাতেই রৌড়ির তৈল ভেসে উঠবে, পরে ছেকে জলটাকে মেয়ে নিলেই পরিষ্কার রৌড়ির তৈল হয়। যাঁদের অবস্থা ভাল তাঁরা ঘানিতেই পিষে নিতেন; তবে প্রাথমিক কাজ করতেই হবে। সদ্ভূতে বলা আছে যন্ত্রপেষিত তৈল অপেক্ষা সিদ্ধ তৈল স্নিগ্ধগুণ। পাকাশয় বা অগ্নে কোন উদ্বেগ হয় না। যন্ত্রপেষিত তৈল রুদ্ধতা আনে।

### তৈলের ব্যবহার

১৯। পেট ফাঁপায়— দাস্ত পরিষ্কার হয় না, আবার পেটও অল্প ফাঁপে, এ ক্ষেত্রে গরমজলের সঙ্গে আধ বা এক চামচ এরুণ্ড তৈল খেতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যরা, তবে বয়স হিসেবে মাত্রা ঠিক করে দিতেন।

২০। ক্রিমির উপদ্রবে— মলম্বারে এসে প্রায় রোজই জ্বালাতন করে, অস্বস্তিকর অবস্থা—এ ক্ষেত্রে দুই একদিন অন্তর ৫/১০ ফোঁটা থেকে আরম্ভ করে ১ চামচ পর্যন্ত (বয়সানুপাতে) একটু গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হয়। এটাতে অনেকের কেঁচো ক্রিমিও বেরিয়ে যায়।

২১। বৃন্দ রোগে (বাভজ)— যাঁদের অণ্ডকোষের বহিরাবরণের চর্মাধারে জল



জর্মেইন অথচ আকারে বড় হ'য়ে আছে; সেক্ষেত্রে এই এরন্ড তেল ১ চামচ ক'রে একটু গরম দুধে মিশিয়ে এক/দেড় মাস খেতে হয়; সেটা খালিপেটে ভোরের দিকে খেলে ভাল হয়। এটা সুদ্রুত সংহিতার ব্যবস্থা।

২২। পিত্তশূলে (Biliary colic) পিত্তনিঃসারক স্রোতপথের আকস্মিক আক্কেপ (spasm) মাঝে মাঝে হ'তে থাকে, এ ক্ষেত্রে গ্লিসিইরমধু (Glycyrrhiza glabra) ৫/৬ গ্রাম খেঁতো ক'রে এবং সিদ্ধ ক'রে এক ছটাক আন্দাজ থাকতে নামিয়ে, সেটাতে আন্দাজ ১ চামচ চিনি মিশিয়ে খেলে ওটা চ'লে যাবে। এটা রাত্রে শয়নকালে অথবা ভোরের দিকে খেতে হয়।

২৩। মূত্র শূলে— এরন্ড তৈলের সঙ্গে ১ চামচ আদার রস অল্প গরমজলে মিশিয়ে খেলে এটা উপশম হয়, তবে এর গন্ধটা বিরক্তিকর, বর্তমান ক্ষেত্রে গন্ধবিহীন (Odourless Castor oil) এরন্ড তৈলের ব্যবহার চলছে।

পায়ের শিরা কেঁচোর মত জড়িয়ে যাচ্ছে ও মোটা হয়েছে, পেশীগুঁড়লিও শক্ত, মাঝে মাঝে টনটন করা, ব্যথা ও যন্ত্রণা উপসর্গ আছে—সেক্ষেত্রে প্রত্যহ অল্প গরম দুধের সঙ্গে এক বা আধ চামচ মাত্রায় খাওয়া। এটা কিন্তু বিরচন হিসেবে ব্যবহার করা নয়, রক্তগত বায়ুকে নিবারণ করার জন্য। এর সঙ্গে পায়ে আস্তে আস্তে এই তৈলের মালিশ ব্যবস্থা।

২৪। কেটে গেলে— এরন্ড তৈলে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে কাটা জায়গায় চেপে বেঁধে দিলে রক্ত বন্ধ হ'য়ে যায় ও ব্যথা হয় না এবং তাড়াতাড়ি জুড়ে যায় এবং খেঁতলে গেলেও এইভাবে লাগাতে হয়।

২৫। অগ্নিদগ্ধ— পোড়া জায়গাটা আস্তে আস্তে মুছে দিয়ে তৎক্ষণাৎ এই তৈল তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে লাগাতে হয়। লাগানোর ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে পোড়ার জ্বালা কমে যায়। এ ক্ষেত্রে ক্ষত হ'লে একটু সাদা ধূনোর গুঁড়োর সঙ্গে মলম ক'রে লাগালে সেরে যায়।

২৬। শিশুদের পেটকামড়ানিতে— কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পেটে অল্প অল্প বায়ু হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই তৈল আর জল একসঙ্গে ফেটিয়ে নাভির চারিদিকে লাগিয়ে আস্তে আস্তে মালিশ করে দিতে হয়; এটাতে অল্প সময়ের মধ্যে কষ্টটা চলে যায়।

২৭। সাদা দাগে— গায়ের মাঝে মাঝে ফুটুফুটু দাগ। সেক্ষেত্রে এই তৈল প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর গায়ে মাখতে হয় অথবা ঐ দাগগুলিতে লাগাতে হয়। এমন কি শ্বেতিতর (শিবির রোগ) ঠিক প্রথমাবস্থায় এই তৈল দিনে ২।৩ বার ক'রে লাগাতে হয়। তবে কমপক্ষে ২।৩ মাস না লাগালে এই ক্ষেত্রে ফল দেখা যায় না।

২৮। আঁচিলের ঘা— অনেকে আঁচিলে চূণ, সোডা লাগিয়ে তুলে দেন, সেখানে ক্ষতও হয়, সেই ক্ষতে এরন্ড তৈল লাগালে সেরে যায়।

২৯। বাতের ব্যথায়— সৈন্ধব লবণের সঙ্গে গরম এরন্ড তৈল মিশিয়ে ভাল ক'রে পিষে ওটা ব্যথার জায়গায় লাগাতে হয়, এটাতেও কিছু উপশম হবে।

৩০। চোখে বালি বা ময়লা প'ড়ে জল ঝরতে থাকলে পালকে ক'রে চোখে লাগিয়ে দিলে ওটা বন্ধ হয়।

### ক্ষারের ব্যবহার

৩১। মেদ বৃদ্ধিতে— না খেয়েও মোটা হ'য়ে যাচ্ছে—এ ক্ষেত্রে এই এরন্ড পত্রের ভস্ম আধ গ্রাম আর তার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা হিং এক গ্রেণ (আধ রতি) এই দুটি একসঙ্গে

মিশিয়ে আধ কাপ আন্দাজ ভাতের মাড় (ফেন) মিলিয়ে খেতে হয়। এটা তৈরী করার নিয়ম—বেশ কিছুটা শুষ্ক এরন্ড পত্র (রোড়ির পাতা) হাঁড়িতে মৃদু বন্ধ করে মাটি লেপে পোড়া দিয়ে যে সাদা-কালো মিশানো ছাই পাওয়া যাবে সেইটা নিলেই হবে।

৩২। কাসে— কোন ওষুধেই বিশেষ কাজ হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে এই পাতার পোড়া মিহি ভস্ম ২/৩ রতি (৬ গ্রেণ) (এটা পূর্ণ মাত্রা) একটু পুরানো গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে চোটে খেতে হবে।

এ ভিন্ন দ্রব্যের রস, গুণ, বীৰ্য বিপাক ও প্রভাব বিচার করে রোগ প্রতিকারে আরও বহুক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে একটি রোগের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অ-সমীচীন—সেটা হ'লো রক্তপিণ্ডে, কারণ এরন্ডের পঞ্চাঙ্গ ফল মূল পত্রাদি—এর প্রতিটি অঙ্গ অগ্নিদ্রব্য, তাই এর প্রয়োগ নিষেধ।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., recinine and toxalbumin recin. (b) 45-50% fixed oil.



## শুভ্রুচী

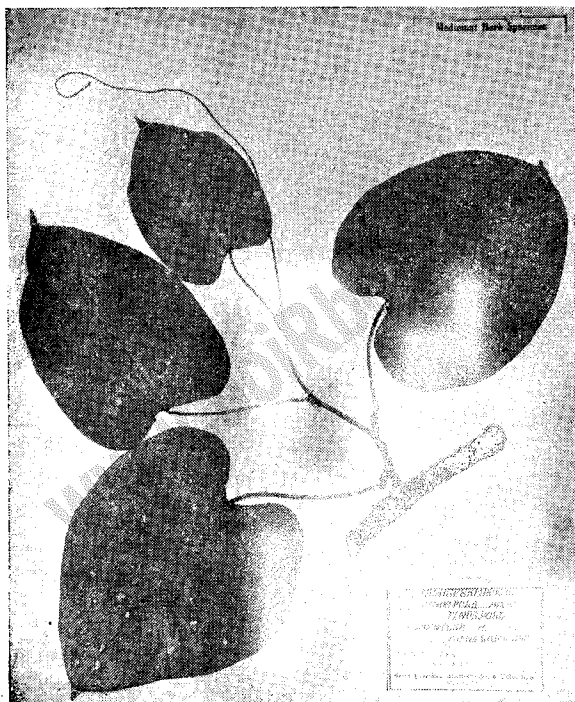
(গুলঞ্চ)

প্রবাদবাক্য হ'লেও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত আমাদের আত্মরক্ষা-প্রয়াস যে সর্বদাই মানসিক স্বভাব বা প্রবৃত্তি, তাই হ'লে ওঠে প্রবাদ বাক্য—

‘আত্মানং সততং রক্ষত’।

অর্থাৎ নিজেকে সর্বদা রক্ষা করো; তারই লোককথা—‘আপনি বাঁচলে বাপের নাম’। অবশ্য এ কথাটা আমরা লাগনসই ক্ষেত্র পেলেই প্রায়ই এটা আওড়ে দিয়ে থাকি। এই গড়ুচীর ক্ষেত্রে সে উপমাটা আজ কাজে লাগবে।

জীবজগতে এমন প্রাণী আছে (অবশ্য পদ্রুপ পক্ষে) তারা নিজের স্বগোত্র এমন কি নিজের সন্তানও তার আহাৰ্য্য হয়, তবে কোন সময়েই গর্ভধারিণী তাকে ভক্ষণ করে না; বাগে পেলে জন্মদাতাই বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে; এটা বিড়ালের ক্ষেত্রে। উন্মিড জগতের গড়ুচী সেই রকম। আমরা চলতি কথায় একে গুলুগু বলি।



*Tinospora tomentosa* Miers.

প্রসঙ্গের উৎসঃ— অথর্ববেদ বৈদ্যাককল্প ১।১৬৪।৫ সূক্ত—

ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সথায়ঃ সন্ধান্তি সোমং দধতি পয়্যাসি।

বৎসাদনী অভিগন্তি জনানাং অমৃতং ত্বদা কশ্চন হি প্রকেষঃ॥

মহীধর ভাষা করেছেন—

বৎসাদনী=বৎসাঃ অদ্যন্তে=ভূজ্যন্তে ইতি প্রিয়ঙ্গেন অদ্ ল্যুটী  
ডীপ্। ভুজঃ সকাশাৎ কশ্চনঃ আ-সমন্তাৎ যতো ভবতি সখায়ঃ স্বাং  
ইচ্ছন্তি। কিন্তুতাঃ সখায়ঃ সোম্যাসঃ সোমস্য সোম সন্পাদিনঃ  
ইচ্ছন্তি সোমং সন্দ্বলিত পয়াংসি অমৃতং ইতি গদুড়চী। গদুড়ং  
আত্মরক্ষণং চায়তে দোষদৃষ্টানি যানি তেষু অমৃতং প্রকোভঃ  
সন্ধানকৃৎচ।



*Tinospora cordifolia* Miers.

এই স্তূতিটির অনুবাদ হ'লো—বৎসাদনী, বৎস তোমার প্রিয় খাদ্য। তোমার কাছ থেকে  
যে কেউ সম্যক্ রূপে সোমের প্রিয়তা আনয়ন করে। তোমার রস অমৃত। এটি তাই  
গদুড়চী—যে আত্মরক্ষণ করে তাই গদুড়চী। গদুড় শব্দের অর্থ আত্মরক্ষণ। তোমাতে  
য়ুক্ত রসই অমৃত। দোষদৃষ্ট যা কিছু সবই তোমার কাছে এসে অমৃতের সন্ধান পায়।

এই বৈদিক স্তূতি থেকে নাম পাওয়া গেল বৎসাদনী, অর্থাৎ বৎসকে যে ভক্ষণ  
করে। এর এই বৈদিক নামটি কাব্যধর্মী কিন্তু সমীক্ষালব্ধ। এই উদ্ভিদটি মাংসল

লতা গাছ, অন্য গাছকে আশ্রয় করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরিণত বয়সের (৩।৪ বৎসরের) লতাগুলি থেকে সরু সূতোর মত এক প্রকার ঝড়ির বেরোয় (Aerial roots)। এই গুল্লগু লতা কেটে ঘরে রাখলে পচে যায় না, ঐ সূতোর মত বোয়োগুলির রস খেয়ে সে বেঁচে থাকে, তখন ওগুলি শুকিয়ে যায়। এগুলিকে সম্পূর্ণ খাওয়া হলে তারপর নিজে সে শীর্ণ হতে থাকে। তার এই বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য করেই এই বৎসাদন্য নামকরণ, এটি এর স্বভাব পরিচয়ের সংজ্ঞা নাম। এর আর একটি বৈদিক নাম অমৃত, এই নামটি তার গুল্লের পরিচায়ক। তারপর মহাধরের ভাষ্যে পাওয়া গেল সর্বজন পরিচিত তার গুড়ুচী নামটি। চরকের কালে এসে তার আরও কতগুলি নাম পাওয়া যায়—মধুপর্ণী (চরক সূত্রস্থান ৪ অধ্যায়), ছিন্নরুহা, ছিন্নোন্মভবা প্রভৃতি। এই মধুপর্ণী নামকরণের তাৎপর্য হলো—মধুকাল অর্থাৎ বসন্ত কালে এই উল্লগ লতাগুলি আবার নতুন পাতায় ভরে যায়, সেই জন্যেই তার এই নামকরণ। আর লতার টুকরো কেটে মাটিতে বসালেই গাছ হয়, সেই জন্যেই এর নাম ছিন্নরুহা ও ছিন্নোন্মভবা।

আমাদের মনে এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, একটি ভেষজের এতগুলি নামকরণের যুক্তি কি? বেদের উক্তিই তার যুক্তি, অর্থাৎ বৈদিক সূক্তে বলা হয়েছে—

‘সর্গাৎ ওষধীঃ বিবর্ত্তস্বঃ ওঘাৎ’।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভেষজকে তার ওষধীরূপ জানতে শ্রেণী, জাতি, বর্ণ ও গণের ভেদ আছে জেনেই ভৈষজ্য কার্যে তাকে কল্পনা করবে; নইলে সেই বংশের স্বভাব বা বিশেষ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। তাঁরা বলেছেন প্রত্যেকের জাতি ও গণ এবং বর্ণের দ্বারা তাদের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য জানা যায়। এই যে শ্রেণী জাতি বর্ণ ও গণের ভেদ সেটি কিন্তু আধুনিক (পাশ্চাত্য) পদ্ধতিতে নয়, বৈদিক মতে; এই লতাগাছটি পর্ব্যোনি প্রভব, মূলজ প্রভব এবং স্কন্ধজ প্রভব। এই তিনটি ধর্ম যেখানেই থাকবে তারই এক নাম হবে সোমযোনি অর্থাৎ মদিরার জন্ম দিতে পারে। উন্মিহ এবং অমৃতজন্মা এটি। একে অন্তঃসারপ্রধান ভেষজ বলা হয়।

চরক সংহিতায় বিভিন্ন রোগ প্রশমনে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করার একটা গুঢ় তাৎপর্য আছে, যেমন মধুপর্ণী নামের যেখানে উল্লেখ করেছেন, সেখানে তার কার্যকারিতা সন্ধানীয় ও স্নেহ উপগ এই হিসেবে। স্নেহ উপগ শব্দের অর্থ হলো, স্নেহ সম্পন্ন করা, আবার স্তন্য শোধন, দাহ প্রশমন ও রসায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার গুড়ুচী নামোল্লেখ, আবার বয়ঃস্থাপক বলে যেখানে উল্লেখ, সেখানে তার নাম অমৃত। তাঁদের চিন্তাধারা হলো নাম শুদ্ধ নামই নয়, সেটা হবে সার্থক শব্দ।

### পরিচিতি

এই বৃক্ষারোহী গাছ কখন কখন বেড়ার গায়েও দেখা যায়। দীর্ঘদিনের হলে খুবই মোটা হয়, এই লতাগুলি আগুলের মত মোটা হলে, সরু সূতোর মত শিকড় বেরিয়ে ঝুলতে থাকে (Aerial roots)। লতার গায়ে ছালগুলি কাগজের মত পাতলা, ভিতরটা যেন একগোছা সূতো দিয়ে পাকানো দাঁড়ি, স্বাদে তিক্ত ও পিচ্ছিল। পাতা দেখতে অনেকটা পানের মত হলেও সাদাশো হৃৎপিণ্ডাকৃতি, শীতকালে পাতা পড়ে বসন্তে আবার নতুন পাতা বেরোয়। ছোট ছোট হরিদ্রাভ সাদা ফুল; ফল হয় মটরের মত।

সাধারণতঃ দু'টি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। একটির বোটানিক্যাল নাম *Tinospora cordifolia* Miers. এই গুল্মকে সাধারণ লোকে বলে 'ঘোড়া গুল্ম'। এটি স্বাদে স্বল্প তিক্ত। আর একটি প্রজাতি পাওয়া যায়, তার লতাগুলির গায়ে দু'টি বৃদ্ধি দানা হয়, একে বলা হয় 'পশ্ম গুল্ম'। এই লতাগাছের পাতাগুলি একটু রোমশ এবং আকারে বড়। এই লতার রসে পিচ্ছিলতা অনেক বেশী এবং স্বাদে খুবই তিক্ত। এই প্রজাতির বোটানিক্যাল নাম *Tinospora tomentosa* Miers. এদের ফ্যামিলি *Menispermaceae*. ভারতের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় পত্র ও সমগ্র লতা। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার—আমাদের প্রাচীন বনৌষধির গ্রন্থ রাজনিষিষ্টদুতে আর এক প্রকার গুড়ুচীর উল্লেখ দেখা যায়, তাকে বলা হ'য়েছে 'কন্দোৎসব'। যার অর্থ হ'ল কন্দ থেকে উৎপত্তি। তারই আরও নাম দেওয়া হয়েছে 'পিন্ডামতা', 'কন্দরোহিণী', রসায়নী। এই নামের গুল্ম কিন্তু আমাদের কাছে অপরিচিত হয়েই আছে; অবশ্য আমাদের পূর্বসূরী প্রাচীন বৈদ্যগণেরও এ একই প্রতিধ্বনি।

আর এক প্রকার গুল্ম বর্তমানে আমরা দেখতে পাই; তার লতার গায়ে ঘন বৃদ্ধি থাকে (পশ্মবীজের চাকায় যেমন থাকে সেইরকম)। এই লতাগাছের পাতাগুলি রোমশ নয়। এই লতাগাছটির বোটানিক্যাল নাম *Tinospora malabarica* (Lam) Miers. হিন্দিতে একে গিলোয় বা গুদুচ্ কিম্বা গুড়ুচ্ বলে।

### প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে গুড়ুচীর ব্যবহার

প্রথমেই বলে রাখি পূর্বাচার্যগণ কতকগুলি ভেষজকে কাঁচা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন; এই গুড়ুচীও তার মধ্যে অন্যতম।

### চরক সংহিতায় ব্যবহার

বিষম জ্বরে (চিকিৎসিত স্থান ১৫ অধ্যায়); কামলায় (জন্ডিস) ২০ অধ্যায়; পিত্তজ বমনে ২৩ অধ্যায়ে; বাতরক্তে ২৯ অধ্যায়ে; স্তন্য-শূন্যার্থে ৩০ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

### সুশ্রুতে ব্যবহার

অশ্রুগে চিকিৎসিত স্থান ৬ অধ্যায়ে; প্রবল পিত্তাম্বিকজনিত বাতরক্তে চিকিৎসিত স্থান ৫ অধ্যায়ে; বাত জ্বরে উত্তরতন্ত্র ৩৯ অধ্যায়ে প্রধানভাবে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

শরবতীকালে বাগ্ভটে (৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ) ব্যবহার।

মহ রোগে চক্রদন্ত সংগ্রহ (চক্রপাণি দন্ত কৃত ১১শ খৃষ্টাব্দ) ব্যবহার করেছেন। জীপদে (ফাইলোরিয়ায়), আমবাতে, কুষ্ঠে ভাবপ্রকাশ (ষোড়শ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ) এই গাছের পত্র। কামলা রোগ ও জীর্ণ জ্বরও প্রয়োগের বিধান দিয়েছেন, তবে ভাবপ্রকাশকার চরকেরই ব্যবস্থাগুলিকে পুনরাবৃত্তি করেছেন।

### লোকায়তিক ব্যবহার

১। পুরাতন বা জীর্ণ জ্বরে— গুল্মের পাতা শাকের মত কুচিয়ে ভেজে খেলে জ্বর ছেড়ে যায়। পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ৮/১০ গ্রামের মত গুল্মের ডাঁটা

অল্প জল দিয়ে থেঁতো করে নিংড়ে ঐ রসকে ছেঁকে, অল্প গরম ক'রে খেতে হয়, এটাতেও কাজ হয় অথবা থেঁতো করা ঐ গুলুগু এক কাপ জলে সিদ্ধ করে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে অল্প চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। অথবা গুলুগুর রস বা ক্বাথ দিয়ে ঘি (ঘৃত) তৈরী ক'রে খেতে দিলেও জ্বর ছেড়ে যায়।

২। অরুচিতে— বাঁদের মূখে কিছু ভাল লাগে না, খেতে ইচ্ছে হয় না, তাঁরাও এই পাতা ভাজা খেয়ে দেখুন, অরুচি চলে যাবে।

৩। বাতের যন্ত্রণায়— প্রায়ই হাত-পা কন্কন্ করে, এই ক্ষেত্রে ১০ গ্রাম অন্দাজ গুলুগু ছেঁচে উপরিউক্ত নিয়মে ক্বাথ ক'রে অল্প একটু দুধ মিশিয়ে কয়েকদিন খেলে ওটা উপশম হবে। তবে যে সব কারণে (আহার-বিহারে) বাত বাড়ে সেগুলিকে বর্জন তো ক'রতেই হবে।

৪। পচা ঘায়ে— ১০/১৫ গ্রাম থেঁতো গুলুগুর ক্বাথ ক'রে সেটা দিয়ে ক্ষত ধুলে ওর বিষদিনি দোষটা কেটে যায়।

৫। হৃৎ কম্পনে— ৫/৭ গ্রাম গুলুগুকে ক্বাথ ক'রে খেলে ওটা ক'মে যাবে, তবে ২ গ্রেণ বা একরাত গোল মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যগণ।

৬। রক্তার্শে— যাঁরা এ রোগে ভুগছেন, তাঁরা ৫/৭ গ্রাম গুলুগুকে ক্বাথ করে খেয়ে দেখুন, প্রশমিত হবে। তবে এই ক্বাথকে ভাগ ক'রে দু'বেলায় খেতে হবে।

৭। দ্বিভৌয় যোগ (অর্শের)— একটা মাটির খুরিতে গুলুগুর রস মাখিয়ে, সেই পাত্রে দই পেতে সেই দই খেলে অর্শ উপকার হয়।

৮। অগ্নিমান্দ্য— খাওয়ার প্রবৃত্তিও যেমন কম, আবার খেলেও হজম হ'তে চায় না, যাকে বলা হয় অগ্নিমান্দ্য রোগ (শ্লেষ্মপ্রধান অগ্নিমান্দ্য), এ ক্ষেত্রে গুলুগু শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে প্রত্যহ ১ গ্রাম ক'রে জলসহ খেয়ে দেখুন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ক্ষিধে বেড়ে যাবে।

৯। স্নরভংগ— স্থূলকায়, তার সঙ্গে আবার কফের যোগ হ'লে অনেকের স্নরভংগ হয়, সেখানে গুলুগুর ক্বাথে কাজ হয়।

১০। কাসিতে— যে কাসি হেঁকে ডেকে আসে না, খুস্-খুসে, সেখানে একটু গুলুগুর ক্বাথে মধু মিশিয়ে খেলে ও অসুবিধেটা ক'মে যাবে।

১১। বাতরক্তে— অনেক সময় গায়ে চাকা চাকা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে শক্তও হয়, আবার ব্যথাও থাকে; এ ক্ষেত্রে গুলুগুর রস বা ক্বাথ দিয়ে তৈরী তেল মাখা, আভাবে গুলুগুর রস গায়ে মাখা ও গুলুগুর ক্বাথ খাওয়া, এর দ্বারা ঐ বাতরক্তজনিত অসুবিধে যেটা আসছে সেটা দূর হয়।

এটি পক্ষ্মগুলুগু হওয়া দরকার, তা না হ'লে আশানুরূপ উপকার হয় না। আর এর সঙ্গে যদি কোন গুণ্গুলু ঘটিত ঔষধ খাওয়া যায় আরও ভাল হয়।

১২। কামলা বা ন্যাযা রোগে— ২ ইঞ্চি পরিমাণ গুলুগু চাকা চাকা করে কেটে ১ কাপ জলে রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জলটায় একটু চিনি মিশিয়ে খাওয়া।

১৩। বাতজ্বরে— সর্দি কাসি কিছুই নেই, হঠাৎ হাই উঠে কে'পে জ্বর এলো, আবার খানিকক্ষণ বাদে ক'মে গেল, একে বলে বাতজ্বরের জ্বর, এ ক্ষেত্রে ৮/১০ গ্রাম গুলুগুকে থেঁতো ক'রে তার ক্বাথ ছেঁকে ঠান্ডা হ'য়ে গেলে খেতে হয়।

১৪। শূল ব্যাথায়— গুলুগু চূর্ণ ১ গ্রাম, গোল মরিচের গুঁড়ো সিকি গ্রাম একসঙ্গে গরম জলে দিয়ে খেতে হয়।

১৫। বসন্ত রোগে— হাত-পা অসম্ভব জ্বালা করে; সেক্ষেত্রে গুলুগু রস ক'রে

(অল্প জল দিয়ে থেঁতো ক'রলেই রস বেরোয়) হাত-পায়ে লাগালেই ঐ জ্বালা কমে যায়।

১৬। পেটের দোষে— প্রায়ই ভুগে থাকেন, পেট জ্বালাও করে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে ভাব আসছে, এ ক্ষেত্রে গুলগুণের কাথ কাজে আসে।

১৭। অরুণিকায়— মাথায় ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি ও ব্যথাও আছে, আবার মূত্রে মাম্‌ড়িও পড়ে; এটি পিত্তশ্লেষ্মাজ ব্যাধি। এ ক্ষেত্রে গুলগুণের রস দিয়ে তৈরী তেল মাথায় লাগালে ভাল কাজ হয়, তা না হ'লে ১ চামচ রস ৩/৪ চামচ জল মিশিয়ে একটু গরম ক'রে সেইটা প্রত্যহ একবার করে কয়েকদিন লাগানো আর গুলগুণের রস খাওয়া।

১৮। সোরিয়াসিসে (Psoriasis)— গায়ে চাকা চাকা হয়ে ওঠে, মাম্‌ড়ি পড়তে থাকে, আবার কোন কোন জায়গা থেকে রস গড়াতে থাকে, এ ক্ষেত্রে গুলগুণের কাথ খাওয়া, গুলগুণের রস দিয়ে তৈরী তেল মাথা, আর গুলগুণ রস ক'রে গায়ে মাখা। অল্পভূত ফল পাবেন।

১৯। পিত্ত-বমিতে— পেটে কিছু থাকছে না, সে ক্ষেত্রে আধ কাপ জলে দেড় বা দুই ইঞ্চির মত গুলগুণ পাতলা চাকা চাকা ক'রে কেটে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর তা থেকে ছেঁকে ২/১ চামচ ক'রে জল নিয়ে তার সঙ্গে ২/১ চামচ দুধ মিশিয়ে খেতে হয়। অবশ্য এটা পিত্তশ্লেষ্মা জন্য বমনেই ভাল।

২০। পিপাসায়— এভাবে কাটা গুলগুণ ও মোরী একসঙ্গে ভিজিয়ে ঐ জল একটু একটু ক'রে খেতে দিলে পিপাসা চ'লে যায়।

২১। মেদাম্বিতায়— যারা না খেয়েও মোটা, খেলে তো আর কথাই নেই, তাঁরা ৮/১০ গ্রাম গুলগুণের কাথ ক'রে (১ কাপ আন্দাজ) তাতে ১ চামচ মধু মিশিয়ে খেয়ে দেখুন, তবে ২/৪ দিন খেয়েই হতাশ হ'লে চ'লবে না।

২২। ক্রিমিতে— গুলগুণের কাথ একটু একটু খেতে দিলে, বা খেলে ক্রিমির উপদ্রব কমে যায়।

### গুলগুণের চিনি বা শ্বেতসার প্রস্তুত

পরিণত বয়সের মোটা মোটা গুলগুণকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে থেঁতো ক'রে ৮ গুণ জল দিয়ে ভাল ক'রে ম'স্টে, যাকে বলা হয় চট্‌কে নিয়ে, একটা চুবড়িতে ঢেলে দিলে সিটেগুলি মোটামুটি ভাবে বেরিয়ে যাবে, তারপর ঐ জল থিতিয়ে গেলে উপরের ঐ জল আস্তে আস্তে ঢেলে ফেলতে হবে। নিচে ষেটা থিতিয়ে ব'সে আছে সেইটাই রৌদ্রে শুকিয়ে ছেঁকে নিলেই গুলগুণের শ্বেতসার পাওয়া যায়; একেই গুলগুণের চিনি বলে। বহু রোগের ক্ষেত্রে এই চিনি ব্যবহার করা হ'য়েছে।

২৩। মস্তিস্কের দুর্বলতায়— গুলগুণের চিনি ৩ রাত থেকে এক আনা মাত্রায় একটু দুধের সঙ্গে খেলে ঐ দুর্বলতাটা কেটে যায়।

২৪। দুর্বলতায়— দীর্ঘদিন থেকে চ'লছে। অস্থির কোন পোষণ নেই; সেক্ষেত্রে অল্প ঘিয়ের সঙ্গে গুলগুণের চিনি ১ গ্রাম আন্দাজ মিশিয়ে চটে খেলে আস্তে আস্তে ওটা চ'লে যাবে।

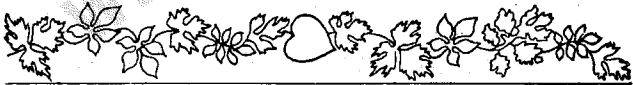
২৫। প্রমেহ রোগে— প্রমেহ কথাটার দ্বারা প্রস্রাব ঘটিত বহু রোগের ইঙ্গিত বহন করে, তার মধ্যে যে মেহে প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে লালার মত নিগ'ত হয় তাকে বলা হয় লালা মেহ। এই ক্ষেত্রে গুলগুণের চিনি ২ গ্রাম এবং তার সঙ্গে কাবার্‌চিনি



ই গ্রাম মাত্রায় একত্রে দুধ সহ খেলে কয়েক দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত যে, নিম গাছের গুলুগুই বেশী তিক্ত হয়, এবং সেই গাছের গুলু গ্রহণ করে। এরা অপরাধিতা লতা হ'লেও অপরের রস গ্রহণ করার উপযোগী পরিবেশই বা কোথায়? তারা তো মাটি থেকে রস গ্রহণ করে। তবে প্রজাতি ভেদে সে যে গাছই আশ্রয় করে থাকুক না কেন, স্বল্প বা তিক্ত হবেই। সাধারণ গুলুগু, যাকে আমরা চলতি কথায় 'ঘোড়া গুলুগু' বলি (*Tinospora cordifolia*) সে গুলুগু নিমগাছের হ'লে সে তিক্ত হবে। আবার পল্লীগুলুগু যদি আমড়া গাছেও হয়, তার তিক্ততার তীব্রতা যিনি আম্বাদ না করেছেন তিনি বুঝবেন না।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Giloin. (b) Giloinin. (c) Glycoxides of myristic and palmitic acid. (d) Unidentified bitter principle. (e) A neutral substance. (f) Glycosides.



## ভূগরাজ

(শিরস্ত্রাণ মার্কা)

“শাককেও শাক, সঙ্গে মুলো” বলে একটা গেরো কথা আছে, এই ‘মার্কা’ কিন্তু সেই ধরণের বনৌষধি।

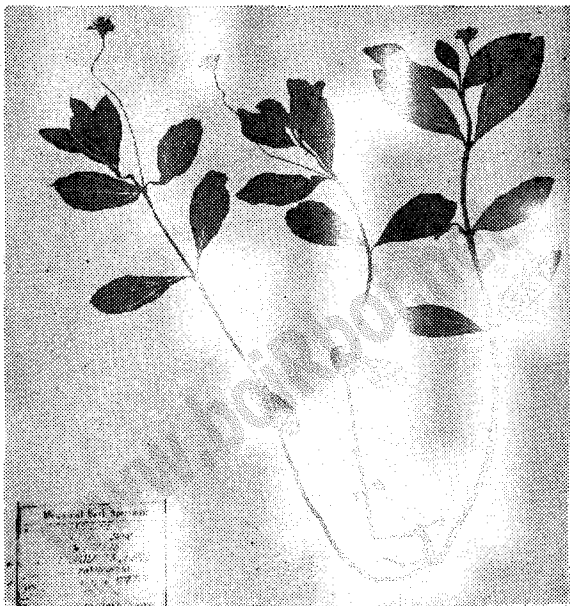
শিরোনামটায় শিরস্ত্রাণ যথা-অর্থে সার্থক হলো তার শারীরিক ক্রিয়ায়। সে শিরোরোগকে দ্রাণ তো করেই, অধিকন্তু সে দেহে সৃষ্টি করে সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান। বিংশ

শতাব্দীর আমরা অনেকে ভাবি যে, সুদূর অতীতের ভারতে বোধ হয় রূপচর্চার কোন রেওয়াজ ছিল না; কিন্তু তা যে নয় সে ইঙ্গিত বৈদিক তথ্যেই পাওয়া যায়।

### বৈদিক যুগের সমীক্ষা

শিরোগম্ভন সীদ মা' হ্রা সুৰ্যোহভি তাপসীন্ মার্কবঃ অচ্ছিন্ন-  
পত্রঃ অন্দুবীক্ষস্বান্দ্র অঙ্গারকঃ জন্তুন্ সুকৃতস্য লোকে।

(অথর্ববেদ—৮৪২।২১।২৩৩ সুক্ত)



এই সুক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—

শিরোগম্ভন গম্ভনি=গভীরে স্থানে। হ্রা সীদ উপবিশ। মা হ্রা  
সুৰ্য্যা অভি তাপসীৎ=সুৰ্য্যা ন অভি তাপ্যেৎ। হ্রা মার্কবশ্চ  
অঙ্গারকঃ ভৃগুরজঃ। মার্কব ইতি মারয়তি ক্রিপ্। মারি কেশ-  
ক্রেতে কয়তে কৃ অচ্। ভৃগুরজ=ভৃগু রোলে অন্দ্র রঞ্জয়তি অসুন্  
প্রাণান্ প্রকাশয়তি। হ্রা অঙ্গারকঃ চ পিশায়া হি যম্বৎ (অথর্ববেদ  
২৬৯।২২।৩)। অচ্ছিন্নপত্রঃ মূলতঃ সৰ্ব্বং অন্দুবীক্ষব, লোকে  
সুকৃতস্য সুদখিনোহপি ক্রিমীন্ অভি তাপসীৎ।

প্রচলিত নাম ভাইরাস্ (Virus), এদের বৈদিক নাম 'ষাতুধানঃ'; বিশ্বের যে কোন সত্তায় এরা অবস্থান করে এবং দুর্বল ক্ষেত্র পেলেই এরা সক্রিয় হ'য়ে আক্রমণ করে; তখন সে আর 'জড়' নয়, 'অজড়'। ঋষিবৃন্দ ব'লেছেন যে—একসঙ্গে শোওয়া, বসা, খাওয়া, একে অন্যের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা বা নিশ্বাস গায়ে লাগা প্রভৃতি কারণে কতকগুলি রোগ সংক্রমিত হয়। এই নেত্রাভিষ্যন্দ রোগও তার মধ্যে একটি। অভিষ্যন্দ শব্দের অর্থ হ'লো—সর্বতোভাবে সন্দন করা, অর্থাৎ করণা বওয়া অর্থাৎ বরংবর ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়া ও চোখ কর্কর ক'রা—এই জন্য এই রোগকে নেত্রাভিষ্যন্দ পর্যায়েও আনা হয়, যাকে আমরা চলতি কথায় চোখ ওঠা বলে থাকি, যদিও চোখ ওঠার প্রকৃত কারণ এতে থাকে না। এ রোগে কি ক'রে তাকে ব্যবহার করা হয়—কাঁচা পাতা গরমজলে ধুয়ে নিয়ে, একটু খেঁতো ক'রে বা হাতে রংগড়ে দুই-এক ফোঁটা রস সকালে বৈকালে দিনে দুইবার ক'রে চোখে দিতে হয়; তবে অসাধারণ কিছু হ'লে চক্ষু-চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ভারতীয় চিকিৎসাধারার অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাইমক্ সাহেব তাঁর "ফারমাকোগ্রাফিয়া অফ ইন্ডিকা" নামক পুস্তকে এটি যে চক্ষুরোগের ক্ষেত্রে কাজ করে এটা লিখে গিয়েছেন। এভিন্ন আরও লোকায়তিক ব্যবহার আছে।

### লোকায়তিক ব্যবহার

১। ফুলোয়— হঠাৎ ঠান্ডা লেগে হাতে পায়ের গাঁট ফুলে গেলে (এটা সাধারণতঃ কফের বিকারে হয়) এই হাতিশুড়ো পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে ঐ সব ফুলোর জায়গায় লাগালে ওটা ক'মে যায়।

২। আঘাতের ফুলোয়— এই পাতা বেটে গরম ক'রে ঐ আঘাতের জায়গায় লাগালে ব্যথা ও ফুলো দুইই চ'লে যায়।

৩। বাগীর ফুলোয়— উরু ও তলপেটের সন্ধিস্থানে অর্থাৎ কুচকীতে ষোটা হয় তার নামই বলা হয় বাগী, ডান বা বাম যে কোন দিকেই হ'তে পারে। সাধারণতঃ এটা বৌন সংসর্গের সময় অস্বাভাবিক অবস্থানের জন্য অথবা মেহ বা ঔপসর্গিক মেহ (গণোরিয়া) রোগগ্রস্ত লোকগুলি এই রোগে বেশী আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও ঐ পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে লাগালেও ক'মে যায়।

৪। রিউমেটিকে— এই বাতে ফুলো থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ অস্থির সন্ধিস্থানে (গাঁটে) বেশী হয়। এ ক্ষেত্রে এরন্ড তৈলের (রোড়ির তেল) সঙ্গে এই পাতার রস বা পাতা বাটা দিয়ে পাক ক'রে, ছেঁকে নিয়ে সেই তৈল গাঁটে লাগাতে হয়।

৫। বিষাক্ত পোকাক কামড়ে— জ্বালা করে, কোন কোন ক্ষেত্রে ফুলেও যায়, সে সময় এই পাতার রস ক'রে লাগালে ওটা ক'মে যায়।

৬। লেপ্সা জ্বরে— সর্দিতে বৃক ভার, সেক্ষেত্রে এই পাতার রস ২ চামচ একটু গরম ক'রে ছেঁকে নিয়ে খেতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যরা। এর দ্বারা সর্দিটা বন্ধ হ'য়ে বেরিয়ে যায়; অবশ্য এটা আমার শোনা কথা।

৭। টায়ফয়েড জ্বরে— পিপাসা ও সঙ্গে মাথা চালাও প্রবল থাকে, এ ক্ষেত্রে ঐ পাতার রস গরম ক'রে, ছেঁকে ঐ রস ১০ ফোঁটার একটু জল মিশিয়ে খেতে দিতে হয়। আশ ঘণ্টা অন্তর দুই/তিন বার খাওয়ালে এই উপসর্গটা প্রশমিত হয়, তবে দুই-তিন বারের বেশী খাওয়ানো উচিত নয়।

৮। ফেরিন্‌জাইটিসে— অথবা লেরিন্‌জাইটিস্ হ'লে পাতার রস ২ চামচ আধ কাপ অল্প গরম জলে মিশিয়ে গারগেল্ (gargle) ক'রতে হয়। প্রত্যহ সকালে বৈকালে দুই বার ক'রতে পারলে ভাল। এমন কি গলার মধ্যে ক্ষত ভাব দেখা দিলে সেটাও সেরে যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে এর সঙ্গে ২/৩ চামচ বাসক পাতার রস একটু গরম ক'রে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে পারলে কফের বিকারটা নষ্ট হয়।

৯। এক্‌জিমায়— এই পাতার রস লাগালে ক'মে যায়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids. (b) Saponin. (c) Essential oil. (d) Fatty acids.



## ধূতূর

অনেক লোকই ধূতূর হয়, এমন কি পশু-পক্ষীর মধ্যেও তাদের কার্ণের বিশেষ অভিব্যক্তিতে কতকটা আন্দাজ করা যায় যে, এরাও কম নয়। এই জড়াজড় বৃক্ষলতাদির মধ্যেও যে এই জাতীয় ধূতূর গাছও আছে, সে সম্মান পাওয়া গেল আমাদের বেদ সংহিতায়।

এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, নড়েচড়ে না, কথাও কয় না অথচ তাদের এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটা তাঁরা কি বুঝেছিলেন?

সঙ্গ না ক'রলে যেমন কারুর চরিত্র বোঝা যায় না, এটা সেই রকমই। এই নিবন্ধোক্ত গাছটির সঙ্গ ক'রেই উপলব্ধ অভিজ্ঞতায় তার নামকরণ করা হয়েছিল 'ধূতূর'—সে

উপরিভাগ শৃঙ্খলের মত, তোমার লোকনাম হস্তিশৃঙ্খল। তোমার শৃঙ্খলাকৃতি দন্ডিট দন্তুর, বহু পাপজ ব্যাধি দূর করে। ব্যাধিগুলি দেহের উভয় পার্শ্ব জন্মগ্রহণ করে, সেগুলি দেহের পাশক। (পাশক=বন্ধন)

### সংহিতার যুগের অনদৃশীলন

উপরিউক্ত ভাষ্যের অনূসরণে পাওয়া যাচ্ছে, প্রথম বস্তুব্যে তার পরিচিতির বর্ণনা, তারপর তার তৎপরতা কি ধরনের এবং কোথাকার রোগে।



### পরিচিতি

শ্রীহস্তিনী বা হস্তিশৃঙ্খল এই নাম দুটি ঐ গাছটির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা নাম; হস্তীর শ্রী হ'চ্ছে তার শৃঙ্খল; এই গাছের পদ্ব্যপদ্ব্যটির গঠন অবিকল হাতের শৃঙ্খলের মত। এই নামকরণটি নিরর্থক নয় বলা যেতে পারে; আমরা চলতি কথায় একে হাত-শৃঙ্খলের গাছ বলি; এই গাছটির বিভিন্ন প্রাদেশিক নামও আছে, যেমন—মহারাজের বলা

হয় ভূরুন্ডী, হিন্দীভাষী অঞ্চলে হাতাজুড়ি সারিয়ারি, তেলেগুতে নাগদন্তী, ওড়ীয়া ভাষায় বলা হয় হাতিশুন্ডা প্রভৃতি।

বর্ষজীবী ছোট গুল্ম, ভারতবর্ষের অধঃসম্ভূত অতি সাধারণ গাছ, এক দেড় ফুট উঁচু হয়। এই গাছের কাণ্ডগুলি ফাঁপা ও নরম, বৈশিষ্ট্য তার পুষ্পদণ্ডে। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Heliotropium indicum* Linn. ফ্যামিলি Boraginaceae.

এই গাছটি দুটি ধারায় অনুশীলিত হয়েছে। একটি চরকীয় ধারায়, আর একটি সৌশ্রুতীয় ধারায়। চরক ধারায় দেখা যাচ্ছে পাণ্ডকর্মীর চিকিৎসার অন্তর্গত শিরোবিরেচনের ক্ষেত্রে তার অনুশীলন। আর অপর ধারাটির অনুশীলন প্রত্যক্ষতঃ ব্যাধি বিমোচনের ক্ষেত্রে। চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে বৈদিক নাগদন্তী নামটিই গৃহীত হয়েছে আর সুশ্রুতে চিকিৎসাস্থানের ১৭ অধ্যায়ে আর সুগ্রস্থানে গুণ পরিচয়েও এই নামটিকে গ্রহণ করা হয়েছে অর্কাদ্বিগণে। চরকের সমীক্ষায় শিরো-বিরেচনের কষায় তিক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী, যেহেতু ভেষজটি বায়বীয় প্রধান, তাই কফ-পিণ্ডাবিকারজনিত রোগে সে কার্যকরী। তারপর সুশ্রুতের চিকিৎসাধারা প্রত্যক্ষতঃ ব্যাধিঘাতক হয় যে, যে ক্ষেত্রে যে যে দ্রব্য, তাদেরকে নিয়েই এক একটি গণের গঠন করা হয়েছে (সুগ্রস্থান ৩৮ অঃ)। তাঁদের মতে নাগদন্তীর মূলের রস, পত্রের রস ক্টিম ও কুষ্ঠপ্রশমক, বিশেষ করে ব্রণশোধক। তাই বিসর্পরোগের চিকিৎসায় (চিঃ স্থান ১৭ অঃ) নাগদন্তীর মূলের ও পাতার রস ব্যবহার করেছেন; কিন্তু লোকায়তিক ব্যবহারে দেখা যায়—সে নেত্রাভ্যাসন্দ, যাকে চলতি কথায় বলা হয় ‘চোখ ওঠা’, রোগের একটি নিশ্চিত ফলপ্রদ ওষধি।

তাই ব'লছি—গোদের উপর বিষফোড়ার মত এই চক্ষুরোগ। অস্ভূত তার অনুপ্রবেশ; রাতে শুয়ে আছেন, সকালে উঠে অনুভব করতে লাগলেন যে, আপনার চোখ আর আপনার এস্ত্রিয়ারে নেই, মনে হবে চোখে বালি পড়ে চোখ কর্কর করছে আর চোখ-নাক দিয়ে খালি জল আসছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে এটা একটা অজ্ঞাত ভাইরাস ইনফেকশন (Virus infection), এর অনুপ্রবেশ বন্ধ করা মূর্শকিল। তবে এটা সত্যি যে, সসাগরা পৃথিবী এখন বিজ্ঞানী মানুষের মূঠোর মধ্যে; সুতরাং নিত্য নূতনের অনুপ্রবেশ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে এ জাতীয় রোগ তৎকালিক ভারতীয় চিকিৎসকদের জানা ছিল না তা নয়। তাঁরা বলেছেন, রোগটি যখন-তখন আসে আবার নিয়ম করেও আসে, অর্থাৎ বৎসরের সব সময় আসার সুযোগ খোঁজে, একটু ফাঁক পেলেই আসে; সে ফাঁকটা হ'লো ঋতুর বিপর্যয় হ'লে পর। তার মানে গ্রীষ্মে যদি বসন্তের উদয় কিম্বা বসন্তে গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়, এমনি বর্ষায় শরতের অথবা গ্রীষ্মের আগমন হয় তখনই এসে নয়নম্বয়ে এই রোগের বসতি হয়, এই জন্য সুশ্রুতে পরিষ্কার বলা আছে—

“স্বেদাৎ রজো-ধূম নিষেবণাচ্ছর্দে বিঘাতাদ্ বমনাতি যোগাৎ।  
তথা ঋতুগাং চ বিপর্যয়েণ বাষ্প গ্রহাৎ সুক্ষ্ম নিরীক্ষণাৎ চ।”

অর্থাৎ চোখের রোগের সংখ্যা ৭৬ প্রকার। তাদের কারণও পৃথক পৃথক, যেমন রৌদ্র লাগলে, ধোঁয়া লাগলে, খুব বমি হ'লে, নিদ্রা না হ'লে এবং ঋতুর বিপর্যয় হ'লে চোখের রোগের কারণ হয়। যেগুলি আগন্তুক মাত্র সে সব রোগের ভোগকাল ৫ থেকে ৬ দিন, আর হেতু হয় পিণ্ড-শ্লেষ্মার বিপর্যয়। তা ছাড়া সংক্রামক হ'লেও দেখা দেয়, কারণ কোন কোন ব্যাধি ‘জড়াজড়’ কারণেও জন্ম নেয়। যার আধুনিক

৪। পোড়ায় সাদা নাগে— এক্ষেত্রে ভুগরাজের রস থেকে ও কেশদূর্তের রসে দু'বাঁ বেটে লাগালে কয়েকদিনের মধ্যে গায়ের স্বাভাবিক রং ফিরে আসে।

৫। চোখ ওঠায়— পুঁজ পড়তে থাকলে ২০/২৫ ফোঁটা ভুগরাজের রস জলে মিশিয়ে ঐ জলে চোখ ধুলে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়।

৬। পায়োরিয়ায়— ভুগরাজের পাতা চূর্ণ করে মাজনের মত ২/৪ মিনিট মেজে মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়। এর দ্বারা ঐ দোষটি সেরে যায়।

৭। অম্বদৌৰ্ভল্যে— দাস্ত হতে চায় না—তাদের এটি বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে এটি দীর্ঘদিন ব্যবহার না করাই ভাল।

৮। পুরাতন আমাশয়— ক্ষয়ীর্ণ মল, তার সঙ্গে আমও আছে, মলের রংও ভাল নয়; সেক্ষেত্রে এর পাতার রস ২৫/৩০ ফোঁটা প্রত্যহ আধ কাপ ছাগল দুধের সঙ্গে কয়েকদিন খেতে হয়।

৯। শোথে— সর্বশরীর অথবা হাত-পায়ে একটু ফুলো ফুলো ভাব, সেক্ষেত্রে ২৫/৩০ ফোঁটা এই পাতার রস দুধের সঙ্গে খেলে ও ভাবটা কেটে যায়।

১০। রক্ত শ্বেতকণিকা বেড়ে গেলে— এই পাতার রস উপরিউক্ত মাত্রায় দুধের সঙ্গে খেতে দিলে ওটি আবার স্বভাবে ফিরে আসে।

১১। কেশপতনের বিশেষ ক্ষেত্র— যেসব মা শ্বেতপ্রদরের শিকার হয়েছেন, তাঁদের মাথার চুল প্রায় ক্ষেত্রেই উঠে যেতে থাকে। তাঁরা ভুগরাজের পাতা সিদ্ধ করে সেই জলে দিনে ২ বার মাথা ধুয়ে ফেলবেন, এর দ্বারা ৩।৪ দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফল পাবেন।

১২। ক্রিমির উপদ্রবে— কুচো বা বড়ো ক্রিমি সব বয়সের লোককেই ব্যতিব্যস্ত করে, সেক্ষেত্রে এই ভুগরাজের পাতার রস ১ চা-চামচ (পূর্ণবয়স্কদের জন্য) সিকি কাপ জলে মিশিয়ে খেলে ওটির উপদ্রব কমে যায়।

১৩। দাদে— ভুগরাজের রসের প্রলেপ দিলে বেশ কাজ হয়।

১৪। স্নায়বিক দুর্বলতায়— ভুগরাজের রস ২৫।৩০ ফোঁটা প্রত্যহ সকালে মধু সহ খেলে স্নায়ু বল ফিরে আসে।

১৫। পাণ্ডুরোগে— কুলেখাড়ার পাতার রস না দিয়ে ভুগরাজের পাতার রস খাওয়ালে আরও বেশী কাজ হয়।

১৬। পুরাতন অম্ল ও অজীর্ণে— যাঁরা এতে ভুগছেন, তাঁরা সকালে ও বিকালে ১ চা-চামচ মাত্রায় ভুগরাজের পাতার রস খেয়ে দেখুন, এতে উপকার পাবেন।

১৭। দাঁতের মাড়ির দুর্বলতায়— ভুগরাজের পাতার গুড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ি শক্ত হয়। মাড়িতে ঘা থাকলে ঐ পাতার কাথে কয়েকদিন মুখ ধুলে সেরে যায়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Alkaloids viz., ecliptine, nicotine. (b) Steroidals constituents.  
(c) Fatty acids.



## শ্রীহস্তিনী

চোখে কি হাতি ঢুকেছে? গ্রাম বাংলায় এমনি একাট রহস্যজনক উপমা; এটা যে অবাস্তব সেটারই প্রতিধ্বনি; এ যেন মহারাজার কৃষ্ণপ্রাপ্তি!

তাই বলছিলাম—চোখেও হাতি ঢোকে, তবে তার রকমফের আছে।

এই হাতির সন্ধান পাওয়া যায়—অথর্ববেদের বৈদ্যককম্পের ৫০।৫৭।৬৭ সূক্তে; সেখানে তিনি নাগদন্তী নামে পরিচিতা, পরে সংহিতার যুগে এসে পরিচিতা হ'য়েছেন শ্রীহস্তিনী নামে। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে—

‘স্বাং গন্ধর্বা নাগদন্তীং অথন স্বাং বৃহস্পতিঃ।

দন্তিকা বিজহুঃ পাশকা বহব্শ্চুরা দন্তুরা পাপ্মানম্॥’

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

গান্ধর্বাঃ দেববিশেষাঃ স্বাং নাগদন্তীং অথনঃ বৃহস্পতিশ্চ স্বাং, দন্তিকাসি গজশৃঙ্গাভ্যন্তর-প্রতীকাশা=শ্বেতপদ্মপিকা, হস্তি-শৃঙ্গিকোতি লোকে, স্বং দন্তুরা বহব্শ্চুরা অতঃ পাপ্মানং ব্যাধিঃ বিজহুঃ তে গদ্বণবিশেষাঃ, অতস্তু চ পাশকা যে চ ব্যাধয়ঃ দেহ-পার্শ্বতঃ জায়ন্তে ইতি পাশকঃ।

এই ভাষ্যটির অনূবাদ হ'লো—গন্ধর্বগণ বা দেববিশেষবৃন্দ তোমাকে খনন করেন। বৃহস্পতিও, তোমার আকৃতি গজদন্তের অভ্যন্তর যেমন শৃঙ্গ তেমনি শ্বেতপদ্মপিক্ত,



এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—শিরোভাগের গভীর স্থানে তুমি বাস কর। সূর্য তোমাকে অভিভূত করে না। তুমি মার্কব। অর্থাৎ শিরঃক্ৰেশ দূর কর। তুমি অগ্নারক অর্থাৎ ভৃগুরাজ। ভৃগু অর্থে রোল (শব্দ)। তার দ্বারা প্রাণের প্রকাশ কর। পিশল্যার যেমন অকালপক কেশকে অগ্নার বর্ণ করেছ—তেমনি কর। তাই তোমার নাম অগ্নারক। তোমার মূল থেকে সবই অগ্নারক। যারা সর্বপ্রকারে সূর্যী হয়েও ক্রিমির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তুমি তাদের অভিভূত কর।

উপরিউক্ত বৈদিক সূত্র থেকে সংহিতাকারগণ কি তথ্য পেলেন?

১। শিরোভাগের গভীরস্থানে তুমি বাস কর—এই ইঙ্গিতে এটির প্রভাব—স্নেহা, বৃদ্ধি, স্মৃতি ও প্রতিভার উপর যে আছে—সেইটি তাঁরা বিচার করে প্রয়োগ করেছেন।

২। সূর্য তোমাকে অভিভূত করে না—এই উক্তি থাকতে তাঁরা বিচার করেছেন যে, এর দ্ব্যর্থাক্তি শিরোগত উন্মাকে প্রতিহত করে থাকে। সংহিতাকারগণের চিন্তাধারা হলো—পিত্তের স্বভাব আগ্নেয়, কিন্তু বিকৃত হলেই রোগ সৃষ্টি করে; সে তখন অনুষ্ণগী হয় বায়ুর, তখনই আসে বায়ুরোগ; এই ভৃগুরাজ ঐ বিকৃত পিত্তের উন্মাকে শান্ত করে।

৩। তুমি মার্কব অর্থাৎ কেশের ক্ৰেশ দূর কর—এখানে কেশের ক্ৰেশ তার অকালপকতা ও পতন—এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন কেশরঞ্জক হিসেবে ও কেশপতন নিবারণে; এই ভেষজটি বায়ু ও কফঘা।

আমাদের অনেকের ধারণা আছে—কফ আর শ্লেষ্মা ধাতু বৃদ্ধি পরিভাষাগত এক—কিন্তু তা নয়, এই শ্লেষ্মাধাতু আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, এটি আমাদের দেহের ধারক ও পোষক বটে, কিন্তু যেটা বেরোয়—সেটা ঐ শ্লেষ্মাধাতুর বিকৃত রূপ, যাকে আমরা কফ বলি (চরক সূত্রস্থান ১২ অধ্যায়)।

আমরা অনেক সময় দেখি—ভৃগুরাজের রস অথবা তার রসে প্রস্তুত তৈল মাখলে সর্দি হয়, এ ক্ষেত্রে ঐ বিকৃত জিনিষটিই বেরিয়ে আসছে—সেটি বেরুলে তবেই না রোগ নিরাময় হবে। এক্ষেত্রে ঐ কাজের জন্য ভৃগুরাজের জুড়ি নেই। এইটাই বৃষ্ণ বৈদ্যগণের অভিমত।

৪। তুমি অগ্নারক—এর দ্বারা প্রমাণ করে—সে কেশরঞ্জক। এই নামটি তার গুণ-প্রকাশক। সংহিতাকারগণের সমীক্ষাটা এখানে বলে রাখি—এই অকালপকতা ও খালিত্য (টাক) কয়েকটি কারণে আসতে পারে। (ক) প্রাকৃতিক—এটির কারণ দেশজ, কোন কোন প্রদেশে চুল অল্প বয়সে পেকে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে টাকও পড়ে। (খ) পৈরিক—এখানে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হচ্ছে—অস্থি ও কেশ পিত্তসূত্রে সন্তান পায়, সুতরাং পিতার ঐ জিনিষটি থাকলে সন্তানেও বর্তাতে পারে। (গ) রোগজ—পেটের রোগ, প্রমেহজনিত দোষ, অত্যধিক দৃষ্টিচলতা ও কটীজ ব্যাধি ইন্দ্রদ্যুত (Alopecia) প্রভৃতি কারণে চুল উঠে যায় ও টাক পড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে অকালেও পাকে। এক্ষেত্রে সেই পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুর বিকৃতির ফলে ওখানকার স্বকের স্বভাব-ধর্মিতায় ক্ষয় আসাতে স্বকৃৎ রোগ এই টাক উপস্থিত হয়। স্বকেরই অপভ্রংশ শব্দ টাক।

৫। তুমি অগ্নারক—এক্ষেত্রে ঐ অগ্নারক নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

‘উষ্ণোদহতি—চাণ্ডারঃ শীতশ্চৈব মলিনীকরঃ’

চিরঞ্জীব-১৮

এই অঙ্গার যদি উষ্ণ হয়, তখনই সে দহন করে। আর যদি শীতল গুণান্বিত হয়, তখন সে মলিন করে। এক্ষেত্রে এই ভৃগুরাজ শীতগুণান্বিত এবং কেশকে কালো করে বলেই তার এই অঙ্গারক নামকরণ। এটি তার গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা নাম।

৬। ভৃগুরাজ (ভৃগুরাজ)—এই নামটি স্বার্থ হয়ে দু'টি ইঙ্গিত বহন করছে। প্রথমটি হলো—ভৃগু (রোল) অর্থাৎ ধ্বনি, এর দ্বারা মস্তিস্কের শব্দ ধরে রাখার শক্তিকে সে সংহত করতে পারে, সেই ইঙ্গিত এই নামের মধ্যে প্রকাশমান। আর দ্বিতীয়টি হলো—এটির প্রয়োগের ফলস্বরূপ মূত্রের বর্ণসম কেশের তুলনা; এই সূক্তের শেষোক্ত বক্তব্য—এটি ক্রিমিনাশক; সেটি বাহ্য বা আভ্যন্তর কোথাকার ক্রিমি, সেইটাই বিচার্য।

### পরিচিতি

বৈদিক সূক্তে পাওয়া যায়—ভৃগুরাজ বা ভৃগুরাজের কথা, এটি পীতপুষ্প (হলদে ফুল); পরবর্তী কালে দেখা যায় আরও দুই প্রকারের উল্লেখ আছে, শ্বেত ও নীল পুষ্প। নিবন্ধোক্ত বনৌষধিটি বেদোক্ত পীতপুষ্প ভৃগুরাজ সম্পর্কে এটি ভূমিপ্রসারিত লতা। এই প্রজাতির আর এক প্রকার গাছ দেখা যায়, সে গাছের ডাঁটা একটু লালচে। এই সামা ও লাল ডাঁটা ভৃগুরাজ বারো মাসই প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়; তবে বাংলা, আসাম, মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু, নাড়ু, অর্থে পঞ্জী), মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে এগুলি বেশী জন্মে। এর হিন্দী নাম পীলা ভাগেরা; এইটির বোটানিক্যাল নাম *Wedelia Calendulacea* ব্যবহার্য অংশ—মূল সমেত সমগ্র গাছ। দ্বিতীয় শ্বেতপুষ্প ভৃগুরাজ বা ক্ষুদ্র ভৃগুরাজ। কালমেঘের (*Andrographis Paniculata*) মত ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ, স্থান ভেদে কখনও ভুলদৃষ্টিতও হয়—একে কেশরাজ বা কেশদূর্তে বলে, এর চলিত নাম কেশদূর্ত; হিন্দীতে একেও ভাগেরা বলে। এর বোটানিক্যাল নাম *Eclipta alba*। আর নীলপুষ্প ভৃগুরাজ যে কি—সেটি আজও আমাদের কাছে অজানা। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল সমেত সমগ্র গাছ। এটির ফরমালি *Compositae*।

### দ্রব্যশক্তির বিচার

এই ভেষজটি কটু, তিক্ত ও গোণত কষায় রসধর্মী; তারই ফলে স্বাভাবিকতার এটি পিত্ত ও শ্লেষ্মাবিকার কক্ষের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে এবং তজ্জন্য এইসব বিকার-জনিত রোগের উপশম হয়।

### রোগ প্রতিকারে

১। শিরোরোগে—সূর্যোদয়ের পর অনেকের মাথার যন্ত্রণা হয়, আবার কারও বা আধকপাল মাথাব্যথা হয়; সেক্ষেত্রে ভৃগুরাজের নস্য নিলে বা মাথায় মাখলে এর উপশম হয়।

২। কেশপতনে—এই পাতার রস করে দু'পদ্র বেলার দিকে লাগাতে হয়। এই পাতার রস দিয়ে তৈল পাক করে লাগালেও কেশপতন বন্ধ হয়।

৩। মাথায় উকুন হলে—এই পাতার রস মাথায় মাখলে উকুন মরে যায়।

সংহিতার গ্রন্থকারগণ এই ভেষজটিকে নিয়ে যে কাজ করেননি তা নয়, কারণ বাগ্‌ভট্ (ষষ্ঠ শতকের গ্রন্থ) শূদ্ধ স্ববর্ণকরত্রে তিন্দুক ফলের বাহ্যপ্রয়োগ ক'রেছেন—

(১) কোন জায়গায় ক্ষত (ঘা) সেরে যাওয়ার পর (যে কোন কারণেই হোক) সাদা দাগ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কাঁচা গাব ফলের রস কিছুদিন ঐ দাগের উপর প্রলেপ দিলে ওটার বর্ণ স্বাভাবিক হ'য়ে যায়।



(২) পুরাতন অজীর্ণে— গাব গাছের ছাল ৫।৬ গ্রাম আন্দাজ নিয়ে গাম্ভারী গাছের (Gmelina arborea) পাতায় মূড়ে মাটি দিয়ে লেপে আগুনে ঝালুসে নিয়ে তারপর ওটাকে বের ক'রে নিয়ে অল্প জল দিয়ে থেঁতো ক'রে তা ছেঁকে সেই রসটায় একটু মধু মিশিয়ে খেতে হয়। বাঁদের পাতলা দান্ত কিছুতেই ভাল হয় না, তাঁরা এটাতে নিশ্চিত উপকার পাবেন, তবে অগ্নিবল বুঝে এবং আহারে সংযত না হলে অতিসার কখনই সারে না। এ যোগটি হারীত সংহিতায় বলা আছে।

(৩) অগ্নিদগ্ধের ক্ষতে— ক্ষতটা পুরে উঠছে না, তখন কাঁচা গাব সিম্ব ক'রে সেই জল ছেকে তারপর তাকে ঘন ক'রে লেহবৎ (paste) করতে হবে। এইটা একটু গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাতে হবে। এটা ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশের যোগ।

(৪) শিশুর হিক্কায়— গাবের শুষ্ক ফুলচূর্ণ ১ গ্রেণ মাত্রায় একটু মধু মিশিয়ে শিশুকে চাটালে হিক্কা প্রশমিত হয়। এটা সপ্তদশ শতকের বঙ্গসেনের পরীক্ষিত যোগ।

চরক সূত্রস্থানের ৪ অধ্যায়ে ৪৩ গুচ্ছে 'তিন্দু-ক-পিপাল-বদর-খাদির ইতি' এবং সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ২৩ গুচ্ছে 'কদম্ব-বদর-তিন্দু-ক' প্রভৃতি কয়েকটি বৃক্ষের দ্রব্য-শক্তির পরিচয়ে তিন্দুকের রক্তপিণ্ডহরত্ব প্রভৃতি আরও কয়েকটি উল্লেখ আছে, তাছাড়া ৪৬ অধ্যায়েও আছে। চরকের টীকাকার চক্রপাণি বলেছেন—তিন্দু-ক মানে কেদ' কিন্তু প্রচলিত ক্ষেত্রে দেখা যায় কেদু গাছ পৃথক প্রজাতি (species), যার পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরী হয়। আর সুশ্রুতের টীকাকার ডব্বন বলেছেন—তিন্দু-ক মানে 'তিন্দুরানি'। নিঃসংশয়ে বোঝা যায়—চক্রপাণি বাংলার পরিভাষাই গ্রহণ ক'রেছেন আর ডব্বন মহারাষ্ট্রের। কিন্তু গাব এই ভাষাটি বাংলা ও হিন্দীতে উভয়েরই।

পাণ্ডিতগণ খুব শক্ত বা কঠিন দ্রব্যকে সংস্কৃত ভাষায় 'গালব' বলেন, অপরপক্ষে নিষ্করুণহৃদয় গালব মূনিরও একটি নাম পরিচয়ে তিনি 'গালব' (দেবী ভগবত)। হয়তো কালে সেই গালব শব্দের তুলনামূলক গাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এর আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে 'নীলসার'।

এই নীলসারের সংহিতা পরিচিত নাম 'তিন্দু-ক'। তিন্দু শব্দের শব্দার্থ হ'ল—যেখানে সে লাগে, আর ছাড়তে চায় না। এর আরও একটি নাম 'কালস্কন্ধ', বোধ হয় গাছের নামই কালস্কন্ধ। গাছের ও ডালের রং কালো ব'লেই বা একে আমরা চল্‌তি কথায় গাব বলি। এ ভিন্ন বনোৰ্ষধির গ্রন্থে 'রিষতিন্দু-ক' বলে আর একটি ভেষজের উল্লেখ আছে। তার ফলগুলিও দেখতে গাবের মত হলেও ঐ ফলের গায় সবুজ ও মসৃণ। সেগুলি পাকলে হলদে রং হয়—চল্‌তি নাম কুচিলা ফল। তার চ্যাপ্টা ও পুরু বীজ-গুলিই আমাদের ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Strychnos nux-vomica* Linn. ফ্যামিলী *oganiaceae*. বর্তমানে এদেশে ঠিক গাবের মত দেখতে আর এক প্রকার ফল পাওয়া যায়। অবশ্য এটি এসেছে বার্মা অঞ্চল থেকে, একে চল্‌তি কথায় বিলিতী গাব বলে। এটি আমাশায় রোগে সেদেশে ধ্বংসতার বলা যেতে পারে, এর বোটানিক্যাল নাম *Garcinia mangostana* Linn. ফ্যামিলী *Guttiferae*.

এই নিবন্ধোক্ত গাব গাছটি শাখাবহুল ও মাঝারি ধরণের। পাতা পুরু ও শক্ত, আকারে অনেকটা গরু-মহিষের জিভের মত। চৈত্র-বৈশাখে ফুল ও ফল হয়, ফল পাকে ৪।৫ মাস বাদে, ফলগুলি দেখতে লাঙ্গুর মত। কচি অবস্থায় এর ফলের গায়ের রং যেন ইটের গুঁড়ো মাখানো, ফল পাকলে ঈষৎ হলদে রং হয়। তখন ফলের শাঁসটা মিষ্টি ও একটু কষা লাগে—কাক ও অন্যান্য পাখী ওগুলি খেতে খুব ভালবাসে। গ্রাম্য অঞ্চলের বালকেরাও খায়। এই আলোচ্য গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Diospyros peregrina* Gurke. ফ্যামিলী *Ebenaceae*. এই গাবকে উপমা দিয়ে একটি লোক-কথা দেশগায় প্রচলিত। সেই ক্ষেত্রটি হচ্ছে—'কোন ব্যাপারে কোন ব্যক্তি ফেঁসে যাওয়ার পর তার কাকুতি-মিনতি। যেই সেই কার্যোন্মাদ হয়ে গেল, আর মনে থাকে না।' এই ক্ষেত্রেই পাকা গাব ফলকে উপমায় ব্যবহার করা হয়। সেই লোককথাটা হচ্ছে—'আর

১১। পাদদারী রোগে— যাঁদের পায়ের তলা ফেটে ফেটে যায়, তাকেই পাদদারী রোগ বলে। এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কনক তৈল বিশেষ উপকারী।

১২ ছুলিতে— এই কনক তৈল লাগালেও কাজ হয়।

১৩। কানের যন্ত্রণায়— উদ্ভূত শ্লেষ্মার দোষে কানে বা কপালে যন্ত্রণা হয়, সে ক্ষেত্রে কানে তেলের ফোঁটা দেওয়া আর কপালের যন্ত্রণায় একটু তৈল কপালে মালিশ করা।

১৪। শ্বাসে— সমগ্র গাছকে অর্থাৎ গাছ, পাতা, মূল, ফল ও ফুল সিদ্ধ করে অন্যান্য দ্রব্য সহযোগে সন্ধিত আসব (Fermentation) করা হয়। এইটি কনকাসব নামে প্রচলিত।

১৫। বাতের ব্যথায়— ধূতুরা পাতার রসের সঙ্গে সরষের তৈল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে কমে যায়।

১৬। ফোঁড়ায়— ধূতুরার পাতার রসের সঙ্গে সামান্য একটু গাওয়া ঘি মিশিয়ে প্রলেপ দিয়ে পেকে যায়।

এই নিবন্ধের উপসংহারে জানাই যে, সব ফুলই দেখে চোখ জুড়ায়, ব্যতিক্রম কেবল এই ধূতুরো ফুলের বেলায়।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., hyoscyamine, hyoscyne, atropine, scopolamine, norhyoscyamine. (b) Vitamin C. (c) Other constituents viz., fixed oil and allantoin.



## তিন্দুক

কথায় আছে, 'নারদের ঢেঁকি', জানি না নারদের বাহন ঢেঁকিট কোন কাঠে তৈরী হ'তো, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় সে ঢেঁকি গাব কাঠে তৈরী হ'তো না, তার কারণটা বলছি—আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যত অচল জিনিস আছে, তাদের মধ্যে গাবের ঢেঁকিও একটি, এই গাছের সারকাঠে তৈরী ঢেঁকি এত ভারি হয় যে, তা দিয়ে ধান তানাও (ভাঙ্গা) সম্ভব হয় না। এই ঢেঁকি বস্তুটি যে কি, সেটা গ্রামাঞ্চলের লোকেই বেশী বুঝবেন; তাই অকম্পা লোকের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হ'য়ে থাকে; তাই বলছিলাম নারদের ঢেঁকি গাব কাঠে প্রস্তুত করা হয়নি।

তাই বলে কি গাবের সব অংশটাই অচল? তা নয়, তারও উপযোগিতা আছে, অভিজাত্যও আছে এবং আছে ভৈষজ্যগুণও। যদিও ঢেঁকি শব্দটি সাঁওতাল মন্ডাদের নিজস্ব ভাষা; কিন্তু তার উপাদান কাঠটি মন্ডাদের আবিষ্কৃত নয়; ওটি বহু প্রাচীন তিন্দুক; এর বৈদিক পরিচয় ও সমীক্ষা—তোমার স্বক্ দিয়ে আমাদের শরীরের বলকে স্নিগ্ধ কর। তোমার ফলের রস আমাদের আহাৰ্যের জীর্ণতা আনে না।

### কালান্তরে

সেই বৈদিক তথ্যটিকে উপজীব্য করে চরক ও সুশ্রুত সম্প্রদায়ের সংহিতা গ্রন্থে এটিকে রোগ-প্রশমনে কাজে লাগানো হয়েছে। চরকে উদর্দ প্রশমন বর্গে (শীতপিত্তের প্রকার ভেদ) এটির উল্লেখ দেখা যায়; তবে এই বৃক্ষের ছালটিকেই প্রধানভাবে ব্যবহার করার উপদেশ চরক-সুশ্রুতে দেওয়া হয়েছে, কারণ ফলের রস দূর্জর অর্থাৎ সহজে হজম হতে চায় না, অত্যন্ত সংগ্রাহী ও বায়ুবর্ধক। তারপর পরবর্তীকালের আয়ুর্বেদ

ভুলনাবাচক হিসেবে এই নামকরণ করা হ'য়েছে, সেটাতেই সম্ভবতঃ অবকাশ থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ এই কনক শব্দটি কৃষ্ণ ধাতুরেরই পর্যায়ে ধরা হ'য়েছে; তা হ'লে ত্রিা-ধিকাই কি কনক শব্দের প্রতীক করা হ'লো? তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ কৃষ্ণ ধাতুরকেই কনক ধাতুর হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন।

সবজন পরিচিত এই ধাতুরা অল্পসম্ভূত গুণ্ণ; ভারতের প্রায় সকল স্থানেই দেখা যায়। এক একটা গাছ ৪/৫ বৎসরও বেশি থাকে। সাদা ফুলের গাছই যতদূর দেখা যায়; বর্ষাকালে ঘণ্টার আকারে সাদা ফুল হয়, তাই তার এক নাম 'ঘণ্টাপুষ্প'। লাড়ুর মত গোল ফলের চারিদিকে ছোট ছোট কাঁটা আছে, তাই এই গাছের আর একটি পর্যায় শব্দনাম 'কণ্টফল'। গাছ, ফল, পাতা সবই সবুজ রং-এর; কোন পশুপক্ষী এর পাতা বা ফল খায় না, ফলের মধ্যে গুচ্ছাকারে বহু সাদা বীজ হয়, এর ফল পাকলে ফেটে যায়, তখন ঐ বীজের রং পাংশুটে (ছাই) রং-এর হয়।

দ্বিতীয়টি কৃষ্ণধাতুর, যাকে আমরা বর্তমানে কনক ধাতুরা বলি, তার পাতার শিরা, বোঁটা, গাছের ও ফুলের রং গাঢ় বেগুনে রং-এর বস্বে একটি ফুলও হয়, আবার একটি বস্বে অস্তঃপ্রবিষ্ট দুটি বা তিনটি ফুলও হয়; মনে হয় যেন একটির মধ্যে আর একটি গুঁজে দেওয়া। এরা প্রজাতিতে কিন্তু একই। এর বোটানিক্যাল নাম *Datura metel* Linn. ফার্মালি Solanaceae. এর হিন্দি নাম ধতুর, ধুরা, ধতুরা। ঔষধে ব্যবহার হয় পত্র, ফল ও মূল।

আর এক প্রকার ধাতুরা গাছ বিহারের অঞ্চল বিশেষে এবং উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। এগুনি ৬/৭ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, তার পাতাগুলি দেখতে অনেকটা বাসক (*Adhatoda vasica*) পাতার মত, ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা; কুচবিহার অঞ্চলে একে বলে গজঘণ্টা ধাতুরা। বিহার প্রদেশের বৈদ্যগণের মতে এটি রাজধাতুর।

### প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে ধাতুরের ব্যবহার

১। উদ্ভাস্ত কুকুর ও শূগালে কামড়ালে— ধাতুরার মূল কাঁচা ১ই গ্রাম (দেড় গ্রাম) পুনন'বার (*Boerhaavia repens*) কাঁচা মূল ৫ গ্রাম একসঙ্গে বেটে শীতল দ্রব বা জলের সহিত পান করাতে বলা হয়েছে সুদ্রুত সংহিতায়। কল্পসম্মানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এটি উল্লেখ করা হ'য়েছে।

২। উল্লেহ— ধাতুরার মূলের খুব সরু যে শিকড় (মূল শিকড় বাদ) কাঁচা ১ গ্রাম (৭/৮ রতি) শিলে বেটে সেটা আধসের জলে গুলে সেই জলে ৫০ প্লাম আন্দাজ পুরানো চাল দ্রুদ আধ সের ও মাত্রামত চিনি বা মিছার দিয়ে পান্নেস করে এইটা সকালে এবং বৈকালে খাওয়ার কথা বলা আছে চন্দ্রদত্ত সংগ্রহে (এটি ১১ শতকের গ্রন্থ)। তবে রোগীর বলাবল, ক্ষেত্র, বয়স এসব বিচার করে রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

মন্তব্যঃ— বিস্তৃত চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন জনসাধারণের পক্ষে এটি ব্যবহার করা উচিত হবে না। ধাতুরা গাছের কোন অংশের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে (internal application) বিস্তৃত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এর সঙ্গে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, পূর্বে বৈদ্যগণ বিশেষ ওষুধিগুলি নিজেরা করতেন। এই ধাতুরার শিকড় তোলার সময় গাছের উত্তরদিকের শিকড় তুলে নিতেন, তাঁদের বক্তব্য হ'লো—এই উত্তরদিকের শিকড় সোমগুণ প্রভাবে বেশী পান্ন বলে তার বান্দ্র দমনের শক্তি সমৃদ্ধ হয়, তাই তার নিদ্রাকর্ষণ করার শক্তি বেশী।

৩। **গরলবিষে**— ধূতরার মূল, কাঁচা হলুদ, শিরীষ ফুল (Albizzia lebbeck Benth.) একসঙ্গে বেটে লাগালে গরল বিষ দূর হয়।

### পাতার ব্যবহার

৪। **টাক রোগে (বিক্লিষ্ট টাকে)**— যেটা বৈদ্যকের দৃষ্টিতে ইন্দ্রদ্যুত রোগ, সাধারণ লোকের ধারণা, এটা তেলাপোকায় কেটে দিয়েছে; তা নয়, এটা একপ্রকার Fungus infection। একবার গায়ের কোন জায়গায় বসলে তাকে তাড়ানো মুশকিল। এ ক্ষেত্রে ধূতরা পাতার রস মাথায় যেখানে হ'য়েছে সেখানে লাগাতে বলেছেন বাগ্‌ভট (এটি ষষ্ঠ শতকের গ্রন্থ); এটা বলা হ'য়েছে উত্তরতন্ত্রের ২৬ অধ্যায়ে। তবে অনেক সময় দেখা যায় প্রায় সমগ্র মাথায় এই রোগ ব্যাপ্ত হয়ে প'ড়েছে, সেক্ষেত্রে পাতার রস আজ এধার ও কাল ওধার ক'রে লাগাতে হয়; দিনে একবারের বেশী লাগানো উচিত নয়, আর এক দিন বাদ এক দিন লাগালেই ভাল। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই রোগের নাম দেওয়া হ'য়েছে—Alopecia areata. যদি দেখা যায় যে মাথায় একটা যন্ত্রণা অনুভব ক'রছেন, তা হ'লে এটা ব্যবহার করা সমীচীন হবে না।

৫। **ক্লিমিডে**— পাতার রস ২/৩ ফোঁটা ক'রে দুধের সঙ্গে খাওয়াতে বলেছেন ভাবপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে প্রয়োগের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই, পরীক্ষা প্রয়োজন।

৬। **স্তনের ব্যাধি**— কাঁচা হলুদ ও ধূতরার পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে লাগাতে বলা হয়েছে। এটাও ভাবপ্রকাশের যোগ।

৭। **ফুলো ও ক্যামায়**— ধূতরার পাতার রস করে, তাকে জ্বাল দিয়ে ঘন ক'রে (মধুর মত) তুলি ক'রে লাগাতে হয়, এর দ্বারা ব্যাধি ও ফুলো দুয়েরই উপশম হয়। আর যদি এর সঙ্গে একটু আফিং ও মুসম্বর মিশিয়ে লাগানো যায় তবে আরও ফলপ্রসূ হয়।

৮। **ফিক্‌ ব্যাধি**— সে ঘাড়ে বা পিঠে যে কোন জায়গায় হোক না কেন, ধূতরার পাতা ও চূর্ণ একসঙ্গে র'গড়ে রস বের ক'রে সেই রসটা লাগালে ঐ ব্যাধি কমে যায়; অন্ততঃ ৩ বার ৪/৫ ঘণ্টা অন্তর লাগাতে হয়।

৯। **নাদা আমাশয়**— কাল ধূতরার পাতার রস ৩/৪ ফোঁটা আধ পোয়া দই-এ মিশিয়ে খেতে বলে থাকেন গ্রামীণ বৈদ্যরা।

১০। **হাঁপানীতে**— কাল ধূতরার শুষ্ক পাতা ও ফুল বাসক পাতায় বেঁধে চুরট তৈরী ক'রে সেই চুরটের খোয়া টানলে হাঁপের টান কমে যায় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সর্দিটা টেনে যায়। বাসকপাতা বা ফুল ভেঙে বিড়ির তামাকের মত ক'রে নিতে হয়—তার মাত্রা হবে ৩ রতি থেকে ৬ রতি পর্যন্ত।

### বৈদ্যবাহীর 'কনক তৈল'

প্রস্তুত বিধি—সরষের তৈল ১ কেজি, ধূতরার পাতা ডাঁটা সমেত কুটে, নিংড়ে রস নিতে হবে ২ কেজি বা লিটার, আর ঐ শুধু পাতা বেটে আন্ডাজ ১০০ গ্রাম। তৈলটা আগুনে চড়িয়ে নিম্ফেন হ'য়ে ধোঁয়া উঠতে থাকলে, তৈলটা নামিয়ে একটু ঠান্ডা হ'লে ঐ রসটা এবং ঐ পাতা বাটা অল্প অল্প ক'রে দিতে হবে। ১০/১৫ মিনিট পরে আন্ডাজ ২ সের জল দিয়ে পাক ক'রতে হবে, জলটা ম'রে গেলে, ঐ তৈলটাকে ছেঁকে নিতে হবে।



অভিজ্ঞতাটা হ'লো, যেমন কাউকে নষ্ট ক'রতে গেলে তার মাথাটা আগেই খেতে হয়, সেই রকমই। এই গাছটির বীজ যদি খাওয়া যায়, তা হ'লে তড়িৎ গতিতে এর বিষ-প্রভাব মস্তিস্কের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ভাবাক্রান্ত ক'রে উন্মাদের স্তরে নিয়ে যায়। তার ধূস্তর নামকরণের সার্থকতা এইখানেই।



### প্রাচীনদের নাজর

কিং শ্বিদ বনং বৃক্ষা আসন্ যতঃ পৃথিবী নিষ্ঠ তক্ষুঃ। মনীষিণঃ  
ধূস্তরং।

ধূস্তরং মহাহৃদ্যো অভিতঃ ভুবনানি ধারয়তু।

—উপবহণ সংহিতা ১৩।২৮

ভাষ্যকার উবট্ এই সূক্তটির ব্যাখ্যা ক'রেছেন—

পদ্যরূপি প্রশ্নঃ—শ্বিদ ইতি বিতর্কে তম্বনং কিমাস=বভূব ইতি, বৃক্ষা এব বনং আসন্ কিং যত তানেব নিষ্ঠ তক্ষুঃ নিস্তম্বা অলং কৃতবন্তঃ। ততঃ প্রশ্নে মনীষিণঃ ধূস্তরং প্রাপ্য ন মহাহৃদ্যু। ভুবনানি ধারয়ন্তু তে, অন্যো মহাহৃদ্যন্তি।

পুনরায় প্রশ্ন, তাই শব্দ শব্দটি বিতর্ক অর্থ প্রকাশ করে। প্রশ্ন এই—সেই বন কিরূপ ছিল? বৃক্ষের সমষ্টিই তো বন। তা হ'লে সেই বনের প্রতিই তাঁরা অ-তাজনীয় হয়ে অলংকৃত করেছিলেন? অর্থাৎ ধৃতুর কি তাদের নিষ্ঠার অলংকার হ'য়েছিল?

উত্তর— মনীষীবৃন্দ ধৃতুরা পেয়ে কখনই মুহাম্মান হন না, ধৃতুরার স্মারাই তাঁরা বিশ্বকে ধারণ ক'রে থাকেন। অপরে কেবল মুহাম্মানই হয়।

এখানে মনীষীদের দৃষ্টি হ'লো ধৃতুরায় অমৃত্যু লাভ হয় এবং অজ্ঞদের পক্ষে তা শব্দ নেশায় জিনিস।

ধৃতুরার বৃক্ষ, ফল, পাতা নিয়ে তান্ত্রিক, রসতান্ত্রিক ও বিষবৈদ্যদের গ্রন্থে যত অনুশীলন, সে তুলনায় আর্থদারার সংহিতাগ্রন্থের মধ্যে চরক, সুশ্রুত, বাগভট, কাশ্যপ সংহিতায় তেমন কিছুই নেই বললেই হয়।

### সংহিতাদ্বয়ের অনুশীলন

চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে তিত্তক শব্দে 'সুমনঃ' দুবাটি চক্রপাণি দত্তের মতে ধৃতুর অথবা ধৃতুর। বৈদিক অভিধানে বলা হ'য়েছে—ধূর উর্ধ্বভার, তুর অর্থে গতি, কেবলমাত্র বানানের হেরফের, কিন্তু রাজনিঘণ্ট ও সারকোমুদী ধৃতুরার আর পর্যায় পরিভাষা গ্রহণ করেননি।

তারপর চরকের কৃষ্ণরোগের চিকিৎসায় ৭ম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে কনক শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়েছে, ওখানে চক্রপাণি কনক অর্থে ধৃতুরকে গ্রহণ করেছেন। এখানে ধৃতুরা বীজ দিয়ে এবং অন্যান্য দ্রব্য সহ যে মধ্বাসব, সোটি পান ক'রলে কৃষ্ণ নিরাময়ের কথা বলা হয়েছে; তারপর কৃষ্ণরোগে যতগুলি প্রলেপের ষোগ, তাদের মধ্যে দুটি ষোগে কনক শব্দের দ্বারা ধৃতুরার ব্যাখ্যা, ওখানে ধৃতুরার মূলত্বক্ (মূলের ছাল) এবং বীজের প্রলেপের কথা বলা হ'য়েছে।

সুশ্রুতে এবং বাগভটে উপবিষের মধ্যে কনক শব্দের উল্লেখ, কিন্তু রসতান্ত্রিকগণ এবং বিষবৈদ্যগণ ধৃতুরার ব্যবহারের উল্লেখ প্রায়ই ক'রেছেন। সবক্ষেত্রে খাওয়ার ঔষধেই ধৃতুরার বীজের উল্লেখ এবং তার শোধন পদ্ধতিটি দৃশ্য সহ সিম্ব ক'রে তারপরে তাকে শুকিয়ে নিয়ে ঔষধে ব্যবহার করার উপদেশ। হয়তো তান্ত্রিকদের এই ধারা অনুসরণ ক'রেই লোক-ব্যবহারিক বৈদ্যগণ ধৃতুরাকে ঔষধে প্রয়োগ ক'রেছেন।

### ধৃতুরার ভেদ

বনৌষাধির প্রাচীনগ্রন্থ রাজনিঘণ্টতে লিখিত আছে—

‘সিত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত, পীত প্রসবাশ সন্তি ধৃতুরাঃ।  
সামান্য গুণোপেত্যন্তেষু গুণাত্যন্তু কৃষ্ণকুসুমঃ স্যাৎ ॥’

অর্থাৎ শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত এবং পীত পুষ্পের ধৃতুর দেখা যায়, ইহারা ক্রিয়া-কারিণে সমান হ'লেও কৃষ্ণপুষ্প ধৃতুরেরই ক্রিয়া অধিক। তিনি যখন এই ধৃতুরের ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন তখন ধৃতুর, কৃষ্ণ ধৃতুর ও রাজ ধৃতুর এই ৩ প্রকার ধৃতুরের পর্যায় পৃথক পৃথক লিখেছেন; তবে কনক ও স্বর্ণ শব্দের উল্লেখ তাঁর পুষ্পের বর্ণকে উদ্দেশ্য করে। অথবা ক্রিয়াক্রিয়ায় আধিক্য থাকতে স্বর্ণের সঙ্গে

গাব খাবো না, গাব-তলায় আর যাব না (যেহেতু গলায় পাকা গাবের বীজ আটকে ছিল); যেমনি নেমে গেল, অমনি—গাব খাবো না খাবো কি, গাবের তুল্য আছে কি?”

### লোক-ব্যবহার

১। **ঋতুস্রাবাধিক্যে**— অনেক মায়ের মাসিকের সময় স্রাব বেশী হয় ও দীর্ঘদিন থাকে—তারা ৭।৮ গ্রাম কাঁচা গাব ফল অল্প জল দিয়ে খেঁতো করে সেই রস মাসিকের তিন দিন বাদ দিয়ে খাবেন। ২। ৩ দিনের বেশী খেতে হয় না, ওর দ্বারা স্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

২। **দীর্ঘদিনের আমাশয়**— এই গাছের ছালের রস ১ চা-চামচ মাত্রায় একটু গরম করে ছাগলের দুধের সঙ্গে খেতে হয়। এটাতে আমাশার প্রকোপ কমে যায়।

৩। **লালা মেহে**— যাদের প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে অথবা যেকোন সময় লালার মত ক্ষরণ হয়, তারা এই ফলের রস আধ বা এক চা-চামচ গরম করে দুধের সঙ্গে খাবেন। তবে কোষ্ঠকাঠিন্য এলে অর্ধেক মাত্রায় খাবেন।

৪। **ডায়াবেটিস রোগে**— অল্প বয়সেই ষাঁদের ডায়াবেটিস হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বৃন্দ বৈদ্যরা অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে এটিও ব্যবহার করতেন।

৫। **ক্যানসারের লালাস্রাবে**— গলায় বা জিভে ক্যানসার হ'লে বহু লালাস্রাব হ'তে থাকে; এক্ষেত্রে গাব ফল কাঁচা হলে ১০।১৫ গ্রাম ও শুষ্ক হ'লে ৬।৭ গ্রাম জলে সিদ্ধ করে সেই জলে ভাত বা অন্য কোন আহাৰ্য দ্রব্য পাক করে খেতে দিলে ঐ লালাস্রাব উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়।

এ ভিন্ন (ক) কাঁচা গাবের পাতা জ্বারে জ্বারে করে কেটে সিদ্ধ করে জল ফেলে দিয়ে নারকোল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্টের মত রাধতে হয়। পূর্ব-উত্তর বাংলার এটি একটি রুচিকর তরকারি। একধারে আহাৰ ও ঔষধ।

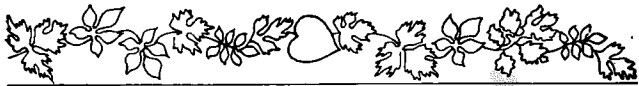
(খ) গ্রাম্য লোকেরা মাছ ধরার জালের সুতো শক্ত করার জন্য গাবের রস লাগিয়ে থাকে। সুতোর আয়ু বাড়়ে গাবের রসে।

(গ) লবণাক্ত জলে দীর্ঘ দিন ব্যবহারে নৌকার কাঠ খারাপ হয়ে যায়। সেজন্য গাবের রস নৌকার তলায় লাগানো হয়—একে বলা হয় গাব-ঘেস্ দেওয়া।

তাছাড়া আরও কত লৌকিক ব্যবহার হয়তো আমাদের অজানা রয়েছে। মোট কথা আয়ুর্বেদের রীতিতে ভেষজের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যায়গুলি যত খুঁটিয়ে অনুশীলন করা হবে, ততই ভৈষজ্যবিদ্যায় প্রবেশের রহস্য ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্যের আবিষ্কার হবে। [www.boiRboi.net](http://www.boiRboi.net)

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tannin. (b) Acids viz., tannic acid, malic acid. (c) Fatty oil.



## গন্ধনাকুলী

বাংলায় কতকগুলি কথা এমনভাবে মৃদু মৃদু ফেরে যেগুলি অনেক সময় খনার বচন ব'লে ভ্রম হয়, অথচ কথাগুলি খুব সার্থক, কারণ খনা ছিলেন ভারতীয় বিদুষী, তাঁর প্রকৃত নাম জ্ঞানা যায় না, তিব্বতী ভাষায় ম্মখন শব্দে জ্ঞানীকে বোঝায়, সেই ম্মখন শব্দটি খনা বলেই উচ্চারিত হয় অর্থাৎ জ্ঞানীর বচন। ঠিক এমনি একটি জ্ঞানীর বচন 'ছোট চান্দা বড় চান্দা—কি হবে তোর দড়ি বাম্বা'। গ্রাম বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটি প্রচলিত ছিল; কথাটার ভাবার্থ হ'লো ছোট চাঁদড় (Rauwolfia Serpentina) ও বড় চাঁদড় (Rauwolfia Canescens) থাকতে দড়ি বাঁধার দরকার কি—এটির স্ৱারা এই ইঙ্গিত যে, এটি সপর্নিবষে কাজ করে; অবশ্য তার দ্রব্যশক্তিরই ইঙ্গিত বহন ক'রছে কিন্তু যে যুগে এই ধরনের প্রবাদ প্রচলিত হ'য়েছে তখন আয়ুর্বেদ চিকিৎসারই প্রসার প্রতিপত্তি বেশী ছিল; এবং দ্রব্যগুণের বিচারও আয়ুর্বেদোক্ত বায়ু, পিত্ত, কফের মৌল ভিত্তিতে এবং ক্ষেত্র বিচারেই তার সীমা বাঁধা ছিল।

### পরিচিতি—কাল-নাম-ধাম

তুমিই রাম না শ্যাম? এমনি মনোভাব নিয়ে যেমন আমরা প্রশ্ন করি—এই বনৌষধিটিও সেই সমস্যার সৃষ্টি ক'রেছে, তাই তার সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রতে ক'রতে এগিয়ে গিয়ে আজ থেকে তিন শত বৎসর পূর্বেকার সংকলিত বনৌষধির গ্রন্থ রাজ-নিষণ্টকতে সপ'গন্ধা বা নাকুলী এবং গন্ধনাকুলী বনৌষধিটির নামোল্লেখ ও রস-গুণের বর্ণনা দেখতে পাই। সেখানে বলা হ'য়েছে 'নাকুলী গন্ধনাকুলী চ' অর্থাৎ নাকুলী এবং গন্ধনাকুলী। তৎপূর্ববর্তী গ্রন্থ 'ভাবপ্রকাশে' উল্লেখ আছে নাকুলী গন্ধনাকুলী (রাস্না ভেদ)।

রাজনিষণ্টকাকারের মতে রাস্না তিন প্রকারের— (১) মূল রাস্না, (২) পত্র রাস্না, (৩) তৃণ রাস্না। এই নাকুলী ও গন্ধনাকুলীই মূল রাস্না অনেকে এটা অনুমান করেন, কারণ উপরিউক্ত গ্রন্থে লেখা আছে—

‘নাকুলী সপ’গন্ধাচ স্দগন্ধা রন্তপত্রিকা’।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সপ’গন্ধাই নাকুলী।

এই শ্লোকটির আর একটি ক্ষেত্রের উল্লেখ ক’রছি—সেখানে উল্লেখ আছে সপ’ক্ষী ‘গন্ধনাকুলী’, এই নামটির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় যখন তার বীজগুলি পাকে; এর উল্লেখ ভারতীয় বৈদ্যক-অভিধানে কয়েকটি নামের মাধ্যমে; তার মধ্যে সপ’ক্ষীও একটি। বীজগুলি পাকলে দেখতে সাপের চোখের মত হয়।



ভারতবর্ষের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়; পূর্বে হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জেলার যত্র-তত্র পাওয়া যেতো, কিন্তু এখন এই প্রজাতিটি দূর্লভ হ’য়ে পড়েছে। বর্তমানে অবশ্য কোন কোন প্রদেশে কিছু কিছু চাষ আরম্ভ হয়েছে। বহু-শাখাবিশিষ্ট গুল্ম। গাছগুলি উচ্চতায় ৪।৫ ফুট পর্যন্ত হয়। গাছ ও মূল কাষ্ঠগর্ভ, এর শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে চারটি বা তিনটি পত্র বিন্যস্ত। প্রধানতঃ দেখা যায় তার জন্যই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীগণ এই প্রজাতিটির (species) বর্তমানে নামকরণ ক’রেছেন *Rauwolfia tetraphylla* Linn.। পূর্বে এই প্রজাতিকে বলা হ’তো *Rauwolfia Canescens* Linn. ফ্যামিলি Apocynaceae.

আর একটি কথা এখানে জানিয়ে রাখি, মূলটি ছোট বা বড় চাঁদড়ের কিনা, এটি

চিনবার সহজ উপায় হ'লো—এদের মূল ভাঙ্গলে অবিকল কাঁচা তেঁতুলের গন্ধ পাওয়া যাবে। সেটা না পেলেই এটা আসল কিনা সন্দেহ করার ক্ষেত্র থাকে, তবে কাঁচামূলের গন্ধটা পরিষ্কার বোঝা যায়। আর একটা কথা জেনে রাখা দরকার, ছোট চাঁদড়ের মূল ভাঙার অর্থাৎ সহজেই ভাঙতে পারা যায়, কিন্তু বড় চাঁদড়ের মূল খুবই শক্ত। দুইই কিন্তু স্বাদে তিক্ত এবং এর পাতাও তিক্তাস্বাদ।

ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ মূল। এখন পত্রেরও ব্যবহার করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এটাকেও যদি সর্পগন্ধার মূলের পরিবর্তে কাজে লাগানো যায়।

### গুণাদির বর্ণনা

উপরিউক্ত বনৌষধির গ্রন্থ রাজনিষ্য'টুতে বলা হ'য়েছে—

‘নাকুলী যুগলং তিক্তং কটুকণ্ড হ্রিদোষনুৎ। অনেক বিষ-বিধবংসি  
কিণ্ডং শ্রেষ্ঠ ম্ভিতীয়কং’।

অর্থাৎ এই নাকুলী ও গন্ধনাকুলী স্বাদে তিক্ত এবং বায়ু, পিত্ত, কফ নাশক; সর্বপ্রকার বিষহরণকারী; তবে ম্ভিতীয় অর্থাৎ গন্ধনাকুলীটি কিণ্ডং শ্রেষ্ঠ এ কথাও উল্লেখ করা হ'য়েছে; এই মূলটি যে কিণ্ডং শ্রেষ্ঠ, পাশ্চাত্য ভেষজ বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটা প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁদের মতে এটি নাকি Less toxic। আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে বলা হ'য়েছে এটি সাপ, মাকড়শা, বৃশ্চিক (বিছে), ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নষ্ট করে, আর নষ্ট করে জ্বর ক্রিমি ও ব্রণ। এগুলি কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ভৃতি।

জ্বর চিকিৎসায়— রাস্নার প্রয়োগ একাদশ খণ্ডাঙ্গে চক্রপাণি দত্ত প্রণীত চিকিৎসার গ্রন্থ ‘চক্রদত্ত সংগ্রহে’ দেখা যায়; কিন্তু এই গ্রন্থে নাকুলী ও গন্ধনাকুলীর নামের উল্লেখ দেখা যায় না, সেখানে রাস্নার উল্লেখ; আবার তারও পূর্ববর্তী তিনখানি আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ চরক, সূত্রুত ও বাগভটে সেই রাস্নার উল্লেখ। এর দ্বারা এটাও বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করা যায় না যে, নিবন্ধোক্ত বনৌষধিটি তাঁদের নির্দেশিত বনৌষধি কিনা। তার আরও একটা কারণ হ'লো পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণের মতে এই বনৌষধিটি নাকি বহিরাগত, কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রাচ্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের একটি মত আছে; সেটা হচ্ছে—প্রাচ্যের ভৈষজ্য পরিভাষার শব্দবিন্যাস ও তার অর্থবোধ সম্বন্ধ। এই গান্ধনাকুলী বা বড়চান্দা বা চাঁদড় ভেষজটি তার একটি উদাহরণ। তবে জানি না কত শত বৎসর পূর্ব থেকে ভারতে এসে বসবাস ক'রেছে অথবা এদেশে বরাবরই আছে।

এই গাছটি সম্পর্কে আর একটি বস্তু্য এখানে রাখছি—এর আর একটি পারিভাষিক শব্দনাম ‘নকুলেণ্টা’ অর্থাৎ নকুলের (বেজির Ichneumon) ইন্ট সামনকারী। আবার ওড়িয়ার অঞ্চল বিশেষে এই গাছটিকে বলা হয় ‘পাতাল গরুড়ী’; জানি না এই গরুড় শব্দটির দ্বারা নামকরণের ইঙ্গিত কিনা, সে সপের শব্দ সেই প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি। তাই হয়তো বা ঐ প্রদেশের এই পাতাল গরুড়ী নামকরণের তাৎপর্য এইখানে। এই বর্ণনাটিও পাশ্চাত্য দেশের অনুসন্ধিৎসু মনীষী সংকলিত সংগ্রহ পুস্তকেও (ইকোনোমিক প্রোডাক্ট্‌স্ অফ ইন্ডিয়া) এই কথা লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে।

### রোগ-প্রতিকারে অনুশীলনের উৎস

দ্রব্যের রস, গুণ, শক্তি অস্বীকার্যও যেমন হয় না তার কার্যকারণ দেখে, তেমনিটি

কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের ক্ষেত্রে দ্রব্যকে তৎক্ষণাৎ কারণ মানা হয় না, যেহেতু ও ব্যাপারটা দ্রব্যের একান্ত যোগে হয় না; তবে ক্ষেত্র-অযোগ্য দ্রব্য নিয়েও হয় না। এমনই এক গদ্য ঐতিহ্যপূর্ণ চিন্তাধারাগুলির উৎস খৃঃজতে খৃঃজতে ৬০০ খৃষ্টাব্দের একটি চিকিৎসার গ্রন্থে (অষ্টাঙ্গ হৃদয়) সর্পবিষের প্রতিরোধক দ্রব্যের ব্যবহারিক পদ্ধতির সম্বন্ধে পাওয়া গেলেও ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই মানুষ চেষ্টা করে চলেছে সর্প-দংশনোত্তর কালের প্রতিকার ও পূর্বোত্তর কালের প্রতিষেধ ব্যবস্থার সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে ভারতের আয়ুর্বেদের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ চরক সংহিতার উদ্ধৃতিগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

বিষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের অগদ তান্ত্রিক চিকিৎসার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; একটি মন্ত্রতন্ত্র, আর একটি ভৈষজ্য বিধান। আলোচ্য বনৌষধিটি সেই ভৈষজ্য বিধানের অন্তর্গত। ভৈষজ্যটির গুণ বিচারের প্রসঙ্গে আসতে গেলে প্রথমে সাপের জাতিভেদ ও তার বিষের প্রকৃতি সম্পর্কে একটু আলোচনা না করলে প্রাচ্য বিজ্ঞানের চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি ও দ্রব্য বিচারটা সম্যক বোঝানো সম্ভব নয়।

সাপের জাতিভেদ—

দম্বীকরা মণ্ডলিনো রাজীমন্ত স্তথৈবচ। সর্পা যথাক্রমং বাত-পিপ্ত-শ্লেষ্ম প্রকোপনাঃ। দম্বীকরাঃ ফণী জেরো মণ্ডলী মণ্ডলা ফণা। বিন্দুলেখা বিচিত্রাঙ্গ পল্লগঃ স্যান্তু রাজীমান্। বিষং যথাক্রমং তেষাং ভস্মাং বাতাদি কোপনম্।

এই সর্পকুলকে তারা তিন ভাগে ভাগ করেছেন দম্বীকর, মণ্ডলী ও রাজীমান। তা ছাড়া কোন জাতীয় সাপের কি প্রকৃতি, তারা কামড়ালে বায়ু, পিত্ত ও কফ কোন্ দোষের প্রকোপ হয় ও কি কি উপসর্গ উপস্থিত হয় তার যথাযথ বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন।

### এ প্রসঙ্গে সাপের বিষের প্রকৃতি যোজনা

যে সব সাপের ফণা হাতার মত তাকে বলা হয় দম্বীকর প্রণী। এদের বিষ বায়ু-বর্ধক। এই বিষ শব্দটির অর্থ ব্যাপ্ত, যা ছড়িয়ে পড়ে। দম্বীকর সাপের বিষ তড়িৎ-গতিতে ছড়িয়ে পড়ে স্নায়বিক যন্ত্রের অবসাদ ঘটিয়ে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে এবং মৃত্যুও ঘটায়। একে বলা হয় নিউরোটক্সিক্ (Neurotoxic); (অগদ তন্ত্রের ভাষায় “স্নায়ুক্ষেপ”)।

মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে আলোচ্য বনৌষধিটি কি করে সাপের বিষে কাজ করে।

এখানে চরকীয় সমীক্ষায় দেহে বিষ সঞ্চারের ক্ষেত্রে বলা হ’য়েছে—

জগ্গমং স্যাদ্ উদ্ধর্ভাগমধোভাগং তু মূলজম্।

তস্মাদুণ্ট্রাবিসং মৌলং হন্তি মূলং চ দুগ্ধষ্টজম্॥

অর্থাৎ দেহে জগ্গম বিষের গতি উর্ধ্বদিকে, আর স্থাবর বিষের গতি অধোদিকে, দুটি বিষের এই বিপরীত গতি হওয়ায় স্থাবর বিষ জগ্গম বিষক্রিয়াকে এবং জগ্গম বিষ

স্বাভাবিক বিকল্পিতাকে প্রতিহত করে; অর্থাৎ নৈসর্গিক কারণে স্বাভাবিক বিষ পার্থক্য শক্তিতে এবং জগ্গম বিষ বায়বীয় শক্তিতে পূর্ণ। এই স্বাভাবিক বিষ আবার দুই প্রকারের—একটি খনিজ, যেমন শঙ্খবিষ (আর্সেনিক) আর একটি উদ্ভিজ্জ বিষ—যেমন অমৃত বা মিঠাবিষ (এ্যাকোনাইট); এইগুলি পার্থক্য ও গুরুত্ব।

দেখা যাচ্ছে—চরকীয় চিন্তাধারায় স্বাভাবিক ও জগ্গম বিষ ভেদে যে বিষের উদ্ভাব ও অধোগতি বিচার করা হ'য়েছে, তার মধ্যে সর্পের জাতিভেদ বিজ্ঞানটিও ত্রিদোষের অন্তর্ভুক্ত ক'রে (বায়ু, পিত্ত, কফ) তাদের বিকৃতির বিচারও করা হ'য়েছে; অতএব কেউটে জাতীয় সাপে কামড়ালে হৃদযন্ত্রে যে বায়ুর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয় (দ্রুততা) সেটা জাগ্গমিক বিষের উদ্ভাবগতিই কারণ। সেইখানেই এই চাঁদড়ের প্রয়োগ। এটি গত শতাব্দীতেও প্রয়োগ করা হ'তো।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণের নিরীক্ষায় জানা যায়—ভারত ও পূর্বভারতীয় ম্বীপ যাভা ও মালয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকে সাপে কামড়ালে এ গাছের মূল ক্রাথ ক'রে খাওয়ানো এবং বেটে প্রলেপ দেওয়া হ'তো। শৃঙ্গু তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে বহু রোগেও এটির ব্যবহার হ'য়ে থাকে।

এ তো গেল গত শতাব্দীর সংকলিত তথ্য। বর্তমান যুগে ব্রাডপ্রেসার রোগে ও উন্মাদ রোগের ক্ষেত্রে এটির ব্যাপক প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। এখানেও সেই আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারায় বিকৃত বায়ুর উন্মাদ গতিককে দমনিত করা; এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রোগোৎপত্তির জন্য যেটি বিকৃত হেতু সেটি ত্রিদোষের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের অন্তর্গত বায়ুরই অশান্ত গতিককে প্রতিহত করা; সুতরাং ব্রাডপ্রেসারে এবং কোন কোন প্রকার উন্মাদের ক্ষেত্রে এটি যে কার্যকরী হ'য়েছে—সে ইঙ্গিত পুরাতনের চিন্তাধারার নুতন রূপ। রাস্না মূলজ বিষ, তার একটি শক্তি তাতেই নিহিত আছে কিনা তাও আশু অনুসন্ধান করতে হবে, ব্রাডপ্রেসারটি প্রকৃতপক্ষে শোণিতজ মূছা রোগ, সেই মূছা রোগের উৎস যখন মলীভূত শোণিত, তখন সেই শোণিতেই বিকল্পিতা ঘটে বলেই এই ভেদজ তাকে উপশমিত করে।

### CHEMICAL COMPOSITION:

- (a) Alkaloids viz., rauwolscine, reserpine, serpentine, deserpidine.  
(b) Sterols viz., betasitosterol, gama sitosterol. (c) Fatty alcohols.





## সর্পগন্ধা

গোলা বৃদ্ধি ও গোলা বিদ্যের অনেক দোষ, এই ধরুন—আমাদের দেশে একটা প্রখ্যাত প্রবাদ আছে যে—

‘হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুদুমধ্যাৎ’

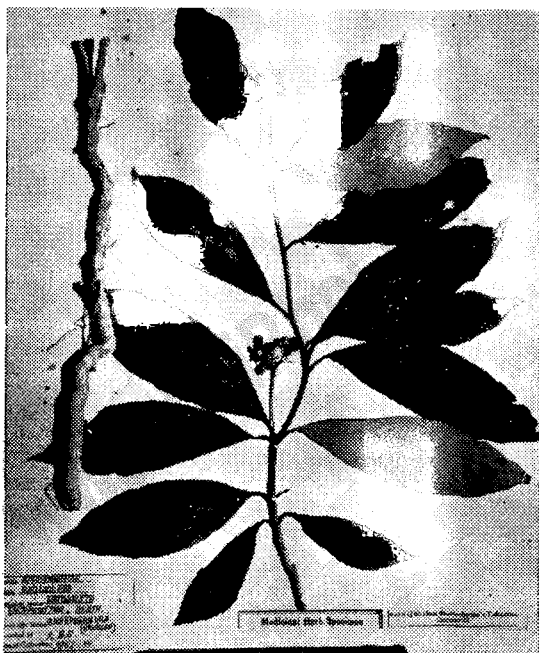
এই শ্লোকটার অর্থ করে আমরা বলে থাকি—দুধে জলে মিশিয়ে দিলে হাঁস (হংস) নাকি দুধের অংশটা খায় আর জলটা পড়ে থাকে, এর পিণ্ডিতি ব্যাখ্যা হ’লো—জলের সঙ্গে মাটি গুলে দিলে সে জলটুকু শুষে নেয়, মাটি পড়ে থাকে। এই বক্তব্যের মধ্যে হংসকে খুঁজলে দেখা যায় এই হংস মানে সূর্য (যজুর্বেদ), সুতরাং গোড়াতেই গলদ। সেই রকমই এই ‘সর্পগন্ধা’ নামের ক্ষেত্রটিতে।

আমার বৈদ্যক জীবনের প্রথমাঙ্কে মনে ক’রেছিলাম এই গাছটার কোনও অংশে কি সাপের গন্ধ আছে? নাকি সাপ এ গন্ধ সহ্য ক’রতে পারে না? নাকি ভালবাসে? আমিও যে প্রথম জীবনে এ বোকামি করিনি তা নয়, গোখুরো সাপকে রাগিয়ে তার মূত্থের কাছে এই গাছের মূল ধরতেই সে কামড়ে ধরলো, সুতরাং এই সর্পগন্ধা নামটি দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে সম্বন্ধে পাওয়া গেল না।

আজ উত্তর বয়সে এই নামটি অনুশীলন ক’রতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, এখানে গন্ধ শব্দের অর্থ হিংসা অর্থাৎ সাপকে যে হিংসা করে। আর তাকে হিংসা করার অর্থই হলো—তার বিবিক্রিয়াকে হিংসা করা। এর আর একটি নাম ‘সর্প-সুগন্ধা’ অর্থাৎ সাপের বিষের ক্ষেত্রে উত্তমরূপে যে হিংসা করে। এখন এই ভেষজটি যে জন্য আমরা ব্যবহার করছি তা’ কেন করছি, তার বিজ্ঞানটাই বা থোকায়, সেইটা প্রমাণ করতে গেলে খান ভানতে গিয়ে শিবের গীত গাওয়ার মত গাইতে হয়। আর না গাইলেও এর

লজিক্যাল ফ্যালসিটা কোথায় এবং কতটাই বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক, সেটা বোঝানো যাবে না, তাই বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে চলে যাচ্ছি।

এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ একে প্রধানভাবে ব্যবহার করছেন ব্রাড-প্রেসারের ক্ষেত্রে, অবশ্য তার বীর্ষ-বিশেষকে (পার্ট অব প্রোটেন্সি) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করে। আর ভারতীয় বৈদ্যক সম্প্রদায় ব্যবহার করেন উন্মাদের ক্ষেত্রে তার সমগ্র মূল্যাংশ। কিন্তু দৃ'জনের লক্ষ্যই উন্মার্গগামী বায়ুকে দমিত করা। ব্রাড-প্রেসারের সিস্টোলিক প্রেসার এটাতে নামিয়ে দেয় এবং উন্মাদের ক্ষেত্রে সেই উচ্ছ্বসিত বায়ুর বিকার অর্থাৎ তার উন্মার্গগামীতাকে দমিত করা, সুতরাং সেখানে দোষ অংশ বলতে বিকারগ্রস্ত বায়ুই।



এখন প্রশ্ন এসে পেঁছছে যে, এর সঙ্গে সাপের কি সম্পর্ক—এ তথ্যের সম্ভান বৈদ্যক-সম্প্রদায়গণ জানতেন কিন্তু চিরাচরিত রীতিতে গোষ্ঠী-গদ্যন্তর রক্ষণশালিতার জন্য হয়তো বা প্রকাশ্যে গোচরীভূত হয়নি। কিন্তু এটা যে উন্মাদ ব্যাধিকেও দমিত করতে পারে—এ প্রচারটা করেছেন পাটনার হাসান ইমাম ছায়েব। আর এটি যে ব্রাড-প্রেসারের কাজে লাগানো যাবে—এ তথ্য দিয়েছেন তদানীন্তন কালের কলিকাতার দৃ'জন খ্যাতনামা চিকিৎসক।

## প্রাচ্য বৈজ্ঞানিকদের সমীক্ষায়

এদের মতে সর্পগন্ধার দুই ভাগ—একটির নাম নাকুলী, অপরটির নাম গন্ধনাকুলী। শ্লেকাটি হচ্ছে—নাকুলী-গন্ধনাকুলী চ—নাকুলী সর্পগন্ধাচ সূত্রগন্ধা রক্তপত্রিকা ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে সর্পগন্ধাই নাকুলীর অপর একটি নাম। আর শ্লেকাকের শেষে আছে সর্পাক্ষী গন্ধনাকুলী। সর্পাক্ষী নামের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় যখন এই গন্ধনাকুলীর বীজ-গুঁড়ি পাকে, দেখতে অবিকল সাপের চোখের মত হয়। মাধবকরের পর্যায় মূল্যবলীতে রাস্নার দু'টি নাম—নাকুলী ও গন্ধনাকুলী (তখনকার প্রচলিত নাম “বিষমঙ্গুরী”)। মাধবকরের মতে এর নয়টি পর্যায়বাচী নাম। তাদের মধ্যে সর্পগন্ধা ও সর্পাদনী—এ দু'টি নামও ত্রিযাচক।

সুশ্রুতের সুত্রস্থানের ৩৭ অধ্যায়ে এবং বাগ্ভটের সুত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে অর্কাদি বর্গে রাস্নার উল্লেখ এবং চরুদত্তের জ্বর চিকিৎসায় রাস্নার উল্লেখ। চরকে উন্মাদ রোগাধিকারে (মহাপৈশাচিক ঘৃতে) এর ব্যবহার করা হয়েছে।

সর্পগন্ধা, সর্পাক্ষী, সর্পাদনী প্রভৃতি যে কয়টি এর শব্দপর্যায় সেগুলির অনেক-গুলি ত্রিযাকারিত্বের এবং কতকগুলি আকৃতি পরিচায়ক। তা'ছাড়া অনেক সময় শব্দার্থ ও শব্দ-তাৎপর্যে জ্ঞানের অভাব থাকলে বৈদিক নামের ভেদজগুলির পরিচয় লাভ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন সর্পগন্ধা—সর্পাণাং বিষস্য গন্ধঃ—এর অর্থ আপাতদৃষ্টিতে সাপের বিষের গন্ধ বোঝালেও আসলে এখানে গন্ধ শব্দের অর্থ হিংসা। আর একটি শব্দ সর্পাদনী—‘সর্পবিষং অদ্যতে অনয়া’—এর অর্থ যে ভেদজ সাপের বিষকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ নষ্ট করে। এর আর একটি নাম সর্পাক্ষী, যা এর স্বরূপ পরিচয় জ্ঞাপন করে—‘ষস্য বীজং সর্পস্য অক্ষিরিব’ অর্থাৎ যার বীজ সাপের চোখের মত। এই কথাটির সামঞ্জস্য দেখা যায় গন্ধনাকুলীর (*Rauwolfia canescens* Linn.) বীজের ক্ষেত্রে।

রাজনিষাটুর ৬ষ্ঠ বর্গে রাস্নার ২১টি পরিভাষা এবং ৩টি প্রকার ভেদ—একটি মূল-রাস্না, একটি পত্র-রাস্না, একটি তৃণ-রাস্না। এই মূল-রাস্নাই নাকুলী ও গন্ধনাকুলী। গুণের বর্ণনায় বলা হয়েছে—‘নাকুলী তুবরা তিস্তা কটুষ্ণাচ ত্রিদোষাজং। ভোগীলতা-বৃশ্চিকাথু-বিষজ্বর ক্রিমি-ব্রণান্।’ ভোগী শব্দের অর্থ সাপ, লতা (মাকড়সা), বৃশ্চিক (বিছা), আথু (ইন্দুর)—প্রভৃতির বিষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

আর একটি শ্লেকে বলা হয়েছে—

‘নাকুলী যুগলং তিস্তং কটুষ্ণাচ ত্রিদোষনুৎ।

অনেক-বিষবিধংসি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠং দ্বিতীয়কং॥’

অর্থাৎ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী উভয়েই তিস্তরস-সম্পন্ন, কটু, উষ্ণ ও ত্রিদোষনাশক। এটি বহুপ্রকারের বিষকে নষ্ট করে, তবে গন্ধনাকুলী কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ।

## পরিচিতি

এ দুটি ওষধি Apocynaceae ফ্যামিলীভুক্ত। নাকুলী অর্থাৎ সর্পগন্ধার বোটানিক্যাল নাম *Rauwolfia serpentina*, এটির বাংলায় চলিত নাম ছোট চাঁদড় আর উদ্ভূতে বলে ইস্রোল এবং গন্ধনাকুলীর বর্তমান নাম *Rauwolfia tetraphylla*, এটাকে বলা হয় বড় চাঁদড়। বর্তমানে নব্য বৈজ্ঞানিক বলছেন যে, বড় চাঁদড় less toxic,

অথচ কয়েকশত বৎসর পূর্বে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাই তাঁরা বলেছেন—ছোট চাঁদড় অপেক্ষা বড় চাঁদড়ের মূল কঠিন শ্রেষ্ঠ।

ছোট চাঁদড়ের গাছগুলি সাধারণতঃ ২।৩ ফুট উচ্চতায় দীর্ঘ হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ৩।৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতেও দেখা যায়, গাছে বিশেষ শাখা-প্রশাখা হয় না। পাতাগুলি দেখতে অনেকটা মালতীফুলের গাছের পাতার মত, কিন্তু পত্রাগ্র একটু সরু ও লম্বা। পুষ্পদণ্ডে অল্প গুচ্ছবদ্ধ গোলাপী ফুল হয়, পুষ্পাধি টকটকে লাল, বীজগুলি প্রথমে সবুজ, পরে পাকলে বেগুনী কালো হয়, বীজগুলি প্রায় ক্ষেত্রে জোড়া হয়। মূলগুলি দেখতে মোটা, প্রায় ১/১২ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ও ভগ্নদূর। মূলের রঙ ধূসর পীতবর্ণের। এর মূল চেনার উপায়—কাঁচা মূলের গন্ধ কাঁচা তেঁতুলের মত। বড় চাঁদড়ের গাছগুলি ৪/৫ ফুট লম্বা হয়, কাষ্ঠগর্ভ মূল। শস্যায় তিনটি করে পাতা বিন্যস্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে চারটি পাতাও হয়ে থাকে। এটার মূলের গন্ধও আঁবকল কাঁচা তেঁতুলের গন্ধ। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় গাছের মূল।

আর একটা কথা, এ সম্পর্কে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে ৩।১১।২৭ সূক্তে একটি তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে বলা হয়েছে—

ধন্বানি সর্পাদনী সহস্র যোজনেষু অহন্তী অধঃ ক্ষ্মাচরী নাকুলী  
বিষং অঘবদ্ স্তনুধুমীঢ়।

ভাষ্যকার সাধারণ বলেছেন—

সর্পাদনীঃ স্তোতি, স্বঃ

“ধন্বানি সহস্র যোজনেষু অধঃ ক্ষ্মাচরী নাকুলী বিষং অঘবদ্  
স্তনুধুমীঢ়।”

এটির অর্থ হ'লো সর্পাদনী লতার প্রশংসা ও স্তুতি—‘তুমি সহস্র যোজনে বিস্তৃত হও, ধন্ব দেশে জন্মগ্রহণ করে ধরণীর অধোভাগে প্রবেশ করে নকুলের বিষ গ্রহণে সাহায্য কর।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি বস্তুবা হচ্ছে এটি ধন্বন্ দেশে জন্মে; এই নিবন্ধোক্ত ওষধিটি অথর্ববেদোক্ত এই গাছ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখে।

এখানে আর একটি কথা জানিয়ে রাখি—অনেকের মতে এই গাছটির একটি পর্যায় নাম নকুলেষ্ঠা থাকায় এটা কি মনে হয় না যে সর্পদন্ত নকুল (বেঁজি) আত্মরক্ষার জন্য এর মূলকে ইষ্টজ্ঞান করে? এটির বোটানিক্যাল নাম *Ophiorrhiza mungos* Linn. ফ্যামিলি Rubiaceae, একে *Ichneumon plant-* ও বলে; এটি দক্ষিণ-ভারতে খুব বেশী পাওয়া যায়, তবুও এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যা হোক আমার বস্তুবা বিষয় প্রচলিত সর্পগন্ধা সম্পর্কে।

এখন প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, এটি সর্পবিষের হিংসা করে, এ কথাটা তাৎপর্য কি?

এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হ'লো, দর্বা সাপে (যাদের ফণা আছে তাদেরই দর্বা বলা হয়; এই দর্বার অর্থ হাতা, যার ফণা দেখতে হাতার মত। কেউটে, গোখরো এই পর্যায়ের সাপ), কামড়ালে হৃদযন্ত্রে অসম্ভব বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে রক্তের তণ্ডন ক্রিয়া অসম্ভব বেড়ে যায়, সেইটাই হয় হৃদযন্ত্রের বন্ধের কারণ; সেইজন্য এই বায়ুর চাপজনিত তণ্ডন ক্রিয়াকে সংযত করতে এই সর্পগন্ধার মূল বাটার সরবৎ

খাওয়ানো হ'তো; যার দ্বারা চিকিৎসা করার সময় পাওয়া যেতো। এও কিন্তু সেই বায়ুর উদ্ভবগতিকে দমিত করার পদ্ধতি। এই হেতু তার সর্পগন্ধা নামকরণ।

বাংলার চিকিৎসা জগতের দুটি উদিত সূর্য মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত কবিরাজ গণনাথ সেন ও ডাক্তার কাকতিচন্দ্র বসু মহাশয় একযোগে এই মূলটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেছিলেন (১৯৩০)। তাঁদের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি—ইহা অত্যন্ত উত্তেজনানাশক ও নিদ্রাকারক, ইহার মূল চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে স্নানিদ্রা হয় ও উদ্বেগের হ্রাস হয়। ইহার উপক্ষার (Alkaloid) হৃৎপিণ্ডের উপর অবসাদক ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং রক্তবহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলিকে বিস্ফারিত করিয়া থাকে। এই ক্রিয়ার জন্য এই ঔষধটির ব্যবহারের দ্বারা রক্তের স্রোতে বাহিত বায়ুর চাপ কমিয়া যায়।'

এর মাত্রা সম্বন্ধে বলেছেন—নিদ্রাকারক মাত্রা ১৫—২০ গ্রেণ অর্থাৎ ১ গ্রাম-সওয়া গ্রাম মাত্রায়। রক্তগত বায়ুর বৃদ্ধিতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় দিনে একবার প্রয়োজন হ'লে বায়ুর আধিক্যে দুইবার দেওয়া হয় দুধ ও চিনি সহ।

তাঁরা আরও লিখেছেন যে, সকলপ্রকার মনোবিকারে (Insanity) ইহা ফলদায়ক হয় না। শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ বোধ হ'লে এবং মানসিক অবসাদজনিত রোগে (Melancholy) সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ low ব্লাড-প্রেসার রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পূর্বে উদ্ভাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার সময় ৫।৭টি গোলমরিচ বাঁটা এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'তো। হয়তো এর উদ্দেশ্য সর্পগন্ধার অবসাদ আনা দোষটাকে সে অনেকটা কাটিয়ে দেয়, যেহেতু গোলমরিচ হৃৎবলকারক, উষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উত্তেজক।

সর্বশেষে আমার একটা বক্তব্য রেখে এই বনৌষধি নিবন্ধের উপসংহার করছি।

ক্ষেত্র বিশেষে এই মূল সাময়িক ও সীমিতভাবে ক্ষতিকারক নাও হ'তে পারে, কিন্তু রক্তগত বায়ুর গতিকে দমিত করার জন্য অনেককে দীর্ঘদিন এই মূলকে রূপান্তরিত আকারে ব্যবহার করে যেতে হচ্ছে জীবনের আশু বিপত্তি রক্ষার জন্য; কিন্তু তারই ফলস্বরূপ কালে বিপর্যয় ডেকে আনছে কিনা বৈজ্ঞানিকগণের আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্র আছে বলে মনে করি।

কারণ দুইটুকু ছেলেকে ঘেরা জায়গায় বন্ধ করে রেখে দিলে সে বেরদুতে না পেরে নীচের মাটিটাই যে খুঁড়বে না, এ কথা না ভাবাই ভাল।

### CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., ajmaline, ajmalinine, ajmalicine, serpentine, serpentinine, isoajmaline, neoajmaline, rauwolfine. (b) Other basic constituents. (c) Oleoresin, serposterol.



## রূপান্তরিক

এই গাছটি সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে বৃক্ষজগতের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্কের মৌল সংহতি-সূত্র কোথায় এবং জন্ম-বৈচিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কি, স্বাধিচিন্তা-প্রসূত সেই মৌল সূত্রটা জানাই।

পশ্চিম পাজাবে যদি থানকুনি (*Centella asiatica*) না পাওয়া যায় তাতে তার ভৈষজ্য গুণটি অস্বীকৃত হয় না অথবা চব্বিশ পরগণায় যদি জটামাংসী (*Nardostachys jatamansi*) না পাওয়া যায় তাতেও জটামাংসীর ভৈষজ্যগুণ হারায় না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় আখরোটের গাছ চেষ্টা করলেও হ'তে চায় না, এবং আপেলও হয় না, তেমনি কাস্মীরে গেলে সেখানের কোথাও তুলসীর গাছ (*Ocimum Sanctum*) দেখা যায় না অথবা গোল মরিচের (*Piper nigrum*) লতাও নজরে পড়ে না; এর কারণ অবশ্যই মেনে নিতে হয় সেই সূত্রাত সংহিতার (সূত্রস্থান ৩৫—৪১ অধ্যায়) কথা; কোন দেশ জাংগল, কোন দেশ আনুপ, কোন দেশ মরু বা ধ্বন, কোনটি বা সাধারণ দেশ। প্রতি দেশেরই বৈশিষ্ট্য আছে, সে বৈশিষ্ট্য মৃত্তিকাপ্রধান, তারপর ভূখন্ডের অবস্থান ভেদে সূর্যের তাপ বিকিরণের তারতম্যে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ গুণের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যও কি জীবজগৎ কি বৃক্ষজগতের শরীরের ও প্রকৃতির গঠনের পরিবর্তন ঘটায় সূত্রাত উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারও স্থানীয় ভূশক্তির প্রাধান্য নিয়ে, সূত্রাত তাই বলা হয়েছে—

“তত্র পৃথিবী অপ-তেজো-বায়ু-আকাশানাং সমুদয়াং দ্রব্যভি-  
নিবৃতিঃ উৎকর্ষস্বাভি ব্যঞ্জকো ভবতি।

অর্থাৎ এই পৃথিবীই ইংগিত করে সকল দ্রব্যকে, কোন দ্রব্য ক্ষতি-প্রধান, কোনটি জল-

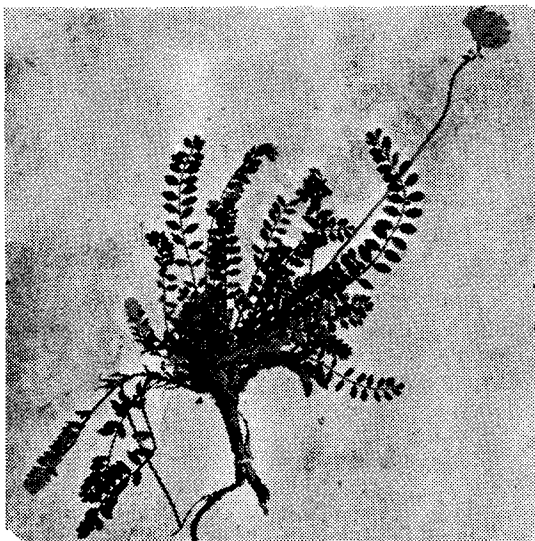
প্রধান, কোনটি বায়ু-প্রধান আর কোনটি বা আকাশ-প্রধান। কারণ পৃথিবীর অবস্থান ব্যক্তনার দ্বারাই দ্রব্য সমূহের স্বভাব প্রকৃতির নিষ্পত্তি।

আর এই জন্যই প্রতিটি ভেষজও প্রতিটি মানবের জন্য পৃথক পৃথক গুণ প্রকাশ করে। এছাড়া আছে কাল এবং বয়সে ঋতুর পার্থক্য থাকায় এই পার্থক্য সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে চরক সংহিতার একটি উক্তি—

“যস্য দেশস্য যো জন্মি তজ্জং তস্য ভেষজম্।”

অর্থাৎ যে রোগ যে দেশে জন্মে, ভেষজও তার আশেপাশে থাকে। সেই যুগে ওষধীয় চিন্তায় ভারতবর্ষকে চারটি ভাগে ভাগ করা হ'য়েছিল, সে সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে আরও দুটি অঞ্চলকে প্রধান্য দেওয়া হ'য়েছে। একটি হৈম দেশ, দ্বিতীয়টি পার্বত্য দেশ। পূর্বেই উল্লেখিত হ'য়েছে যে, দেশভেদে কি জীবজগৎ কি বৃক্ষজগৎ, এ দুই-এর প্রকৃতিগত তারতম্য ঘটে; যার জন্য রোগের ও



ভেষজের বৈচিত্র্যও দেখা যায়; অতএব জলাসন্ন দেশের গাছ মরু দেশে হওয়া সম্ভব নয়। আলোচ্য বনৌষধিটি কিন্তু হৈম এবং পার্বত্য দেশজাত। এই গাছটি সম্পর্কে অথর্ববেদ বা অথর্বসংহিতায় এর উল্লেখ দেখা যায় না; এমনকি আমাদের সংহিতাগ্রন্থ চরক সূত্রদ্বিতেও এই নামীয় কোন ভেষজের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র এটির উল্লেখ দেখা যায় সপ্তদশ শতকের বনৌষধির গ্রন্থ রাজনিঘণ্টদ্বিতে।

সেখানে বলা হয়েছে—

চনপত্রং সমপত্রং ক্ষুদ্রপশ্চৈব তথাকৃতি।

শৈশিরে জলবিন্দুনাং শ্রবন্তীতি রুদন্তিকা।

অর্থাৎ ছোলা গাছের মত গাছ ও পাতা, শিশিরকালে এর পাতা থেকে জলবিন্দু ঝরতে থাকে।

### পরিচিতি

এটি সাধারণতঃ হিমালয়ের সন্নিহিত বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া গেলেও বর্তমানে এটি দুর্লভ বলা যেতে পারে। এখনও পাওয়া যায় উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও কৈদারনাথের শিখরাঞ্চলে ৯—১৩ হাজার ফুট উঁচুতে। এটি দেখা যায় সাধারণতঃ যে সব অঞ্চলে বরফ পড়ে; এ ভিন্ন হিমাচল, কাশ্মীর, শিমলা, গাড়োয়াল ও কুমায়ূনের পার্বত্য অঞ্চলেও বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সব অঞ্চলে বরফ পড়ে সেসব অঞ্চলের ছোট গাছগুলির পাতা প্রায়ই রোমশ; এই সব ক্ষুদ্র জাতীয় গাছের রোমশ পাতাগুলি শিশিরকণাকে ধরে রাখে; সূর্যোদয়ের পর এই শিশিরকণা বিন্দু বিন্দু ঝরতে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে অঞ্চলে এই রুদন্তিকা গাছ জন্মে, সে অঞ্চলের সব ছোট গাছের পাতা প্রায়ই অল্প রোমশ। ঠান্ডা সহ্য করার জন্যই এটা প্রকৃতির দান।

এই গাছটির বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে অবলম্বন করে এর এই কাব্যিক রুদন্তিকা নামকরণ; সুতরাং সমতল ভূমিতে এ নামের সার্থকতা সম্ভবও নয়।

নিবন্ধোক্ত রুদন্তিকা আকারে ও সাদৃশ্যে ছোলা গাছের (*Cicer arietinum*) মত, কাণ্ড ছোট ও সরু, পাতা ঘন, ছোট ৩।৪ ইঞ্চি নাগে পুষ্পমঞ্জরী হয়, এটি গোল ছোট, ঘন সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফলও খুব ছোট লম্বাটে, বহিরাবরণের মধ্যে থাকে এক একটি কোষে ৩।৪টি বীজ, এটির সংগ্রহকাল আগস্ট থেকে অক্টোবর অর্থাৎ বরফ-গলা থেকে বরফ-পড়া পর্যন্ত। বৎসরে মাত্র একবার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Astragalus leucocephalus* Garh. ফ্যামিলি Leguminosae.

এই গাছের আর একটি প্রজাতি আছে—তার নাম *Astragalus candolleanus*। এটা সাধারণতঃ ১০—১৩ হাজার ফুট উঁচুতে জন্মে, এর ফুলগুলি হলদে।

### রুদন্তিকা মৃদুকিলের আসান

এই সব গাছপালা সংগ্রহকালে উচ্চতায় অস্বিজেনের অভাবহেতু একটু শ্বাসকষ্ট হ'তে থাকে, তখন আমরা এই গাছের মূল চিবিয়ে খাই; এর দ্বারা আমাদের ঐ অসুবিধেটা আর হয় না। এর মূলগুলি কিন্তু একটু পিচ্ছিল।

এই তথ্যটি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের হিমাচল প্রদেশস্থ বনৌষধির সার্ভে অফিসার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মিঃ এ. সি. দে মহাশয়।

গুণাধি বর্ণনা—রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বলা হ'য়েছে—

কটুতিক্তেষ্কা, ক্ষয়ঘ্রী, কৃমিঘ্রী, রক্তপিত্তঘ্রী, মেহঘ্রী, জরাব্যাদি হরদ্বাং রসায়নী।



অর্থাৎ এটি রক্তপিপ্ত, ক্ষয়রোগ, মেহ ও কৃমিরোগনাশী, আর নিষণ্টকর তার গুণ সম্পর্কে লিখেছেন—কটু-তিক্ত ও উষ্ণগুণ সম্পন্ন।

এর গুণ সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে—এটি বায়ু ও তেজগুণসমৃদ্ধ অর্থাৎ এটি শ্লেষ্ম-জনিত রোগ নিরাময়কারক; আর উষ্ণগুণান্বিত হওয়াতে সে কৃমি ও মেহরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর স্বাদে তিক্ত হওয়াতে স্বভাবতঃই এটি কফ-নাশকারী আকাশধর্মীগুণের আধার।

দ্রব্যগুণ বিচারে দেখা যায় যে, শ্বেত্মবিকারজনিত ক্ষয়রোগে তার ভূমিকা হ'তে পারে অসাধারণ।

### রোগ-প্রতিকারে লোকায়তিক ব্যবহার

ঐ অঞ্চলের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগে সমগ্র ভেষজচূর্ণ ১—৩ গ্রেণ পর্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ একবার বা দুইবার দুধ ও মধু মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন। তবে আধ গ্রেণ থেকে সূর্য ক'রে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দুই বা তিন গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার ক'রে থাকেন এবং আবার আস্তে আস্তে কমিয়ে তার ন্যূনতম মাত্রায় নেমে আসেন। আর এই ঔষধ ব্যবহারকালে আহাৰ্য ও পথ্য হিসেবে দুধ-রুটি ও দুধ-ভাতের ব্যবস্থা আর অলবণ আহাৰ্যই ব্যবস্থা। এক মাসের মধ্যে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়; এবং স্বাস্থ্যও ভাল হয়।

### বিশেষ ইঙ্গিত

Glossary of Indian Medical Plants নামক পুস্তকে রুদ্রবন্তী ব'লে যে গাছের উল্লেখ আছে—সেটির বোটানিক্যাল নাম *Cressa cretica* Linn. ফ্যামিলি *Convolvulaceae*. রাজনিষণ্টকতে উক্ত আছে—ওষধিটি স্বাদে তিক্ত—এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই কোনটি আয়ুর্বেদোক্ত রুদ্রান্তিকা সেটা নির্ণয় করা সমীচীন; তবে এটা বলতে পারা যায়, গ্লোসারিতে উক্ত রুদ্রবন্তী গাছটি তিক্ত নয়। এটি অভিজ্ঞের মত।

www.boirboi.net



## তিথিভেদে খাদ্যে বাছ-বিচার কেন?

দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন; খাদ্যের প্রতিক্রিয়ার শক্তিতে মনের বল বাড়ে, যদিও মনের সুস্থতার জন্য বাইরের পরিবেশেরও সুস্থতার প্রয়োজন। মিত্তীয় ক্ষেত্রে বিশ্ব-বিজ্ঞানেরও মত আছে, প্রথমটির ক্ষেত্রে তা নেই।

প্রথম ক্ষেত্রে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের অভিমত—শরীরের প্রয়োজনে যেসব ‘ভিটামিন’ বা ‘খাদ্যপ্রাণের’ বিশেষ আবশ্যিক, সেইসব ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ যেসব খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আছে, তা গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ থাকবে। এখানে মনের প্রসঙ্গে তাঁরা নীরব।

এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের বক্তব্য—প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে পাণ্ডুর্তাতিক (ক্ষীত-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম) গুণরাশি বিদ্যমান, তা পাণ্ডুর্তাতিক দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এবং সেই পাণ্ডুর্তাতিক দ্রব্যের স্থূলাবয়বের মধ্যে ত্রিদোষের (বিকারগ্রস্ত বায়ু-পিত্ত-কফের) বিচার করার উপাদান রয়েছে; অর্থাৎ স্বতু-পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রব্যের শক্তির উপচয় (বৃদ্ধি) বা অপচয় (হ্রাস) যেমনি ঘটে, তেমনি ঘটে প্রতিনিয়ত দিবা-রাত্রির মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের শক্তিরও ব্যাপক প্রসার এবং অপসার। এটি বিশ্বের সর্বত্র অবিরত ঘটছে। মনেরও স্বাভাবিকতা এই প্রকৃতি-নির্ভর।

যেসব খাদ্যের দ্বারা প্রাণী জীবনধারণ করে এবং যেসব খাদ্যের অভাবে প্রাণীর জীবন-বিয়োগ হয়, সেখানেও বায়ু, চন্দ্র এবং সূর্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং উভয় ক্ষেত্রেই আবরক (ক্রিয়াশালী) ও আবৃত (বিকারগ্রস্ত) হয়েই কাজ করে।

খাদ্যের মধ্যেও এই দু’টি ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাই আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—দেহের সঙ্গে খাদ্যের প্রাণশক্তিতে তিথির শক্তিক্রিয়া। তিথি মানে যে আসে, থাকে এবং যায়। অত্-ইখিন্ অর্থাৎ কাল বা সময়টা চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবের মাধ্যমেই আসে, থাকে ও যায়। বারু তো সর্বদাই রয়েছে। সে চন্দ্র-সূর্যের প্রভাবের মাধ্যমেই আসে, আর চিরজীব-২০

বায়ু তাদের ক্রিয়াকে গতিশালী করে দেয়। চন্দ্রের শৈত্য-ক্রিয়াই হোক, আর সূর্যের তীক্ষ্ণ-ক্রিয়াই হোক—এগুলি কখনো আবরক আবার কখনো বা আবৃত; এই খেলাই চলছে অহরহ—জগতের বস্তুর মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে খাদ্য বস্তুগুলির উপর বায়ু চন্দ্র আর সূর্যের ক্রিয়াকে পরিলক্ষণ করে আর্ষসংহিতাকারগণ বিচার করে দেখেছেন—বস্তু আর তার সংযোজন যদি সমান হয়, তবে উভয়ের সংযোজনে সাম্য হলেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়, অসাম্য হলেই হ্রাস হয়।

তাই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের সর্বজনীন ক্রিয়ার সঙ্গে তিথি বিচারের সামঞ্জস্য করার বিধানটা ভিন্নমুখী। সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেহ ও বস্তুতে কতখানি—এই দৃষ্টান্ত কিন্তু ভিটামিন তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্যসাধনের পৃথক দৃষ্টিকোণ।

সূর্যের প্রভাব আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন মনে হলেও চন্দ্রের প্রভাব সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ও ভারতীয় ঋষিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্রের মধ্য দিয়েই আমরা সূর্যের প্রভাবকে ভোগ করি। যদি তা না হতো, তবে সূর্যের প্রচন্ড দাহ্য শক্তিতে সবই অগ্নিময় হয়ে যেতো, কোন প্রাণশক্তির অস্তিত্বই থাকতো না। আবার চন্দ্রের প্রভাব স্বাধীন হলে সবই জলময় হতো। অতএব উভয়েই উভয়ের সহায়ক। সুতরাং দেহে ও খাদ্যে উভয়ের প্রভাবই বিকার ও আরোগ্যের এবং পুষ্টি ও ক্ষয়ের কারণ। বায়ু ও কাল কিন্তু স্বাধীন হলেও এটিকে অতিক্রম করে ক্রিয়াবত্তা প্রকাশ করতে পারে না।

শুক্রা ও কৃষ্ণা প্রতিপদে প্রকৃতি ও দেহের মধ্যে শ্লেষ্মাধাতু বলবান হওয়ায় লবণ রসের আধিক্য ঘটে। তাই বিকৃত কফের প্রত্যক্ষ আশ্বাদও লবণাক্ত। এর জের উভয় পক্ষের স্বিতীয়্যাতোও থাকে। এই জন্যই প্রতিপদে ও স্বিতীয়্যায় চালকুমড়া খাওয়া নিষিদ্ধ, কারণ চালকুমড়ার রসে ও বীর্ষে ক্ষারের প্রাধান্য থাকলেও ঐ দু'টি তিথিতে কৃষ্ণাধাতু যখন লবণাক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়, তখন তার সঙ্গে যদি আর একটি ক্ষার-প্রধান দ্রব্যের সংযোগ ঘটে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আর দেহে রুদ্ধতা, ক্ষারপ্রাধান্য ও লবণাক্ত ভাব যখনই দেখা যায়, তখনই রূগ, চুলকণা, খোস-পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি ব্যাধিগুলি দেহের মধ্যে স্থান পায় এবং এর জের দীর্ঘদিন থাকে। যেহেতু চালকুমড়ার ক্ষার আছে—এটা প্রমাণিত সত্য, সেইহেতু শুক্রা ও কৃষ্ণা প্রতিপদে ও স্বিতীয়্যায় চালকুমড়া খাওয়া নিষেধ। এ নিষেধের অর্থ—হিতকর, অর্থাৎ হিতকারিত্বই বিষয়।

### তৃতীয়্য পটোলের নিষেধ

উভয় পক্ষের তৃতীয়্য তিথিতে পিত্তধাতু ও বায়ু পর্ষায়ক্রমে অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং কুটিল গতিতে শরীরে সঞ্চারিত হয়; তার ফলে শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়। এদিকে পটোল উষ্ণবীর্ষ এবং সে রক্তে উষ্ণতা আনে, সেইহেতু ঐ তিথিতে পটোল খেলে দ্রব্যের ও প্রকৃতির স্বভাব একই হবে এবং এজন্য বাতরক্তের পীড়া হবে। বাতরক্ত স্বভাবতঃই কষ্টদায়ক পীড়া এবং শোথের ও চুলকণার কারক। তাই স্বভাব সাম্যে তৃতীয়্য পটোল খাওয়া নিষেধ।

### চতুর্থীতে মূলার নিষেধ

চতুর্থী তিথিতে কফ ও পিত্ত ধাতু রুদ্ধ হয় এবং তার সঙ্গে বায়ুও কুপিত হয়; যার ফলে মলাধার থেকে অনিয়মিতভাবেই মল-নিঃসরণের কারণ ঘটে এবং তাতেই আমাশয় রোগটি জন্ম নেয়। যেহেতু অ-কচি মূলা আমকারক, মলরোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর,

রুদ্ধ এবং পিত্ত ও কফের রুদ্ধতা আনে, সেহেতু মূলায় স্বভাবের সঙ্গ এটি তিথির স্বভাবের মিল আছে। ফলে এই তিথিতে মূলা খেলেই শরীরের পক্ষে তা ক্ষতিকর, আমের উন্মত্তবেরও আশঙ্কা থাকবে।

### পশুঘ্নীতে পাকা বেলের নিষেধ

স্বাভাবিক কারণেই পশুঘ্নীতে পিত্তবৃদ্ধি হয়, তাই এই তিথিতে পিত্তকর দ্রব্য ভ্যাগের উপদেশ, বিশেষ করে পাকা বেল। কাঁচা অবস্থায় এটি যেমন খুবই হিতকর, পাকা অবস্থায় তেমন ক্ষতিকর। তাই শাস্ত্রকারগণ কাঁচা বেলকে অমৃতের সঙ্গে এবং পাকা বেলকে বিবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এ তিথির স্বভাবই হচ্ছে পেটের দোষ, হাত-পা জ্বালা ইত্যাদি ঘটানো, আর তাতে যদি পাকা বেলের সংযোগ ঘটে তো আর কথাই নেই, তাই এত বিধি-নিষেধ। এখানে বিব্ব নিষিদ্ধ নয়, পক্ক বিব্বই নিষিদ্ধ।

### ষষ্ঠীতে মাষকলায়, দই, পুইশাকের নিষেধ

স্বভাবধর্মবশতঃ এ তিথিতে শিরায় শিরায় শ্লেষ্মাধাতুর কোপ বৃদ্ধি পায়; তাই শৈত্যকর দ্রব্যাদিরই ভোজন নিষিদ্ধ; তাতে শিরাস্থিত শৈত্য রসের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আর বাড়তে পারে না। এজন্য ষাঁদের গল্পসী, গেঁটেবাত, কোষ বৃদ্ধি প্রভৃতি শৈত্য-প্রভাবযুক্ত রোগ আছে, তাঁরা তো এগুনি খাবেনই না; পরন্তু অপরও না।

### সপ্তমীতে তাল-নারিকেল-মংস্যের নিষেধ

তিথি অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই এ তিথিতে শরীরস্থ রক্ত ও পিত্ত ধাতুর একইসঙ্গে তারল্য দেখা যায়। এদিকে দ্রব্যের বিচারে তাল-নারিকেল ও মংস্য রক্তধাতুকে দ্রুত তরল করে দেয় এবং সেজন্য রক্তধাতুর গাঢ়তা নষ্ট হয়। সুতরাং এই তিথিতে উপরিউক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি খেলে অজীর্ণ, রক্তপিত্ত, অস্বপিত্ত প্রভৃতির রোগীরা তো কষ্ট পাবেনই, ষাঁদের এসব রোগ নেই, তাঁদেরও সাবধান থাকা উচিত।

### অষ্টমীতে লাউ-মংস্য-নারিকেল নিষিদ্ধ

অষ্টমী তিথিতে স্বভাবতঃই অগ্নিমন্দ্য, পকাশয়ের দুর্বলতা, রক্তের সঞ্চার মন্দ হয়। সেহেতু লাউ-নারিকেল-মংস্য-মাংস স্বভাবতই অগ্নিমন্দ্যকর, সেহেতু এই তিথিতে এগুনি খেতে না বলাটা যুক্তিযুক্ত। অগ্নিমন্দ্যের রোগীরা তো খাবেনই না; সুস্থ লোকদের বেলায়ও নিষিদ্ধ।

### নবমীতে লাউ-কলমীশাকের নিষেধ

এই নবমী তিথিকে সন্ধি তিথি বলা হয়, কারণ উভয় দিকের প্রকৃতি-বিকারই তাতে সমন্বিত থাকে। এই তিথি থেকেই প্রকৃতির গতি এমন পরিবর্তিত হয় যে, একেবারে প্রতিপদ পর্যন্ত তার প্রতিটি অবস্থাই পর পর বৃদ্ধির পথে থাকে। এ

তিথিতে বায়ু প্রকৃপিত হয়, শ্লেষ্মাধাতুর বৃদ্ধি হয়। লাউ ও কলমী শাকের মধ্যে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য যেহেতু দেখা যায়, সেহেতু এই তিথিতে তা খাওয়া উচিত নয়।

### দশমীতে কলমীশাক নিষেধ

দশমী তিথিতে পিত্তধাতু ক্রুর হয়, সেটিতে বায়ু চালিত হয়ে অজীর্ণ, অম্ল, জ্বর প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। এজন্য এই তিথিতে মলসংগ্রাহক দ্রব্য ভোজন করতে শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা। সেইজন্য দশমীতে কলমীশাক খাওয়া নিষেধ, কারণ এটি যেমন মল রোধ করে, তেমনি মলের পরিমাণ ও মলে বায়ু বৃদ্ধি করে।

### একাদশীতে শিম-অন্ন-শাকের নিষেধ

একাদশীতে রসধাতুর বৃদ্ধি এবং শ্লেষ্মার ক্রুরতা হয়, সেইসঙ্গে বায়ুদ্বারা রক্তের স্ফোভ হয়। সেইজন্য একাদশীতে শিম, অন্ন (গম-যব-ডালও অন্ন), শাক প্রভৃতি খাওয়া নিষেধ। একাদশীর উপবাস নিরম্ব নয়; তবে ফলাদি, দুধ এবং ছানা, ঘৃতপক্ক দ্রব্য অল্প মাত্রায় খেলে রসধাতুর বৃদ্ধি হয় না।

### দ্বাদশীতে পুই, মংস্য, গুরুদ্রব্য নিষেধ

তিথির নিয়মানুসারে এই তিথিতে বায়ু কুপিত হয়ে রক্তের গতি মৃদু করে দেয় এবং ধমনী, শিরা, স্নায়ুতে গিয়ে নানাপ্রকার ব্যাধি-বিকারের সৃষ্টি করে। এই তিথিতে এমন দ্রব্য খেতে নেই, যাতে তিথির স্বাভাবিক স্বভাব বেড়ে যায়। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়—এই তিথিতে রাড-প্রেসার প্রকাশ পায়। আরবেদে এই রোগটি শোণিতজ মূর্ছা বলে আখ্যায়িত। এই জন্যই এই তিথিতে পুই, মংস্য, গুরুদ্রব্য দ্রব্য ইত্যাদি খেতে মান্য।

### ত্রয়োদশীতে বার্তাকুর নিষেধ

ত্রয়োদশীতে বায়ু মৃদু হয় কিন্তু রক্তের গতি প্রবল হয়। তাই এ তিথিতে রক্ত-সম্পর্কযুক্ত পীড়ার বৃদ্ধি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই এই তিথিতে বার্তাকু অর্থাৎ বেগুন খাওয়া নিষেধ। যদিও প্রাচীন আরবেদে বলা হয়েছে—বেগুনের সাতটি গুণ, তাহলে হবে কি, এটি যে উষ্ণবীর্য। তাই ত্রয়োদশীতে শুধুমাত্র বেগুন নয়, সর্বপ্রকার উষ্ণবীর্য দ্রব্যেরই ভোজন নিষেধ।

### চতুর্দশীতে মাষকলাই, ডাল, তিস্ত দ্রব্যের নিষেধ

চতুর্দশীতে বায়ুর গতি স্বাভাবিক রুদ্ধ হয়, বিশেষ করে অপান বায়ুকে রুদ্ধ করে; পেটের মধ্যে স্তম্ভতা আনে। ষাঁদের উদরে বায়ুর পীড়া প্রায়ই হয়, তাঁদের পক্ষে এই তিথিটিতে মাষকলাই ডাল, তিস্তদ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। বায়ুকর দ্রব্যমাত্র থেকেই,

বিশেষভাবে এগুন্নি থেকে সাবধান হওয়া একান্ত কর্তব্য। তাই এগুন্নি এ তিথিতে নিষিদ্ধ ভক্ষ্য।

**পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়াগ্নিমান্দ্যকর, কফবর্ধক ও গুরুপাক খাদ্যের নিষেধ**

পূর্ণিমায় চন্দ্রের পূর্ণ রূপ আর অমাবস্যায় চন্দ্রের কলা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় পূর্ণিমা অপেক্ষা অমাবস্যায় বেশী। তবে রসবর্ধক শক্তির উচ্ছ্বাসের কারণ হয় তার দৃষ্টি রূপেই। এই সময় রস-রক্তাদি শরীরস্থ সর্বধাতুরই স্ফীতি হয়। এই জন্যই এই দৃষ্টি তিথিতে বায়ু বৃদ্ধিকর কোন খাদ্যই শরীরের পক্ষে অনুকূল নয়; রস-প্রধান রোগের বৃদ্ধি করে। এতে মন্দাঙ্গি, পরিপাক দৌর্বল্য, কফোৎপত্তি হয়ে থাকে বলেই এই দৃষ্টি তিথিতে অগ্নিমান্দ্যকর, কফবর্ধক খাদ্য বর্জনীয়। এই দৃষ্টি তিথিতে উপবাসের কঠোরতাকে না মেনে লঘুপাক দ্রব্যের মধ্যে যার যেটি সামান্য বা অভ্যস্ত দ্রব্য, তাই আহার করা যুক্তিসঙ্গত উপায়।

এইসব ক্ষেত্রে চরকের উপদেশ খুবই চমৎকার। তিনি বলেছেন—দেশ, ঋতু, তিথি বিচার করবে; বয়সের, দেহের ও অগ্নির বল বিচার করবে; তারপর হিতকর, ও পরিমাণ-মত এবং সময়মত অভ্যস্ত দ্রব্যগুণি গ্রহণ করলে মানবের রোগ হবে না।

আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ কোন প্রাদেশিক মানুষের জন্য রচিত হয় নাই; এমন-কি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্যও না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে কোন দেশের মানুষের পক্ষে এই যুক্তিসঙ্গত হিতকর উপদেশটি বিজ্ঞানসম্মত বলেই সেখানে গৃহীত হয়েছে। খাদ্য-বিজ্ঞানে তার প্রাণ-বিজ্ঞানটাই সব নয়। প্রাণের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং দেশ-কাল-ঋতু প্রভৃতির সঙ্গের তার হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াটা যে স্বাভাবিক—এ জ্ঞানটুকুও আহরণ করতে হয়। আয়ুর্বেদ সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের জন্যই সৃষ্ট, এটি বিশেষ কোন একটি দেশের জন্য নহে।

www.boirboi.net





## রোগ ও পথ্য

ব্যবহারিক দ্রব্যাদি যেমন নিরপেক্ষ নয়, কালের স্বভাবও তেমনী আপেক্ষিক। সুতরাং দ্রব্য এবং কাল নিয়ে যখন ব্যবহারিক প্রকৃতি, তখন সেও নিরপেক্ষ নয়, কারণ গুণ, ক্রিয়া এবং সত্ত্বা এই প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে বলে। তাই চিকিৎসককে রোগ, রোগী, কাল, বয়স এবং দেশের ধর্মকে বিচার করতে হয়। এই বিচার করাটা চিকিৎসকের কাজ। তা ছাড়া রোগীর নিজের অবস্থা তো নিজের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গেই বলি, আয়ুর্বেদে সাধ্য বলে একটা কথা আছে; আপনার যে দেশে জন্ম তার কাল ও জলবায়ুর সঙ্গে অন্য দেশের পার্থক্য তো আছে, তাই দেশ কাল বয়স সব কথাই বিচার করে রোগীর পথ্যাপথ্য চিকিৎসককে নির্বাচন করতে হয়। যেমন ঠান্ডা দেশের লোকের স্নেহপ্রধান দ্রব্য তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় না, কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে সেটা বেশী খেলে তার শরীরে সহ্য হয় না, কোন না কোন রোগ সৃষ্টি করবে। অতএব সেটা তার পক্ষে সাধ্য নয়।

এই সাধ্য কথাটা আরও সোজা করে বলি—মনে করুন মাতৃগর্ভ থেকে যার ছাতুর নাড়ী হয়ে গেছে, তার পক্ষে ছাতুতে শরীর বা পেট খারাপ হয় না, আর আমার মত ভেতো বাঙালী যদি এটা রোজ খায় তা হলে আমাশা হবেই; তাই বলছি প্রথম থেকে যেটায় যে অভ্যস্ত সেইটাই তার সাধ্য। এ তো গেল দেহের সাধ্য-বিচার—এইবার প্রকৃতির সাধ্যবিচারের কথা বলি—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যদি রোজ পেশ্তা, বাদাম, কিসমিস, আখরোট খেতে থাকি তা হলে ‘কাল’ তার বিরুদ্ধে লেগে অতিসার ধরিয়ে দেবে, অথচ এটা শীতপ্রধান দেশে খেলে কিছুই হবে না। সুতরাং পথ্যের ব্যবস্থা দিতে গেলে সেখানকার আবহাওয়ারও বিচার করার প্রয়োজন।

তাই তাঁরা বলেছেন বোটা একজনের পথ্য—সেটা আর একজনের অপথ্য; সুতরাং নার্বজনিক পথ্য অপথ্য বিচারের একটা অসুবিধেও হ’য়ে পড়ে, তবে এটা বলছি না যে

অতিসার হয়েছে কিন্তু ঠান্ডা দেশ বলে তাকে লুচি খেতে দিতে হবে।

### প্রকৃতি বিচার

এইবার ধরুন, যেমন আমি আর গাছ অথবা যে কোন দ্রব্যই হোক, আমাদের মৌল উপাদানের তফাৎ নেই—সেই পাঁচটি মহাভূত স্থিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই থেকেই আমাদের উদ্ভব। তবে এই পাঁচটি মৌল উপাদানের একের অপরের সংযোগ বিয়োগে, তার তারতম্য ঘটলেই তার রূপ ক্রিয়া সবই বদলায়। আসলে আমরা প্রকৃতির যমজ সন্তান, আমাদের আছে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তশ্চেতনা ও বহিঃশ্চেতনা দুই-ই, আর বৃক্ষজগতের আছে কেবল মাত্র নিরীন্দ্রিয় অন্তশ্চেতনা।

এখন প্রশ্ন হলো—এই যমজ ভাই, কি করে সে আমাদের উপকার বা অপকার করে?

এইবার বৈদ্যের ভাবভাষার কচ্‌কচানিতে আসতে হচ্ছে, সেটা সেই বায়ু, পিত্ত কফ।

এখন বায়ু কি?—এটাকে সোজা কথায় বলে দিই—একটা বস্তু ঘরে বসে কথা কইলে সেটা আপনার কানে যায় না কিন্তু ওঘরে যে বাতাস নেই তা নয়, সেটি সেখানে স্তম্ভ হয়ে আছে; আবার পুকুরে ডুব দিয়ে কথা কইলে পুকুরের ওপারে ডুব দিলে শোনা যায়, সুতরাং দুই অণু বা পরমাণুর মধ্যে যে স্থান, সেখানে তো বায়ু রয়েছে। সেই রকম দেহের প্রতিটি স্তরে এই বায়ুর চলাচল অহরহ চলছে। এখানে একথা বলে রাখি—আয়ুর্বেদের সংগ্রহ পুস্তকে একটি শ্লোক আছে—

পিত্তং পণ্ডুঃ কফঃ পণ্ডুঃ পণ্ডুরো মলধাতবঃ।

বায়ুনা যত্র নীরন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ।

অর্থাৎ পিত্ত এবং শ্লেষ্মা ধাতু এদের কোন চলৎ শক্তি নেই, বায়ু তাদের যেখানে টেনে নিয়ে যায়, তারা সেইখানেই উপস্থিত হয়। কোন জায়গায় আগুন লাগলে আমরা দেখি তাপ পেয়ে হওয়া ছুটছে, সেই রকম দেহের যে তাপ সেই ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর এই আগুনের তাপ সৃষ্টি করছে আমাদের খাদ্য। দেহস্থ এই আগুনের পারিভাষিক নাম পিত্ত। পিত্ত আমাদের কয়েকটি জিনিস দিয়ে চলেছে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, সৌন্দর্য, মেধা, দৃষ্টি প্রভৃতি পিত্তের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

এইবার শ্লেষ্মা ধাতু সম্পর্কে বলি—আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে—নাক মূখ দিয়ে গড়গড় করে বেরুচ্ছে এই বর্ষা আয়ুর্বেদের কফ। না, তা নয়, ওটা বিকারপ্রাপ্ত শ্লেষ্মা ধাতু। দেখুন মটরের ইঞ্জিনে যদি মবিল্ অয়েল্ না থাকে তা হ'লে ইঞ্জিনটা যেমন জ্বলে যাবে, সেই রকম যদি এই কফ বা শ্লেষ্মা ধাতু আপনার আমার শরীরে না থাকতো তা হ'লে পিত্তের দাহে ও বায়ুর চাপে আপনি ম'রে যেতেন। সুতরাং এই জলীয় অংশটাই দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এইটাই আপনার আমার শরীরকে সুস্থ রেখে জীবন ধারণ করছে। এই তিনের সমন্বয়ে দেহ ধারণ করি ও চলি। এই শ্লেষ্মা ধাতু আমাদের দান করছে দেহের স্থূলাংশ, এবং বাহ্যতঃ আসছে স্নিগ্ধতা ও কোমলতা।

এই শ্লেষ্মা ধাতুর প্রথম কাজ আমাদের ভুক্তদ্রব্যকে পাকস্থলীতে পিণ্ডাকার তৈরী করে দেওয়া, তার পরের ক্রিয়া পিত্ত ও বায়ুর। এদের যার যে কাজ, সেটা করে গেলেই আমরা নীরোগ, আর একজন বিগড়ে গেলে অন্যেরও কাজের বিশৃঙ্খলা। সেটাই আমাদের রোগ।

## যারা বায়ুপ্রধান—

তাদের প্রকৃতিটা রুদ্ধ এবং দেহটা কৃশ হবেই। এরা ঘুমদ্রুতে চাইলেও ঘুম কম হবে, অথবা নিদ্রাহীন হয়ে কাটাতে বাধ্য হবে। কথা বেশী বলতে ইচ্ছে করবে। দেহের শিরাগুদাল শীঘ্র দেখা দেবে। এরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়, ভীতও হয়। অনুরক্ত ও বিরক্তও হয়, সবই হঠাৎ হঠাৎ। এদের স্মরণশক্তি কম, চঞ্চল বুদ্ধি, চঞ্চল গতি, চঞ্চল দৃষ্টি—অর্থাৎ সবই এঁদের ছটফটে। এরা বেশী শীত সহ্যে পারে না। মুখ প্রায়ই শুকিয়ে যায়। প্রস্রাব সাদা প্রায়ই হয় না। জল বেশী খেলে হয়। ঘুমে স্বপ্ন বেশী দেখে। ওড়ার স্বপ্নই বেশী দেখে।

## এদের পক্ষে উপযোগী খাদ্য

মিষ্টি, অল্প টক, অল্প লবণরস বিশিষ্ট খাদ্য আর দই, দুধ, ঘোল, ঘি; তৈলাক্ত দ্রব্য, মাখন এবং গরম দুধ, গমের রুটি, তা ছাড়া তিলের নাড়ু, গুড় ও গুড়ের জিনিস, আপেল, আঙ্গুর, আতা, আনারস, পাকা আম, কিস্মিস, খেজুর, তরমুজ, নারিকেল, দাড়িম, ফলসা, বৈঁচি প্রভৃতি।

## এদের পক্ষে অনুপযোগী খাদ্য

তিক্ত ও কষায় দ্রব্য, ঝাল, বেশী মধু, লঘু (মুড়ি, বিস্কুট, পিউরুটি, যবের ছাতু, ছোলার ছাতু), শাক, ভারি মাংস, মৃগ, মসুর, বা অড়হর, মটর, ছোলার গাঢ় ডাল, উচ্ছে, কাঁকরোল, বরবটী, শিম, কচু, ঢাউশ। কেবলমাত্র নটে, কলমী ও সুবনী ছাড়া আর সব শাক, গাজর, পাকা বেলা, জাম, তালশাঁস।

## বিহারেও এগুদাল অনাচিত

বেশী কথা বলা, বেশী পরিশ্রম করা, বেশী পথ হাঁটা, রাত জাগা, উপবাস, তর্ক ও কলহ।

## পিত্তপ্রধান ব্যক্তির প্রকৃতি

পিত্তপ্রধান ব্যক্তির বেশী তাপ বা গরম সহ্য করতে পারে না; এদের ঘাম বেশী হয়, ঠাণ্ডা খোঁজে বেশী, এদের হাতের ও পায়ের তলায়, চোখে জ্বালা বেশী হয়। সারা শরীরে একটা গরম বা উষ্ণতা থাকেই সর্বদা, এরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত বেশী হয়। এদের চুল বেশী কাল হয় না, শরীরে লোম কম হয়; অল্প বয়সেই টাক পড়ে আসে, অভিমানপ্রধান এদের মানস প্রকৃতি, অল্প কারণেই এদের চোখ লাল হয়, এদের শরীরে কোথাও না কোথাও একটা চুলকানির অবস্থার ক্ষেত্র থাকে। এদের শরীরের এখানে সেখানে তিল চিহ্ন বেশী হয়। এদের পিত্তপ্রধান প্রকৃতি বলেই মূত্থের আস্বাদ অল্পতেই তিক্ত হয়, প্রস্রাবও একটু হ'লেই রংএর হয়, ঘামে, দুর্গন্ধ হয়, স্বপ্ন দেখে রাগাঙ্গি হ'চ্ছে, মারামারি হ'চ্ছে, ফুলের বাগানের স্বপ্নও তারা দেখে, আবার উল্টোপাল্টাও, দেখে এবং সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়।

## পিত্তপ্রধানদের উপযোগী খাদ্য

মিষ্টি জিনিস, অল্প তিক্ত, কষায়, ঘৃত, মাখন, ছানা, মৃগ, মটর, অড়হর, ছোলা ও কড়াইএর ডাল, এ ভিন্ন খেসারির ডাল খাওয়া চলে।

মাছের মধ্যে—শিঙী, মাগুর, কই, শোল এবং পুকুরের মাছ।

তরকারী হিসেবে—পটোল, পলতা, ডুমুর, টাটকা ও পাকা ফল, কচি ডাবের জল।

### পিত্তপ্রধানদের অনুপযোগী আহার ও বিহার

অসময়ে খাওয়া, ঝাল, টক, বেশী লবণ, তীক্ষ্ণ দ্রব্য অর্থাৎ ভাজাপোড়া, তিলের তেল, মাখনযুক্ত দইএর ঘোল, টক ফল, গরম গরম খাবার বা চা প্রভৃতি। ঝিঙে, পানিফল, লাউ—তা ছাড়া দই, রসুন, পেঁয়াজ, হিং, সরষে বাটা, বেশী টক লেবু, কুল, পান ও বাসি জল।

### শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিদের প্রকৃতি

এই প্রকৃতির ব্যক্তি সাধারণতঃ ধীর স্বভাবের হয়। চেহারাটা একটু ভারী, অল্পতেই ঘুমুতে ভালবাসে, অল্পতেই আলসে আক্রান্ত হয়, বিশেষ খাওয়াদাওয়া নেই অথচ মেদ বেড়েই চলেছে, এরা ক্ষুধা তৃষ্ণার বেশী কাতর হয় না। শ্লেষ্মার বিকার হ'লেও এদের পরিপাক শক্তি কম হয় না, মুখে সর্বদা মিষ্টাম্বাদ অনুভব করে, মিষ্টি জিনিস বেশী পছন্দ করে। হাত-পায়ের তলার চামড়া বেশ নরম হয়, পা ঠোঁট প্রায় ফাটে না, এদের স্বপ্নে পুকুর, নদী, জলা বেশী থাকে।

### কোন কোন জিনিসে কফপ্রধান প্রকৃতির লোকের আকর্ষণ বেশী

এদের স্বাভাবিক প্রকৃতিতে যদিও মিষ্টি, টক, লবণ এবং গুরুপাক আহাৰে টান বেশী থাকে তা হ'লেও ঐ সব খাদ্যে এদের শ্লেষ্মার প্রকাপই বাড়ে।

এদের মাছ, মাংস, গমের রুটি, কড়াইএর ডাল, দই, দুধ, পায়স, গুড় প্রভৃতি জিনিস বেশী প্রিয়। সব রকম মিষ্টি ফল এদের ভাল লাগে, এই সব মিষ্টি জিনিস বেশী খেলে এদের ক্ষতিই হয়। শ্লেষ্মাপ্রাধান্য জনিত রোগে আক্রান্ত হয়। দিব্য-নিদ্রা এদের পছন্দ বেশী কিন্তু এটাতে ক্ষতিও বেশী হয়।

এদের পক্ষে সব রকম মাছ খাওয়া, তিস্ত কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, ঝাল (আদা গোলমরিচ পিপুল, চই প্রভৃতি) তবে বোয়াল, শিঙী, ইলিশ, ভেটকী, সিলেট, আঢ়, বেলে, খয়রা, বাচা, পাঁকাল, মাছের ডিম, যে কোন রকম লবণজলের মাছ এদের পক্ষে খাওয়া ক্ষতিকর হয়। এই প্রকৃতির লোকের অল্প সিদ্ধ হাঁসের ডিম ভাল, তবে যাদের এলাজি, অথবা একজিমা, হাঁপানী, হাত-পা ঘামা থাকে—তাদের খাওয়া অনুচিত। কুর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের মাংস ও মুরগীর মাংস ভাল। পায়রার মাংস এদের পক্ষে অপথ্য। এই যে প্রকৃতি ও সান্না্য বিচার করে পথ্যের ও অপথ্যের ব্যবস্থা লেখা হ'লো এটা রোগীর নিজের বিচারের জন্য নয়, চিকিৎসককে তাঁর রোগীর অবস্থা বিচার করে পথ্য নির্বাচন করে নিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হ'লো এই পথ্য গ্রন্থে জ্বর চিকিৎসার পথ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে কেন? তার উত্তরে বলা যায়, যদিও জ্বর আসে অনুগামী হ'য়ে, তথাপি অগ্রগামী হিসেবে ধরে নেওয়ার পক্ষে কারণ এই—তাপ সৃষ্টির উৎস গিঁত্ত, জ্বরের সঙ্গে সে অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে, যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি অবিচ্ছিন্ন সেই রকমই; অতএব শরীরগত তাপ বা উষ্ণা সেই পিণ্ডটি যদি কোন আভ্যন্তরীণ অথবা

বাহ্য কারণে বিকারগ্রস্ত অথবা আহত হয়, তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে বহির্মুখী হয়, সেই কারণেই রসরক্তাদির অগ্নিটি (Metabolism) বিকারগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে, সুতরাং চিকিৎসার ও পথ্যের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাকে অন্তর্মুখী করে স্বস্থানে নীত করা, তাই অনুগামী হ'লেও তাকে চিকিৎসক সম্প্রদায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই তো চরক সংহিতায় উক্ত হয়েছে—

‘সর্বরোগাগ্রজো বলী’, অর্থাৎ বলবান জ্বর সর্বরোগের অগ্রজ।

জ্বর বললেই যদি আমরা থার্মোমিটার বগলে দিয়ে বিচার করি, তা হ'লে আয়ুর্বেদের চিন্তার ধারায় ভুল হবে। কারণ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, শ্বাস, কাস, মূত্রাতিসার, রক্তপিণ্ড, ক্ষয়, পক্ষাঘাত, শূল প্রভৃতির ক্ষেত্রে অগ্নিক্রিয়া কিন্তু মন্দীভূত থাকবেই। এখানে কিন্তু ধাতুগত (রসাদি সন্তধাতু) অগ্নিক্রিয়া বিকারগ্রস্ত, তাই পিত্ত উৎক্ষিপ্ত, এর (অর্থাৎ রসাদি ধাতুর) অগ্নিবল স্বস্থানগত করতে পারলেই তবেই তো রোগ সারবে, নইলে রোগ লক্ষণের চিকিৎসা করে লাভ কি? এর সঙ্গেই কিন্তু পথ্য ব্যবস্থা অঙ্গাগিগভাবে জড়িত, একটিকে বাদ দিলে শৃঙ্খল আর একটিতে হবে না; সুতরাং সব সময়ে জ্বর মানেই তাপ নয়, এখানে অগ্নিবল। এই হেতু জ্বরের পথ্যটাই প্রথমে বলা হলো। এই পথ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রও থাকে—যেমন শ্লেষ্মা জ্বরে ঠান্ডা জল পথ্য নয় কিন্তু বায়ুপ্রধান জ্বরে সেটা পথ্য। আবার পিত্তজ্বরে ও অজীর্ণে শীতল বর্ণার জলও তো অপথ্য। কিন্তু ঐ শীতল জলই আবার উদাবর্তে ও পুরানো জ্বরে পথ্য, এইভাবে প্রতিটি দ্ব্যয়ের মধ্যে তো হিতাহিত ব্যবস্থা অবশ্য রয়েছে, এটার বিচার করা চিকিৎসকের কাজ। এই রকম রোগের তরুণাবস্থা, মধ্যাবস্থা এবং জীর্ণাবস্থায় কালসাপেক্ষ পরিবর্তন করা দরকার হয়।

### নব জ্বরে

কোন কষায় রস, দিবানিদ্রা, দূধ, ঘোল, ঘি, মিষ্টরস, ডাল বা মাছ খাওয়া অহিতকর। এ ভিন্ন পূর্বদিকের বাতাস লাগানো ও বেশী চলাফেরা অনুচিত। আবার পুরানো জ্বরের ক্ষেত্রে বিচার করে এগুলিই আবার উপকারী হয়।

### জ্বরের মধ্যাবস্থায়

পুরোনো চালের ভাত, কচি বেল, সজিনার ডাঁটা, ছোট্ট উচ্ছে, কচি বেতের ডগা, পটোল, কাঁকরোল, কচি মূলা, মৃগ, মসুর ও ছোলার ডালের যুগ্ম। মৃগের ডালের সঙ্গে পলতা বা শিউলি পাতা বেটে ওটা গুলে নিয়ে, তাওয়ায় সেক্কে মড়মড়ে করে বড়া, লাজামন্ড—এটি তৈরী করার নিয়ম ২৫ গ্রাম আন্দাজ গোটা মৃগ সিদ্ধ করে, ফেটে গেলে, ওর সঙ্গে ২৫ গ্রাম সাদা থৈ দিতে হবে; এই দুটি গুলে গেলে, ওটা পাতলা গামছায় ছেঁকে ঐ মন্ডটা নিতে হবে, তাইতে অল্প লবণ মিশিয়ে থেলে সুপথ্যও হ'লো এবং এটা জ্বরের উপশায়কও বটে। তা ছাড়া বেতো শাক, ছোট নটেশাক, ফিসমিন, দাড়িম, ফলসা, আপেল, পাকা ন্যাসপাতি, কচি পানফল, কুলখ কলাইএর যুগ্ম, এগুলি উপকারী।

### পুরানো জ্বর বা মৃদুস্বাদে জ্বরের পথ্য

এ সময় ছোট মুরগীর মাংসের যুঁষ, অল্প ঘি; আমলকীর মোরস্বা, কুমড়োর মিঠাই বা মোরস্বা, ধোঁস্বানী, দুই/চারটি আখরোট, ঘি বা মাখন মাখানো সেকা পাউরুটি, দুধ, পাহাড়ী ঝরণার জল, হরীতকীর মোরস্বা, কচি বেগুন, নটে, সুস্বাদু ও পালং শাক, কাঁচা পেঁপে, লাউ, পলতা, কাঁচা কলা, বেগুন, লাল আলু এই সব তরকারি, এবং মশলা হিসেবে ধনে ও জীরে, তবে ভাজা জিনিস ভাল নয়, এমন কি মরিচ পর্যন্তও না।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সর্বপ্রকার জ্বরে অপথ্য ও কুপথ্য—সর্বপ্রকার ভাজা জিনিস, তেল ঘিএ পাক করা জিনিস, টক ঝাল প্রভৃতি ফল হিসেবে তরমুজ, কলা বেরুনো ছোলা ও মৃগ, পোস্ত বাটা, পিঠে-পুঁদিল, শাকপাতার তরকারী, পেঁয়াজ, রসুন, মুলো। আতা, নারিকেল এগুলি ভাল নয়, এ ভিন্ন স্নান করাও ভাল নয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে বাত-পিণ্ড জ্বরে অথবা পেটের দোষ রয়েছে এমন জ্বরে অথবা তীব্র জ্বরে ভুল বকা আছে, সে ক্ষেত্রে শীতল জলে মাথা ধোয়ালে উপকার হয়। তবে মনে রাখতে হবে শ্লেষ্মাকর খাদ্য খাওয়া, সর্দি থাকলে স্যাঁৎস্যাঁতে জায়গায় থাকা, জলো হাওয়া খাওয়া, তা ছাড়া নতুন মধ্য ও পুরাতন জ্বরে যেগুলি অবস্থা বিশেষে পথ্য ধার্য করা হয়েছে সেগুলিও ভাল নয়।

এই জ্বরের পথ্য পড়ে বর্তমান চিকিৎসক সম্প্রদায় নিশ্চয় মনে করবেন যে, এভাবে খেয়ে আধমরা হয়ে থাকা কি পথ্যের ব্যবস্থা? পূর্বে যেটা বলা হলো এটা তো চরকীয় ধারার ব্যবস্থা। এইবার এই আয়ুর্বেদের মৌল চিকিৎসার অন্তিম যুগে রস-তান্ত্রিকদের গুরুত্ব মন্টটা বলি—

ন দোষাণং ন রোগাণং ন পুংসাং চ পরীক্ষণম্।

ন দেশস্য ন কালস্য কাৰ্য্যং রস চিকিৎসিতে॥

(রসতরঙ্গিণী)

অর্থাৎ রসচিকিৎসার (পারদ, গন্ধক) বিষ ঘটিত ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করলে বয়স, কাল, দেশ বা অন্য কোন হেতুর অপেক্ষায় রোগীর পথ্যাপথ্য বিবেচনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। এটা যুগের হাওয়া পাণ্ডে যাওয়ার পর নিশ্চয়। বর্তমান যুগের ভাবনাটা আজ থেকে এক হাজার বৎসর পূর্বেই তারা ভেবেছিলেন।

আয়ুর্বেদ মতে জ্বরের অন্তর্নিহিত কারণ যখন অগ্নিমন্দ্য, জ্বরবাসনে যদিও সে স্বস্থানগত কিন্তু তখনও সে হীনবল, তাই তাকে বেশ কিছুদিন অগ্নির বলাধান বাড়ানোর জন্যে হিসেব করে চলতে হয়, এখানে অনবধানতা বশত সে অভিভাবকের বা চিকিৎসকের দ্রাব্যান্তিতে অথবা অপথ্যের কারণজনিত পুনরাব্রাম্ভণ হয়, তবে তাতেই হবে। অতিসার কারণ, তাই এখানেই বলা হচ্ছে জ্বরাতিসার।

জ্বরাতিসার (জ্বরের সঙ্গে পেটের দোষ)—এখানে চিকিৎসক উভয় সংকটে পড়েন, যেমন বলা যায় ‘জলে কুমীর ডাঙায় বাধ’, জ্বর ছাড়তে গেলে, পেট পরিষ্কার, আবার সেদিকেও সামাল সামাল, তাই চিকিৎসক হন নাজেহাল তার পথ্য ব্যবস্থা দিতে। এ ক্ষেত্রে যবের মণ্ড, শঠীর পালো, কচি ডাবের জলে সিদ্ধ করে পুরানো চালের ভাত, শিশুর ক্ষেত্রে এইটাকে চটকে মণ্ড করে দেওয়া, কাঁঠোলায় ভাজা চিড়ের ভাত বা মণ্ড, অথবা মৃগ, মসুর বা অড়হর ডালের যুঁষে ভাজা চিড়ে বা খই সিদ্ধ করে দেওয়া, এখানে লবণ দেওয়া চলবে না, একটু চিনি দিতে হবে। অথবা

খইএর মণ্ডে ছাগলের দুধ মিশিয়ে দেওয়া, মূত্রে অরুচি থাকলে অল্প একটু কয়েং-বেলের শাঁস একটু চিনি মিশিয়ে দেওয়া যায়।

এ ক্ষেত্রে তরকারী দেওয়া যায়—কচি মোচা চট্টকে ছিবড়ে ফেলে কচি কাঁচাকলা বা কাঁচা কাঁঠালী কলা, পাকা জাম, চালতার পাতলা অম্বল, শালুক ডাঁটার তরকারী, কাঁচা গাব, টক বা মিষ্টি ডালিম, কচি বেল পোড়া, আমরুল শাকের চাটনী। মিষ্টি আলু আর মশলার মধ্যে ধনে, জীরে, আদা ও শুঠের গুঁড়ো, এগুনালি কিন্তু হিতকর, তবে পেটের অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা দিতে হবে।

### নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি অহিতকর

গরম জলে স্নান, বেশী জল খাওয়া, রাত্রি জাগা, বেশী ধূমপান, কোন রুদ্ধ জিনিস, যেমন চাল বা মুড়ি ভাজা, বিস্কুট, পাউরুটি প্রভৃতি খাওয়া, কড়াইএর ডাল, যবের বা গমের রুটি, সজিনার ডাঁটা, শিম, মূলো, চালকুমড়া বা লাল কুমড়া, কুল আগুদর, কিস্মিস্, আমলকীর মোরসা, রসুন, পেঁয়াজ, পাতা শাক, কাঁকড়া, পুনর্গবা শাক, সরষে, ডিম, পুঁইশাক ও বেতোশাক, গুড়, আখের রস, নারিকেল, দই, পাকা আম।

**গ্রহণী**—এই রোগটি যে কোন কারণে পেটের দোষ ঘটে গেলে এবং সেটি দীর্ঘদিন চলতে থাকলে, পরিণামে এই রোগটি সৃষ্টি হয়। এই রোগটিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসার ভাষায় কোলাইটিস্ (Cholitis) বলা হয়। এই গ্রহণীরোগ দীর্ঘদিন হ'য়ে গেলে, সে হবে সংগ্রহ-গ্রহণী, যাকে পাশ্চাত্য মতে বলা হয় chronic cholitis। এটির বিশেষ লক্ষণ হল দিনের বেলায় দান্ত কয়েক বারই হবে কিন্তু রাত্রে কোন উদ্বেগ থাকে না।

আয়ুর্বেদ মতে এর তিনটি ভাগ—বাতপ্রধান, পিত্তপ্রধান ও শ্লেষ্মপ্রধান, এর চিকিৎসার সূত্র অগ্নিউদ্দীপক ঔষধ ও পথ্য। এর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ্য মাখন তোলা ঘোল, কয়েংবেলের শাঁস, আমরুল শাকের রস ও দাড়িমের রস, ঘোয়ান বাটা ও ভাজা হিং এদের তরকারীতে মিশালে উপকার ভাল হয়। এ ভিন্ন খাওয়া যায় কচি বেগুন পোড়া (অল্প), ভাতের আমানি (পুরানো কিন্বা টাটকা), ছাগলের দুধ, গোদুগ্ধের মাখন, টাটকা দই, মসুর ডালের জল, মুরগীর বা ছোট পাখীর মাংস, কচ্ছপের মাংস, পুরানো চালের ভিজে ভাত, মশলার মধ্যে আদা, জীরে, ধনে; আপত্তি না থাকলে বা রুচি হলে গুগলী বা গের্গড়ির ঝোল। জামের জেলি, মাছের মধ্যে থলুসে বা মোরলা মাছ। মোচা, ডুমুর, এগুনালি চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলে খাওয়া। কাঁচা কলা সিদ্ধ করে ভাজা চিড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে রুটি, শুষ্ক পানিফল গুঁড়ো করে তার রুটি। সুদৃশ্য শাক।

### এগুনালি অপথ্য বা কুপথ্য

পুঁই, পিড়িং, মোথি, পালং এসব শাক, ছাঁচি কুমড়া, লাউ, ঝিঙে, কচু, ওল, মান, উচ্ছে, শিম, কাঁকড়া, চুবড়ি আলু, সজিনার ডাঁটা প্রভৃতি। ফল হিসেবে পাকা বা কাঁচা আম, পাকা পেঁপে, নারিকেল, শসা, আর মেওয়া হচ্ছে খেজুর, আপেল, ন্যাসপাতি, কিস্মিস্ প্রভৃতি।

## অশ্বরোগের পথ্য

এই রোগের পরিচয় অপেক্ষা এ রোগে কোন কোন দোষের প্রাধান্য থাকে সেটা সংক্ষেপে বলি। এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাপ্রধান তো হ'য়ে থাকেই, আরও হয় সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং সহজ অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যার হয়। এর চিকিৎসা খুব সরল নয়, সব অশ্বই এক ধরনের চিকিৎসায় সারে না, তার পদ্ধতিও ভিন্ন; যেমন ক্ষারসূত্র দিয়ে অথবা শস্ত্রের সাহায্যে বা অগ্নিময় ভেষজ প্রয়োগ করে কিম্বা আভ্যন্তর ঔষধ প্রয়োগের ম্বারা এর চিকিৎসা হ'তে পারে।

এই সব আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগের মূল লক্ষ্য থাকে বায়ুর অনুলোম করা; জাঠরাগ্নির বল বৃদ্ধি করা।

আর অশ্ব হ'লেই যে এক পথ্য হবে তা নয়, কারণ অশ্ব আভ্যন্তরও হয় আবার বাহ্যও হয়। সুতরাং পথ্যের পার্থক্য হবে, এ কথার সমর্থন পাই চরকে।

## আভ্যন্তরিক অশ্বের উপযোগী পথ্য (চরকের মতে)

রসুন, পেঁয়াজ, পুঁইশাক, কুলখ কলাই, মসুর, অড়হর, বন মুগ (যাকে মোট বলে) ডালের বৃষ, মাখন, তরকারীর সঙ্গে কালো তিল বাটা, আমলকীর বা হরীতকীর মোরষা, আখের (ইক্ষু) রস, আখের গুড়, কিসমিস, ফলসা, গাওয়া ঘি, গাওয়া ছানা, আর তরকারির মধ্যে কাঁকরোল, কাঁচা পেঁপে, বেতো শাক, পুরানো চাল-কুমড়া, পুরানো ওল (অর্থাৎ মাটি থেকে তুলে রাখার ৪/৫ মাস বাদ), পটোল, পলতা (পটোল পাতা), লাউডগা কিন্তু লাউ নয়। কাগ্জী লেবুর রস (পাতি লেবু নয়), কয়েংবেল, এই সব জিনিস—আর এদিকে খাওয়া যায় বেগুন পোড়া (ঘি দিয়ে), আদা কুচিয়ে বা শুঠের গুঁড়ো মিশিয়ে টাটকা ঘোল (তক্ত)। এ ভিন্ন বায়ুর অনুলোমকারী যাবতীয় খাদ্য।

## অশ্বরোগের অপথ্য ও কুপথ্য

ছাগমাংস: যে কোন প্রকার মাছ, পিষ্টক (পিঠে), মাষ কলাইএর ডাল, কাঁচা আম, পালংশাক, বরবটি, হাঁসের বা মুরগীর ডিম, লাল কুমড়া, বাঁধা বা ফুলকাঁপ, মহিষের দুধ ও দই, শালুক ডাঁটার তরকারি, কচু, চুবড়ি আলু (খাম আলু), এ ছাড়া রক্তপিত্তে লিখিত অপথ্যগুলিও বর্জন করা উচিত। একটা কথা যে—যে যেটায় ছোটবেলা থেকে খেয়ে অভ্যস্ত, এর মধ্যে সেটি থাকলে যতদূর সম্ভব বর্জন করে চলার চেষ্টা করা উচিত, তবে দেখা যায় অভ্যস্ত হ'য়ে পড়লে তার সেটায় খুব বেশী ক্ষতি করে না, অন্যে যতটা করে, কারণ সেটা তার সাখ্য হয়ে আছে। অর্থাৎ তার শরীর সেটা নিতে অভ্যস্ত। এগুলি তো আমার কথা নয়, প্রাচীন দ্রব্যগুণ বিশারদগণেরই কথা।

## অগ্নিবিকার (অগ্নিমান্দ্য)

এই একটি রোগ যেন 'রামধনু'। বৃষ্টি বজ্রপাতের মত তার মৌলিকত্ব নেই, কিন্তু তার রূপ আছে।

আমরা প্রধানভাবে এই তিনটি রূপে তার অভিব্যক্তি দেখতে পাই।



\*(১) মন্দাঙ্গি, এটি কিন্তু শ্লেষ্মাধাতুগত অগ্নি মন্দীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়, আবার পিত্তধাতু যখন বিকারপ্রাপ্ত তখন সে সৃষ্টি করে তীক্ষ্ণাঙ্গি, আর বায়ু যখন বিকারগ্রস্ত হয়ে যায় তখনই সৃষ্টি হয় বিষমাঙ্গি। আর যখন সবই হীনবল হয়, তখন একটু অসাম্য দ্রব্য আহার করলেই বিপত্তি আসে, একেই বলা হয় সমাঙ্গিদোষ; একাধি কথা বলে রাখি এই যে, অগ্নিবিকার বা অগ্নিমান্দ্যের ক্ষেত্রে সেটি কিন্তু উদ্ভ্রম আমাশয়ে (dysentery) প্রায় সব রোগসৃষ্টির উৎসের প্রাথমিক স্তর এই অগ্নিবিকার।

### চরকীয় ধারায় চিকিৎসার ব্যবস্থা

মন্দাঙ্গির ক্ষেত্রে বমনের ব্যবস্থা, তীক্ষ্ণাঙ্গির ক্ষেত্রে পিত্তনিঃসারক ভেষজের ও বিরচনের ব্যবস্থা আর বিষমাঙ্গিতে বায়ুর সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য অথবা অনুলোম করার জন্য তৈলাদি অভ্যঙ্গের ব্যবস্থা। আর সমাঙ্গির ক্ষেত্রে সর্বধাতুর (বায়ু, পিত্ত, কফ) অগ্নিবল, যাকে বলা যায় metabolism বাড়ানো দরকার হয়। তবে এক কথায় বলা ভাল যে যোগ ব্যায়ামের দ্বারা রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করাটাই সর্বোত্তম। কিন্তু উপযুক্ত গুরুদর আদেশেই এ সব করা সমীচীন।

### এখন পথ্য সম্বন্ধে বলি

খৈ, ভাজা চিড়ে বা যবের মণ্ড, মৃগের ঘূষ, ছোট পাখীর মাংস (পায়রা নয়), ছোট মাছের কোল, মাছটা অল্প ভাজা অথবা না ভাজা হ'লেই ভাল হয়। শাক হিসেবে হিঙ্গে, শালিঙ্গে, বেতো শাক, বেতের ডগা, কচি মুলো, কাঁচা পেঁয়াজ, পুরানো চালকুমড়োর তরকারি, কচি কাঁচা কলা, সজিনার ডাটা, পটোল, বেগুন, কাঁকরোল, গাঁদাল পাতা, পলতা, সুসুগ্ধ শাক, যবের আটার রুটি, মাখন (অল্প), ভাজা হিং, ঘোয়ান, আদা, গরম জল, জীরা ও ধনে প্রভৃতি।

### কোনগুলি অপথ্য

এ রোগে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে পেট নরম বা পাতলা দাস্ত না হয়।

এ ক্ষেত্রে রাতি জাগরণ যেমন ভাল নয় তেমনি দিবানিদ্রাও ভাল নয়। আর ভাল ক্ষিধে (ক্ষুধা) না হ'লে পুষ্টিকর কোন খাদ্যও গ্রহণ করা উচিত নয়। বিশেষ নিষেধ আছে এদের রক্ত মোক্ষণ করা। খাওয়া হিসেবে বলতে গেলে কোন মাছই খাওয়া উচিত নয়, তবে দুই/এক টুকরো কই, মাগুর বা শিগি (পেটের অবস্থা বুঝে) ক্রাধ ক'রে দেওয়া যায়। তারপর ডিম, মাংস এ তো আর কথাই নেই। তরকারির ক্ষেত্রে পুঁইশাক, আলু, পেঁয়াজ, রসোল, বরবাটি, ওল, কচু, মান, চুড়ি আলু, লাল বা মিঠে কুমড়ো, কচুশাক, শিম, যে কোন রকম শাক, তেল, ঘিের রান্না যে কোন জিনিস, পিঠে, ক্ষীর, গুঁড়ো দুধ, ছানা, কালজাম, তালশাঁস, মিছরি বা চিনির সরবৎ, ডাবের জল, গাঢ় ঘোল, দই, তা ছাড়া যে কোন মশলা। এগুলিকে কুপথ্য হিসেবে ধরা চলে।

### ক্রিমি রোগ

ক্রিমি এই নামকরণটি ব্যাপক অর্থে করা হয়েছে। সে দৃশ্যমান হোক আর

নাই হোক—যে কীটের ক্রিয়াশালিতা আছে সেটাকেই ক্রিমি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সে দেহের অভ্যন্তরীণই হোক আর বাহ্যই হোক, আর সে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য যাই হোক। বর্তমান যুগের ভাইরাস (Virus) ও (ফাঙ্গাস্কেও) (Fungus) তাঁরা ক্রিমি আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। সেই রকম দেহাভ্যন্তরের মলাশয়েতেও ক্রিমি হয় এবং রক্তাশয়েতেও ক্রিমির উদ্ভব হয়, আবার অন্ত্রেও তো ক্রিমি বাস করে, সেই রকম বাহ্যক্রিমিও আমাদের শরীরের নানাস্থানে বাসা বাঁধে।

বহু রোগ আছে যেটার ক্রিমি থেকে উদ্ভব হয়ে থাকে, যেমন উল্মাদ, অপস্মার (Epilepsy), হৃদ্রোগ, অতিসার, আমাশা, গুল্ম পাণ্ডু, শূল, কুষ্ঠ প্রভৃতি।

কি ধরনের পথ্য এদের খেতে দেওয়া উচিত—পদুরানো ধানের চালের ভাত, পটোল, বেতের ডগা, রসোন, বেতোশাক, চিতে পাতার সগ্গে (Plumbago Zeylanica), মৃগের ডাল বেটে বাড়ি দিয়ে, শূকর দিয়ে নিয়ে, তরকারির সগ্গে খাওয়া। (আর একটা কথা দিয়ে সাবধান করে রাখি যে, আমাদের দেশে বেড়ায় যে চিতে হয়, যার পাতা আকারে ছোট লুচির মত সে চিতে নয়); এ ভিন্ন ক্রিমিতে আর এক রকম পাতা মৃগের ডালের সগ্গে বেটে বাড়ি দিয়ে, শূকর দিয়ে, তরকারির সগ্গে খাওয়া যায়, সেটি হ'লো পারিভ্রম গাছের পাতা, যাকে চলতি কথায় পালুখে মাদারের গাছ বলে। এ ভিন্ন সরষে শাক, কাঁঠালী কলার মোচা, বৃহতীর কাঁচ ফল, নালতে বা তিতো (তিস্তু) পাট শাক, পলতা, থানকুনী (থলকুড়ি), তিল তেলের রান্না তরকারি। তবে একটা কথা জানা দরকার ক্রিমি-জ্বিন্ত কোন রোগ হ'লে সরষের তেল খেতে নেই। তা ছাড়া খাওয়া যায় পাকা তালের মাড়ি (মজা), পান, বনষোয়ান বাটা মিশিয়ে তরকারি, শূলফো শাক, করলার পাতা, গোল মরিচের ঝাল, ধনে, চই, বক ফুল, সজনে শাক, কাল কাসুন্দের ফুল, কাঁচ বেগুন, কোয়াস, ডুমুর, ধোড়, ছাগল দুধ, এ ভিন্ন ক্রিমিনাশক আহাৰ্য দ্রব্যগুলি।

### এ ক্ষেত্রে কোনগুলি অপথ্য

দিবানিদ্রা, সব রকমের পিঠে (পিষ্টক), কড়াইএর ডাল, ডালের বড়া, ডালের বেশন, পাপির, ডিম, সবরকম পাতা শাক, মাংস, লাউ, টক দই, পুই শাক, টোমাটো, সুঁজির হালুয়া, তৈলাস্ত বা পাকা মাছ, সব রকমের আচার, বিশেষ করে চিংড়ি মাছ।

### পাণ্ডু ও কামলা রোগ (Gaundice)

প্রস্রাব হ'লদে বা চোখ হ'লদে হ'লেই তখন আমরা বলি জন্ডিস্ হ'য়েছে, আর হাত পা ফ্যাকাশে হ'লেই তবে বলি যে এ্যানিমিয়া (Anaemia) বা পাণ্ডুরোগ হ'য়েছে, তার আগেও অনেক লক্ষণ আসে, তা ছাড়া এমন লক্ষণও ইঙ্গিত দিয়ে দেয় যে এগুলি পাণ্ডুরোগ। এই যেমন অল্পতে ক্লান্তি বোধ, মাঝে মাঝে অরুচি, প্রায়ই পিপাসা, হাসি-কান্নার অল্প উত্তেজনাতেই চোখে জল, যখন তখন কিমূর্নি, বিনা পরিশ্রমে শরীরের যেখানে সেখানে ব্যথা, সব ঋতুতেই দেহ ঋক্ষসে; এ সবই পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

যাঁরা এ সব লক্ষণাক্রান্ত তাঁদের প্রথম কর্তব্য হ'লো মাঝে মাঝে মৃদু বিরেকচন বা

জোলাপ নেওয়া, যতটা সম্ভব পুরানো চালের ভাত খাওয়া, মৃগ, মসুর বা অড়হর ডালের পাতলা যুগ, পায়রা ভিন্ন সব রকমের ছোট পাখীর মাংস, কচি মাছ, হিঙ্গে ও কুলেখাড়া শাক, বেগুন, রসোয় পেশাজ পাকা আম, হরীতকীর মোরশ্বা, টাটকা ঘোল, অল্প ঘি বা মাখন (যদিও বর্তমান যুগে সরপ্রকার তেল, ঘি জাতীয় জিনিস বর্জন করার রেওয়াজ চলছে, কিন্তু আয়ুর্বেদ সে কথা বলে না। এ ভিন্ন পদার্থবা শাক, মশলা হিসেবে তেজপাতা, দারুচিনি ও যোয়ান ব্যবহার এ রোগে ভাল। ঝাল হিসেবে চই ভাল। যেখানে আহাৰ্য তেলের ব্যবহার করতে হবে সেখানে সরষের তেলের পরিবর্তে তিল তেলের ব্যবহার করলে রোগ তো বাড়েই না অধিকন্তু কমে যায়। তাই দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় পাণ্ডু ও কামলা রোগ কম হয়। আর একটা খাদ্য ও ঔষধ হিসেবেই বলি—কাঁচা কলা চাকা চাকা করে কেটে, শুকিয়ে গুঁড়ো করে, সেটার সঙ্গে অল্প যব বা গমের আটা মিশিয়ে রুটি করে খেলে ২/৪ দিনেই পাণ্ডু ও কামলা রোগের উপশম হবে এটা পরীক্ষিত।

### এ রোগে অপথ্য

পোস্ত বা সরষে বাটা, সরষের তেলে রান্না, পান খাওয়া, টক দই, শিম, যে কোন রকম পাতা শাক, কচু ডাঁটার তরকারি, ওল, কচু, মান, বরবাট, লাল কুমড়া, মুলো, বিট, গাজর, ফুলকাপি, ওলকাপি, বাঁধাকাপি, পালং শাক, টোমাটো, তেঁতুল, জাম্বীর লেবু, এ ছাড়া দিবাশিলা, কাঁচা লবণ, বেশী জল খাওয়া, নদীর জলে স্নান ও পান, আর সমীচীন নয় বিড়ি সিগারেট খাওয়া।

### এইবার রক্তপিত্ত সম্পর্কে বলি

এই রোগের নামেই লোকের আতঙ্ক, রক্ত যেখান থেকেই পড়ুক না কেন, মানুষের আশঙ্কা হয়, নানা চিন্তাই মনে আসে, এই রক্তপিত্তের রক্ত শুদ্ধ মৃদু থেকেই আসে তা নয়, মলম্বার ও প্রস্রাবের সঙ্গেও যায়, এ ভিন্ন নাক থেকেও আসে, এও দেখা গেছে রোমকূপ থেকেও বিন্দু বিন্দু ঘামের মত বেরোয়।

এখন প্রশ্ন—রক্তের সঙ্গে পিত্ত কথাটার সংযোগ কেন করা হ'লো—সে ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের বক্তব্য পিত্ত ও রক্ত দুইএর উষ্ণতায় এবং দ্রবত্বে সমভাবাপন্ন; এই পিত্তটাই খাদ্যরসকে রক্তে রূপান্তরিত করে; আর সর্ব ধাতুর একটা নিজস্ব উষ্ণা আছে, তাদের দ্রব ও স্থলত্ব আছে, এই উষ্ণাই আয়ুর্বেদের ধাতুগত অগ্নি, যখন রক্তপিত্তের রক্ত নির্গত হয় তখন রক্তের দ্রবত্বটাই পিত্তের দ্রবত্বের সঙ্গে মিশে যায়। সেইটাই আমরা দেখতে পাই। এর সঙ্গে শ্লেষ্মার যোগ হ'লেই বায়ু তাকে উৎক্লিষ্ট করে দিয়ে থাকে, যেহেতু এটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ দ্রব পদার্থ।

এই জন্য আহাৰ বিহার সম্পর্কে বিশেষ অবহিত না হ'লে এর থেকেই ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ এসে পেঁছাবে।

### এ রোগের পথ্য

পুরাতন ধানের চালের ভাত, এখানে ব'লে রাখি, আমরা চালটাকেই পুরানো ধরি, কিন্তু তা নয়, পুরানো ধানের চাল, কাগুনী দানার ভাত, এর সংস্কৃত নাম চিরঞ্জীব-২১

(কণ্ঠদুর্নী)—এটা ভেজে, কেড়ে নিয়ে খাওয়া যায়। যবের পালো বা বালি, মৃগ, মসুর, ছোলা অথবা বুনমুগের (মোটাল) পাতলা যুষ, যদ্বদ পাখীর মাংস, এক বল্কা দুধ, পাতলা ছাগদুগ্ধ ও ঘি, কাঁঠালী কলা, ক্ষুদ্রে নটে শাক, বেতের ডগা, বন আদা, পুরানো চালকুমড়া, কচি তালশাঁস, দাড়িম, খেজুর, আমলকীর মোরষা, ডাবের জল, ঝুনো নারকোলের শাঁস, পানিফল, কেশদুর, পাকা কয়েৎবেল (তবে মিষ্ট হওয়া চাই), ফলসা, কিসমিস, আখের রস। আর ব্যঞ্জন হিসেবে এই রোগের পক্ষে ভাল—পলতার শুক্তোর মত বাসকপাতা দিয়ে রান্না শুক্তো, লাল শালুকের ডাঁটার ও পশ্চিমুলের (গোঁড়ের) তরকারি। আর ঝাল হিসেবে—পিপুল বা চইএর গুড়ো মিশিয়ে অথবা চই বাটা দিয়ে তরকারি রান্না করে খাওয়া, পানীয় হিসেবে ঠান্ডা জল, কুয়োর (কুপ) জল খাওয়া, ঠান্ডা জলে স্নান, কলাপাতার খাওয়া, তিল তেল মাখা।

### এই রোগে অপথ্য ও বর্জনীয়

বেশী হাঁটা, ব্যায়াম, সাতার দেওয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ, ধূমপান, এদের কোনটাই ভাল নয়।

খাওয়া হিসেবে—কুলখ কলাইএর ডাল, পোস্ত ও তিল বাটা দেওয়া তরকারি, সরষে শাক, কলাইএর ডাল, তেঁতুলের টক, দই, লেবু (অবশ্য কোন লেবুই ভাল নয়) আর তরকারির দিকে—বেগুন-নিমপাতা, মানকচ, কচুরমুখী, মেটে আলু, শিম, টোমাটো, মুলো, রসুন, পেঁয়াজ, ডিম, বেশী লবণ বা বেশী লবণ দেওয়া রান্না তরকারি, আর যে সব খাদ্যে অজীর্ণ সৃষ্টি করে সেগুনি যথাসম্ভব হিসেব করে খাওয়া ভাল।

### যক্ষ্মারোগ ও তার পথ্যাপথ্য

এই রোগের উৎপত্তির প্রধান কারণ থাকে শরীরের সহনোপযোগী শ্রম ছাড়া অতিরিক্ত শ্রম করা এবং আহার-বিহারের মাত্রাতিরিক্ত। এই রোগে পদ্রুপ বেশী আক্রান্ত হয় ঐ সব কারণে, স্ত্রীজাতি আক্রান্ত হন সাধারণতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, অথচ সন্তান প্রসবে যখন নিরুপায় হন।

এই কারণে শরীরের ধাতুগুলিই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়ে রোগাক্রমণের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হইয়ে যায়। এর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা দেহের অগ্নিবল রক্ষা, পদ্রুপের ক্ষেত্রে শুদ্ধ রক্ষা, আর নারীর ক্ষেত্রে বার বার সূতিকাগারে প্রবেশ থেকে বিরত থাকা।

### এই রোগের সূপথ্য

রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করে, ছোট ছোট পাখীর মাংস খাওয়া ভাল, তবে বিনা মশলায়, মৃগ ও ছোলার ডালের পাতলা যুষ, ছাগলের দুধ, ঘি, মাখন, কলার মোচা, ছানার মিষ্ট, পাকা আম, আমলকীর মোরষা, মিষ্ট খেজুর, ফলসা, ডাবের জল (তবে দুপদ্রুবেলায়), ঝুনো নারকোল চিবিয়ে ছিঁড়ে ফেলে খাওয়া, কিসমিস, মহিষের দুধ, ঘি (অবশ্য পুষ্টিকর হিসেবে); এ রোগে বিশেষ তরকারি পাকা চালকুমড়া রান্না করে খাওয়া, স্বতকুমারীর শাঁসের তরকারিও খাওয়া যায়, শাকের মধ্যে গিমে শাক, (খুব অল্প) আর থানকুনী (খলকুড়ি), মশলা

হিসেবে ধনে, মৌরী, জিরে, ঝাল হিসেবে পিপড়লের গুড়ো, শঠীর পালোর বা পাণিফলের গুড়োর হালদুয়া। আর আখের (ইক্ষু) রসও খারাপ নয় তবে কালো আখ হ'লে ভাল হয়।

### এ রোগে অপথ্য ও বর্জনীয়

রোগভোগকালে পরিশ্রম করাটাই দোষের, তা ভিন্ন বেশী হাঁটা, দিবানিদ্রা এবং স্ত্রী-পুরুষের একত্রে অবস্থানটাও বিশেষ ক্ষতিকর, যেহেতু শত্রুক্ষয়ই এ রোগের অন্যতম একটি কারণ, তা ছাড়া সাহস করে কোন কার্যিক পরিশ্রমের কাজে লেগে যাওয়া এবং রাত জাগাও ভাল নয়। এ রোগে পান খাওয়া অসমীচীন।

আহার্য হিসেবে—ডালের মধ্যে কুলখকলাই ও মাষকলাইএর ডাল, তরকারির মধ্যে কাঁকরোল, শিম, বেগুন, লাউ, সরষে শাক, অন্য কোন পাতা শাক; মশলার মধ্যে—রসোন, পেঁয়াজ, হিং, ফলের মধ্যে—তরমুজ, টক কমলালেবু, পাকা পেঁপে, তিতো (তিস্ত) কষার বিশিষ্ট ফল, পাকা বেল, এ ভিন্ন দই, সে টক মিষ্টি ঘাই হোক। বনোঁষধির মধ্যে তুলসী পাতার রস।

### কাস রোগ

লোকে কথায় বলে 'পেট গরমের কাস'; কথটা কিন্তু মিথ্যে নয়।

মনে করুন কালবৈশাখীর বড়, গরমে হাওয়া উঠে সে জায়গাটার আংশিক শূন্যতা সৃষ্টি হ'লো আর ওমনি সন্ধ্যাবেলা অন্য জায়গা থেকে ঐ শূন্য জায়গাটাকে পূরণ করার জন্যে বাতাস ছুটে আসাটার সময়টাই তো বড়ের রূপ, সেই রকম দেহের মধ্যে বায়ু সর্বত্রই তো কাজ ক'রে চলেছে, একেই বলে সমান বায়ু, এই দেহের মধ্যবর্তীস্থানে অর্থাৎ গহণী নাড়ীর উর্ধ্বদিকে কেন্দ্র করে যিনি বসে আছেন তার নাম উদান বায়ু, তিনি কুপিত হ'লেই কাসি হবে, তার সঙ্গে শ্লেষ্মার যোগ থাক আর নাই থাক, আবার এরই সঙ্গে যখনই বিকৃত কর্ফাপ্তের যোগ হবে, তখনই হবে কাস রোগ। এই সময় সতর্ক না হলে বা তার প্রতিকার না করলে পরিণামে আসবে যক্ষ্মা, জ্বরও এসে জুটবে, সঙ্গে সঙ্গে সব ধাতুরই ক্ষয় হ'তে থাকবে, তার ফলে আসবে অকালবার্ধক্য। আর একটি কুলক্ষণ দেখা যায় যে, প্রথম যৌবনটার ঈপ্সিত প্রবৃত্তি তাকে চেপে ধরে।

### পথ্য—কি আহারে কি বিহারে

ডালের মধ্যে মৃগ মসুরের ও কলাইএর যুষ, মাংসের মধ্যে ছোট পশু-পক্ষীর অথবা কচ্ছপের (কুমের) মাংস, মেওয়া হিসেবে খেজুর, কিসমিস, দাড়িম ও আমলকীর মোরস্বা, হরীতকীর মোরস্বা, অম্লবেতসের চাটনি।

সাধারণ পথ্য হিসেবে—শঠীর পালো, খই, খইএর মন্ড, শুষ্ক মূলো চূর্ণ ক'রে তরকারিতে দেওয়া, গমের ডালিয়া, সৈন্দ্ব লবণ, তরকারি ও শাকের মধ্যে বেতো, কাকমাচি শাক, কালকাসুন্দের ফুল, থানকুনি, লাল পুনর্ণবা শাক, সুস্বাদু শাক, তরকারির মধ্যে কচি মূলো, কচি বেগুন; মশলার মধ্যে—ধনে, পিপড়ল, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, রসোন, আদা; প্রকিয়া হিসেবে পেটে বায়ু হ'লে ওখানে পুরানো ঘি মালিশ, আর বিরচনের জন্য মৃদু জোলাপ নেওয়া।

## এ ক্ষেত্রে অপথ্য কি

এ রোগে ডুস্ নেওয়া, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম করা, রৌদ্র লাগানো, বেশী পথ হাঁটা, কোন রুদ্ধ দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ হয় এমন খাদ্য, যে দ্রব্য খেলে উল্গার (ডেকুর) ওঠে এমন খাদ্য খাওয়া, ঠাণ্ডা জলে স্নান আর কোন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে কোন রকম মাছই ভাল নয়। তরকারির মধ্যে গুল, কচু, মান, লাউ, বরবটি, বিশেষ করে পুঁইশাক, আর বর্জনীয় সরষে, খেসারি ও মটর শাক।

## শ্বাস ও হিক্কা রোগ

শ্বাস রোগকেই আমরা বলি হাঁপানি। বংশগত যত রোগ আছে তার মধ্যে এই রোগটি শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা জীবন দীর্ঘায়ত করে। দুই-একটা সাধারণ কারণ থেকেও হাঁপানি হয়, যেমন বিকারগ্রস্ত শ্লেষ্মণ ধাতু শুকিয়ে গেলে, হৃদদৌর্বল্য হলে; আহার বিহারের ব্যভিচার হলে অথবা সীসা বা দস্তার বিষক্রিয়াতেও হতে পারে। এ সকলই সাক্ষাৎ কারণ, আর এ সব থেকে মুক্ত থেকেও যে এ রোগ থেকে রেহাই পায় না, তা হলো পিতৃ বা মাতৃ সূত্রে সেটা তার দেহে পৌঁছেচে।

## আহার ও বিহারের বিধি

এ রোগে ঈষদৃষ্ণ জলে স্নান, রাতিতে অল্প গরম জল খাওয়া, সৈম্ধব লবণ পিপপুল, শূঠ (শূঢ়ক আদা), গোল মরিচ, ছাগলের দুধ। এই দুধ নিত্যপথ্য হিসেবে অভ্যাস করলেই ভাল হয়। ছাগল দুধের ঘি, পুরানো গুড়, পুরানো ধানের চালের ভাত, কুলখ কলাইএর ঘৃষ, যবের পালো, গমের ডালিয়া, ছোট মুরগী ও পাখীর মাংস, এ ক্ষেত্রে ঔষধের মাত্রায় অল্প পরিমাণ মৃতসঞ্জীবনী খাওয়া ভাল, তবে এটি যথাশাস্ত্র প্রস্তুত না হলে, অন্য ঐ জাতীয় সুরাসার খাওয়াও চলে; এবং মধুও দুই/এক চামচ মাঝে মাঝে খেলে ভালই হয়।

এদিকে তরকারির মধ্যে কচি মুলো, পটোল, সজিনার ডাঁটা, বেতো ও নটে শাক, বেগুন, পুরানো চালকুমড়া, হরীতকী বা আমলকীর মোরশ্বা, তা ছাড়া যে সব জিনিসে কফ এবং বায়ু বিকারগ্রস্ত বা কুপিত না হয় সেই সব দ্রব্য ব্যবহার করা চলে।

## এ রোগে কি অপথ্য ও বর্জনীয়

মলমূত্রের বেগ ধারণ, পিপাসায় ঠাণ্ডা জল খাওয়া, বেশী পরিশ্রম, ধুলো ও রৌদ্র লাগানো, ঠাণ্ডা ঘরে বায়ুস্কাপ দেখা, ফ্রিজে রাখা কোন ঠাণ্ডা জিনিস বা আইসক্রিম খাওয়া, ঠাণ্ডা ঘরে থাকা এগুলি সর্বদা বর্জন করে চলতে হয়; আর উভচর প্রাণীর অর্থাৎ যারা ডাঙায়ও থাকে আবার জলেও চলে, যেমন কচ্ছপ (কাছিম)-এর মাংস, যেসব মাছ মাটিতে থাকতে ভালবাসে, যেমন শিঙা, মাগুর, পাকাল প্রভৃতি মাছ ও কাঁকড়া, লবণাক্ত জলের মাছ, যেমন বড়চাঁদা (পম্প্রেট), ভোলা, ভেটকি এই সব মাছ, এ ভিন্ন চিংড়ি মাছ খেলেই এ উপদ্রব যেন ছুটে আসে।

এদিকে তরকারির মধ্যে শিম, ওল, কচু প্রভৃতি এবং কন্দজাতীয় জিনিস ভাল নয়। তারপর সরষে ও পোস্ত, সরষের তেল, তেলে ভাজা, কলাইএর ডাল, এসব জিনিসও বর্জন করে চলতে হয়।

### স্বরভোগ

এ রোগ যত তাড়াতাড়ি আসে তত শীঘ্র যেতে চায় না, কারণ লোকে এ রোগের গুরুত্বও দেয় না; সুতরাং এটা নিরাময়ের জন্য তৎপরও হয় না, তার উপর আহার বিহারেও তার বিধিনিষেধ মেনে চলে না। এর চিকিৎসা কিন্তু হিষ্কা-শ্বাসের মত এবং পথ্যও তাই, এর মধ্যে যেটুকু বিশেষ করণীয় সেইটুকুই লিখছি।

### বিশেষ পথ্য

মাঝে মাঝে জোলাপ নিয়ে পেটটা পরিষ্কার রাখতে হয়, আর দু'বেলা বালি একটু দুধ মিশিয়ে খেলে ভাল হয়। মাংসের মধ্যে এই রোগে হাঁস বা মুরগীর মাংস ভাল, শাক হিসেবে—কাকমাচি শাক তবে যোগুলি ভিত্তো (তিক্ত) সেগুলা নয় কিন্তু; তরকারি হিসেবে—কচি মুলো, কচি বেগুন, আর এদিকে রসোন ফোড়নের তরকারি, আদা, মরিচ, গাওয়া ঘি ও দুধ এবং কিসমিস, খেজুর।

এ রোগে সর্বাপেক্ষা কুপথ্য হ'লো কয়েৎবেল, ওলের, কচুর এবং শালদকের ডাঁটার তরকারি, কচুর মুখী বা কচু, বরবাটি, শিম, টোমাটো ও ফুলকপি খাওয়া উচিত নয়। ফলের দিকে জাম ও গাব দুটোই ভাল নয়।

### অরুচি রোগের পথ্যাপথ্য

এ রোগটি অনেক কারণেই আসতে পারে, তবে দেখা যায় দু'টি রোগের অনুগমন করে আসে, একটি নাসা রোগ, একে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলে থাকে (polypus) আর একটি ক্ষেত্র হ'লো আমাশয়ের নিম্নভাগের গ্রহণী নাড়িতে ক্ষত, যাকে বলা যেতে পারে বৃহদন্ত্রক্ষত। এ ভিন্ন কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়, শোক, ক্রোধ, ও ঘৃণা থেকেও এ রোগ আসতে পারে। এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে কোন কোন রোগ-ভোগের পরেও অথবা গর্ভাবস্থাতেও তো অরুচি হয়; এটা তা হ'লে কি?

এ ক্ষেত্রে আরুর্বেদের বক্তব্য—আপাতদৃষ্টিতে রোগ দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে সে এখনও পূর্ণ সুস্থ হয়নি, তাই তার এই অরুচি। আর দ্বিতীয়টি—তার ক্লেদযুক্ত আমাশয়ের প্রতিক্রিয়া।

### এ রোগে করণীয় কি

মাঝে মাঝে মৃদু জোলাপ নিতে হয়, তবে গর্ভবতীর অরুচির ক্ষেত্রে প্রয়োজন নয়; এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। তা ছাড়া তিস্তরসপ্রধান দ্রব্য খাওয়া ভাল, আর মাছ হিসেবে চ্যাং, মৌরলা, পুঁটি, ইলিশ, খ'লসে, কই, মাছের ডিম, বা মাছের তেল, এর মধ্যে যার যেটায় রুচি, সেটা তিনি খাবেন।

লিখতে সংক্ষেপ বোধ করলেও লিখছি—মাছ কলার পাতায় জড়িয়ে, মাটি লেপে,

জলশত উনুনে ফেলে, পুড়িয়ে, সেটাকে পরিষ্কার করে তেল-নুন দিয়ে মেখে খেলে তাড়াতাড়ি অরুচিটা চলে যায়। জাপানে দশ মৎস্য খাওয়া ওদেশের সম্প্রদায় বিশেষের একটা প্রিয় খাদ্য। আর আমাদের উড়িষ্যা প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে এটা এখনও প্রচলিত, সে অরুচি হোক আর নাই হোক, মুড়ি বা পান্তা ভাতের সঙ্গে পোড়া মাছের টাকনা। আর তরকারির মধ্যে চালকুমড়া, বেতের ডগা, কচি মুলো, কচি বেগুন, কলার মোচা, পলতা, হিঙে প্রভৃতি তিতো শাক, এদিকে ওল, মান প্রভৃতি।

টক হিসেবে জামির লেবু বা যে কোন লেবু, কাঁচা বা পাকা আম, নুন জলে ভিজানো কিসমিস, পাকা কুল, বৈঁচ ফল, পুরানো তেঁতুল, কুল-শুঠের গুঁড়ো, কয়েৎবেল, হিং (ভাজা) যোয়ান প্রভৃতি।

### এ ক্ষেত্রে অপথ্য

যা খেতে ভাল লাগে না, তা খাওয়ার দরকার নেই, সে পুষ্টিকর দ্রব্য হ'লেও না, তবে রকমফের রান্না করে দিলে সেই জিনিসেই আবার অরুচি কেটে যায়।

### ছর্দি (বমি) রোগ

অনেক কারণেই এ রোগ আসতে পারে, পেটে ক্রিমি হ'লে, বেশী দিন শুধু তরল জিনিস খাওয়ার অভ্যাস করলে, বেশী তিতো (তিক্ত) জিনিস অর্থাৎ (তীক্ষ্ণ তিক্ত) বেশী দিন খেতে থাকলে, অথবা ক্রিমির উপদ্রব দূর করতে অতিরিক্ত তিতো বেশী দিন খাওয়ালে বমি রোগ আসতে পারে, আর একই নির্দিষ্ট সময়ে না খেয়ে উল্টো-পাল্টা সময়ে খেলে এবং খাওয়ার দোষে পাকস্থলীতে (stomach) দূষিত কোন জিনিস গেলে বমি হয়ে থাকে।

### করণীয় কি

এ রোগে গুলুগু, তা কাঁচা বা শুষ্ক যাই হোক, কাঁচা হ'লে রস ২/১ চামচ আর শুকনো হ'লে ৪/৫ টুকরো, ১ কাপ গরম জলে ভিজিয়ে, সেই জলটা খেলে বমি বন্ধ হয়। এ ভিন্ন খইএর মণ্ড বা খই, কয়েৎবেল, পিপুল বা গোলমরিচের ঝাল, হরীতকীর মোরঝা, ধনে বাটা দিয়ে তরকারি, রান্না করা মূগ বা মসুর ডালের পাতলা যুঁষ, গমের ডালিয়া, যবের পালো, জায়ফল ঘষে (অল্পমাত্রায়) একটু তরকারিতে দিয়ে খাওয়া, নিম বেগুন, মোরী, শুলফো বা নটে শাক, কচি বেগুন পোড়া (২/৫ ফোঁটা ঘি ও লবণ দিয়ে), ডাবের বা তালশাঁসের জল, বুনো নারকেল কোরার সঙ্গে মুড়ি বা ভাজা চিড়ে প্রভৃতি। বমি হ'তে থাকলে বা বমি রোগে অবস্থা বিবেচনায় এগুলির মধ্য থেকে বিচার করে দিতে হয়, তবে এ সব কুল না পেলে একটু মৃতসঞ্জীবনী বা ব্রান্ডী আধ বা এক চামচ বেশী করে জল মিশিয়ে দেওয়া যায়।

### এ ক্ষেত্রে অপথ্য কি

এমন কিছু করা উচিত নয়, আর যে জিনিস কখনও খাওয়া অভ্যাস নেই সে জিনিস খাওয়া অনিচিত। তরকারির মধ্যে কুঁদরী, শিম, বরবটি, ভুঁইছাতা, বিট, গাজর, সরষে শাক, আর সরষে বাটা, মশলার মধ্যে ছোট এলাচ খাওয়া উচিত নয়।



## তৃষ্ণা রোগ

বার বার পিপাসা পাওয়াটার মূলে অন্য কারণ থাকে, যাদের মূত্রগ্রন্থি ও তালুগ্রন্থি বিকারগ্রস্ত হয় অর্থাৎ কোন দোষে দৃষ্ট হয়, এ ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের বক্তব্য, তার সেই দুই স্থানের জলবাহী স্রোতবায়ু কতৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বদ্ব্যত হবে।

এই রোগ দীর্ঘদিন চলতে থাকলে, সেটা থেকে আসে মূর্ছা (হিষ্টিরিয়া) অথবা অপস্মারও আসতে পারে; সুতরাং এই রোগটিকে খুব লঘু করে দেখা উচিত নয়।

## এই রোগের পথ্য কি

গরম ভাত অথবা মুড়ি অল্প গাওয়া ঘি মেখে কিছুদিন ধরে খাওয়া। এটাকে নিরাময়ের ব্যবস্থা না করলে পরিণামে উপরি উক্ত রোগ দুটির যে কোন একটি আসার সম্ভাবনাও যেমন আছে, সেই রকম ভ্রমরোগ, তন্দ্রা (বিমদন) এমন কি সন্ধ্যারোগও হ'তে পারে। এই তৃষ্ণারোগে খইএর মণ্ড, মোয়া খইএর ছাতু, চিড়ে ভাজা, চিড়ে মণ্ড (একটু দুধ চিনি মিশিয়ে খাওয়া) আর ব্যঞ্জন হিসেবে অল্প ঘি দিয়ে ভেজে নিয়ে মৃগ, মসুর ও ছোলার ডালের রান্না অথবা ঘি দিয়ে সাতলে (সন্তলন করে) নিয়ে সেটা খাওয়া প্রয়োজন। মোট কথা একটু ঘি পেটে পড়া চাই। আর তেল হিসেবে তিল তেল বা বাদাম তেল খাওয়া ভাল। আর তরকারি হিসেবে মোচা, চালকুমড়া, লাউ, পুই শাক, পটোল, আর এদিকে—কাঁকড়ের বা তরমুজের তরকারি, বেতের ডগার শক্ত, পাকা তেঁতুলের অম্বল। এগুলি এই রোগের উপযোগী খাদ্য, আর ডাবের জল, মধুর সরবৎ, ঝুনা নারকোল কোরা, মহুয়া ফুলের সরবৎ, ফলের মধ্যে মিষ্টি জামীর লেবু, আপেল, ন্যাসপাতি, কিসমিস, বাল হিসেবে চই আর আম্র হিসেবে ছোট পাখীর মাংস ভাল।

## এদের অপথ্য কি

সরষের তেল খাওয়া বা মাখা, যে কোন রকম টক ফল, কোন রকম কষায় জিনিস (মোচা বাদ), কোন গুরুপাক দ্রব্য, নোনতা জিনিস ও বাল, আর আম্রের দিক থেকে মাছ ও মাংস, বিশেষ করে কচ্ছপের (কুমের) ও মুরগীর মাংস বেশী ক্ষতিকর।

একটা কথা বলে রাখি, মূর্ছারোগের পথ্য ও অপথ্য ঐ তৃষ্ণারোগেরই তুল্য। তবে মূর্ছারোগের বিশেষ পথ্য হচ্ছে পাতলা মটরের ডাল, ছোট নটে শাক, খরগোসের মাংস, পায়সে কিসমিস দিয়ে খাওয়া।

## উন্মাদ

এ রোগের উৎপত্তি বংশজ কারণেও হ'তে দেখা যায়, মনোবিকারেও হয়, এবং মস্তিস্কের বিকার সৃষ্টি করে এমন ধরণের কোন বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করলেও উন্মাদ হতে দেখা যায়।

ভূতোন্মাদ বলে অথর্ববেদে একটি উক্তি আছে, এটার ব্যাখ্যায় চরক সূত্রভূতের অভিমত হচ্ছে—অতীত জীবনে দম্ভ, মোহ, ঈর্ষা ও লোভ প্রভৃতি কারণে উৎকট

দুঃকর্মজনিত কর্মের স্মৃতিতে মন পীড়িত ও অন্তঃপদাংশ হ'তে থাকলে, সে অবস্থাটাকে বাহ্যঃপ্রকাশ করতে না পারার জন্য যে মনোবিকার সেটাকেও ভূতোন্মাদের পর্যায়ে ধরা হয়।

এ ভিন্ন আর একটা কারণে উন্মাদ হ'তে পারে, সেটা হ'লো কামজ উন্মাদ, বিশেষতঃ এ রোগে যুবক বা যুবতীকেই আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রের প্রধান কারণ থাকে বয়সকালের ধর্ম। সেটায় যদি তার মন অতৃপ্ত হয়।

আর এক প্রকার উন্মাদ আছে, সেটা অত্যধিক শরীর ক্ষয়জনিত, সে স্ত্রী-পুরুষ যেনই হোক।

### এ রোগের চিকিৎসামূলক পথ্য

(১) যদি দেখা যায় তার সর্দি হ'তেই চায় না, শরীর কালা হ'য়ে, এবং শূন্যকিয়েও যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে বৃষতে হবে এটা বায়ুপ্রধান উন্মাদ। সে ক্ষেত্রে ঘৃত পান করানো ভাল।

(২) যে ক্ষেত্রে তার ক্রোধ বেশী, গায়ে জ্বালা, ঠাণ্ডা জিনিস ভাল লাগা, বিবস্ত হ'য়ে থাকার প্রচেষ্টা, এ সব কিন্তু পিত্ত-প্রধান উন্মাদ রোগের লক্ষণ। এদের দান্ত বেশী যাতে হয় এইভাবে বিরেচন ঔষধ খাওয়ালে উন্মাদের তীব্রতা কমে যাবে।

(৩) শ্লেষ্মাপ্রাধান্যে উন্মাদ হ'লে, বিড়বিড় করে বকা বেশী হয়, শ্বাবির হয়ে থাকতে চায়, কিন্তু এদের ঘুম হয় অথচ পাগল, যে কাজে লেগে যায় সেটা নিয়ে ক্ষণিকক্ষণ থাকে, এই যে ক্ষেত্র, এ ক্ষেত্রে চরকের ব্যবস্থা বমন করানো; অবশ্য এটা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে করাতে হবে। আর সাধারণভাবে ব্রাহ্মীশাকের রস (Herpestis monniera) ২ চামচ একটু গরম করে দুধের সঙ্গে খাওয়ানো ভাল, কিন্তু পিত্তপ্রধান ও বায়ুপ্রধান উন্মাদে মণ্ডুকপর্ণী বা খুলকুড়ির (যার প্রচলিত নাম থানকুনি—Centalla asiatica) পাতার রস খাওয়ানো ভাল অথবা ঝোল করে খাওয়ানো যেতে পারে। আর পুরানো চালকুমড়োর রসের (৩/৪ চামচ) সঙ্গে চিনি দিয়ে সরবৎ করে খাওয়ানো যেতে পারে, আর, ব্যবহার করা যেতে পারে সুবুনী শাক, জটামাংসী, শতমূল, শঙ্খপুষ্পী প্রভৃতি; এগুলি যেটাকে যে ভাবে খাওয়া সম্ভব সেই পদ্ধতিতে উন্মাদের ক্ষেত্রে খাওয়াতে পারা যায়—এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য নয় যে সব কয়টি একসঙ্গে বা এক সময়েই খাওয়াতে হবে। এ ভিন্ন তিল তেল মেখে স্নান, গায়ে ঠাণ্ডা জিনিসের প্রলেপ দেওয়া, পথ্য হিসেবে গমের ডালিয়া, মুগের চুই, ধারোক্ষ দুধ, নুতন বা পুরানো ঘি খাওয়া, প্রত্যহ কচ্ছপের মাংস (প্রয়োজন হ'লে লুকিয়েও খাওয়াতে হবে) পুরানো চালের ভাত, চালকুমড়োর তরকারী, শাকের মধ্যে নটে, বেতো, পালং, সুবুনী শাক, সম্ভব হ'লে গাধার দুধ, আরও সম্ভব হ'লে এই প্রাণীর মূত্র পানেরও ব্যবস্থা দেওয়া আছে চরকে। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি, বসন্ত রোগাক্রমণ কালে, যদি উন্মাদের লক্ষণ দেখা যায়, তা হলে তাকে গাধার দুধ খাওয়াতেই হবে। আর যে কোন রকম উন্মাদ রোগীর ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল, হরীতকীর মোরশ্বা, আমলকীর মোরশ্বা, কিসমিস, ডাবের শাঁস, পাকা কয়েৎবেল, পাকা কাঁঠালের রস, যখন যেটা পাওয়া যায় খেতে দিতে পারা যায়। মোট কথা যেহেতু পাগল হয়েছে ভেবে তাকে গভানদূর্গতিক ধারায় চিকিৎসা না করে বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে কোন দোষের লক্ষণের সঙ্গে তার লক্ষণের

মিল আছে সেটা বিচার করে চিকিৎসা করলে তাড়াতাড়ি উপশম হবে। একেই আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে দোষ প্রত্যন্যীক চিকিৎসা, এ ক্ষেত্রে ব্যাধি প্রত্যন্যীক চিকিৎসা করা বিধি নয়।

### উন্মাদ রোগের অপথ্য

এ রোগে কেবল মদই নিষিদ্ধ নয়, কোন রকম নেশা করাই উচিত নয়, কারণ ষেটার দ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয় এমন ধরনের সব জিনিসই পরিত্যজ্য। এ ভিন্ন যে সব ঔষধ ও পথ্যে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রকে লাঠি মেরে স্তম্ভ করে দেয় এ সব বর্জন করে চলাই উচিত; আর নির্দিষ্ট সময়ে তাকে খেতে দিতে হবে অর্থাৎ অভুক্ত রাখা উচিত নয়। এদের পিপাসা বেশী হয়, চাইলে জল দিতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে তরকারিরও বাছবিছার আছে, যেমন উচ্ছে বা করলা, নালতে পাতা (তিস্ত পাট শাক) চিচিঙ্গে, যে কোন রকম পাতা শাক (পথ্য হিসেবে যোগদলি বলা আছে সেগদলি ভিন্ন) ওল, কচু, মান, পলতা, এসব তরকারি খাওয়া উচিত নয়।

### অপস্মার

আয়ুর্বেদে দুটি কথা আছে, আধি আর ব্যাধি, আধি হয় মনে, আর ব্যাধি হয় দেহে আর মনে। দেখা যাচ্ছে—এই অপস্মার রোগের হেতু হ'লো মনোবহ স্রোত বিকার-গ্রস্ত হওয়া, অবশ্য এই রোগ বায়ু, পিত্ত, কফ যে দোষের আধিক্যেই সৃষ্টি হোক না কেন, তার চিকিৎসার চিন্তাধারা থাকবে মনের সুস্থতা বজায় রাখতে যে স্নায়ুকেন্দ্রকে অভিভূত বা শান্ত করে রাখার প্রয়োজন হয় সেই রকম আহার-বিহারই এ ক্ষেত্রে বিধি, সূত্ররূপে উন্মাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ এবং পথ্য ও অপথ্যাদুলি মেনে চললেই এ রোগের শান্তি হয়।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখি, আয়ুর্বেদে এই অপস্মার চিকিৎসার ক্ষেত্রে কখনও অতিসত্ত্বা বাদে বিশ্বাসী নয়, তাঁরা অপগত স্মৃতিকে (সাময়িক হারানো স্মৃতি) ফিরিয়ে আনার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত সেই উপদেশই দিয়েছেন।

### বাতব্যাধি

কৃষ্ণের শতনামের মত এই একটি রোগ, যেমন যেমন কর্মের জন্য তিনি এক একটি নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন, সেই রকম এই বায়ু-বিকারগ্রস্ত হয়ে এক একটি অবতারের মত রোগ সৃষ্টি করে। এই যেমন রোমকূপে যদি বায়ু বিকারগ্রস্ত হয়, দেখা গেল রোমাঞ্চ হ'লো, চোখের পাতায় বায়ুর বিকার হলো, তখন সে নাচতে লাগলো, সংস্কারে পড়লাম কল্যাণ অকল্যাণের।

এই হাত বা মাথা কাঁপা, তার নাম হ'য়ে গেল কম্পবাত, রাতে শূয়ে আছেন, সকালে উঠে দেখা গেল মদুখানা যেন বাংলার পাঁচ, এও কিন্তু বায়ুর ক্রিয়া, একে বলা হ'লো অদ্রিত রোগ, হঠাৎ চোয়াল আটকে গিয়েছে, এটাকে বলা হ'লো হনুগ্রহ, কানে বাঁশ বাজছে এও বায়ুর ক্রিয়া, সেখান তার নাম হ'লো কর্ণনাদ। এই রকম বাতবিকারে ৮০ প্রকার রোগ হয়। এই বায়ু কিন্তু রোগ

আসার রাডার—এই মনে করুন, অন্যমনস্ক হ'লে আপনার পা নাচে, এটা কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে বাতব্যাধি আসার ইঙ্গিত, তারপর যাঁরা প্রায়ই (প্রত্যহই) পেট বাজিয়ে থাকেন, তাঁদের ঢেকুর ওঠার রোগ (উদাবর্ত) এসে পড়বে তারই ইঙ্গিত। যাঁদের মলত্যাগে মনের খুঁতখুঁতানি যায় না, তাঁদের হয় অর্শ আছে, না হয় আসবে; যাঁদের ঘন ঘন হাই উঠছে, তাঁদের হয় পাকাশয়ে খাদ্যের অভাব হয়েছে না হয় হৃদদৌর্বল্য এসেছে বা আসছে। এ রকম বহু ইঙ্গিত দেওয়া আছে সংহিতা গ্রন্থে।

### বাতব্যাধি রোগের আহার ও বিহার

(১) তেল মেখে স্নান, তবে অবগাহন স্নানই প্রশস্ত। আর খুবই উচিত দেহের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক রেখে যতটা সম্ভব চলাফেরা এবং শোয়া-বসা যায়। গা-হাত-পা টেপানোটা ভালো, যাকে বলা যায় ম্যাসেজ্ করানো।

### পথ্য বিচার

এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে যেটা হজম হবে সহজে, অথচ পুষ্টিকর। অল্প ঘি দিয়ে রান্না তরকারি, দইএর অগ্রভাগ, গমের তৈরী খাবার, মাষকলাই ও ভাজা কুলখ কলাইএর ডাল। মাছ হিসেবে—পাব্দা, কৈ, রুই, মৌরলা, বানমাছ। মাংস হিসেবে—কচি পাঠা, কচ্ছপ (ছোট কাছিম)। তরকারির মধ্যে—পটোল, স'জনের ডাঁটা, বেগুন, কাঁচা পেঁপে, বেতো শাক। ফলের মধ্যে—দাড়িম, কিসমিস, আলুবোখারা, ফলসা, আপেল, পাকা মহুয়া, মিষ্টি কুল, সফেদা, সরবাত লেবু, এ ভিন্ন মিষ্টি ফল; তবে সব সময়েই মনে রাখতে হবে, যে কোন ফলই হোক সুর্ষাস্তের পর খাওয়া উচিত নয়।

এ ক্ষেত্রে রসোন শাক ও রসোন বিশেষ উপকারী।

### অপথ্য কি

পরিশ্রম, রাগি জাগা, উপবাস এগুলি বিশেষ ক্ষতিকর। আর ডাল হিসেবে—ছোলা, মূগ, মসুর এই তিনটি বর্জনীয় আর থেঁসারির ডালের তো কথাই নেই। এ ক্ষেত্রে গম চলে কিন্তু যবের পালো, যবের ও ছোলার ছাতু ভাল নয়। তরকারির মধ্যে—ডুমুর, লাউ, থোঁড়, মোচা, চাল কুমড়া বা লাল কুমড়া, শিম, করলা, উচ্ছে, কাঁচা কলা ভাল নয়। মোট কথা আদা, রসোন, পেঁয়াজ বাদে কোন মাটির নিচের তরকারি ভাল নয়। পশ্চিমের ডাঁটা (নাল) ও শালুক ডাঁটার তরকারি খাওয়া নিষেধ।

### বাতরক্ত

এই রোগটি যেন শূন্য নিশূন্য, কারুরই প্রতাপ কম নয়। শূন্যতের মতবাদে রক্তও একটি মূল ধাতু, সেই হিসেবে বাত (বায়ু) ও রক্ত দুটি মূলধাতু একক হিসেবে যখন বিকারগ্রস্ত হয় তখনও যেমন বহুরোগ সৃষ্টি করতে পারে, আর এই দুই মূলধাতু বিকারগ্রস্ত হ'য়ে এক সঙ্গে জোট বাঁধলে শরীরের বর্ণ, রূপ দুটিকেই সেন্সিট করে দেয়।

## রোগের পূর্ব রূপ

প্রথম ও প্রধান উপসর্গ হয় ঘাম হওয়া, সে সর্ব শরীরেই হোক আর হাত-পায়েই হোক, (তবে অনেক সময় দেখা যায়, বংশ পরম্পরায়, সে পিতৃ বা মাতৃ যে কুলেই হোক, হাঁপানি বা একজিমা থাকলে শুদ্ধ হাতের তালু ও পায়ের তলাই ঘামে এ ক্ষেত্র ভিন্ন) পরবর্তী স্তরে তার অনেক রূপ, যেমন ছুঁলি, মেচেতা, গ্রন্থি-সংকোচ, হাত, পা শক্ত হ'য়ে কাঠের মত হওয়া, যেখানে সেখানে কালো বা লাল অথবা তামাটে দাগ দেখা যাওয়া, এ সব কিন্তু বাতরক্তের পর্যায়ে পড়ে, এ দাগগুলি আঘাত লেগে রক্ত জমে যাওয়ার মত দাগ। এ রোগ একবার দেহে বাসা বাঁধলে, তাকে সরানো দঃসাধ্য বলা যেতে পারে, তবে পুরোনো কাঠে উইএর বাসা যেমন ভগ্না কঠিন হয়, এই রোগ সারাটিও প্রায় সেই পর্যায়েই পড়ে বলা যেতে পারে।

## মোটামুটি কিসে ভাল থাকা যায়

যদি রোগ যব সিদ্ধ করে তার মণ্ডটা খাওয়া যায় অথবা বালি রান্না করে খেলেও চলবে, আর মহিষের দুধ, এইসব রোগীর বেশী উপকারী, এ ভিন্ন যতটা সম্ভব পুরোনো চালের ভাত খাওয়া যায় ততই ভাল, আর ডাল হিসেবে বন মগ (মোট ডাল) আর অড়হর এ দুটি ভিন্ন কোন ডালই এই রোগীর ভাল নয়। তরকারি ও শাকের মধ্যে বেতো, পুই, সুন্দানি, নটে ও শালিগ্ধে শাক, গাঁদাল পাতা, উচ্ছে, চাল কুমড়া, কাঁচ বেগুন, পটোল, পলতা, কাঁচা পেঁপে, খোড় আর ঘি হিসেবে গাওয়াটাই ভাল।

মাংসের মধ্যে—তিত্তির পাখী, ছোট মুরগী, ছোট পায়রা খাওয়া ভাল।

এই রোগে কোন প্রকার মাছই ভাল নয়। আর খাওয়া যায়, মিষ্টি আঙ্গুর, কিসমিস, বাটা চিনি। তেল হিসেবে—তিল ও বাদাম তেল গায়ে মাখা ভাল, সাদা বা রক্তচন্দন ঘষে গায়ে মাখলেও ভাল অথবা গায়ে মেখে বেশ খানিকক্ষণ বাদে স্নান করলেও উপকার হয়। তবে বিস্তবান হ'লে চন্দনের তেল (Sandal wood oil) গায়ে মাখতে পারেন।

## কি ভাবে চলতে হবে

দিনে ঘুমুনো বন্ধ করা দরকার, আগুনের কাছে যাওয়া বা রৌদ্র লাগানো চলবে না; মাষকলাই ভাজা, কুলথ কলাই, মটর, খেসারির ডাল খাওয়া ভাল নয়। তবে একটা কথা জানাই—অলবণ খাওয়ার অভ্যাস করলে অনেক ক্ষেত্রে এ রোগের হাত থেকে হাণ পেলেও পেতে পারা যায় আর ঔষধ হিসেবে তিস্তক ঘি, তিস্তক দ্রব্য আহ্বার করা এ রোগে বিশেষ বিধান।

## আমবাত

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে আমবাত মানে গায়ে চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠা ও চুলকানো থাকবে কিন্তু আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে আমবাত পৃথক রোগ; এ রোগের আক্রমণ যে কোন দেহে, যে কোন ঋতুতে, যে কোন বয়সে যে কোন দেশেই

ঘটে, কারণ অপক্ক আহাৰ্য রস, বায়ুর দ্বারা আমাশয় (Stomach) ও দেহের সন্ধিস্থলে উপনীত হ'য়ে সেই বায়ুর দ্বারাই দ্রুত দূষিত হ'য়ে দেহের সমস্ত স্রোতকে ক্লেদযুক্ত ক'রে দেয়, তাতে সমস্ত শরীরটা ভারী হয়, প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখা দেয়। হেন ব্যাধি নেই যে আমবাতে রোগ থেকে আসতে পারে না। এ রোগটি সাধারণভাবে প্রকাশ পায় ও বিশেষভাবেও প্রকাশ পায়। এ রোগের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা উপবাস, তিত্তো (তিস্ত) জিনিস খাওয়া, যাতে অগ্নিবল বাড়ে এমন জিনিস খাওয়া, যে জিনিসে শরীরের রস টেনে নেয় এবং এমন জিনিস দিয়ে সেক, যেমন বালির পুটিলির সেক। এ ক্ষেত্রে কোন স্নেহ দ্রব্যের মালিশ, যেমন তেল লাগিয়ে মালিশ, ক্ষতিকর হয়; এমন কি কোন প্রকার ম্যাসেজ করানোও উচিত নয়।

### পথ্য কি

রসুন, শূঠ (শুষ্ক আদা), এরণ্ড তেল (ক্যান্টর অয়েল), ভাজা কুলখ কলাইএর ডাল, এই ডাল ভিন্ন আর কোন প্রকার ডালই ডাল নয়। আর সব সময়ে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করাই উচিত, এ রোগে কোন প্রকার মাছ মাংসই ডাল নয় তবে বলাধানের জন্য পাখীর মাংসের যুষ্ণ ডাল, অবশ্য ছোট মুরগী চলতে পারে। মোট কথা যাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে এমন কোন জিনিসই ব্যবহার করা ডাল নয়। তরকারির মধ্যে—পটোল, শালিগে শাক, করলা, উচ্ছে, বেগুন, সজনে শাক, সজনে ডাঁটা, আর মশলার মধ্যে আদা বাটা ও অল্প যোয়ান বাটা, এ ভিন্ন জলখাবারের ব্যবস্থা হ'লো চিড়ে ভাজা, থৈ, মর্দি, চাল ভাজা, এই রকম শুকনো জিনিস।

### অপথ্য ও কুপথ্য

দই, মাছ, গুড়, পুই শাক, যে কোন প্রকার ডালের খাবার অথবা ডাল, (কুলখ ছাড়া) এদিকে আখের রস, চিনি, গুড় অর্থাৎ এক কথায় মিষ্টি জিনিসই বর্জন করতে হবে। আর যে কোন রকম গুরুপাক দ্রব্যও, সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য, আর অসময়ে খাওয়া—এ সবই কুপথ্য।

### শূল রোগ

এ যেন শিবের ত্রিশূল—এর কালাকাল নেই, বয়স নেই, কারণের হৃদিস বোঝা যায় না, রোগী তো দিশেহারা, আর চিকিৎসক সেই সঙ্গে ব্যতিব্যস্ত; এ রোগের নিয়মের বাঁধাধরা ছক দেওয়া মূর্খিকল, খেলে বাড়ে কোন শূল, আবার কোন ক্ষেত্রে খেলে কমে, কারুর বর্ষাকালে বাড়ে, কারুর আবার এই সময়ে কমে যায়, কারুর রাতে বাড়ে কারুর দিনে বাড়ে, কিন্তু রাতে কমে। এই রকমই শূল রোগের ধারা, আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, এখন খাদ্যপ্রাণ বেশী গ্রহণ করছি বলে আমরা কলা বেরুনো ছোলা, মটর ভিজানো খাই কিন্তু আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মাধব নিদানেই তো বলা আছে যে এটাতে শূল রোগ হয়; কিন্তু এ কথা আজ যদি বলি আমি উন্মাদের পর্যায়ে পড়ে যাবো না তো? তবুও কথাটা কানে তুলে দিলাম।

তবে সব রকম শূল রোগে সর্বাত্মে তেল মালিশ, এমন ধরণের জিনিস খাওয়া উচিত যোগদলি শরীরের রক্ষতা আনে না অথচ অগ্নিবলকে স্থির রাখে। আর

রোগোপশমের প্রধান সরণী দান্ত পরিষ্কার রাখা। এত হিসেব করে সাধারণের চলা সম্ভব হবে না ব'লে একটা সাধারণভাবে পথ্য ব্যবস্থা লেখা হ'লো, যবের পালো, গরম দুধে বালি মিশিয়ে খাওয়া, যবের আটার রুটি, তরকারির মধ্যে পটোল, সজনের ডাঁটা, কচি বেগুন; ভাল জাতের কোন কোন পাকা আম, কিসমিস, আঙ্গুর, কয়েংবেলা (তবে মিষ্টি ও পাকা হওয়া চাই), সৈন্দ্ব ও সচল লবণ, হিং, আদা, ঘোয়ান, লবঙ্গ, গরম জল, পাকা জামীরের রস, বুনো মুরগীর মাংস, বেতো শাক, ক্ষুদ্রে নটে শাক, শালিঙে শাক, লঘুপাক খাদ্য, খইএর মন্ড বেশ উপকারী।

### অপথ্য ও কুপথ্য

তিল, সরষে, পোস্ত, খনে বাটা মিশানো তরকারি এবং যে কোন ডাল বা ডালের তৈরী খাবার, নতুন চালের ভাত, ঠান্ডা খাবার, চা কফি, ফুলকাপি বাঁধাকাপি, সংস্বেদজ্জ শাক যাকে আমরা চলতি কথায় ব্যাঙের ছাতা বলি, শিম, লাল কুমড়া, বরবাটি, করলা, উচ্ছে, চিচিঙে, কলা বেরুনো যে কোন রকম কলাই; তা ছাড়া এ রোগে অলবণ খাওয়ার অভ্যাস করতে পারলে ভাল হয়।

### উদার্ত ও আনাহ

এ রোগে ভরা পেটই হোক আর খালি পেটই হোক ঢেকুর উঠবেই, এমন কি যে কোন জায়গায় একটু টিপে দিলেও ঢেকুর ওঠে অথচ বদ হজমের কোন লক্ষণ নেই, এতে পিপাসাও থাকে আবার হাঁচিও হয়, আবার বমি বমি ভাব। অল্পতে বমিদুনি এমন কি ঘুম এসে পড়বে, অল্প পরিশ্রমে হাঁসফাসানি। এ লক্ষণগুলি দেখে মনে হয় না যে এটা দূঃসাধ্য ব্যাধি, কিন্তু এটা একটা রোগ। এর সঙ্গে আর একটি এসে জোটে, নাম তার আনাহ। দুটি রোগ পৃথক হ'য়েও একত্র থাকে, পার্থক্য আনাহে পেটে বায়ু থাকবে আর উদার্তে খালি পেট, এ দুই-এর পরিণাম মূত্রকৃচ্ছ্র; মূত্রাতিসার ও অশ্মরী।

### পথ্য ব্যবস্থা

প্রয়োজন হ'লে তীক্ষ্ণ অথবা মৃদু বিরেচন নিতে হয়। নিত্য একটু করে মাংসের যব খাওয়ার অভ্যাস করতে হয়, মাংস নয়।

তরকারি হিসেবে—কচি মুলো ও বেগুন, নটে ও বেতো শাক, কাঁচা পেঁপে, আলু (অল্প), পটোল খাওয়া যায়।

জলখাবার হিসেবে—কিসমিস, তবে এটা লবণ জলে ভিজিয়ে খেলে ভাল হয়। আর ফলের দিকে শর্কি আলু, পানিফল। তিল তেলের রান্না, লবঙ্গ বাটা, ভাজা হিং, তেজপাতা, যারা মৃতসঞ্জীবনী সূরা সহ্য করতে পারেন তাঁরা দু'বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু একটু খেতে পারেন। এদের ক্ষেত্রে পাতলা দুধই ভাল।

### অপথ্য ও কুপথ্য

আলু, জাতীয় কোন দ্রব্য, এবং কোন প্রকার ডাল এ রোগে ভাল নয়,—আর

ভাল নয় নাল্তে পাতা, তিল, পোস্ত এবং সরষে বাটা, সরষের তেল, কোন রকম পিঠে (পিষ্টক) খাওয়া চলে না। কোন প্রকার ভাজাভুজি এমন কি পাঁউরুটি বিস্কুট পর্যন্তও অপথ্য; এ দিকে মহিষের দুধ এবং দই, পাতলা বা জমাটি ছানা, জাম, কাঁচা আম, নিমের শক্ত, শিম; আর কোন প্রকার গুরুপাক খাদ্য, এ রোগের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হ'লো উপবাস।

### গুল্ম

সাধারণের ধারণা গুল্ম রোগটি বৃদ্ধি কেবলমাত্র নারীজাতিরই হয়, তা নয়, এ রোগ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হ'য়ে থাকে, এ রোগ নারীজাতির হ'লে হবে মাসিক ঋতু বন্ধ আর গর্ভের অন্যান্য লক্ষণ, বাকী অরুচি, মলমূত্রের কষ্টকর প্রবর্তন, পেটে বায়ু, মাঝে মাঝে পেটে গড় গড় শব্দ আর হবে ঢেকুর। এ রোগে অধো বায়ু নিঃসরণ হয়ই না। আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হ'লো গর্ভ কিনা নিঃসন্দেহ না হ'লে নারীদের ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ। তাই তাঁরা বিধান দিয়েছেন দশ মাস অতিক্রম ক'রে চিকিৎসা আরম্ভ করতে; আর পুরুষের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন এ রোগ হ'য়ে থাকলে শস্ত্র চিকিৎসার আওতায় আসে এবং নারীর ক্ষেত্রেও তাই।

### পথ্য

মোট কথা আহার ও ঔষধ এমন ধরণের হবে, যেটার দাস্ত পরিষ্কার থাকে, মাঝে মাঝে উপবাস এটাও উপকারী, কুলখ কলাইএর যুষ, ছাগলের দুধ, পাকা জামীর লেবুর রস, ফলসা ফল, থৈকলের চাটনি, কচি মুলো, শালিগে ও বেতো শাক, সজনে শাকও খাওয়া যায় তবে ওকে সিদ্ধ ক'রে জল ফেলে তারপর তাকে রান্না করা। আর এদিকে ফলের মধ্যে দাড়িম, কিসমিস আর আমলকীর মোরশ্বা। এ রোগে রসোন উপকারী। হাঁ, বিশেষ কথা, এই সব তরকারি এরন্ড তেলে (Castor oil) পাক ক'রে খাওয়ার কথা বলা আছে। তবে রিফাইন্ড ক্যান্টার অয়েল হলে আর কোন গন্ধ লাগে না।

### অপথ্য ও কুপথ্য

এমন কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয় যাতে বায়ু বাড়ে, তা ছাড়া বিরুদ্ধ ভোজন, কোন প্রকার মাছ ও মাংস, মিষ্টি রসের ফল, এবং মৃগ মসুর ও ছোলার ডাল, কোন প্রকার গুরুপাক জিনিস ও বার বার জল খাওয়াটাও অপথ্য। এ রোগে বমন প্রবৃত্তিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিতে হয়, অথবা যাতে বমন হ'তে পারে এমন কোন জিনিস ব্যবহার করা উচিত নয়।

### হৃদ্রোগ

বঙ্গদেশ বললে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি বহু ভূখণ্ড পড়ে যায়, আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় হৃদয়ও তেমনি, এর অন্তর্গত বক্ষস্থল, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও উরশ্চদ (প্লুরা) প্রভৃতি যত ক্রিয়াশালী যন্ত্র আছে সবক'ই ধরা হয়। এটি একটি সংজ্ঞা-



মাত্র, আর বর্তমান মতে হৃদযন্ত্রটাকেই (heart) কেবল হৃদয় বলা হয়। সেই প্রাচীন মতে এখানে শ্লেষ্মণধাতু বিকারগ্রস্ত হ'লে কফের আধিক্য আসে এবং বায়ুকে অনুবন্ধি করে বাত শ্লেষ্মাবিকারজনিত যাবতীয় রোগ সৃষ্টি করে, মোট কথা কফের সংশ্রব থাকবেই। অতএব হৃদরোগ বলতে গেলে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় মূলতঃ কফের অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে ওখানের চিকিৎসা করলে চলবে না।

হৃদযন্ত্রের রোগ হ'লে বমন করানো নিষিদ্ধ সত্যি, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষেত্রে কফের প্রাধান্যে কোন রোগ হ'লে সেখানে বমন করানো বিধি।

### পথ্য

উপবাস করা; ডুস নেওয়া এ রোগের অন্যতম পথ্য, পুরাতন ধানের চালের ভাত, ছোট বন্য পাখীর মাংস, মূগের ডালের যুষ, চালুতার অম্বল, পটোল, কাঁচ কাঁচা কলা, কাঁচ মুলো, পুরোনো চালকুমড়োর তরকারি, পাকা আম, ও কিসমিস, ঘোল, যোয়ান, আদা, রসোন, অল্প ধনে বাটা, গোল মরিচ; মাঝে মাঝে পান খাওয়া, উৎকৃষ্ট মদ্যও ঔষধের মাত্রায় খাওয়াটা খারাপ নয়।

### অপথ্য ও কুপথ্য

এই হৃদযন্ত্রের রোগে (heart disease) এমন কোন খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, যাতে অরুচি, তৃষ্ণা বা বমির বেগ আসে। মূত্ররোগ বা অধোবায়ুর সৃষ্টি হয় এমন দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়, এ রোগে উষ্ণবীৰ্য জিনিস, যেমন চিচিংগে, বরবাটি, ছোলা ও অড়হরের ডাল, শিম, তরমুজ প্রভৃতি জিনিস খাওয়া উচিত নয়, আর বর্জন করতে হবে গুরুপাক দ্রব্য, পাতা শাক, উৎকট ঝাল, আর লবণ সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হতে হয়। যারা হৃদরোগগ্রস্ত তাঁরা লবণ বর্জন না করলে পক্ষাঘাতে পণ্ড হওয়াটা অসম্ভব নয়।

### মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ

এটি তিনটি স্থানকে আশ্রয় করে হ'য়ে থাকে; (১) মূত্রাশয় অর্থাৎ কিডনিতে, (২) বস্তিদেশে অর্থাৎ মূত্রথলিতে আর মূত্রম্বারে অর্থাৎ প্রোস্টেট্ গ্লাম্ন্ড্ যেখানে অধিষ্ঠিত; এ রোগ আসার হেতু সাধারণভাবে—যারা তীক্ষ্ণবীৰ্য দ্রব্য আহার করেন, যেমন পাকা মাছ, পায়রার মাংস; তরকারির মধ্যে ওল, মানকচ, মুলো এইসব জিনিস, আর ভাল জীর্ণ হয়নি সে অবস্থার আবার খাওয়া, যাকে বলা হয় অজীর্ণে ভোজন, মাংস গুরুপাক করে রান্না করে খাওয়া, এইসব কারণে এ রোগ আসে, আবার অনেক ক্ষেত্রে গণোরিয়ার পরিণতিতেও এ রোগ আসতে পারে।

### পথ্য কি

আমলকীর মোরস্বা, গুলশের রস, শ্বেত পুন্দর্ণবা শাক, গমের তৈরী খাবার, ছোট এলাচ, ছাগলের দুধ, কিসমিস, পুরাতন ধানের চালের ভাত, টাটকা ঘোল, টাটকা দই, কাল কলাইয়ের যুষ, পুরোনো চালকুমড়োর তরকারি, পটোল, বন আদা, ডাবের শাঁস, খেজুর, তাল আঁটির শাঁস, খেজুর রস এবং তালের তাড়িও-অসম্প্রমাণ ভাল।

## অপথ্য কি

এঁদের ব্যায়াম থেকে বিরত থাকা ভাল, বেশী পথ হাঁটা, কাঠের আসনে বসা, যানবাহনে বেশী দূর ভ্রমণ করা। আহারের ক্ষেত্রে মাটির নিচের তরকারি, পাকা এবং তৈলাক্ত মাছ, আর অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া।

এই মৃতকৃচ্ছ্র রোগের পথ্য ও অপথ্য যেটা বলা হ'লো এটাকে মেনে চলতে হয় অশ্মরী (পাথুরী) ও সর্বপ্রকার মেহরোগ ও প্রমেহ (পুষ্কৃত) রোগ আর সোম রোগের ক্ষেত্রে।

## মেদোরোগ

ভূরি ভোজন করা, দিবা নিদ্রা, কায়িক পরিশ্রমে বিমুগ্ধ, এই তিনটি মূলীভূত কারণ হ'লেও শারীরিক ক্রিয়ায় রসবহ ও রক্তবহ স্রোতের মধ্যে সাবলীল গতিটা বাধা পেতে থাকে, এটাও যত না ক্ষতি করে, তার থেকে আরও নিমিত্তের কারণ হয়ে থাকে এই মেদোগত অগ্নির স্বল্পতা; যাকে বলা যায় মেদের মেটাবলিজম্ হ্রাস হওয়া।

এর প্রতিকারের উপায়—ঔষধ না খেয়ে ক্রিয়াকরণের দ্বারা কমাতে হ'লে মাঝে মাঝে উপবাস, রাত্রি জাগা, প্রত্যহ খানিকটা ক'রে হাঁটা, গায়ে রৌদ্র লাগানো, আর এদিকে মাঝে মাঝে জোলাপ নেওয়া, প্রত্যহ সকালে ১ গ্লাস ঠান্ডা জলে ২ চামচ খাঁটি মধু মিশিয়ে খাওয়া; আহাৰ্য হিসেবে ঘৃত বর্জিত দ্রব্য খাওয়া, চালের বিচার ক'রে খেতে গেলে—কোদো, শ্যামা ও কাঙ্গনী ধানের চালের ভাত (বর্তমানে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ) ভাজা কুলখ কলাইয়ের ও অড়হরের ডাল, যে কোন প্রকার তিস্ত দ্রব্য (এক রকম) প্রত্যহ কোন কোন ভাবে খাওয়া ভাল। বেগুন পোড়াও মন্দ নয়, চিংড়ি মাছ খাওয়া যাবে, তবে এটাতে যদিও এলাজি হয় তা হ'লে চলবে না, এ ভিন্ন সরষের তেল, পত্র (পাতা) শাক, মুলো, ওল, মানকচু খাওয়া যেতে পারে, এগুনি কিন্তু রোগোপশামক হিসেবে লেখা হ'লো।

## অপথ্য কি

গমজাত খাদ্য, (তবে ঘৃত বর্জিত কড়া সেকা রুটি খাওয়া যেতে পারে)। আর অপথ্য হ'লো ছানা, কড়াইএর ডাল, ঘিয়ের খাবার, মাছ, মাংস, দিবা নিদ্রা, মিষ্টি খাবার, মিষ্টি রসের ফল, খাওয়ার পর বেশী জল পান করা, উষা পান, কোন রকম পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া, খইএর মোয়া, এগুনি খাওয়া উচিত নয় অর্থাৎ মেদস্বী হ'লে এগুনি বর্জন করে চলতে হবে।

## উদর রোগ, প্লীহা-যকৃৎ রোগ ও শোথ রোগ

এই রোগগুলি প্রায় জন্ম নেয় অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ থেকে, কারণ এ সব রোগ যেমন স্বেদবহ স্রোত ও অস্বেদবহ স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে সৃষ্টি করে তেমনি প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও জাঠর অগ্নি দূষিত হ'য়েও এ সব রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে। তার দ্বারা আসে দৌর্বল্য, চলৎশক্তির হ্রাস ও অগ্নিমান্দ্য।

## এ সব রোগের পথ্য

মাঝে মাঝে উপবাস, পুরানো গোটা কুলাইএর যুষ, মুরগের যুষ (গোটা মুরগ), যবের পালো, যবের ছাতু, আদা, শালিগ্ধে শাক, ছোট ছোট বন্য পাখীর মাংস, পলতা, পুনর্গবা, সজনের ডাঁটা, রসুন, ছাগল দুধ (পাতলা করে), করলা উচ্ছে এবং তিক্ত স্বাদের খাবার, বড় এলাচ, ভাজা জীরের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে টাটকা ঘোল, কাঁচা পেঁপের তরকারি, লবণটা বর্জন করতে পারলে ভাল।

## অপথ্য কি

উপরি উক্ত রোগগুলিতে ঘিয়ের খাবার ও নোনতা খাবার খাওয়া, বেশী জল পান করা, দিবা নিদ্রা, জলার মাংস (কচ্ছপ, শামুক প্রভৃতি), পত্র শাক, শিম, অড়হর বা ছোলার ডাল, এবং ডালজাত গুরুদ্রব্যাদি, ধূমপানের অভ্যাস আর লবণ খাওয়া, ও বিনা জলে মদ্য পান করা।

এই রোগগুলির মধ্যে শোথের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ পথ্যাপথ্য সম্পর্কে বলি— পুরানো ধানের চালের ভাত, যবের ও কুলাইয়ের যুষ, বন্য ছোট পাখী, কচ্ছপ ও মুরগীর মাংস, শিগ্গী মাছ, অসুবিধে না হলে পুরানো ঘিয়ে রান্না করা তরকারি, টাটকা ঘোল আর এদিকে তরকারির মধ্যে কাঁচ শিম, গাজর, পটোল, বেতের ডগা, মুলো, সাদা বা লাল পুনর্গবা শাক, কাঁচ নিমপাতা, কুলেখাড়া শাক, লাল সজনে শাক ও ডাঁটা। এ রোগে মাঝে মাঝে উপবাস, রক্তমোক্ষণ, স্নেহ দেওয়া, কাঁচা-পাকা জলে স্নান করা বিশেষ পথ্য।

## শোথের ক্ষেত্রে বিশেষ নিষেধ

কোন রকম দূষিত বায়ু-বস্তু ঘরে থাকা, বাসি জল পান করা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করা, অনিয়মিত সময়ে খাওয়া, যখন তখন জল পান করা, দই, পিঠে, ভাজা জিনিস, শুকনো এবং বাসি মাংস খাওয়া, দিবা নিদ্রা ও যৌন সংসর্গ বিশেষভাবে বর্জন করা উচিত।

## বৃশ্চি রোগ (হাইড্রোসিস)

কুপিত বায়ু অধোগামী হ'য়ে যখন কুঁচকি থেকে অন্ডকোষে এসে ফলকোষবাহিনী ধমনীগুলিকে পীড়িত করে তখনই এ রোগের উৎপত্তি হয়।

এ রোগে বায়ুর প্রাধান্য থাকে, সেইজন্য এটি বাতব্যধিরই অন্তর্গত; যদি এই বাতব্যধিটি অন্ত্রগত হয়, তবে শল্যভ্রমের আশ্রয় নিতে হয়, অর্থাৎ শস্ত্রচিকিৎসার আওতায় এসে যায়। এই অন্ত্রগত বায়ু আর এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করে, সেটাকে আয়ুর্বেদে বলা হয় ব্রধ্মনরোগ, যাকে বর্তমানে বলা হয় হার্ণিয়া।

## এ রোগাক্রমণের পূর্বে ও পরে কি পথ্য

মাঝে মাঝে রক্তমোক্ষণ করানো ভাল, শোধিত এরণ্ড তেলের (ক্যান্ডার অয়েল) চিরঞ্জীব-২২

রান্না তরকারি খাওয়া, এরন্ড তেলের বস্তি (ডুস নেওয়া), পুরানো ধানের চালের ভাত, ছোট ছোট পাখীর মাংস, ঘোল, গরম জল, মধু, পুরানো ঘি খাওয়া।

তরকারির মধ্যে—সজনের ডাঁটা, পটোল, লাল বা সাদা পুনর্নবা শাক; বেগুন, গাজর, তা ছাড়া আমবাতে লেখা যে সব পথ্য।

### এ রোগে কুপথ্য

বিরুদ্ধ সংযোগের আহার, অস্বাস্থ্য খাদ্য (তা সে যতই উপকারী হোক না), দই, মাষকলাই, দুধ, পুইশাক, কোন রকম মাছ মাংস, গুরুপাক খাদ্য। এ ভিন্ন একটা বিশেষ হ'লো যদি কামোদ্বেগ হয়, তা হ'লে সেই বেগ এ রোগে দমন করাটা আরও কঠিন, সুতরাং সেইমত নিজেকে সাবধান হ'য়ে চলতে হয়।

### গলাগন্ড

এ রোগ গলাতে মালার মতও হয় আবার কণ্ঠনালীর উপরেও হয়। বায়ুই কফ এবং বিকৃত মেদকে উপাদান করে গলার পিছন দিকে মন্যা নামে যে দুটি শিরা আছে তাদিকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হ'লেও সামনের দিকে রূপ পরিগ্রহ করে। আয়ুর্বেদ মতে এটিও শোথ রোগের অন্তর্গত। অতএব শোথরোগের পথ্য এ রোগে উপকারী, তা ছাড়াও যব, মৃগ এবং পটোল প্রধান আহাৰ্য দ্রব্য হওয়া ভাল; এবং রসুন খাওয়াও ভাল। বিশেষ উপকার হচ্ছে মাঝে মাঝে বমি করানো, পুরানো ঘিএ রান্না করে খাওয়া, পুরানো ধানের চালের ভাত, সজনের ডাঁটা, করলা, শালিগে শাক, বেতোয় ডগা, এবং নিতাই অল্প করে মাংসের ঘৃষ, তার সঙ্গে অল্প আদা বাটা দেওয়া যায়।

### অপথ্য কি

দুধ বা দুধের জিনিস যত, আখের রস, পিঠে পায়ের, মিষ্টি, গুরুপাক খাদ্য, সংযোগ বিরুদ্ধ খাদ্য।

### শলীপদ বা গোদ রোগ

বিকৃত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মেদ এ রোগের হেতু। এই রোগের পূর্বরূপে দেখা দেয়—নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ কাঁপুনি, আবার কোন কোন সময় অল্প জ্বরও তার সঙ্গে, এটা প্রধানভাবে হ'য়ে থাকে একাদশী থেকে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা মध्ये, তারপর অনেকের কুঁচকি বা বগলের গ্রন্থিগুলি (গ্ল্যান্ড) ব্যথা হয়। তার সঙ্গে অল্প ফুলো থাকে, এ ফুলো আর কমে না, পুনরায় জ্বর হ'লে ওটা আরও একটু বেড়ে যায়, এইভাবেই তার বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ এই রোগ আশ্রয় করে কানের ও চোখের পাতায়, হাতে বা পায়ে, নাকের ডগায় ও ঠোঁটে, কনুইয়ের পর্বের উপর দিকটায় এবং জননেন্দ্রিয়ে।

সংস্কৃত ভাষায় একে বলা হয় শলীপদ, অর্থাৎ শিলীভূত (পাথরের মত) পদ।

## পথ্য কি

এ রোগে উপবাস, বমন, রক্তমোক্ষণ, জ্বোলাপ নেওয়া, পুরানো ধানের চালের ভাত, যব, কুলখ কলাই, রসুন, পটোল, কচি বেগুন, সজনের ডাঁটা, করলা উচ্ছে, পুনর্গবা শাক, এরন্ড তৈল ও অন্যান্য তিক্তদ্রব্য; এ রোগে কচি মূলো বেশ উপকারী।

## অপথ্য ও কুপথ্য কি

কোন প্রকার পিঠে (পিষ্টক), দ্রব্ধজাত দ্রব্য যেমন ছানা কীর প্রভৃতি, গুড়, মাংস, মিষ্টি খাবার, নদীর জল (পানের উপযুক্ত হলেও নয়), গুরুপাক খাদ্য, পিচ্ছিল খাদ্য, শ্লেষ্মাকর দ্রব্য, আতা, চালতা, আমড়া এগুলিকে বর্জন করে চলতে পারলে ভাল হয়।

## ভগন্দর

এটি স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই হয়, মলম্বার থেকে এক ইঞ্চি ব্যাসের মধ্যে। কেবল স্ত্রী জাতির ক্ষেত্রে আর একটি রোগ হয়ে থাকে তাকে বলে 'ঘোনিকন্দ', সেটা হয় ঘোনি ও মলম্বারের মাঝখানে, এটিও ঐ ভগন্দর জাতীয় রোগ।

## এ রোগে পথ্য কি

উপবাস, রক্তমোক্ষণ একান্ত প্রয়োজন, তা ছাড়া পুরানো ধানের চালের ভাত, গোটা মৃগের যব, যব ও মৃগ এক সঙ্গে সিদ্ধ করে তার যব, ছোট পাখীর মাংস, পটোল, সজনের ডাঁটা, বেতের ডগা, কচি মূলো, তিলু তেলের রান্না আর তিতো (তিক্ত) তরকারি রান্না খাওয়া।

## অপথ্য এবং কুপথ্য

সংযোগ বিরুদ্ধ খাদ্য, রোদ্র লাগানো, অসময়ে খাওয়া, যানবাহনে চড়া, কাঠের আসনে এবং শক্ত জায়গায় অথবা উবু হয়ে বসা, কৌথ দিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। আর একটা বিষয়ে বলা দরকার যে যতদূর সম্ভব ঘোনি সংসর্গ বর্জন করা।

## কুষ্ঠরোগ

নামটা শুনলেই লোকে আঁতকে ওঠে, কিন্তু যদি আরুর্বেদ পরিভাষা দেখা যায়, আঁতকে ওঠার কোন কারণ নেই। অর্থাৎ কুণ্ঠিতভাবে যে বসে থাকে সেইই কুষ্ঠ, ঘামাচি, চলকণা, ছুলি এরাও তো কুষ্ঠ; কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এই দোষ কুণ্ঠিত, কোথাও দৃষিত আবার কোথাও সে আত্মপ্রকাশ করে; কিন্তু এই একটি রোগ যে রোগে এই তিনটি উপসর্গের দ্বারা সে আত্মপ্রকাশ করে। কোন জায়গায় সে রসখাত্তকে দৃষিত করে কয়েকপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সে রক্তখাত্তকে দৃষিত করে সৃষ্টি করে, আবার মাংস ও অস্থিকেও সে

বাদ দেয় না, তবে দেখা যায় তার অভিব্যক্তি চর্মকে কেন্দ্র করে; তাই আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় চর্মরোগ মাত্রই সে কুষ্ঠের পর্যায়ভুক্ত—এই দৃষ্টি নিয়েই কুষ্ঠরোগ নামটি দেওয়া। এই রোগটির সাধারণ সংখ্যা করা হয়েছে সাত প্রকার, আর বিশেষ সংখ্যা করা হয়েছে আঠারো প্রকার। এই রোগে বিশেষ বিশেষ দোষের প্রাধান্য দেখে বাতপ্রধান ঘৃতপানকে প্রশস্ত করা হয়, আর পিত্তপ্রধানে বিরচনকে এবং শ্বেত্ম-প্রধানে বমনকে, তা ছাড়া পিত্তপ্রধানে রক্তমোক্ষণ এক প্রশস্ত ক্রিয়া, প্রলেপ দেওয়াটাও অন্যতম একটা উপায়। তবে শেষোক্ত পদ্ধতিটি স্বকৃৎ কুষ্ঠে বেশী উপকারী, যেমন দাদ, কণ্ডু, সিধা (ছুলি), কিটিম (একজিমা) বিচারিকা (চাপড়া ঘামাচি), কচ্ছ (খোস), শ্বিত্র (শ্বেতি) প্রভৃতি।

### পথ্য কি

এ সব রোগে আক্রান্ত হ'লে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক হিসেবে পুরানো ধানের চালের ভাত, গমের ডালিয়া, অড়হর এবং মসুর ডালের যুষ; টাটকা মধু, ছোট ছোট পাখীর মাংস, বেতের ডগা, পটোল, কাকমাচি শাক, কাঁচ নিমপাতা, হিঙ্গে ও পুনর্গবা শাক, চাকুলের পাতা ও ফুলকে শাকের মত রান্না করে খাওয়া রসুন, পাকা তাল, পুরানো ঘি, এ ভিন্ন তিস্তরসের শাকপাতা। চর্মরোগের ক্ষেত্রে রান্নার জন্যে তিল তেলটাই প্রশস্ত।

### অপথ্য ও কুপথ্য

বিরুদ্ধ ভোজন, দিবা নিদ্রা, রৌদ্র লাগানো, কোন প্রকার ভাপ লাগানো, স্ত্রী-পুরুষে এক শয্যায় অবস্থান, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, এ ছাড়া আখের রস, চিনি, টক ফল, টক রসের দ্রব্য, মাষকলাই, খেসারির ডাল, পথ্যে লিখিত কাকমাচি শাক ছাড়া অন্য কোন শাক; মূলো, ডিম, যে কোন প্রকারের মাছ ও মাংস, নদীর জল, দই, দধি, গুড় বা গুড়ের পাককরা জিনিস; এ রোগে মদ্যপান সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর।

শীতপিত্ত, উদর (ইরিসিসপ্লাস), কোঠ (মন্ডল কুষ্ঠ) কুষ্ঠের পথ্য, অপথ্য ও কুপথ্যগুলিকে মেনে চলতে হয়।

### অঙ্গাপিত্ত রোগ

একটি প্রচলিত কথা আছে যে—‘ছুঁচ হ'য়ে ঢোকে ফাল হ'য়ে বেরোয়’; এই একটি রোগ যেটা এই উপমারই উপযুক্ত স্থল। দেহ রাখতে গেলে আহার করতেই হবে সত্যি, কিন্তু বৃদ্ধি-বিরেচনা করে খাওয়ার হিসেব সবাই করে না। পেটে ক্ষিধে থাকলে খাওয়ার আবার হিসেব কি, কিন্তু তা নয়; এত বেছে গুঁছে খাওয়া মানেই রোগ ডেকে আনা এ ধারণা ঠাঁই হবে, তাঁর কিন্তু গর্তে পড়ে যেতে হবে। এই ধরুন ঘাস পাতা জ্বাললেও আগুন হয়, আবার কাঠ খড়েও আগুন হয়, সেই রকম যুঁটেতেও আগুন হয়, তারপর গ্যাস, কয়লা, বিদ্যুৎ, দাবাণি, বাড়বাণি সবতেই তো আগুনের উন্মা আছে, কিন্তু সব আগুনেরই পরিপাক শক্তি কি এক? তা তো নয়—পাতার আগুনে কি মানুষ পোড়ে, আবার কাঠের আগুনে কি লোহা গলে? দেহের অগ্নিবলেও সেইরকম কেউ লোহা খেয়ে হজম ক'রছে, কেউ আবার

সাগর খেয়ে ঢেকুর তুলছে; অতএব দেহের আকৃতি প্রকৃতি যখন একরকম হয় না তখন অগ্নিবলও একরকম থাকে না। এর আর একটা কারণও থাকে, যেমন পচা ছানা আর দোলো চিনিতে ভাল সন্দেশ তৈরী হয় না,—সেই রকম রুদ্র মা-বাপের সন্তানও কি তাঁদের প্রকৃতি থেকে কিছু পাবে না? তবে মার কাছ থেকেই সে বেশী পায়, যেহেতু মার থেকে সে পেয়েছে রস, রক্ত ও মাংস; সুশ্রুত বলেছেন যকৃতের বল পায় মার কাছ থেকে আর হৃদয়ের বল পায় বাবার কাছ থেকে। আবার দেশ-ভেদে জলবায়ুর আহার্যের ভেদ হয়, সেজন্য তাদের প্রকৃতির পার্থক্যও ঘটে। আমরা দেখতে পাই এক এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস।

যে অম্লপিত্ত রোগটির সম্বন্ধে এখন আমার পথ্যাপথ্যের নির্বাচন, সেটির মূখ্য বস্তুর দ্বারা দিয়ে মাছ রান্না করে খাওয়ার অভ্যাস এবং তা জীর্ণ করার সামর্থ্য সাময়িকভাবে থাকলেও বস্তুশক্তি যখন বৃদ্ধিকে অপেক্ষা করে না, নিজের কাজ নিজেই করে, তেমন বিরুদ্ধ সংযোগের আহাৰ্য্যগুলি কিছুদিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেই করে, এমন কি ওষধিটও প্রয়োগের ক্ষেত্র উপযুক্ত না হলে সেটা প্রয়োগ করে আপাতদৃষ্টিতে রোগ সামলানো যায় বটে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সে করবেই। যার ফলে অম্লপিত্ত রোগের উদ্ভব হবে। অতএব নিজে মৌলিকরোগ না হয়েও অনেক রকম ঝঞ্জাট ঘটিয়ে দেয়, যেমন ব্লাড প্রেসার, জলোদর, শোথ, জটিল অগ্নিমান্দ্য, জাঁডুস, বাত, মূত্রে ক্ষত, অস্ত্রে ক্ষত, হৃৎশূল এমন কি ক্যান্সার পর্যন্ত—এ যেন নারদের ভূমিকা।

এ রোগের প্রথমাবস্থায় উদ্বর্তিত বায়ুর চাপ থাকলে অর্থাৎ গলা-বুক-জ্বালা, ঢেকুর এইসব উপসর্গ আরম্ভ হ'লে বমন করানো ভাল আর অধোগত হ'লে বিরচন দেওয়া ভাল, আর একসঙ্গে দুটি হ'লে আহাৰ্য্য কমাতে হবে।

### পথ্য হিসেবে

পুরানো ধানের চালের ভাত, যবের পালো, গোটা মূগের যুস, মশলাবিহীন রান্না-করা পাখীর মাংস, মধু মিশিয়ে যবের ছাতু খাওয়া। তরকারির দিকে—পটোল, কাঁকরোল, বেতো ও হিণ্ডে শাক, বেতের ডগা, পাকা চালকুমড়া, মোচা, কয়েংবেল (পাকা), দাড়িম, আমলকী, অল্প তিল রস, অল্প তিল তেলে রান্না তরকারি (বাঞ্জনাদি)।

### এদের ক্ষেত্রে কুপথ্য কি

নতুন ধানের চালের ভাত, বিরুদ্ধ সংযোগের খাবার, রুক্ষ শুষ্ক খাবার, মাষকলাই, কুলখকলাই, সরষের তেল, সরষে, লঙ্কা, ডিম, লবণ, মাছ, মাংস, গুরুপাক দ্রব্য, দই, মিছারির সরষে, লেবুর রস; মরিচের বাল, ঘোল, ছানা, ক্ষীর এদের কোনটাই ভাল নয়। তবে রোগের প্রকোপ কমে গেলে অল্পস্বল্প বিনা মশলায় মাছের কোল খাওয়া যায়, কিন্তু চর্বি যেন না থাকে।

### বিসর্প, অগ্নিবিসর্প, কদম্ববিসর্প, গ্রন্থিবিসর্প

এই রোগগুলির মূল প্রকৃতিটি প্রায় কুষ্ঠেরই মত, প্রভেদ হ'লো—কুষ্ঠে একসঙ্গে

রক্ত ও পিত্তের প্রাবল্য থাকে আর বিসর্পে রক্ত এবং পিত্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রবল বিকৃত হ'য়ে দেখা দেয়।

কুষ্ঠরোগে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) আর দুষ্ট অর্থাৎ রস, রক্ত মাংস প্রভৃতি ধাতুকে দূষিত করে দীর্ঘদিন অবস্থান করে।

আর বিসর্পে এই দোষ ও দুষ্ট অংশ দ্রুত প্রসর্গিত হয়, এবং দ্রুত ক্ষত সৃষ্টি করে প্রধানতঃ কোমল অঙ্গে, গ্রন্থিতে ও কোমলাস্থিতে। এইটাই বর্তমানের ক্যানসার রোগ, সে যে ধরণেরই হোক।

### এ ক্ষেত্রে করণীয় কি

তারা রক্ত পরীক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু কিভাবে করা হ'তো তার সূত্র আজ আর পাওয়া যায় না। আর করা হ'তো রক্ত মোক্ষণ। সামান্য লক্ষণ দেখা দিলে নিমছাল, পলতার কাথ করে খাইয়ে বমন করানোর ব্যবস্থা ছিল, এর দ্বারা আমাশাকে (স্টমাক্) শোধন করা হ'তো।

### পথ্য কি

পুষ্পের মৃণাল (মাটির নিচে দিয়ে যে ফে'কড়ি চলে, এটা মূল থেকে বেরোয়), মোচার তরকারি, গোটা মসুর, মটরের য্ৰ, তিত্ত রসপ্রধান খাদ্য আর ঘি দিয়ে সাতলানো তরকারি এবং কাংগনি ধানের চালের হালদ্রা (ঘি দিয়ে), পুরানো ধানের চালের ভাত, তাও ঘি দিয়ে, ছোলা ভিজানো জলে অল্প দুধ মিশিয়ে স্নান করা, গায়ে রক্তচন্দন মাখা আর বালা (pavonia odorata) বেটে গায়ে লাগানো।

এই পথ্যটি যে কোন চর্মরোগেই ব্যবহার করা উচিত।

### অপথ্য ও কুপথ্য কি

যে কোন রকম শাক, বিরুদ্ধ ভোজন, দই, ঘোল, কোন প্রকার আসব, অরিন্ট, মদ; এদিকে ছানা, রসোন, কুলখকলাই ও মাষকলাইএর য্ৰ, মাছ, মাংস; যে কোন টক জিনিস, ঝাল, তিল ও পোল্ট বাটার তরকারি, সরষে বা তিল তেলে রান্না তরকারি এগুলি ক্ষতিকর হয়।

এ ডিম রোদ্দ লাগানো, ব্যায়াম করা, দিনে ঘুমানো, বেশী হাওয়া খাওয়া উচিত নয়। এটা মনে রাখা দরকার, যে কোন চর্মরোগের পক্ষেই এগুলি ক্ষতিকর হয়।

### বসন্তরোগ

এই রোগ বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শরতে প্রায়ই হয় না, বসন্ত ঋতুতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বলেই তাকে উপলক্ষ্য করে এই নামকরণ। কিন্তু এর আয়ুর্বেদিক নাম মসুরিকা, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর স্ফোটকগুলি দেখতে গোটা মসুর কড়াইএর মত হয়। এই রোগের কারণ পিত্ত শ্লেষ্মার আধিক্য, এরা রস রক্তাদি সপ্তধাতুর যে কোনটিকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হ'তে পারে। যেমন রসধাতুকে আশ্রয় করে যে বসন্ত হয়, তাকে



আমরা বলি পানি বসন্ত, চিকেন্ পক্স্ (chicken pox); তারপর রক্ত-মাংস প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিণত ধাতুকে দূষিত ও আশ্রয় করে যে সব বসন্ত উদ্ভূত হয়, সেগুলিকে আমরা বলি small pox; সাধারণে একে বলে জাত বসন্ত। যত গভীরে এই রোগের সৃষ্টি হয় তাদের আকৃতি কিন্তু ছোট হ'তে দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক।

আর একটা কথা, বসন্তের রং দেখে চিকিৎসক জানতে পারেন এটা কোন ধাতুকে আশ্রয় করেছে, যেমন রক্তগত হ'লে লাল হয়, মাংসগত হ'লে আকৃতিতে মুখবিহীন লাল আমবাতের (শীতপিণ্ডের) মত হয়, এইভাবে তার বিচার করে নেওয়া হয়। তবে চিকিৎসক কখনও মনে করেন না যে চরগামত খাইয়ে ফেলে রাখলেই চলবে।

### এ রোগে পথ্য

উপবাস (রসগত পানিবসন্ত হ'লে), প্রয়োজন হ'লে বমন, পুরানো ধানের চালের ভাত, গোটা ছোলা, মৃদু ও মসুরীর যে কোনটির রুক্ষ খাওয়ানো যায়। সংস্কারে না বাধলে ছোট ছোট পাখীর মাংসের রুক্ষ খাওয়া যায়; আর তরকারির মধ্যে পটোল, করলা উচ্ছে, কঁকরোল, কাঁচা কলা, সজনের ডাটা, হিণ্ডেশাক, ফলের মধ্যে কেবল কিসমিস। এ ছাড়া নিসিন্দে বা নালতে পাতা সিদ্ধ করে সেই জলে স্নান। বসন্তের গুটিগুলি শুকিয়ে গেলে, কাঁচা হলুদ বাটা মেখে স্নান করা ভাল।

### অপথ ও কুপথ্য

রোগী স্ত্রী-পুরুষের এক শয্যায় শয়ন অনুচিত, মশারির মধ্যে রোগীকে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এ ভিন্ন তেল মাখা, গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া, দূষিত বায়ু লাগানো, জানালা বন্ধ করে থাকা অনুচিত। এ ভিন্ন শিম, আলু, কোন রকম শাক, লবণ, টক জিনিস খাওয়া ও মলমূত্রের বেগধারণ যেমন অনুচিত, তেমনি রৌদ্র লাগানো, কোন রকম সেক নেওয়াও উচিত নয়।

### ক্ষুদ্ররোগ

এমন কতকগুলি রোগ আমাদের দেহে সৃষ্টি হয়, যেগুলিকে বলা যায় ক্ষুদ্র-রোগ; অবশ্য রোগের যন্ত্রণায় তারা ক্ষুদ্র নয় কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেগুলির বেশীর ভাগ ক্ষেত্র খুব জটিল হয় না। টাক পড়া, নখকুনি, পা ফাটা, মাথায় খুস্কি, গায়ে পম্পকাঁটা, মেচেতা, তিল, এই সব ছোট রোগগুলিকেই ধরা হ'য়েছে; যদিও এ সব ক্ষেত্রে বায়ু, পিত্ত, কফের বিকার ধরে চিকিৎসা করা হয়, তবুও এ সব রোগের নির্ধারিত ভেষজের দ্বারা চিকিৎসা করলে যে সারে না তা নয়। তবে টাক ক্ষুদ্র-রোগ হ'লেও বহুতেরও বাড়া।

এখানে একটা কথা বলছি, এ সব রোগ কায়চিকিৎসার অন্তর্গত হলেও কয়েকটি ক্ষেত্র আছে, যেগুলি ধ্বংসাত্মক সম্প্রদায় অর্থাৎ সূত্রদ্বয়ের শল্য শালক্য চিকিৎসার আওতায় পড়ে, যেমন কার্বঙ্কল, (বল্মীক রোগ), ইন্দ্রবিম্বা (হারাপস্) অগ্নি-রোহিণী (ইরিসিস্টিয়াস) গলরোহিণী (ডিপার্থিরিয়া) প্রভৃতি চরকীয় ধারার চিকিৎসকদের মতে উপরি উক্ত রোগগুলি কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা দিতে বলেছেন।

## উর্ধ্বজরুগত রোগ

দেহের একটি অংশকে আরুর্বেদ বলেছেন “উর্ধ্বজরু”, যাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসক-গণ বলেন E. N. T.। তার মধ্যে আবার ভাগ আছে, যেমন মূখরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, তালুগত রোগ, কণ্ঠরোগ, গলরোগ, জিহ্বরোগ, দন্তবেষ্টরোগ এই রকম ১৯টি ক্ষেত্রে এই রোগের কথা বলা আছে; দেখা যাচ্ছে স্থানকে আশ্রয় করে, রোগের নামকরণ করা হয়েছে।

এখন মূখরোগের পথের কথা বলি—এ সব উর্ধ্বজরুগত রোগ, যেখানে হয় তার মূলভূত কারণ কিন্তু সেখানের নয়। কেবলমাত্র আগন্তুক ও নৈমিত্তিক কারণ ভিন্ন বাকী সবগুলিই জন্ম নেয় পাকাশয়ে, আমাশয়ে, ও অন্যাশয়ে; অতএব সে সব ক্ষেত্রে এ রোগ যে দোষে সৃষ্ট, সেইটার নিরসন করাই (এ সব রোগ নিমূল করার) উপায়। তবে স্থানিক ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন যে হবে না সে কথা বলছি না।

## মূখরোগের পথ

যব, মৃগ, ও কুলখকলারের যুষ্ বা ফোল, তরকারির মধ্যে পটোল, করলা উচ্ছে, কাঁচ মূলো এ ভিন্ন গরম জল সর্বদা ব্যবহার করা উচিত। আর ব্যবহার করতে পারা যায় বিনা চুণে সুপারি খয়ের দিয়ে পান খাওয়া। তবে খয়েরটি আসল হওয়া চাই।

## অপথ্য কি

অম্লরসের খাবার খাওয়া, মাছ, মাংস, ডিম, দই, সরষে, কড়াইএর ডাল, গুড় এগুলি খাওয়া উচিত নয়। আর বর্জন করতে হবে শক্ত কোন খাবার চিবিয়ে খাওয়া, কোন শক্ত জিনিস দিয়ে দাঁত মাজা, জিভ ছোলা, বার বার স্নান করা, উপড়ু হ'য়ে শোওয়া।

## কর্ণরোগ

কানে যত রকম রোগ হয় সবই এক দোষে অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত কফের দোষে তা নয়। এর সঙ্গে রক্তের দোষও এসে জোটে।

কর্ণ নাদ (কানে ভেঁ ভেঁ শব্দ হওয়া), কর্ণ শোথ (কান ফোলা), কর্ণক্ষত (যাকে চলতি কথায় কানচটা রোগ বলে), কর্ণ কণ্ডু (কান চুলকানো), কর্ণ গুণ্ড (কানে কম শোনা), কর্ণ প্রতিনাহ (কানে দম্ দম্ শব্দ হওয়া) কর্ণ পুতি (কান দিয়ে জল ঝরা বা পুঁজ পড়া), কর্ণপাক (কানের মধ্যে ক্ষত হওয়া; এটা শিশুদের হয়) কর্ণ অর্শ (কানের মূখের কাছে মটরের মত দানা হওয়া)। এই রোগগুলির জন্য অল্প বিরেচনের ব্যবস্থা ভাল। এবং কোন ঔষধ দিয়ে ভাপ দেওয়াও খারাপ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে নস্যও দেওয়া যায়, তা ছাড়া পুরানো ধানের চালের ভাত, মৃগের যুষ্, মূরগির মাংস, তরকারির মধ্যে পটোল, সজনের ভাঁটা, বেগুন, সুসুণী শাক, করলা উচ্ছেব তরকারি, মশলা হিসেবে আদা ও ধনে বাটা দিয়ে তরকারি, এগুলি ব্যবহার করা ভাল।

## অপথ্য ও কুপথ্য

বিরুদ্ধ অন্ন ও পান, মলমূত্রের বেগধারণ, বেশী কথা বলা, কড়া স্বাসে দাঁত মাজা, ডুব দিয়ে এবং মাথা ঝুলিয়ে স্নান করা, ব্যায়াম করা, গরুদুপাক দ্রব্য খাওয়া, কানে বার বার কিছ্ দিয়ে ঢুলকানো, আর ঠাণ্ডা লাগানো ক্ষতিকর।

## নাসারোগ

নাসিকার রোগের সংখ্যা যতই থাক, এ সব রোগের পরিণাম কিন্তু ঘাণশক্তির বিলোপ। কারণ নাসারোগের মূল কারণ থাকে শ্লেষ্মাপিত্ত বিকার, এ বিকারের পরিণতিতে মূত্রের কোন স্বাদ থাকে না।

এখন বলি, নাসিকার রোগের সংখ্যা তেরটি, অর্থাৎ নাসার স্ফন্দ স্ফন্দ স্রোতগুলি বায়ুর দ্বারা শোষিত এবং পিত্তের দ্বারা প্রতপ্ত হয়ে পলিপস (Polypus) ও নাসা-অর্শ হয়।

তা ছাড়া গলা ও তালুর স্রোতকে এমন কি শঙ্খস্রোত অর্থাৎ কপালের পাশের (যাকে আমরা রগ বলি) স্রোতকে রুদ্ধ করে, এমন কি বিনষ্ট হয়েও যায়, তারপর এই জন্য চক্ষুরোগ আসতে পারে এ রোগ সদৃশ হয় প্রতিশ্যায় থেকে, যাকে এখন সাধারণে বলে থাকেন। nasal allergy.

এ ক্ষেত্রে কর্তব্য যেখানে বায়ুর প্রবাহ কম সেখানে বাস করা; সেকালের বৈদ্যগণ পায়ের দিকটা গরম রাখা ও মাথায় উষ্ণীষ্ ধারণ অর্থাৎ টুপি পরা বা পাগাড়ি বাঁধার ব্যবস্থার কথা বলতেন। তাঁদের অভিমত হ'লো—এ দ্বারা ঋতু পরিবর্তনজনিত অগ্নিবলের যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এটি ব্যবহারে সেটি হয় না। মধ্যে মধ্যে উপবাস, নস্যগ্রহণ, বমন, স্নেহদ্রব্যের নস্য নেওয়া, মাথায় তেল মাখা, পুরাতন ধানের চালের ভাত, কুলখ-কলায় ও মূগের যুষ্, জগলা পাখীর মাংস; আর তরকারির মধ্যে বেগুন, পলতা, সজনের ডাঁটা, কাঁকরোল, কচি মুলো, রসুন খাওয়া ভাল; আর খাওয়া উচিত গরম জল, তবে তালের রসকে তাঁরা ব্যবহার করতে বলেছেন কিন্তু গের্ণিজয়ে নয়।

## সাধারণতঃ এ রোগে অপথ্য কি

বিরুদ্ধ ভোজন, দিবা নিদ্রা, শ্লেষ্মাকর দ্রব্য, তরল দ্রব্য এ রোগ বৃদ্ধি করে, তাই সে অপথ্য; আর একটা কথা—মাটিতে শোয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ, বার বার স্নান করা, দই খাওয়া এ রোগে অপথ্য বলেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## নেত্ররোগ

আমরা সকলেই জানি চক্ষুই হ'লো আমাদের প্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, কিন্তু এই ইন্দ্রিয় যাতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার প্রাতি সর্বদা সচেতন থাকা একান্ত কর্তব্য। এই ইন্দ্রিয়ে বহু কারণে রোগ আসলেও প্রধানভাবে কয়েকটি কারণ থাকে; অত্যধিক কোন আলো চোখে লাগানো, তাপ লাগানো, ধোঁয়া-ধুলো এগুলি থেকে সাবধান হওয়া দরকার। এ ভিন্ন রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা, বমি করার প্রবৃত্তি, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অত্যধিক শোকেরও বেগ সম্বরণ, মাথায় আঘাত, বেশী মদ খাওয়া, তা ছাড়া

ঋতুগুলির যথাযথ প্রকৃতি না থাকলে অর্থাৎ শীতে গ্রীষ্মের ও বর্ষায় অন্য ঋতুর প্রকাশ পেলো, চোখে অভিব্যক্তি ক্রমে দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে খুব সাবধানে থাকা উচিত, তা ছাড়া বেশী কষ্ট সহ্য করা, মস্তকে প্রচণ্ড ভার বয়ে নিয়ে যাওয়া, চোখ উঠলে তার প্রতি যথাযথ যত্ন না নেওয়া, বসন্ত রোগে চোখ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া, তা ছাড়া অত্যধিক রেতঃক্ষয়ে, বেশী দূরের জিনিসকে জোর করে দেখার চেষ্টা করা প্রভৃতি কারণে চক্ষুরোগ আসে; এ ক্ষেত্রে প্রাচীনদের উপদেশ—মাঝে মাঝে চোখে অঙ্গন দেওয়া ভাল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আপনারা অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন যে ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রভাবে যারা চলেন, তাঁরা চোখে সূর্য্য লাগিয়ে থাকেন, এ রীতিটি কিন্তু আমাদের প্রাচীন রীতি—অঙ্গন লাগানোরই একটি পদ্ধতি। চোখকে নিরাপদ রাখার জন্য দান্ত পরিষ্কার রাখা, মাঝে মাঝে রক্ত মোক্ষণ করা, পায়ের তলায়, নাভিতে ও নখের কোণে ভাল করে তেল লাগানো সব থেকে চোখ ভাল রাখে; যদি সরষের বা তিল তেলের কবল ধারণ করা যায় অর্থাৎ মুখে পুরে খানিকক্ষণ বসে থাকা যায়। এ ছাড়া খাদ্য হিসেবে মৃগের যুষ্, যবের পালো, জংলা মুরগীর মাংস, ঘিয়ের রান্না খাওয়া, রসুন, পটোল, বেগুন, কাঁকরোল, করলা, মোচা, কচি মুলো, পুনর্নবা ও শালিগে শাক, ঘৃতকুমারীর শাঁসের ডালনা, তা ছাড়া একটু তিস্তাস্বাদের তরকারি ও বাজন এবং লঘুপাক খাদ্য খাওয়াটা খুব উপকারী।

### অপথ্য ও কুপথ্য

এই চক্ষুরোগের পক্ষে ক্ষতিকর হলো—কোন কারণে চোখ দিয়ে জল পড়া, বমি আসা, রাত জাগা, দাঁতে দাঁত ঘষে কথা কওয়া, দাঁতে দাঁতে চেপে কিছু খাওয়া, মাথায় বেশী জল ঢালা, রৌদ্র লাগানো, তরল খাদ্য খাওয়া, ধূমপান করা, চোখে ভাপ দেওয়া, দই, ঘোল, তরমুজ, তিলবাটা, পোস্তবাটা, কলা বেরুনো কোন রকম কড়াই খাওয়া, পান খাওয়া, নতুন চালের ভাত, মদ, বেশী লবণ, কোন প্রকার গরম (উষ্ণবীর্য) জিনিস খাওয়াটাই কুপথ্যের মধ্যে পড়ে।

### শিরোরোগ

লোকে কথায় বলে মাথা থাকলেই মাথাব্যথা, কিন্তু সেই মাথাটা যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে গেলেই এর রোগ যাতে না হয়, তার ব্যবস্থাটা করা প্রথমেই দরকার। কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয় সক্রিয় ও স্বাভাবিক থাকলেও, যদি মাথাটা রোগগ্রস্ত হয়, তা হলে সবটাই বিকলেরই সামিল। ইলেকট্রনিকের যুগে বসে যদি বলি, তখনকার ঋষিরাও কম ছিলেন না। এই ছোট মাথাটার মধ্যে রেডিও-একটিভের যন্ত্রগুলি কে কোথায় আছে, তাঁরা বিচার করে গেছেন। এর মধ্যে তাঁরা দেখেছেন ৪০টি কোষ (Cell) আছে। এদের কাজের ভাগটাও অশুভূত। সবাইকেই কন্ট্রোল করছে মন, যেমন চিন্তার কাজের জন্য চারটি, স্মৃতির ৪টি, বাকপ্রবৃত্তির ৪টি এই রকম চির দর্শন অর্থাৎ কোন জিনিস চেনা বা মিলিয়ে নেওয়া; আর শব্দ শ্রবণের জন্য ৪টি আর আত্মাণের জন্য ৪টি এমনি প্রতিটি কাজের জন্য পৃথক পৃথক কোষ সক্রিয় হয়; এর মধ্যে যে কোষের যে প্রকোষ বিকল হয়ে যায় সেই অংশের কাজটাতেই অভাব হয়ে পড়লো। মনের কাজ স্বাভাবিক থাকলেও কোষ প্রকোষ যদি কার্যকর না থাকে তবে মনের কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না।

আয়ুর্বেদ মতে ১১ প্রকার রোগের দ্বারা এই কোষ্ঠ প্রকোষ্ঠগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব রোগোৎপত্তির মূলের কারণ থাকে—ধাতুক্ষয়, ক্রিমিরোগ, রক্তের বেগ অথবা স্তম্ভতা, অত্যধিক বমন হওয়া প্রভৃতি। এর পরিণতিতে আসে শিরোরোগ, তারপর মন নিজেও যখন গ্রস্ত হ'য়ে পড়ে তখনই সে আক্রান্ত হয় মূর্ছা ও অপস্মারে। অনেক সময় দেখা যায়—ছাড়া ফেরানো যাচ্ছে না সেটাও অনন্ত বাতের লক্ষণ; যদিও ওটা বাতব্যাধির অন্তর্গত। মূলতঃ ওখানে শিরোদেশের এবং গ্রীবার দু' পাশে মন্য নামক দু'টি শিরা আক্রান্ত হয় বলেই ওটা শিরোরোগের আওতায় পড়ে।

এইসব রোগে হিতকর ব্যবস্থা হিসেবে নানাপ্রকার ভেষজের প্রলেপ এবং ওসব ক্ষেত্রে উপবাস করা, শিরোবস্তি দেওয়া, রক্ত মোক্ষণ, মাথায় পাগুড়ী বাঁধা, পায়ে মোজা পরা, পদ্রানো ঘি মাথায় লাগানো।

তা ছাড়া মৃগ মসুরের শুষ্ক, মাংসের কেবল শুষ্ক, আর তরকারির মধ্যে পটোল, সজনের ডাটা, বেতো শাক, করলা উচ্ছে, ঘৃতকুমারী শাঁসের তরকারি; আর এদিকে মিষ্টি পাকা আম, আমলকী ও হরীতকীর মোরস্বা, দাড়িমের রস, ঘোল, নারিকেলের জল, বেণামূল বাটা মিশিয়ে সরবৎ, এবং বড় এলাচের দানায় মৃৎশুদ্ধি করা।

### অপথ্য ও অবিধি

হাঁচি, কাসি, হাই তোলা যে সব কারণে ঘটে, সেইটাই অবিধি, মলমূত্রের বেগ ধারণ, ঘুম এলেও না ঘমানো এবং দিনে ঘমানো, বাসি জল বা পদ্রানো কুয়োর জল মাথায় ঢালা, চোখে ঘন ঘন অঞ্জন দেওয়া, চোঁচিয়ে পড়া, এমন কি চোঁচিয়ে কথা বলা, অল্প আলোর পড়াশুনো বা কাজকর্ম করা, আর পেটে বায়ু হয় এমন খাদ্য খাওয়া, বেশী পথ হাঁটা, রৌদ্র লাগানো, কোন তীর গন্ধের ঘ্রাণ নেওয়া, এগুলি সব অপথ্য ও অবিধির পর্যায়ে পড়ে।

### অসুগ্দের বা রক্তপ্রদর

এর পথ্য বা অপথ্য সবই রক্তপিপ্তের মত, তবে রোগের ক্ষেত্রটি কেবলমাত্র রমণীদের জননকোষ্ঠের ক্ষতুগ্রস্তিতে সৃষ্টি হয় বলেই তার নাম অসুগ্দের বা রক্তপ্রদর বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আয়ুর্বেদে বলা আছে—

যং পথ্যং যদপথ্যশ্চ রক্তপিপ্তেষু কীর্তিতম্।

প্রদরেহপি যথা দোষং তত্তমারী ভজ্যে তাজেৎ॥

অর্থৎ রক্তপিপ্ত রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্যের কথা বলা হয়েছে প্রদর রোগাক্রান্ত নারীদের জন্য পথ্য এবং অপথ্য সেই সবই গ্রহণ করতে হবে এবং বর্জন করতে হবে।

### যোনি ব্যাপদ

[এখানে ব্যাপদ অর্থে রোগ]

নারীর শারীর বৈশিষ্ট্যের প্রধান ক্ষেত্র যে যোনি সেই স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হয় প্রধানতঃ এই কারণগুলিতে, যথা—অনুপযুক্ত আহার বিহারে, মাসিক ঋতুর অনিয়মে, পতি-পত্নীর মানসিক বিকারে, তা ছাড়া অসংযত পদ্রুশের সংগমজনিত দোষেও এই রোগ আসে।

আয়ুর্বেদ মতে এই রোগ ২০ প্রকার। এই রোগে আক্রান্ত হ'লে পথ্যাপথ্য হওয়া উচিত—যে সব জিনিসে বিকৃত বায়ুর প্রশমন করে এমন ধরণের আহার বিহারের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজন হলে কোন দ্রব্য ক্রাথ ক'রে উত্তরবিস্ত (ডুস দেওয়া)। আর পিচুধারণ Plugging Procedure করানো। এর পথ্যাপথ্য বিচার করতে দেখা দরকার যে কোন দোষের আধিক্য ঘটেছে এবং সেইটার প্রশমনের ব্যবস্থা প্রথমে করা।

### গর্ভণীরোগ

গর্ভটা তো আর রোগ নয়, তবে সেই সময় যে সব উৎপাত আসতে পারে, যেমন গর্ভটি ধরে রাখার ক্ষমতা না থাকায় গর্ভপ্ৰাব হ'য়ে যাওয়া, এটা কিন্তু ৮ মাস পৰ্যন্ত ঘটেতে পারে। এ সময়টায় আরও কতকগুলি রোগ এসে হাজির হয়,—যেমন রক্তাশপতা (পান্ডুরোগ), বলহানি, মাঝে মাঝে প্রাব, ইঠাৎ তলপেটটা টেঁসে বা খিঁচে ধরা ব্যথা, কোন সময় একাঙ্গগত কোন সময় বা সর্বাঙ্গ শোথ, পান্ডু, মলক্ষয়, মলের শৃঙ্খতা, যৌনি কণ্ডুতি (অসম্ভব চুলকোয়) এগুলি আসে।

### এ ক্ষেত্রে কি খাওয়া উচিত

সাধারণ পথ্য,—তবে বিশেষ হলো খইএর ম'ন্ড, যবের ছাতু, মাখন, ঘি, পাতলা ক'রে চিনির সরবৎ, পাকা কঠালের রস, পাকা কলা, আমলকীর মোরষা, কিসমিস, পাকা আম, যে কোন মিষ্টি ফল খাওয়া যায়। আর বমি বা বমি ভাব এইটাকে যতটা সংবরণ করতে পারা যায় সেটার চেষ্টা করা উচিত।

### অপথ্য কি

এ সময় ভাপ নেওয়া, বমি করা ভাল নয় (যদিও এ সময়টায় বমি ভাব আসে), মলমূত্রের বেগ ধারণ করা, কোন গরম জিনিস খাওয়া, উপবাস করা, পথপ্রশ্ন করা, বেশী ঝাল এবং মদ খাওয়া, চিত হ'য়ে শোওয়াও ভাল নয়। এ ভিন্ন কোন প্রকার যৌন আলোচনা করাটাও আহিত কার্যেরই সামিল।

### শিশুরোগ

আয়ুর্বেদে শিশুর 'সংজ্ঞা ৩ প্রকার (ত্রিবিধ); অর্থাৎ শিশুর বয়সসীমাকে ৩ ভাগে দেখা হয়। (১) দুগ্ধজীবী, (২) দুগ্ধামজীবী, (৩) অন্নজীবী। এখানে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থায় দুগ্ধজীবী শিশুর ক্ষেত্রে কেবল তার মাকেই চিকিৎসা করতে হবে, আর দুগ্ধামজীবীর জন্য উভয়কে, আর অন্নজীবীর জন্য সেই শিশুকেই ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে; তবে তার রোগ হ'লেই যে উপবাস রাখতে হবে সেটাও বিধি নয়, তবে পুরোপুরি অন্নজীবী হ'লে তার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই জন্য শিশুর এ ত্রিবিধ অবস্থা বিবেচনা করে তার পথ্যের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদীয় বৈদ্যগণ মনে করেন যে, শিশুরোগের কারণ গ্রহবৈগুণ্য, তাদের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় না, গ্রহদৃষ্টি অপসৃত হ'লেই রোগ সেরে

যাবে; কিন্তু যুক্তিবাদী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক বলেন, বিনা কারণে কোন ব্যাধির সৃষ্টি হয় না, তখন ব্যাধির অস্তিত্ব দেখেই তার কারণ নিরসন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

### বিষরোগ

এমন অনেক রোগ সৃষ্টি হয়, যেটার কারণ আমাদের অজ্ঞতা; তবে সেটা প্রত্যক্ষ ক্রিয়াতেও হ'তে পারে আবার সংযোগজ হ'য়েও হ'তে পারে; যেমন ধূতরোর বীজ প্রত্যক্ষ বিষক্রিয়া করে, আবার তামার বা কাঁসার পাত্রে ঘি রেখে সেটা খেলেও বিষক্রিয়া ঘটায়। এইটাই সংযোগজ বিষক্রিয়া। তা ছাড়া আছে কতকগুলি আগন্তুক বিষক্রিয়ার রোগ, এগুলিকে গরবিষোন্মত্ত রোগ বলা হয়। চলতি কথায় একে গরলও বলে।

কতকগুলি বিষজ ব্যাধি আছে যেগুলি দেহে দীর্ঘকাল অবস্থান করে; এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা দরকার যে বাত, পিত্ত, কফ কোন দোষের প্রাবল্য ঘটেছে, সেই দোষের উপশামক যে সব আহাৰ্য, সেগুলিকে পথ্য হিসেবে খেতে দেওয়া উচিত; তবে সাধারণ পথ্য হ'লো—কাগুনী ধানের চালের ভাত, মটর কলায়ের যুষ, তিল তেলের অথবা গাওয়া ঘি দিয়ে রান্না তরকারি হিসেবে বরবটি, বেগুন, পলতা, পুঁই শাক ও নটে শাক, রসুন, পাকা কয়েবেল, তিস্তাস্বাদের তরকারি ব্যবহার করা ভাল।

### বিষরোগে অপথ্য

রাগান্বিত না হওয়া, বিরুদ্ধ ভোজন, টক, লবণ, সরষের তেল, ডিম, স্বেদ বা ভাপ নেওয়া, দিনে ঘুমোনা, ধূমপান, অভ্যস্ত থাকা আর মদ।

### মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরোগ

দেহের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানই বলুন আর শ্রেষ্ঠস্থানই বলুন, সেটা হ'লো শিরোভাগ। তার মধ্যে আবার যেটা উৎকৃষ্টতম স্থান, সেটাই মস্তিষ্ক অর্থাৎ বার চলতি নাম 'ব্রেন' যাকে ইংরাজীতে বলে (brain), ওখানেই থাকে আমাদের ভাব, ভাষা, কর্মশক্তি, কর্মপ্রেরণা, মানবিক অমানবিক কর্মপ্রবৃত্তির উৎস। সেখানটায় ব্যাধি হ'লে সমগ্র দেহটাই অচল। দু'টি রোগ প্রধানভাবে এখানে হ'য়ে থাকে; একটি মস্তিষ্কে, আর একটি তার ধারক ও আবরক স্নায়ুকেন্দ্রে।

এই আবরক কেন্দ্রটি ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলেই অঙ্গ-বিস্তার রোগাক্রান্ত হয়, এরই কারণে হাত পা কাঁপে, এ রোগের উৎস কিন্তু ঐ স্নায়ুকেন্দ্রে।

আর মস্তিষ্কজাত রোগ হ'লে তার ভাব, ভাষা, কর্মশক্তি, কর্মপ্রেরণা সবই স্তম্ভ হয়ে যায়।

এগুলির মূলীভূত কারণ স্নায়ুপোষক ও মস্তিষ্কের পোষক দ্রব্য গ্রহণের অভাব। এ ক্ষেত্রে বিচিরা হ'লো এদের যত পোষণ করা যাবে, ততই তার সাত্ত্বিকতা বেড়ে যাবে, আর তার তমোগুণের ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হবে। অথচ খাদ্য হিসেবে অনেক দ্রব্যই তমোগুণাত্মক, এই যেমন ছোট কচ্ছপের মাংস (কুর্ম মাংস), রুই এবং মাগুর মাছ, দুধের সর ও দুধ, বাদাম, দুধ কলা (কাঁঠালী কলা হ'লে ভাল হয়), দুধ দিয়ে গমের পায়ের, কিসমিস, খোন্দ্যান, আঞ্জুর, ছোহারা, চিল-

গোজা, চি'রোঁজি (পিয়াল বীজ), আপেল, খেজুর, ডাবের জল, এ ছাড়া ঘিয়ে রান্না খাদ্য, চালকুমড়া, পাকা আম, দাড়িম, ঝুনো নারকেল কোরা।

### অপথ্য কি

বিষম আহার অর্থাৎ যেটা যতটুকু খাওয়া উচিত তা না থেয়ে, একটা জিনিস অর্থাৎ এক রসের (সে মিষ্ট, টক বাই হোক) আহার প্রচুর খাওয়া, অসময়ে খাওয়া এবং অধিক খাওয়া, রুদ্ধ দ্রব্য, বাল, তিক্ত আর কষায় দ্রব্য রোজ খাওয়া।

দিনে ঘুমানো, রাত্রি জাগা, মলমূত্রের বেগ ধারণ করা, যোগ্যতার অসমর্থ হ'লেও অপয়োজনীয় কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা, এসবই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরোগগুলিকে ডেকে আনে।

### বিরুদ্ধাচরণে বিপদ

গ্রাম বাংলায় একটা কথা চালু আছে—

‘ভাত খায় কি দে (কি দিয়ে)।

ভাত খায় ক্ষিধে॥’

এ কথাটারও কিন্তু একটা গ্যাজ রয়েছে, কেন বলছি?

অনেক সময় অতাপ্নি হ'লেও তো ক্ষিধে পায়; সেও তো এক ধরনের অগ্নি-মান্দ্য; সুতরাং ক্ষিধে হচ্ছে বলেই যে তা থেকে শরীরের পোষণ হবে এ কথা ভাবা উচিত নয়। আবার খাদ্যের বলেই যখন দেহের ও মনের বল, তেমনি খাদ্যের দোষেও তো এই দুটি ক্ষেত্রের হানি ঘটে।

বাঁচার জন্য চাই খাদ্য আর মরার জন্য চাই রোগ, কিন্তু এই রোগ আসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অহিত আহার-বিহারে। এই অহিত আহারটা স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় ও অপরের ইচ্ছায়ও হ'তে পারে, আবার অজ্ঞতাবশতঃও হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বক্তব্য আমরা অজ্ঞতাবশতঃ কি কি অহিতাচরণ করি। এর কুফল নিজে তো ভোগ করেই থাকি, তা ছাড়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও রোগটা উইল করে বাই, এমন কতকগুলি রোগও আছে; এই যেমন হাঁপানি, অর্শ, মধুমেহ, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা, অগম্মার, মূছা, উন্মাদ এই রকম আরও কয়েক প্রকার রোগও আছে। তা ছাড়া স্বকৃত দোষেও কতকগুলি রোগ হয়—যেমন পান্ডু (এনিমিয়া), গ্রহণী, আমাশা, শোথ, উদাবর্ত, বিসর্প, ক্লেব্য, আনাহ, রাত্যান্য (রাতকানা), ভ্রমরোগ (ভুল হয়ে যাওয়া), অরুচি প্রভৃতি; এ ভিন্ন বালিশে লালাপড়া, হাতে-পায়ের ডিমগুলি (মাংশপেশীগুলি) ব্যথা হওয়া, হাতে পায়ে জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাতিসার, ওঠা-নামায় হাঁপ ধরা, আমবাত, অজীর্ণ, জ্বরবোধ, মূখে জল ওঠা, ঘন ঘন ঢেকুর তোলা, ক্রিমির উপদ্রবে আক্রান্ত হওয়া, খোস, চুলকানি ও দাদে ভোগা, দাঁতের মাড়ীর যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি রোগগুলি সংযোগ বিরুদ্ধ, কাল বিরুদ্ধ, মাত্রা বিরুদ্ধ, সংস্কার বিরুদ্ধ, পাক বিরুদ্ধ প্রভৃতি অন্ততঃ ১৮ প্রকার বিরুদ্ধ ক্রিয়ার ফলেই এগুলি ঘটে থাকে।

তবে এটাও ঠিক যে, কতকগুলি এমন খাদ্য আছে যেগুলি স্বাভাবিক হিতকর, তবুও সেগুলি সংযোগ বিরুদ্ধ বা কাল বিরুদ্ধ হ'লে, তারাও রোগ সৃষ্টি করে।



যেমন জল, ঘি, মাখন, ছানা, দুধ, ভাত, রুটি, ফলের রস, বিশেষ ধরনের ফল, কয়েক প্রকার মাংস প্রভৃতি, এগুলি স্বাভাবিক হিতকর হলেও যদি সংযোগ, সংস্কার প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট হয় তবে তারাও অহিতকর।

এই হ'লো সাধারণ নিয়ম, বিশেষ নিয়ম হ'লো—বায়ুপ্রধান প্রকৃতির যা ভাল, পিত্তপ্রধান প্রকৃতির তা কি ভাল? আবার পিত্তকর যেগুলি—সেগুলি কি শ্লেষ্মা-প্রধান ব্যক্তির খুব ক্ষতিকর হয় না?

### সংযোগ বিরুদ্ধের ধারা কি

সংযোগ বিরুদ্ধ কি ভাবে হয়—এই যেমন মাছও মধুর রস (শরীরের পক্ষে পোষক যে রসটি) আবার মাংসও মধুর রস এবং দুধও মধুর রস—তাই বলে কি একসঙ্গে এই তিনটি খাওয়া চলে? এইটাই সংযোগ বিরুদ্ধ।

এইবার সংস্কার বিরুদ্ধ ও পাক বিরুদ্ধ সম্বন্ধে বলি—এই যেমন আপেল, ন্যাসপাতি, পেয়ারা, শসা, আম, জাম, তরমুজ, খরমুজ, ডালিম, খেজুর, জামরুল প্রভৃতি কাঁচা পাকা যেটাই খাওয়া হোক ক্ষতিকর হয় না, আর সিদ্ধ করে খেলেও সবই লব্ধপাক হয়, আবার এগুলি যদি মশলা দিয়ে রান্না করে তেল বা ঘি দিয়ে সাতলে খাওয়া যায় সে তো ক্ষতিকর হবেই, একেই সংযোগ বিরুদ্ধ ও পাক বিরুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। ঠিক এমনিই তো গাছের যে কোন ফল, যেমন লাউ, কুমড়া, পটোল, সজনের ডাটা, পেঁপে, আমড়া, চালতা, কলা, বেল এগুলি কি মশলা দিয়ে ঘি তেলে সাতলে তরকারি করে খাওয়া ভাল? এটা শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মতে এ পদ্ধতিতে খাওয়া অসমীচীন হ'লেও আমরা কিন্তু আবহমান কাল থেকে খেয়ে আসছি, এটা আমাদের আজকাল সাধ্য হ'য়ে গিয়েছে বলেই তে। তাই বলে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সংস্কার বিরুদ্ধ আহার আমাদের রোগের মাধ্যম হ'তেই পারে না।

এই যে মৃগ, মসুর, অড়হর, এগুলি রবি শস্য এবং ফল। এই সব ভাল রান্না করে খেতে ভয় পান অজীর্ণ রোগীরা কিন্তু কোন মশলা না দিয়ে যদি সিদ্ধ করা উপরের পাতলা য্বেটা খাওয়া যায়, তা হ'লে উপকার বই ক্ষতিকর হয় না, তবে সারাংশ খেয়ে হজম করার মত অগ্নিবল থাকলে খেতে দোষ কি? লব্ধ জিনিসটাকে গুরু করে খাওয়ার অভ্যাস এখন আমাদের মজাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একটা বলি—এই যেমন শাক, চরক সূত্রভূতের কালে অল্প সিদ্ধ করে জলটা ফেলে দিয়ে অল্প লবণ দিয়ে এবং ২/৪ ফোঁটা ঘি মিশিয়ে খাওয়ার বিধি ছিল (সাতলে নয়)। এর দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় না এ কথা বলা আছে। তবে আমাদের নান্য রকম মশলা খেয়ে খেয়ে পেটের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে শাক খাওয়ার কথা এখন বলতেই ভয় হয়ে যায়। এখন ভেবগুণিই হয়েছে মশলা, ওষুধে কাজ হবে কি?

এখনও ভারত এবং তৎসম্বন্ধিত অঞ্চল ছাড়া সব দেশেই তরকারি ও মাংস এক সঙ্গে সিদ্ধ করে তার য্বেটা খেতে দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। এটা কিন্তু ক্ষতিকর হয় না।

এইবার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি—দুধ, এটি স্বাভাবিক হিতকারী পানীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য; কিন্তু তার সঙ্গে চাল বা গম ও চিনি দিয়ে পাক করে গরম মশলা দিয়ে যদি খাই, তা হ'লে সে গুরুপাক তো হবেই, আর যে দুধ আধসের/তিন

পোয়া খেলেও ক্ষতিকর হয় না, কিন্তু সেইটাই যদি ক্ষীর করে খাওয়া হয় তখন তা পেটে সহ্য হয় না। এইটাই হ'লো সংস্কারে গুরু।

দই—এটি স্বাভাবিক উপকারী, কিন্তু কালবিরুদ্ধ হ'লে ক্ষতিকর, যেমন শরৎ, গ্রীষ্ম, বসন্তে দই খেতে নেই, এটি কালবিরুদ্ধ।

আর দইএর সংযোগবিরুদ্ধ হ'লো—ছাতু, পাকা বেলের শাঁস, বেসনের বড়া, শাক পাতা সিদ্ধ করে মিশিয়ে খাওয়া।

তারপর তরকারিতে দই দিয়ে রান্না করা, এটাও কিন্তু সংযোগবিরুদ্ধ।

এই সব সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য খাওয়ার ফলে হয় অজীর্ণ, আমদোষ, আর এই আমদোষ এমন ক্রুরভাবে বসে থাকে, যেটা সহজে বেরুতে চায় না।

ঘি (ঘৃত)—এও খুব স্বাভাবিক হিতকর। কিন্তু ওই ঘিয়ে সমান মাত্রায় মধু, গরম দুধ বা ফলের রস মিশিয়ে খেলে, সেটা হয় সংযোগবিরুদ্ধ; এর দ্বারা আসতে পারে রাত্রান্থা (রাতকানা), মাথা ভার, পেটে বায়ু এই সব রোগ। এই দৃষ্টিতে রান্না ডালকে ঘি দিয়ে সাঁতলানো ভাল না, তবে ঘি পরে মিশিয়ে দেওয়া ভাল।

নারিকেল—এর জল, শাঁস, কুরে নিয়ে তার দুধ খুব উপকারী, কিন্তু ঐগুলোকে যদি ঘিয়ে, তেলে, মশলা বাটার সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায়, এইটি ক্ষতিকর হয়।

আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাংলার গরম তরকারিতে, টকে, বড়ায় নারিকেল কোরা মিশিয়ে রান্না করা হয়, এটা কিন্তু হিসেব মত অসমীচীন, তবে চলছে—তাতে দোষ যে হয় সেইটাই জানিয়ে দিলাম। এই দোষে আসতে পারে মূত্রকৃচ্ছ্রতা; আবার স্বাভাবিকভাবে কিন্তু এটা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগেরই ওষুধ।

মাংস—স্বাভাবিকভাবে দেহের খুব পুষ্টি করে কিন্তু ওতে ভিনিগার দিয়ে মশলা মিশিয়ে ওটার বিরুদ্ধ গুণই হয়—এটা প্রাচীন ধারার অভিমত।

এবার বলি—খাদ্যগুলির সংযোগ বিরুদ্ধের প্রকার ভেদ—যদিও এই বিরোধের হিসেব হ'লো ৪০ প্রকার, তবে মোটামুটি হিসেবে ১৮ প্রকার। এ প্রসঙ্গটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রামাণ্য গ্রন্থ চরকে বলা হয়েছে সুত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ে আর সুশ্রুতের সুত্রস্থানের ২০ অধ্যায়ে।

### (১) দেশবিরোধ—

প্রথমেই বলে রাখি সেকালে ভেষজবিজ্ঞানীরা দেশকে মোটামুটি ৫ ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) জাঙ্গল দেশ, (২) আনুপ দেশ, (৩) ধন্বন দেশ, (৪) সাধারণ দেশ, (৫) পার্বত্য দেশ।

জাঙ্গল দেশ বলতে—যে দেশে গাছপালা কম, প্রচুর আলো-বাতাস। এ দেশটায় বায়ু এবং পিণ্ডের আধিক্য হয়, এখানে রোগও হয় বায়ু-পিণ্ডপ্রধান। এই যেমন বিহারের ও উড়িষ্যার কতকাংশ, ছোট নাগপুরের অঞ্চল বিশেষ, এই বাংলারও কতকাংশ, যেমন বীরভূম ও বাঁকুড়ার অঞ্চল বিশেষকে বলা যেতে পারে জাঙ্গল দেশ।

আনুপ দেশ—এখানে গাছপালা অনেক, এ দেশের মাটি হবে স্যাঁৎসেঁতে, নদী নালা ডোবায় ভরা, যেমন খুলনা, ২৪-পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জেলার আঞ্চলিক পরিবেশ; এখানে নারিকেল, কলা, তমাল, বেত, গাব এইসব গাছ বেশী জন্মে। এখানকার লোকের বায়ু ও কফের প্রাবল্য থাকে।

ধন্বন দেশ—যাকে বলা যায় মরুভূমিপ্রধান দেশ, এখানে গাছপালাও খুব বেশী হয় না, সাধারণতঃ দেখা যায় কাঁটা গাছ বেশী হয়। এখানকার লোকের দেহটা পিণ্ডপ্রধান হয়, এই সব অঞ্চলের লোকে ঘি, দুধ, মাখন খেতে ভালবাসে; এইটাই আয়ুর্বেদ মতে আরোগ্যকর দেশ।

**সাধারণ দেশ**—সাধারণ দেশ বলতে এখানে সব দেশেরই প্রকৃতি কিছু কিছু থাকে।

**পার্বত্য দেশ**—যেমন হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, চট্টগ্রাম, দার্জিলিং জেলার কতকাংশ। এখানকার লোকের আকৃতিটি একটু খর্বাকৃতি হয়। সব থেকে বড় কথা, যে দেশে থাকতে হবে সে দেশের আবহাওয়া, জল অর্থাৎ দেশ-প্রকৃতির উপযোগী যে সব ওষুধ ও পথ্য, সেগুলি গ্রহণ করতে হবে। না হলেই দেশবিরোধ হবে।

যেমন জাঙ্গল দেশের মানুষ স্নিগ্ধকর খাদ্য খায়, এ সব অঙ্গুলের লোকের রক্ত, তীক্ষ্ণ খাদ্য খেলে বাত, পেটের দোষ, আমাশা হয়ে যায়, তাই তারা পছন্দ করে ঠান্ডা জিনিস।

(২) **কালবিরোধ**—মানুষের জীবনে তিন কালে তিন দোষের বেগ আসে। যেমন বাল্যে পায় শ্লেষ্মা, যৌবনে পায় পিত্ত, আর বৃদ্ধকালে পায় বায়ু। আবার সমস্ত দিনটায়ও তিন কালের ছোঁয়াচ লাগে, সকালের দিকে শ্লেষ্মা, দুপুরবেলা পিত্ত, আর বৈকালের দিকে বায়ু। রাত্রির দিকটায়ও এই তিনের বিবর্তন ঘটে।

এই রকম হলো কালের স্বরূপ—বাল্যের আহার যেমন যৌবনে চলে না, তেমনি যৌবনের আহার বাল্যেও চলে না। এই কাল বিচার করে আহার যেমন দেহের ক্ষেত্রেও দরকার, তেমনি আহারিক কালের প্রাত্যহিক খাদ্যবিচারও এই ধরে করতে হয়; বয়সের কাল ধরে বালি—শৈশবে দুধ, যৌবনে দই, বার্বকো ঘৃত উপযোগী পানীয় খাদ্য। তাই বৃদ্ধকালে দই খাওয়া কি ভাল?

এমনি শীতকালের খাদ্যগুলিও গ্রীষ্মকালে খাওয়া ভাল নয়; আবার বর্ষাকালের খাদ্য শীতকালেও খাওয়া ভাল নয়।

(৩) **মাত্রাবিরোধ**—সমান মাত্রায় ঘি ও মধু খাওয়া ভাল নয় অথবা যত চিনি তত জল দিয়ে সরবৎ খাওয়াও ভাল নয়। এই যে আমরা সিরুণী (সিম্পী) তৈরী করে থাকি, সত্যি কথা বলতে কি, এটা কিন্তু মাত্রাবিরোধ ঘটরেই তৈরী করা হয়। এই পন্থাতিতে তৈরী করে কয়েকদিন খেলেই তার অগ্নিমান্দ্য, আমাশা না হয় উদাবর্ত রোগ হবেই।

(৪) **সাম্যাবিরোধ**—এই সাম্য ৪ প্রকার—(ক) গভ্রসাম্য, (খ) দেশসাম্য, (গ) কালসাম্য, (ঘ) ক্রিয়াসাম্য।

(ক) **গভ্রসাম্য**—মনে করুন আপনি মাতৃগভ্র থেকেই ভাত ডালের আহারে অভ্যস্ত হয়ে বড় হয়েছেন; হঠাৎ আপনি রুটি ছোলা বা যবের ছাতু খাওয়া আরম্ভ করলেন, এইখানেই আপনার সাম্যাবিরোধ ঘটতে থাকলো। এইটাই হ'লো গভ্রসাম্য।

(খ) **দেশসাম্য**—যদি বিলেতে বসে, ঘোলের সরবৎ আর ডাবের জল, মৌরির মিছরির সরবৎ খাওয়া যায় তবে অসুখ তো করবেই—এই যেমন পাজাবে লসিয়া না হলে তাদের শরীর থাকে না। এইটাকে বলা হয় দেশসাম্য।

(গ) **কালসাম্য**—গ্রীষ্মকালে খুব গরম মশলা দিয়ে মাংস, ডিম রান্না করে অথবা খুব গুরুপাক করে পিঠে-পুর্নি তৈরী করে খাচ্ছেন; এসব তো শীতকালের খাদ্য। সেটাকে গ্রীষ্মকালে খেলে অসুখ তো করবেই। এইটাকে বলে কালসাম্য।

(ঘ) **ক্রিয়াসাম্য**—ঠান্ডা ঘরে বসে যদি সরবৎ খাওয়া যায় কিংবা গরমে বসে যদি ঘি খাওয়া হয়, সেটাকেও যেমন দোষ, আবার চা পানের পর ঠান্ডা জল খাওয়াও বেশী ক্ষতিকর হয়, এটায় আমদোষ আসতে বাধ্য। এইটাই হ'লো ক্রিয়াসাম্য বিরোধ।

এই সব সাম্যাবিরোধের ফলস্বরূপ আসে হৃদ্যদৌর্বল্য ও শিরোরোগ।

৫) **অগ্নিবিরোধ**—যাদের স্বাভাবিক কারণে দেহের পাচকগ্নির বল কম, তাদের চিরজীব-২৩

যদি ঘি, মাংস, পায়ের প্রভৃতি গুরুদ্রব্য খাওয়ানো হয়, তাদের হবে ক্ষয়মূলক জ্বর, মাথার রোগ, উদ্ভ্রমিত উদারত এইসব।

(৬) দোষাবিরোধ—হ'য়েছে গাঁটে বাত, দেওয়া হ'চ্ছে ভাজা বালির বা গরম ন্যাকড়ার সেক (রসযুক্ত বাতে ফুলো থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া যায়)—এইটাই হয় দোষাবিরোধ।

(৭) সংস্কারবিরোধ—এটা পুবেই বলা হ'য়েছে।

(৮) বীৰ্যবিরোধ—এটাকে চলতি বাংলায় ঠিক বোঝানো যায় না, তবে উপমা স্বরূপ বলতে পারা যায় যে বরফ তো ঠান্ডা কিন্তু বীৰ্য্য সে উষ্ণ। এই রকম দুধ তো শীতল কিন্তু প্রকৃতিতে সে স্নিগ্ধ উষ্ণবীৰ্য্য, গরম তেল কিন্তু গরম নয়, সে প্রকৃতিতে শীতল। এই রকম দুধের সঙ্গে মাছ, মাংসের সঙ্গে দই, ঘিএ তেলে ভাজা তরকারির সঙ্গে দুধ বা দই মিশিয়ে কোন তরকারি রান্না করা—এইখানেই হয় বীৰ্য্যবিরোধ।

(৯) কোষ্ঠবিরোধ—যাদের ক্রুর কোষ্ঠ থাকে তাদের যদি কোন মৃদুবিরেচক দ্রব্য দেওয়া হয় সেইটাই হয় কোষ্ঠবিরোধ। এই রকম কোমল কোষ্ঠে কোন তীক্ষ্ণ বিরেচন দিলে সেইটাই হয় কোষ্ঠবিরোধ।

এর ফলে হৃদ্রোগ, হৃদ্রোগ যেন তাদের কাছে স্বাভাবিক হ'য়ে আসে; অথবা কোমল-কোষ্ঠ ব্যস্তির স্নেহস্বাদিগত রোগ হ'য়েছে, তাকে শোষক ঔষধ দেওয়া হলে, এর হৃদ্রোগ ও হাঁপানি অনিবার্য হ'য়ে দেখা দেয়।

(১০) অবস্থাবিরোধ—যাঁরা পরিশ্রান্ত, যৌন সম্ভোগে ক্লান্ত, এবং উপবাসক্লান্ত তাদিকে যদি বেলের শাঁস খেতে অথবা মেদস্বী, অলস লোককে পান্ডা ভাত, দই, কলা, সন্দেশ এই সব খেতে দিলে তাদের আমাশা রোগও ছাড়বে না আর এর সঙ্গে আসবে গ্রহণী রোগ (ক্লিগিক কোলাইটিস)। একেই বলে অবস্থা বিরোধ।

(১১) ক্রমবিরোধ—খেতে বসে আগে তেতো খাবে, না মিষ্টি খাবে অথবা কষা খাবে না নোনতা খাবে, না টুকু খাবে—এটা না জেনে যাঁরা আহাৰ করেন তাঁরা ক্রমবিরোধের জন্যে অগ্নিমন্দ্য রোগে ভোগেন।

(১২) পরিহারবিরোধ—এই ধরুন গরম চায়ের সঙ্গে মিষ্টি খেতে নেই অথবা ভাত খাওয়ার শেষে দই খেতে নেই কিম্বা মাংস ভাত বা মাংস লুচি খেয়ে দুধ বা ক্ষীর খেতে নেই অথবা দই খেতে নেই—এগুলি না জানার নামই পরিহারবিরোধ।

পরিহারবিরোধ না জানা থাকলে রক্তপিত্ত, শিরোরোগ এদের আসা অবশ্যম্ভাবী।

(১৩) উপচারবিরোধ—কোন ঠান্ডা ঘরে বা গরম ঘরে অথবা খোলা উঠানে বা হাওয়ায় ছাদে বসে, কি কি দ্রব্য খেলে সেইটি হবে দেহের উপযোগী, তা না জানা অথবা কায়িক বা মস্তিস্কের চালনা করে, তখন দেহের অগ্নি কি খাদ্য চায় তা না বুঝে উপবাস করা অথবা পেট ভরে খাওয়া এগুলি হ'লো উপচারবিরোধ। এতে হয় ক্ষয়, জ্বর, পাণ্ডু (এনিমিয়া), শোথ।

(১৪) পাকবিরোধ—কোন ফল কাঁচা খেতে হয়, কোন ফল পাকা খেতে হয় কিম্বা, ভাত, রুটি, লুচির সঙ্গে দই মিশিয়ে খেতে অথবা গুড়, চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। তা না জানার নাম পাকবিরোধ অর্থাৎ পরিপাকবিরোধ।

(১৫) সংযোগবিরোধ—যদিও এটা পথ্যাপথ্য প্রসঙ্গে বলছি, তবুও সংক্ষেপে একটু জানিয়ে রাখি। যেমন দইএর সঙ্গে ছাতু ও চিনি মিশিয়ে খাওয়া, রসুনের ফোড়ন দিয়ে কাঁচা কলার তরকারি, বেগুন পুড়িয়ে পেঁয়াজ, রসুন কুচিয়ে মেশানো, শাকে যোয়ান বাটার ফোড়ন দেওয়া, স্নিগ্ধবীৰ্য্যের কোন তরকারিতে কোন উষ্ণ বীৰ্য্যের

ফোড়ন দিয়ে খাওয়া—এই যেমন লাউএর তরকারিতে আদা বাটা দেওয়া, চালকুমড়োর স্ফোয় সরষেবাটা দেওয়া এইগুলি সংযোগবিরুদ্ধ।

(১৬) হৃৎবিরোধ—অরুচিতে খাদ্য অনিচ্ছায় বা অপরের ইচ্ছায় খাওয়া, অর্থাৎ কারও কোন বিষয়ে সংস্কার আছে অর্থাৎ সেটা কখনও সে খায়নি অথবা খেতে নেই এই ধারণা বন্ধমূল এ ক্ষেত্রে কোন দৈব আদেশ অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রভাবে—সেটা অনিচ্ছায় খাওয়ায় হৃৎরোগই হয়।

(১৭) সম্পদ-বিরোধ—এই যেমন খেজুর, বেল, আখরোট, বাদাম, মুলো, মুখো, টমাটো, আমড়া, চালকুমড়ো, চালতা, এগুলি কাঁচা ভাল না শুকনো ভাল, কাঁচ ভাল না পাকা ভাল, এই বিচার করে যারা না খান তারা প্রায়ই ক্রিমি ও অজীর্ণরোগে ভুগে থাকেন।

(১৮) বিধিবিরোধ—মানুষের সর্বাদিক বিচার করে আহার বিহার পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই চিকিৎসক, গুরু স্মার্ত—এঁরা অভিজ্ঞতা দ্বারা বিচার করে বা দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা হিতকর বিধিগুলি পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলিকে কুসংস্কার ভেবে যদি বর্জন করি তা হলে তার ফলস্বরূপ রোগ আসা সম্পূর্ণ সম্ভব—এই যেমন স্মৃতিতে ব্যবস্থা আছে—রাতে দই খেতে নেই, এটা সকলের ক্ষেত্রে ও গর্ভিণীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে দই ছাতু খাওয়া, রাতে খিচুড়ি ও পায়ের খাওয়াটা নিষেধ করা হয়েছে। এ ছাড়া তিথি ভেদে খাদ্য পরিহার করা—এইগুলি না মেনে চলার নামই বিধিবিরোধ।

রোগ ও পথ্যের উপসংহারে এইটুকু নিবেদন যে সামর্থ্য, দুধ, মূখ ও বাটি—এই চারটির সমন্বয় হলেই তবেই চুমুক দেওয়ার প্রবৃত্তিটি সার্থক হয়—সেই রকম চিকিৎসক, রোগী, রোগ ও পথ্য এগুলির যথাযথ সমন্বয় হলে তবেই তো রোগ সারবে?

তাই অনুরোধের সুরে খাদ্য ও পথ্যে এতগুলি বিরোধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করলাম।

www.boirboi.net



## রোগানুসারিণী সূচী

অকালপকতায়ঃ— নিম্ব-৪১, আম্র-১১৪, মদয়ান্তিকা-১৮৫

অকালবার্ধক্যেঃ— তুলসী-৭৭

অগ্নিমাম্বেঃ— আদ্রক-৫৭, সিদ্ধবার-১০০, মদন্তক-১৪৫, অগ্নিমম্ব-২০৫, সহদেবী-২২২, দাড়িম্ব-২৫১, গুড়ুচী-২৬৯

অজীর্ণেঃ— নিম্ব-৪০, রসোন-৫৪, অলাব্দ-৬০, আম্র-১১৫, মদন্তক-১৪৫, প্রসারণী-২০২, চণক-২০৬, দাড়িম্ব-২৫০, ২৫১, ভৃগরাজ-২৭৫, তিস্তদক-২৮৭

অতিসারেঃ— বাস্তক-১০, উপোদকী-১৮, আদ্রক-৫৮, বিম্ব-১০৯, আম্র-১১৫, জম্বু-১১৯, পম্ব-১৬৬ (পিপ্তজ), বম্বুর-২২৭, প্রসারণী-২০২, চণক-২০৬, দাড়িম্ব-২৫০

অনিদ্রায়ঃ— সূনিষলক-৭২, ধাত্রী-১২৮, মদয়ান্তিকা-১৮৫, দাড়িম্ব-২৫১, গন্ধনাকুলী-২৯৪, সর্পগন্ধা-২৯৯

অম্বদোৰ্ভোঃ— ভৃগরাজ-২৭৫

অপচীতে (গণ্ডমালা)ঃ— শোভাজন-৩২, দারুহরিদ্রা-২১৪

অপম্বারে (মৃগী)ঃ— সূনিষলক-৭২, শ্বেতচন্দন-৮০, মদন্তক-১৪৫

অম্বাপিত্তেঃ— গ্রীষ্মসুন্দরক-২০, পটোল-৩৫, নিম্ব-৪০, অলাব্দ-৬২, ধাত্রী-১২৭, বাসা-১০৭, ভৃগরাজ-২৭৫

অম্বশূলেঃ— যমদাত্তিকা-১৯৬, এরণ্ড-২৬১

অরুচিতেঃ— বাস্তক-১০, নিম্ব-৪১, আদ্রক-৫৮, সিদ্ধবার-১০০, জম্বু-১১৯, আড়কী-২৪০, তর্বাদক-২৪৪, দাড়িম্ব-২৫১, শারিবা-২৫৫, গুড়ুচী-২৬৯

অবর্দ রোগে (টিউমার)ঃ— উপোদকী-১৭, শোভাজন-৩২, সিদ্ধবার-১০৪, বাসা-১০৮, কদম্ব-১৬০

অশ্ব রোগে:— শোভাজন-৩২, নিম্ব-৪০, অলাব-৬২, বিল্ব-১১০, হরীতকী-১২০, বাসা-১৩৭, বংশ-১৫৪, পম্ব-১৬৬, ষমদাতিকা-১১৪, ১১৬, সহদেবী-২২০, প্রসারণী-২৩২, আঢ়কী-২৪০, শারিবা-২৫৫

অশ্বের রক্তপ্রাব নিবারণে:— বাস্তক-১৩, উপোদকী-১৭, সূকন্দক-৪৫, উদম্বর-১৩৩, দারুহরিদ্রা-২১৫, গুড়ুচী-২৬৯

অহিকেন (আফিং) বিষে:— কলম্বী-৯

আঁচিলের ঘারে:— এরণ্ড-২৬৩

আপ্গুল-হাড়ায়:— পটোল-৩৬, হরীতকী-১২০

আখাতজনিত ফোলা ও বেদনায়:— হাশ্টী-২৭, অগ্নিমল্ল-২০৫, গ্রীহস্তিনী-২৭৯

আধকপালিতে (অধাবভেদক):— উদ্দানক-১৫০

আখিরোগে (মেলানকোলিয়া):— সহদেবী-২২২

আম্বিক কতে:— বিল্ব-১০৯

আমসোবে দমকা দশে:— অগ্নিমল্ল-২০৫

আমবাতে:— তুলসী-৭৭, প্রসারণী-২৩২, গ্রীহস্তিনী-২৭৯

আমাজীর্ষে:— দাড়িম্ব-২৫০

আমশায় (সাদা ও রক্ত):— বাস্তক-১৩, রসোন-৫৪, আদ্রক-৫৮, দূর্বা-৯৮, বিল্ব-১০৯, আম্র-১১৪, জম্বু-১১৮, ধাত্রী-১২৮, মস্তক-১৪৫, বড়িগুয়াপান-১৬৯, অজর্দুন-১৭২, ষমদাতিকা-১১৪, সহদেবী-২২২, প্রসারণী-২৩২, দাড়িম্ব-২৫০, শারিবা-২৫৬, এরণ্ড-২৬১, ভৃগুরাজ-২৭৫, ধূস্তর-২৮৪, তিলদুক-২৮৯

আর্টারিওস্কেলোরোসিসে (ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা হ্রাসে):— রসোন-৫২, ষমদাতিকা-১১৫

আত্ব (খত) লাভে:— দূর্বা-৩৮

আহারে:— উপোদকী-১৭, শোভাজন-৩১, সূকন্দক-৪৫, রসোন-৫২, তুলসী-৭৭, হরিদ্রা-৯১, বস্তুর-২২৮, চণক-২৩৭, তিলদুক-২৮৯

ইন্দ্র বিষে:— উদ্দানক-১৫০

ইন্দ্রদশে (চাঁক):— সিদ্ধবার-১০৩, বংশ-১৫৫, ধূস্তর-২৮৪

ইন্দ্রদৈখিল্যে:— সূনিষয়ক-৭২

উকুন-নাশে:— বাস্তক-১৩, তাম্বল-২০০, ভৃগুরাজ-২৭৪

উভাপ নিবারণে (জ্বরে):— পম্ব-১৬৫

উদরাময়ে:— আম্র-১১৫

উদরীরোগে:— পটোল-৩৬

উদ্ভাদে:— কুশ্মাণ্ড-৬৭, ধূস্তর-২৮৩, গন্ধনাকুলী-২১৪, সর্পগন্ধা-২১৯

উপদংশে:— দাড়িম্ব-২৫১, শারিবা-২৫৬

উরুদশে:— বাস্তক-১৩

ঝাজুরোগে:— শেবতচন্দন-৮৩, দূর্বা-৯৮, অগ্নিমল্ল-২০৫



- ক) জ্বরের অনিয়মিততায়:— স্বাস্থ্য-২৭, পক্ষ-১৬৬, রক্তচন্দন-১৭৭, সহদেবী-২২২, শারিবা-২৫৫  
খ) জ্বরের ব্ৰহ্মতায়:— এরণ্ড-২৬১

একজিয়ার:— জলজমানী-১৮১, শারিবা-২৫৫, শ্রীহস্তিনী-২৮০  
এম্কাইলিয়ার:— রসোন-৫২  
এলাজিহতে:— হরিদ্রা-৯২

- কাটি (কোমর) বেদনায় ও শূলে:— এরণ্ড-২৬২  
কফজ রোগে:— তুলসী-৭৮, রুদ্রাক-৮৬, সিদ্ধবার-১০৩, তাম্বুল-১৯৯  
কফ-পিত্তাধিক্যে:— দাড়িম্ব-২৫১  
কর্ণমূলের শোধে:— রক্তচন্দন-১৭৭, বস্বদ-২২৭  
ক) কর্ণ বেদনায়:— তুলসী-৭৭  
খ) কর্ণ শূলে:— তুলসী-৭৭, এরণ্ড-২৬১, ধূস্তুর-২৮৫  
গ) পৃষ্ঠ-কর্ণে:— সুকন্দক-৪৬, সিদ্ধবার-১০৪, মদয়ন্তিকা-১৮৫, তাম্বুল-২০০, দারুহরিদ্রা-২১৫  
ঘ) কর্ণের রক্তপ্রস্রাবিত্তে:— রক্তচন্দন-১৭৭

- কাঁধের ব্যাধায়:— মদয়ন্তিকা-১৮৪, ধূস্তুর-২৮৪  
কাউর ঘায়ে:— উপোদকী-১৭  
কান্তিবর্ধনে:— স্বাস্থ্য-২৬  
কামলায়:— নিম্ব-৪০, অলাব-৬৩, মদয়ন্তিকা-১৮৪, অগ্নিমল্ল-২০৫, দারুহরিদ্রা-২১৫, আঢ়কী-২৪০, গুড়ুচী-২৬৯  
কালে:— বাস্তক-১৩, বাসা-১৩৪, রামবাসক-১৪১, বংশ-১৫৫, বস্বদ-২২৮, আঢ়কী-২৪০, শারিবা-২৫৫, এরণ্ড-২৬৪, গুড়ুচী-২৬৯  
কিডনির দোষে:— অগ্নিমল্ল-২০৫  
কাঁট দংশনে:— সুনিষগক-৭২, উদম্বর-১৩২, উদ্দানক-১৫০, শ্রীহস্তিনী-২৭৯  
কাঁটনাশে:— সিদ্ধবার-১০৩  
কুকুর বিষে (পাগল):— রসোন-৫২, উদম্বর-১৩২, বংশ-১৫৫, ধূস্তুর-২৮৩  
কুষ্ঠে:— শোভাজন-৩২, নিম্ব-৪০, সিদ্ধবার-১০৩  
কৃমিনাশে:— বাস্তক-১৩, নিম্ব-৪১, রসোন-৫১, কুম্ভাশ-৬৭, হরিদ্রা-৯১, সিদ্ধবার-১০৩, বাসা-১৩৭, কদম্ব-১৬০, সহদেবী-২২২, দাড়িম্ব-২৫১, এরণ্ড-২৬২, গুড়ুচী-২৭০, ভৃগুরাজ-২৭৫, ধূস্তুর-২৮৪  
কৃশতায় (কাশ্য):— স্বাস্থ্য-২৬, চণক-২৩৬, তর্বাদক-২৪৪  
কেশ কৃষিকরণে:— নিম্ব-৪১  
কেশনাশে:— দর্বা-৯৮, আম্র-১১৪  
কোষবৃদ্ধিতে:— কদম্ব-১৬০, অজর্ন-১৭৩, দারুহরিদ্রা-২১৫  
কোষ্ঠবৃদ্ধিতায়:— সুকন্দক-৪৫, অলাব-৬৩, কুম্ভাশ-৬৭, হরীতকী-১২৩, তর্বাদক-২৪৪, এরণ্ড-২৬২  
কোলেস্টেরল বৃদ্ধিতে:— অগ্নিমল্ল-২০৬

ক্যানসারের জালাদ্রাবে:— তিলদুক-২৮৯

কতে:— ছাণ্ডী-২৭, রসোন-৫২, দর্বা-৯৮, জম্বু-১১৯, কদম্ব-১৬১, যমদাতিকা-১৯৪, বম্বুর-২২৭

কতে (বিবাক্ত):— ছাণ্ডী-২৭, অলাবু-৬০, হরিদ্রা-৯২, মৃস্তক-১৪৫, রক্তচন্দন-১৭৮

কক কাসে:— অর্জুন-১৭২, রুদ্রান্তিকা-৩০০

কক্রে:— রসোন-৫১, কুশ্মাণ্ড-৬৭, উদ্দানক-১৫০, জলজমানী-১৮১, সহদেবী-২২২, রুদ্রান্তিকা-৩০০

খিলধরা (খল্লী):— সহদেবী-২২২

খল্লীকিতে:— বাস্তক-১০, সিদ্ধবার-১০০, আশ্র-১১৪, মদয়ন্তিকা-১৮৫

খোসে:— উপোদকী-১৭, বাসা-১০৮, শারিবা-২৫৬, এরণ্ড-২৬২

গনোরিয়া রোগে:— কলম্বী-৯, উপোদকী-১৮, শ্বেতচন্দন-৮২, জলজমানী-১৮০, বম্বুর-২২৮

গরল (গর) বিবে:— ধূস্তুর-২৮৪

গরুর প্রসব-করণে:— বংশ-১৫৪

গর্ভকরণে:— বংশ-১৫৪

গর্ভকালীন কোষ্ঠবন্ধভয়:— উপোদকী-১৮

গর্ভপাত নিবারণে:— পদ্ম-১৬৬

গর্ভপ্রাবে:— দাড়িম্ব-২৫০

গর্ভকিতে:— মদয়ন্তিকা-১৮৫, বম্বুর-২২৮

গলরোগে:— সিদ্ধবার-১০৪

গলাব্যথায়:— আশ্র-১১৫

গাত্রদৌর্গন্ধ্যে:— বিম্ব-১০৯, বাসা-১০৭, মদয়ন্তিকা-১৮৫, শারিবা-২৫৫

গৃদভ্রংশে:— পদ্ম-১৬৫

গৃহসীতে:— সিদ্ধবার-১০০, এরণ্ড-২৬২

গেটে বাতে:— সিদ্ধবার-১০০, বংশ-১৫৫, তর্বাদক-২৪৪, ২৪৫

ঘর্মনিবারণে:— ছাণ্ডী-২৬, শ্বেতচন্দন-৮০, উদ্দানক-১৫০

ঘায়ে:— হরীতকী-১২৪, দারুহরিদ্রা-২১৫

ক) কাটা ঘায়ে:— সদ্যোব্রণ দ্রঃ।

খ) ঘা লেয়ে বাওয়ার পর সাদা মাগে:— ভৃগুরাজ-২৭৫, তিলদুক-২৮৭

গ) ঘায়ে শোকা হলে:— রসোন-৫২, বংশ-১৫৫

ঘ) খেঁতলে গেলে:— উদ্ভম্বর-১০২

ঙ) নালী ঘায়ে:— উপোদকী-১৮, মদয়ন্তিকা-১৮৫

চ) পচা ঘায়ে:— উপোদকী-১৮, সূকন্দক-৪৬, জম্বু-১১৯, অর্জুন-১৭০, গড়ুচী-২৬৯

ছ) পোড়া ঘায়ে:— আশ্র-১১৪, হরীতকী-১২০, এরণ্ড-২৬০, তিলদুক-২৮৮

ঘামাচিতে:— তুলসী-৭৭, শ্বেতচন্দন-৮০

ঘুংড়ি কালিতে (হাঁপং কাপ্):— উপোদকী-১৭, রসোন-৫৪, শ্বেতচন্দন-৮০, সিদ্ধবার-১০০, রামবাসক-১৪১

চক্ষুরোগে:— ক) চক্ষু-উঠায়:— গ্রীষ্মসুন্দরক-২৩, হরিদ্রা-৯২, হরীতকী-১২৩, ধাত্রী-১২৮, মদয়ান্তিকা-১৮৫, এরণ্ড-২৬০, ভৃগুরাজ-২৭৫

খ) চক্ষু-প্রদাহে:— কদম্ব-১৬১

গ) চক্ষু-দ্রাবে:— দারুহরিদ্রা-২১৫, এরণ্ড-২৬০

ঘ) চক্ষুর-পার্শ্বকতে:— জলজমানী-১৮১

ঙ) ছানিতে:— অলাব্দ-৬৩, পদ্ম-১৬৬

চ) দৃষ্টি-কীণতায়:— নিম্ব-৪০, ধাত্রী-১২৮

ছ) পিচুটি পড়ায়:— গ্রীষ্মসুন্দরক-২৩, শোভাজন-৩২, নিম্ব-৪০, দারু-হরিদ্রা-২১৫

চর্মরোগে:— নিম্ব-৪০, রসোন-৫১, তুলসী-৭৭, দর্বা-৯৮, ৯৯, হরীতকী-১২৩, সিদ্ধবার-১০৩

চৰ্মপোক লাগায়:— রক্তচন্দন-১৭৭

চুল উঠায় (কেশ পতনে):— স্বাণ্টী-২৬, দর্বা-৯৮, মদয়ান্তিকা-১৮৫, ভৃগুরাজ-২৭৪, ২৭৫ (শ্বেতপ্রদর জনিত)

ছালিতে:— অলাব্দ-৬৩, ধুস্তুর-২৮৫

জন্ম নিয়ন্ত্রণে:— নিম্ব-৪১, তাম্বুল-২০০

জরায়ুচ্যুতিতে:— পদ্ম-১৬৫, মদয়ান্তিকা-১৮৫

জিহ্বাকতে:— সিদ্ধবার-১০৪, জলজমানী-১৮১, আড়কী-২৪০, শারিবা-২৫৬

জীবাশুন্যে:— বাসা-১৩৮

জৌকে ধরায়:— হরিদ্রা-৯২

জ্বরে:— ক) সাধারণ জ্বরে:— শোভাজন-৩২, নিম্ব-৪১, তুলসী-৭৭ (সর্দি সহ তরুণ জ্বরে), কদম্ব-১৬১, চণক-২৩৬

খ) আন্ত্রিক জ্বরে:— শ্রীহস্তিনী-২৭৯

গ) বিষজ জ্বরে:— রসোন-৫২

ঘ) জীর্ণ জ্বরে:— রসোন-৫১, গুড়ুচী-২৬৮

ঙ) পিত্ত জ্বরে:— পটোল-৩৬, শ্বেতচন্দন-৮২

চ) শ্লেষ্মজ্বরে:— শ্রীহস্তিনী-২৭৯

ছ) পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে:— অলাব্দ-৬২

জ) বাতজ্বরে:— গুড়ুচী-২৬৯

জ্বরের উপদ্রবে:— ক) অতিসারে:— স্বাণ্টী-২৭, জম্বু-১১৯

খ) দাহে:— রক্তচন্দন-১৭৭, এরণ্ড-২৬১

গ) পিপাসায়:— মৃদুতক-১৪৫, কদম্ব-১৬১

জন্মলা মেহে:— সুনিষক-৭১

টাক:— 'ইন্দ্রদ্যুত' প্রঃ।

ঠুনকো:— 'স্তন বিদ্রাধি' প্রঃ।

ডাক-হারা কোকিল:— স্বাণ্টী-২৭

ডায়াবিটিসে (মধুমেহ):— জম্বু-১১৯, যমদ্যুতিকা-১৯৬, আড়কী-২৪০, তিলদক-২৮৯

ভোৎলামিতে:— হরিদ্রা-৯১

দম্ব, রোগে:— শোভাজন-৩২, তুলসী-৭৭, রক্তচন্দন-১৭৭, তাম্বুল-২০০, ভৃগুরাজ-২৭৫

দন্তরোগে:— ক) দাঁত নড়ায়:— উদ্দানক-১৫০

খ) দাঁত পড়ায় (অকালে):— আম্র-১১৪

গ) দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ায়:— রক্তচন্দন-১৭৭

ঘ) দাঁতের মাড়ি ফোলায়:— শোভাজন-৩২, বম্বুর-২২৭, চণক-২৩৬

ঙ) দাঁতের মাড়ি হাজায়:— তর্বাদক-২৪৪

চ) দাঁতের মাড়ির ক্ষতে:— নিম্ব-৪১, জম্বু-১১৯, উদ্দম্বর-১৩২, তাম্বুল-১৯৯

ছ) দাঁতের মাড়ির দুর্বলতায়:— ভৃগুরাজ-২৭৫

দাহে:— অলাবু-৬২, সুনিসম্বক-৭২, আম্র-১১৪, মৃস্তক-১৪৫, রক্তচন্দন-১৭৭, বম্বুর-২২৮, চণক-২৩৬, আঢ়কী-২৪০

দুর্ঘটনাজনিত ফোলায়:— অগ্নিমল্ল-২০৫

দৌর্বল্যে:— গুলঞ্চ-২৭০

ধী-শক্তি রক্ষায়:— কুম্ভাশু-৬৭

নখকুনীতে:— আম্র-১১৪, মদয়ন্তিকা-১৮৪, তাম্বুল-২০০, তর্বাদক-২৪৫

নখরঞ্জিকায়:— মদয়ন্তিকা-১৮৪

নাভিপাকে:— শ্বেতচন্দন-৮৩

নাড়ীশূল্যে:— এরণ্ড-২৬২

নাড়ীর ক্ষীণতায়:— রুদ্রাক্ষ-৮৬

নাসারোগে:— তুলসী-৭৭

ক) নাসার্শে:— দূর্বা-৯৯

খ) নাগিকার রক্তপ্রাণে:— সুকন্দক-৪৫, আম্র-১১৪, রক্তচন্দন-১৭৭, দাড়িম্ব-২৫১

নদনছাল ওঠা রোগে:— রক্তচন্দন-১৭৭

পক্ষাঘাতে:— প্রসারণী-২৩২

পক্ষাকাঁটায়:— অর্জুন-১৭২

পশুর বদন্ত নিবারণে:— লবলী-২১১

পাঁচড়ায়:— আম্র-১১৫, বাসা-১৩৮, শারিবা-২৫৬

পাখুরী রোগে:— রসোন-৫১, শারিবা-২৫৬

ক) পিত্তপাখুরী রোগে:— হরীতকী-১২০

পাদমারী (পা ফাটায়):— আম্র-১১৪, ধূস্তুর-২৮৫

পান্ডুরোগে:— হরিদ্রা-৯১, অগ্নিমল্ল-২০৫, ভৃগুরাজ-২৭৫

পায়ের কড়ায়:— রসোন-৫৪

পায়োরিয়ারঃ— উপোদকী-১৮, অলাব্দ-৬৩, দর্বা-৯৮, মদন্তক-১৪৫, মদয়ন্তিকা-১৮৫, ভৃগুরাজ-২৭৫

পিত্তনাশঃ— পটোল-৩৩

পিত্ত-বিকৃতিজনিত রোগেঃ— বাস্তক-১৪, উদম্বর-১৩৩

পিত্তশূলেঃ— হরীতকী-১২৩, ধাত্রী-১২৮, এরণ্ড-২৬৩

পিত্ত-শৈল্য বিকারেঃ— অলাব্দ-৬২

পিপাসা-নিবারণেঃ— অলাব্দ-৬২, শ্বেতচন্দন-৮৩, হরিদ্রা-৯২, বিল্ব-১০৯, গুলঞ্চ-২৭০

পীড়াকারঃ— বংশ-১৫৫

পীনস রোগেঃ— দ্বাষ্ট্রী-২৭

পেটফাণারঃ— রসোন-৫১, কুম্ভাণ্ড-৬৮, ধাত্রী-১২৮, যমদূতিকা-১৯৫, এরণ্ড-২৬২

পেটব্যথারঃ— রসোন-৫১, সহদেবী-২২২

পেটের দোষেঃ— দ্বাষ্ট্রী-২৬, জম্বু-১১৯, গুড়ুচী-২৭০

প্রদরেঃ— আম্র-১১৪, বম্বুর-২২৮

প্রমেহেঃ— হরিদ্রা-৯১, জলজমানী-১৮০, দারুহরিদ্রা-২১৫, বম্বুর-২২৮, চণক-২৩৬, গুড়ুচী-২৭০

প্রদ্রাব-জ্বালারঃ— তুলসী-৭৭, জলজমানী-১৮০, যমদূতিকা-১৯৪

প্রদ্রাব-দোষেঃ— সুকন্দক-৪৫, সিদ্ধবার-১০৪, ধাত্রী-১২৮, অর্জুন-১৭৩, অগ্নিমল্ল-২০৬

প্রদ্রাব-ধারণে অক্ষমতারঃ— সুকন্দক-৪৫, জম্বু-১১৯

শীহা রোগেঃ— বাস্তক-১৩, আম্র-১১৫ (বিস্থিতে)

শ্লৈশ্মিকঃ— কুম্ভাণ্ড-৬৭

ক্ষিক ব্যাধিঃ— যম্বুর-২৮৪

ফেরিনজাইটিসেঃ— শ্রীহস্তিনী-২৮০

ফোড়ারঃ— কলম্বী-৯, পটোল-৩৬, নিম্ব-৪০, সুকন্দক-৪৬, শ্বেতচন্দন-৮৩, হরিদ্রা-৯২, সিদ্ধবার-১০২, উদম্বর-১৩২, বংশ-১৫৫, অর্জুন-১৭৩, রক্তচন্দন-১৭৮, জলজমানী-১৮১, তাম্বুল-২০০, অগ্নিমল্ল-২০৫, এরণ্ড-২৬২, যম্বুর-২৮৫

বংশানুক্রমিক রোগেঃ— উদ্দানক-১৫০

যমন নিবারণেঃ— নিম্ব-৪০, সুকন্দক-৪৬, শ্বেতচন্দন-৮৩, দর্বা-৯৮, বিল্ব-১০৯, আম্র-১১৪, জম্বু-১১৯, ধাত্রী-১২৮, কদম্ব-১৬১, যমদূতিকা-১৯৬, তর্বাদক-২৪৪, গুড়ুচী-২৭০

বলাধানেঃ— কদম্ব-১৬১, চণক-২৩৬

বসন্ত রোগেঃ— কলম্বী-৯, শোভাজন-৩১, পটোল-৩৬, আম্রক-৫৭, তুলসী-৭৭, শ্বেতচন্দন-৮৩, রুদ্রাক্ষ-৮৬, উদম্বর-১৩৩, বাসা-১৩৮, মদয়ন্তিকা-১৮৫, যমদূতিকা-১৯৪, লবলী-২১০, গুড়ুচী-২৬৯

বহুমুদ্রেঃ— নিম্ব-৪০, আম্র-১১৫

বাক্শ্ফুরণেঃ— দ্বাষ্ট্রী-২৭

বাগীতেঃ— শ্রীহস্তিনী-২৭৯

বাতরক্তেঃ— রক্তচন্দন-১৭৭, শারিবা-২৫৫, গুড়ুচী-২৬৯

শাতরোগে:— শোভাজন-৩১, রসোন-৫১, সিদ্ধবার-১০৪, প্রসারণী-২০২

বাতের ব্যাধায় ও ফোলায়:— রসোন-৫২, যমদ্যুতিকা-১৯৪, এরণ্ড-২৬৩, গুড়চী-২৬৯,

যুস্তুর-২৮৪, ২৮৫

বার্ধক্যের দুর্বলতায়:— সহদেবী-২২২

বিছা, ভীমরুল ও বোলতার কামড়ে:— কলম্বী-৯, তুলসী-৭৭, উদ্ভব-১০২, যুস্তক-১৪৫

বিরেচনে:— বাস্তক-১৪, পটোল-৩৬, এরণ্ড-২৬৩

বিসর্পে:— ধাত্রী-১২৮

বিছারে:— হরিদ্রা-৯১

বীৰ্য্যশক্তিতে (বাজীকরণে):— বংশ-১৫৫, বস্কর-২২৮

বৃক ধড়ফড়ানিতে:— অর্জুন-১৭২

বৃকশোথে:— আদ্রক-৫৮

বৃশ্চরোগে:— এরণ্ড-২৬২

বেদনানাশে:— কদম্ব-১৬১, যুস্তুর-২৮৪

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে:— তিলদ্রক-২৮৯

রক্তাইটিসে:— শ্বেতচন্দন-৮২

রূপ প্রলপে:— কদম্ব-১৬১

রূপে:— উপোদকী-১৭, দারুহরিদ্রা-২১৫, চণক-২৩৬

মচকানো ব্যাধায়:— হরিদ্রা-৯২, অর্জুন-১৭৩, যমদ্যুতিকা-১৯৪, বস্কর-২২৮

মদের নেশা কাটতে:— উপোদকী-১৭, যুস্তক-১৪৫

মধুমেহ:— 'ডায়াবিটিস' দ্রঃ।

মলম্বারের ক্ষতে:— সিদ্ধবার-১০২

মলবেগ না আসায়:— অগ্নিমল্ল-২০৫

মলের শূন্যতায়:— প্রসারণী-২০২

মলক বিভাঙনে:— সিদ্ধবার-১০৪

মলিন্তকের দুর্বলতায়:— গুড়চী-২৭০

মাথাধোরায়:— সহদেবী-২২২

মাথাধরায়:— সুকন্দক-৪৬, রসোন-৫২, শ্বেতচন্দন-৮৩

মাথাভারে:— এরণ্ড-২৬১

মাথার যন্ত্রণায়:— পটোল-৩৬, সিদ্ধবার-১০৫, রক্তচন্দন-১৭৭, এরণ্ড-২৬১

মাদকতানাশে:— যমদ্যুতিকা-১৯৬

মাদকতা বৃশ্চ করণে:— কদম্ব-১৬০

মদ্যক্ষতে:— জাণ্টী-২৭, নিম্ব-৪১, সিদ্ধবার-১০৪, কদম্ব-১৬০, ১৬১, মদরশ্মিতিকা-১৮৫, যমদ্যুতিকা-১৯৪, দারুহরিদ্রা-২১৫

মদ্যদৌর্গন্ধে:— পটোল-৩৬, উদ্ভব-১০২, কদম্ব-১৬০

মদ্যরোগে:— সুকন্দক-৪৬

মদ্যল্যাবণ্যে:— জাণ্টী-২৬, অলাব-৬৩

মদ্রুদ্ধে:— উপোদকী-১৮, কুম্ভাণ্ড-৬৮, দূর্বা-৯৮, বংশ-১৫৫, কদম্ব-১৬১, বস্কর-২২৮, প্রসারণী-২০২, দাড়িম্ব-২৫১, এরণ্ড-২৬১

মদ্রুরোধে:— পদ্ম-১৬৬

মদ্রশ্মলেঃ— এরণ্ড-২৬৩

মেচেতায়ঃ— অলাব্দ-৬৩, অর্জুন-১৭৩, দারুহরিদ্রা-২১৫, চণক-২৩৬

মেদ-বৃশ্চিকঃ— সিদ্ধবার-১০৩, যমদ্যুতিকা-১৯৫, অগ্নিমশ্ব-২০৬, এরণ্ড-২৬১  
২৬২, গড়ুচী-২৭০

মেধাহ্বাসঃ— রসোন-৫১, সূনিষলক-৭১, দাড়িম্ব-২৫১

মকুৎ বৃশ্চিকঃ— দাড়িম্ব-২৫১

মকুৎ ব্যাঘ্রঃ— নিম্ব-৪০

মকুতের ক্রিয়াছালেঃ— বাস্তক-১৩, গ্রীষ্মসুন্দরক-২২, হরিদ্রা-৯১

মকুয়া রোগেঃ— রসোন-৫২, কুম্ভাণ্ড-৬৭, রুদ্রাক্ষ-৮৬

যোনিফলঃ— সিদ্ধবার-১০৩

যৌবন রক্ষার্থেঃ— রসোন-৫১, শারিবা-২৫৫

যৌবনের উদ্দীপনা রোগেঃ— বিল্ব-১০৯

রক্তচাপ বৃশ্চিকঃ (রক্তগত মূর্ছা)ঃ— শোভাজন-৩১, পটোল-৩৬, সূনিষলক-৭২, গম্ব-  
নাকুলী-২৯৪, সপর্গন্ধা-২৯৯

রক্তচাপ হ্রাসেঃ— অর্জুন-১৭২

রক্তদান্তেঃ— দূর্বা-৯৮, জম্বু-১১৯

রক্তদৃষ্টিতেঃ— নিম্ব-৪০, তুলসী-৭৭, উদ্দানক-১৫০

রক্তপিত্তেঃ— সুকন্দক-৪৫, কুম্ভাণ্ড-৬৭, সূনিষলক-৭২, দূর্বা-৯৮, আলু-১১৫,  
উদ্ভব-১০৩, বাসা-১৩৭, পদ্ম-১৬৫, অর্জুন-১৭২, রক্তচন্দন-১৭৭, বস্মর্দ-  
২২৮, চণক-২৩৬, আঢ়কী-২৪০, দাড়িম্ব-২৫১

রক্তপ্রদরেঃ— দূর্বা-৯৯, উদ্ভব-১০৩, অর্জুন-১৭২, দারুহরিদ্রা-২১৫, দাড়িম্ব  
২৫০, তিলদুক-২৮৯

রক্তপ্রদবে ও জ্বরালয়ঃ— রক্তচন্দন-১৭৭

রক্তকর্করায়ঃ— নিম্ব-৪০, তুলসী-৭৭, অগ্নিমশ্ব-২০৬

রক্তাশ্মতায়ঃ— উপোদকী-১৮

রসগতবাতঃ— এরণ্ড-২৬১

রসায়নেঃ— ষাণ্টী-২৬, বংশ-১৫৫

রাতকায়ঃ— নিম্ব-৪০, রসোন-৫১, এরণ্ড-২৬১

রূপরাগেঃ— যমদ্যুতিকা-১৯৬

রূপ-লাবণ্যেঃ— ঞ্জি-২৬, বাসা-১৩৭, উদ্দানক-১৫০, চণক-২৩৬, ২৩৭

রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধেঃ— তুলসী-৭৬

লালামেহেঃ— নিম্ব-৪১, জলজমানী-১৮০, তিলদুক-২৮৯

লিঙ্গ-প্রদাহেঃ— উপোদকী-১৮

ল্য লাগলেঃ— সুকন্দক-৪৫, যমদ্যুতিকা-১৯৬

লোল-চর্মেঃ— মদয়ন্তিকা-১৮৫

শয্যাক্তেঃ— সিদ্ধবার-১০৩

শয্যামুদ্রেঃ— সিদ্ধবার-১০৪, জম্বু-১১৯

শরীরের জড়তাঃ— রসোন-৫১

শর্করা রোগেঃ— নিম্ব-৪০, বিম্ব-১০৯

শিরাগত্বাতেঃ— শোভাজন-৩১

শিরালক্ষ্যোচনেঃ— প্রসারণী-২০২

শিরোরোগেঃ— ভৃগুরাজ-২৭৪

শিশুরোগেঃ— ক) শিশুর অভির্গার ও ঝিমিতেঃ— বিম্ব-১০৯

খ) শিশুর কাসিতেঃ— তুলসী-৭৭

গ) শিশুর কেশদাহেঃ— নিম্ব-৪১

ঘ) শিশুর চুলকায়ঃ— সিদ্ধবার-১০৪, জলজমানী-১৮১

ঙ) শিশুর দৃষ্ণতোলায়ঃ— পটোল-৩২

চ) শিশুর পেটকামড়ানিঃ— তুলসী-৭৭, এরণ্ড-২৬৩

ছ) শিশুর মাথার ঝায়েঃ— শ্বেতচন্দন-৮৩, গুলুগু-২৭০ (অরুণিকা)

জ) শিশুর ঝকুত দোষেঃ— তুলসী-৭৭

ঝ) শিশুর রাতে জাগা মনে ঘুমানোতেঃ— কলম্বী-৯

ঞ) শিশুর সর্দিতেঃ— উপোদকী-১৮, তুলসী-৭৬

ট) শিশুর হাড়সার অবস্থা হলেঃ— রসোন-৫১

ঠ) শিশুর হিকারঃ— তিলদুক-২২৮

শীতপিত্তেঃ— উপোদকী-১৭, আদ্রক-৫৭, ধাত্রী-১২৮, ঝমদুতিকা-১৯৫

শুক্ৰভারল্যেঃ— কলম্বী-৯, রসোন-৫১, ৫২, বিম্ব-১১০, জলজমানী-১৮১, প্রসারণী-২০৩

শুক্ৰধারণেঃ— বিম্ব-১০৯

শুক্ৰমেহেঃ— অর্জুন-১৭২, জলজমানী-১৮০, মদরাস্তিকা-১৮৪

শুক্ৰ শোধনেঃ— কদম্ব-১৬১

শূল রোগেঃ— কুম্মাণ্ড-৬৭, শ্বেতচন্দন-৮৩, সিদ্ধবার-১০৩, চণক-২৩৬, গুড়ুচী-২৬৯

শোধেঃ— বাস্তুক-১৩, বিম্ব-১০৯, হরীতকী-১২৩, বংশ-১৫৫, মদরাস্তিকা-১৯৬, ভৃগুরাজ-২৭৫, গ্রীহস্তিনী-২৭৯

শ্বাস রোগে (হাঁপানিতে)ঃ— সূনিষক-৭১, হরিদ্রা-৯২, সিদ্ধবার-১০৩, হরীতকী-১২৩, বাসা-১০৭, বংশ-১৫৫, অর্জুন-১৭৩, অস্তমূল-১৯০, চণক-২৩৬, শারিবা-২৫৫, ধূস্তুর-২৮৪, ২৮৫

শ্বেতকণিকাধিক্যেঃ— ভৃগুরাজ-২৭৫

শ্বেতপ্রদরেঃ— দর্বা-৯৮, ধাত্রী-১২৮, অর্জুন-১৭২, মদরাস্তিকা-১৮৪, ১৮৫, দারু-হরিদ্রা-২১৫, দাড়িম্ব-২৫১

শ্বিত্রে (ধবলে)ঃ— অলাবু-৬৩, পম্ব-১৬৫, এরণ্ড-২৬৩

শ্লীশনেঃ— উপোদকী-১৮, হরিদ্রা-৯২, সহস্রবী-২২১

সন্ধ্যোরণেঃ— আদ্রক-৫৮, দর্বা-৯৮, জম্বু-১১৯, হরীতকী-১২৩, উদম্বর-১০২, এরণ্ড-২৬৩

সন্তান লাভার্থেঃ— দর্বা-৯৮

সর্দিতেঃ— সুকন্দক-৪৫, আদ্রক-৫৭, বিম্ব-১০৯, ঝমদুতিকা-১৯৪, ১৯৬

সর্দি-গর্মিতেঃ— নিম্ব-৪০



- সর্পবিষে:— সিদ্ধবার-১০৫, গন্ধনাকুলী-২৯৪, সর্পগন্ধা-২৯৮
- সিদ্ধির লেখা কাটাতে:— যমদ্যুতিকা-১৯৬
- সূতিকারোগে:— সিদ্ধবার-১০৪
- সোরিয়ালিঙ্গে:— গড়ুচী-২৭০
- স্তনের রোগে:— ক) স্তন-বিদ্রাবিতে (ঠুনকো):— কলম্বী-৯, সূকন্দক-৪৬, মদ্যতক-১৪৫, রক্তচন্দন-১৭৮, এরণ্ড-২৬০
- খ) স্তনের ক্ষতে:— বম্বদুর-২২৮
- গ) স্তনের বাধায়:— খুস্তুর-২৮৪
- স্তনের রোগে:— ক) স্তন্যশুদ্ধিতে:— সিদ্ধবার-১০৪
- খ) স্তন্যস্থলে:— কলম্বী-৯, শারিবা-২৫৬, এরণ্ড-২৬১
- স্তরোগজনিত দ্রাবে:— উদম্বর-১০০
- স্নায়বিক দূর্বলতায়:— ভৃগুরাজ-২৭৫
- স্বপ্নদোষে:— নিম্ব-৪০, জলজমানী-১৮০
- স্বরভঙ্গে:— হরিদ্রা-৯২, হরীতকী-১২০, গড়ুচী-২৬৯
- স্বদীহ্নাসে:— ঘাণ্ডী-২৭, রসোন-৫১, সূনিষরক-৭২, সিদ্ধবার ১০২, বিশ্ব-১০৯, সহদেবী-২২২, তর্বাদক-২৪৪
- স্বলজ দোষে মলরোধ ও আম্রদোষ হলে:— অগ্নিমল্ল-২০৫
- হাত-পা জ্বালায়:— পটোল-৩৬, জম্বু-১১৯, মদয়ন্তিকা-১৮৫, যমদ্যুতিকা-১৯৫, শারিবা-২৫৫
- হাজায়:— মদয়ন্তিকা-১৮৪, তাম্বল-২০০, বম্বদুর-২২৭, তর্বাদক-২৪৫
- হাসে:— তুলসী-৭৭, হরিদ্রা-৯২, লবলী-২১০
- হিষ্কার:— বাস্তক-১০, শোভাজন-৩২, সূকন্দক-৪৫, আম্রক-৫৮, শ্বেতচন্দন-৮০, ধাত্রী-১২৮
- হিমোপ্তোমিন পরীক্ষার জন্য:— মদয়ন্তিকা-১৮৪
- হৃৎকম্পনে:— গড়ুচী-২৬৯
- হৃৎশূল্যে:— পদ্ম-১৬৫
- হৃৎগতরোগে:— কুম্ভাণ্ড-৬৭, তুলসী-৭৮, রুদ্রাক-৮৪, অগ্নিমল্ল-২০৫, দাড়িম্ব-২৫১
- হৃদ্যৌৰ্ভল্যে:— বিশ্ব-১১০

For More E-Books, Visit,  
www.boiRboi.net